ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

শ্রীস্বপন মুখোপাধ্যায়
প্রীতিভাজনেষু

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ ঃ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
রসশেখর রাজশেখর
তারাশঙ্করের শিল্পিমানস (পরিবর্ধিত ২য় সং)
শরৎচন্দ্র ঃ জীবন ও সাহিত্য (২য় সং)
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজজিজ্ঞাসা (২য় সং)
অনন্য রবীন্দ্রনাথ (পরিবর্ধিত ২য় সং)
রঙ্গপ্রিয় রবীন্দ্রনাথ
কালকূট সমরেশ
রামকৃষ্ণ-সারদা অমৃতকথা
রবীন্দ্রসংগীতের উৎস সন্ধানে
রঙ্গপ্রিয় শরৎচন্দ্র
দশপুতুলের সংসার
বাংলাদেশের লেখকপঞ্জি
ভোরের রবি

সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ

শরৎসাহিত্য সমগ্র (২খণ্ড)
সমরেশ বসুর 'একান্ত সাক্ষাৎকার'
সমরেশ বসুর গল্পসমগ্র (২ খণ্ড)
সমরেশ বসুর গোগোল অমনিবাস
কালকূট রচনা সমগ্র (অখণ্ড)
কালকূট রচনা সমগ্র (২ খণ্ড)
কালকূট রচনা সংগ্রহ (৯ম ও ১০ম খণ্ড)
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর অপ্রকাশিত গল্প

ইতিহাসের অলিন্দ থেকে পিছনে ফিরে

ভারতের চারদিকে অবস্থিত প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর কথা বাদ দিলেও আরব সাগর, বঙ্গোপসাগর ও হিমালয়পর্বত-বেষ্টিত এই দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নয়নাভিরাম। কৃষিজ ও খনিজ বস্তুর সম্ভারেও ভারতের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ। তাই, সারা পৃথিবীর লুব্ধ মানুষেরা বারবার এই দেশের উপর আঘাত হেনেছে।

প্রাচীনকালে ভারতের শাসনব্যবস্থা ছিল শিথিল। এক-একটা এলাকায় ভিন্ন-ভিন্ন গোষ্ঠী শাসন করতেন। যোগাযোগ-ব্যবস্থার অপ্রতুলতা এবং কিছুটা ধর্মীয়, গোষ্ঠীগত ও আঞ্চলিক সংকীর্ণতাবাদের জন্য গোটা ভারতবর্ষ ছিল বহুধা-বিভক্ত শিথিল অনেকগুলো রাজ্যের একটি সম্মিলিত দেশ।

এই শৈথিল্য ও বিচ্ছিন্নতার সুযোগ নিয়েই বিদেশী আক্রমণকারীরা এদেশে ঢুকে পড়ত। এই দেশের উপর প্রথম আক্রমণকারী হিসেবে পারস্যের সম্রাট খৃস্টজন্মের পাঁচ শো বছর আগে ভারতের সীমানা পেরিয়ে প্রথমে ঢুকে পড়েছিলেন এদেশের শাসনব্যবস্থার অসতর্কতার সুযোগ নিয়েই।

ইতিহাসের পাতা ওল্টালে আমরা দেখতে পাই, পারস্যের সম্রাটের আক্রমণের প্রায় পৌনে দু'শো বছর পরে ভারত-অভিযানে আসেন ম্যাসিদন-সম্রাট আলেকজাণ্ডার। তার একশো পঁচিশ বছর পরে অর্থাৎ খৃস্টজন্মশতকে এদেশে যারা অনধিকার প্রবেশ করল, তারা কিন্তু কেউ রাজা-বাদশা নয়। তারা হল মধ্য এশিয়ার এক যাযাবর জাতি। ইউয়ে-চি। তারা এদেশের উত্তর পশ্চিমের ছোট্ট একটা অংশ দখল করে ভোগ করতে থাকল।

এদেরই পরবর্তী বংশধর কুশানেরা কিন্তু অল্পে সন্তুষ্ট থাকে নি। তারা ভারতের বিস্তৃত অংশে আধিপত্যবিস্তার করেছিল আনুমানিক আটচল্লিশ থেকে দু'শো কুড়ি খৃস্টাব্দ পর্যন্ত। ওদের মধ্যে কণিষ্ক তো ইতিহাসপুরুষের মর্যাদা পেয়েছেন। তাঁর রাজধানী ছিল বর্তমান পেশোয়ার এবং তাঁর রাজ্য পূর্ব আফগানিস্তান, কাশ্মীর ও পাঞ্জাবের অনেকটা অংশ জুড়ে বিস্তার লাভ করেছিল। ইনি পরে অবশ্য বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন এবং শিল্পকলা, স্থাপত্য, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাঁর যা অবদান, সেজন্য এদেশের জনসাধারণ তাঁকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাটের মর্যাদা দিয়েছে।

ইতিহাসের অলিন্দে দাঁড়িয়ে এরপর আমরা দেখি হুণদের। চারশো চুরাশি খৃস্টাব্দে ওরা ভারতের পশ্চিম দিকে গঙ্গার অববাহিকা প্রদেশ পর্যন্ত গ্রাস করে বসে। ওদের রাজধানী ছিল শকল বা শিয়ালকোট। ওরা অবশ্য ভারতের বুকে বেশি দিন থাকতে পারেনি। পারস্যের সঙ্গে যুদ্ধে পর্যুদস্ত হয়ে ওরা ভারতের মাটি থেকে ক্রমশ মুছে যায়।

এই যে ভারতের বুকে বারবার বিদেশী আক্রমণ, এই ধরনের আগ্রাসী প্রয়াসকে প্রবল বাধা দিয়ে, বিদেশী প্রভাব ক্ষুন্ন অথবা নিশ্চিহ্ন করতে যে সব ভারতীয় বীরেরা সমর্থ হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন পুরু বা পোরস্, চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত, যশোবর্মন, বলাদিত্য প্রভৃতি। বহিরাগত জাতিবর্গ শেষ পর্যন্ত ফিরে গেছে। আবার কেউ-কেউ ভারতীয়দের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশেও গেছে।

ইসলাম ধর্মের অভ্যুত্থান

ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হজরত মহম্মদ যখন ছ'শো বত্রিশ খৃস্টাব্দে লোকান্তরিত হন তখন মুসলমানেরা দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। তৎকালীন ভারতের খণ্ড-বিচ্ছিন্ন-বিশৃঙ্খল সমাজ-ব্যবস্থার সুযোগে ওরা এদেশে হানা দেয়।

মুহল্লার নামে এক মুসলমান আরব দেশ থেকে ভারত-অভিযানের বাসনায় ছ'শো চৌষট্টি খৃস্টাব্দে এদেশে এসেও বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি তার সাঙ্গোপাঙ্গোদের অসহযোগিতার ফলে। তারা মূলতান পর্যন্ত এসে আর এগোতে অস্বীকার করে এবং অনতিকালের মধ্যে দেশে ফিরে যায়। কিন্তু এই ঘটনার মাত্র সাতচল্লিশ বছর পরে আরব দেশ থেকে মহম্মদ কাশেম তাঁর সৈন্য-সামন্ত নিয়ে সিন্ধু প্রদেশ আক্রমণ করলে ওখানকার রাজা ডাহির পরাজিত হন। যুদ্ধে জয়ী হলেও কাশেম এদেশে বেশিদিন থাকেন নি। তিনি এদেশে কিছু সৈন্য রেখে অবশিষ্টদের নিয়ে ফিরে যান।

কিন্তু ওই সময়ে ভারতের সীমান্তের মাত্র দু'শো মাইল দূরে গজনীতে নতুন মুসলমান-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হল আলেপটিগিনের নেতৃত্বে। প্রমাদ গণলেন লাহোরের হিন্দু রাজা জয়পাল। ভাবী বিপদের আশঙ্কায় যুদ্ধের জন্য গজনী-অভিমুখে রওনা হলেন তিনি। প্রথমবার যুদ্ধের পরে উভয়পক্ষে একটা সন্ধি হল। কিন্তু আগ্রাসী আলেপটিগিন সন্ধির চুক্তি ভেঙে আবার যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। এবার জয়পাল পরাজিত হলেন।

ভারতের সীমান্ত উপকূলে যখন মুসলমান সম্রাটেরা বারবার আক্রমণ করছিলেন তখন হিন্দু রাজাদের অসীম শৌর্য ও বীরত্ব তাঁদের সেই আক্রমণ প্রতিহত করছিল। অথচ ওই একই সময়ে মুসলমান সম্রাটদের শাসন দক্ষিণ ইউরোপ দিয়ে শেষ প্রান্ত স্পেন পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল।

বারবার প্রতিহত করলেও মুসলমান সম্রাটদের আক্রমণ এদেশের মাটিতে বারবার আছড়ে পড়তে থাকে। একা গজনীর মামুদ-ই এক হাজার এক থেকে এক হাজার চব্বিশ খৃস্টাব্দের মধ্যে অর্থাৎ চব্বিশ বছরের মধ্যে সতেরো বার ভারতের নানা জায়গায় আক্রমণ করেছেন, লুঠ করেছেন। তারপর পনেরোশো ছাব্বিশ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ পরবর্তী পাঁচশো বছর ধরে ঘোর, দাস, খিলজি, তুঘলক, সৈয়দ, লোদী প্রভৃতি নানা বংশের আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটেছে এই ভারতের মাটিতে।

এরপর এল মোঘলেরা। পনেরো শো ছাব্বিশ খৃস্টাব্দে সম্রাট বাবর বসলেন দিল্লীর সিংহাসনে। বাবর থেকে আওরঙ্গজেব মোগল সাম্রাজ্যের শাসনাধীন ছিল দিল্লী। এর সময়-সীমা প্রায় দু'শো পঁয়ত্রিশ বছর। এই সময় মোগল রাজশক্তিকে বারবার রক্তাক্ত লড়াইয়ে নামতে হয়েছে শিখ, রাজপুত ও মারাঠী বীরদের বিরুদ্ধে। মোগল সাম্রাজ্যের দুর্যোগ ঘনিয়ে আসে শেষ চুয়ান্ন বছর। আওরঙ্গজেবের পর মহম্মদ শাহ্ তবু উনত্রিশ বছর রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন কিন্তু ওঁর পরবর্তীকালে যাঁরাই এসেছেন তাঁরা কেউ-ই পাঁচ বছরের বেশি সিংহাসনে বসতে পারেন নি। মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে পারস্যের সম্রাট নাদির শাহ্ দিল্লীতে যে হত্যা ও লুণ্ঠন চালিয়েছিলেন তা বর্বরতায় ও নৃশংসতায় তৎকালীন পৃথিবীতে নজিরবিহীন।

আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে যখন মোগল সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়েছিল তখন, সতেরো শো দুই খৃস্টাব্দে মুর্শিদকুলি খাঁ ছিলেন বাংলা, বিহার ও ওড়িশার সুবেদার। ওঁর মৃত্যু হলে অর্থাৎ উনি তেইশ বছর শাসন-পরিচালনা করার পর সুজাউদ্দিন হয়েছিলেন বাংলা ও ওড়িশার নবাব। তিনি গদীতে আসীন ছিলেন মাত্র চোদ্দ বছর। ওঁর মৃত্যুর পর সরফরাজ খাঁ মাত্র এক বছর গদীতে বসেছিলেন এবং তিনি সতেরো শো চল্লিশ খৃস্টাব্দে বিহারের নবাব নাজিম আলিবর্দী খাঁ কর্তৃক গিরিয়ার (রাজমহল) যুদ্ধে নিহত হন এবং আলিবর্দী বাংলার মসনদে নবাব হয়ে বসেন। তিনি শাসন পরিচালন করেন একাদিক্রমে ষোলো বছর। অতঃপর তাঁর শূন্য আসনে বসেছিলেন তাঁর দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা।

বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে

ইউরোপের পাঁচটি স্বতন্ত্র রাজ্য দূর প্রাচ্যের সমৃদ্ধ দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্য উপলক্ষে প্রাথমিকভাবে যাত্রা শুরু করলেও ক্রমে ভারতে রাজ্য বিস্তারের উপর সকলেরই আগ্রাসী দৃষ্টি পড়ে। এই প্রসঙ্গে আমাদের প্রথমেই মনে পড়ে ভাস্কো-দ্য-গামার নাম। উনি চোদ্দশো আটানব্বই খৃস্টাব্দের বিশে-মে ভারতের উপকূল কালিকটে উপনীত হন। ক্রমশ পর্তুগীজরা সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের পরিচয় দিতে থাকে। রাজ্যদখল করা এবং খৃস্টধর্ম প্রচার করাই ছিল ওদের মুখ্য উদ্দেশ্য। ওদের এই একতরফা প্রয়াসে বাদ সাধল আরব বণিকেরা। বাণিজ্য করার স্বার্থে ওদের সঙ্গে পর্তুগীজদের দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে উঠল। ভাস্কো-দ্য-গামা ভারতের মাটিতে পা দেবার দশ বছরের মধ্যেই পর্তুগীজদের সঙ্গে আরবদের নৌযুদ্ধ হল এবং আরবেরা হেরেও গেল। বিজয়ী হয়ে পর্তুগীজরা সাম্রাজ্য বিস্তারে মন দিল এবং নৌযুদ্ধের মাত্র দু'বছর পরে ওরা গোয়া দখল করল। প্রসঙ্গত বলা যায়, কোনো শ্বেতাঙ্গ জাতি কর্তৃক এইবারই প্রথম ভারতের একটি ভূখণ্ড অধিকৃত হল।

তখন দিল্লীর মসনদে লোদী বংশ অধিষ্ঠিত। পর্তুগীজরা একে-একে দমন, দিউ, পাঞ্জিম, সালসেট, হুগলী প্রভৃতি দখল করে। পনেরো শো নব্বই খৃস্টাব্দ থেকে পরবর্তী কুড়ি বছরে ওরা ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করেছিল। পরবর্তীকালে ওদের এই বাড়বাড়ন্তে ভাঁটা পড়ে।

এরপরেই মনে পড়ে ওলন্দাজদের কথা। ইউরোপে হল্যাণ্ডের আয়তন ছোট হলেও প্রাচ্যে বাণিজ্য-প্রচারের জন্য ষোলো শো দুই খৃস্টাব্দে ওরা একটি কোম্পানি গড়ে তুলল এবং মাত্র দু'বছর পরেই ওরা ভারতে কারখানা স্থাপন করল। ভারতবর্ষ যে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটি সোনার খনি ছিল, যোগাযোগের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও সমগ্র ইউরোপের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ক্ষমতা বিস্তারের মোহ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের লোভ দেখে তা সহজেই অনুমান করা যায়। অবশ্য ওলন্দাজদের মূল্য লক্ষ্য ছিল দূরপ্রাচ্যের মশলা বাণিজ্যের দিকে। ষোলো শো নয় সালে মাদ্রাজে ওরা কারখানা স্থাপন করল এবং তার মাত্র ষোলো বছর পরে বাংলার চুঁচুড়ায় এবং তারও সাতাশ বছর পরে পুনরায় মাদ্রাজে আরও কারখানা খুলল ওরা। কিন্তু ওই শতকের শেষ দশকে ওদের শক্তি স্তিমিত হয়ে পড়ল কারণ ওরা ষোলো শো ছিয়ানব্বই খৃস্টাব্দে সামরিক ব্যয় সংকোচের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।

হল্যাণ্ডের পর ডেনমার্ক। ওরা প্রাচ্যে বাণিজ্যের আশায় কোম্পানি গড়েছিল ষোলো শো ষোলো খৃস্টাব্দে। ওই সালেই ওরা ভারতে পদার্পণ করলেও আরও চার বছর পরে কুঠীস্থাপন করল ট্রাঙ্কোবারে। পঁয়ত্রিশ বছর পরে ওরা বাংলায় এসে শ্রীরামপুরে আর একটি কুঠীস্থাপন করেছিল। কিন্তু ওরা কখনও তেমন একটা কিছু শক্তিসঞ্চয় করতে পারেনি। আঠারোশো পঁয়তাল্লিশ সালে ওরা ওদের সব সম্পত্তি ইংরেজকে বিক্রী করে দিয়ে ভারত থেকে পাততাড়ি গুটোয়।

এরপর ফরাসীদের পালা। ষোলো শো তেত্রিশ খৃস্টাব্দে ভারতের উপকূলে প্রথম ফরাসী জাহাজ পৌঁছয়। মাত্র এক বছর পরে ওরা এদেশে প্রথম কোম্পানি স্থাপন করল এবং আরও তিন বছর পরে এল ওদের বাণিজ্যপোত। এর এক বছর পরেই ওরা সুরাটে প্রথম কুঠীস্থাপন করল। এরপরে শুরু হল ওদের সাম্রাজ্যবিস্তারের পালা। একে-একে ওরা সম্পত্তি দখল করতে থাকল পণ্ডিচেরী, মাহে, কারিকল, চন্দননগর ও মাদ্রাজে। এজন্য তাদের যুদ্ধ করতে হয়েছে ভারতীয় রাজা, নবাব এবং বিদেশী শক্তি পর্তুগীজ ও ইংরেজদের সঙ্গে। সতেরোশো একত্রিশ খৃস্টাব্দে ডুপ্লে এদেশে আসার পর ওরা ভারতের বিভিন্ন স্থান দখল করায় আরও উৎসাহী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ফ্রান্স রাজ্যবিস্তারনীতি পরিবর্তন করায় ভারতে তার শক্তি সংকুচিত হয়ে পড়ে।

জার্মানীর সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের কিছু পরিচয়ও ভারত পেয়েছে। ওদের অস্টেন্ড কোম্পানি দুটো ছোট জায়গা অধিকার করেছিল। অবশ্য এর জন্য ওরা বিক্রেতাকে নগদে কিছু টাকা দিয়েছিল। এই দুটো জায়গার মধ্যে একটা ছিল বাংলায়। কিন্তু ওরা ওদের দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যার জন্য এবং

এদেশে অন্যান্য সব বিদেশী কোম্পানির সম্মিলিত আক্রমণের ফলে ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এদেশে ওদের ব্যবসা-বাণিজ্যের আয়ুষ্কাল সতেরো শো বাইশ খৃস্টাব্দ থেকে পরবর্তী পাঁচ বছর মাত্র।

এরপর প্রবল দাপটে শুরু হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকারের সুদীর্ঘ একশো নব্বই বছরের শাসন ও শোষণের পালা।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হয়েছিল ষোলো খৃস্টাব্দের শেষে। তখন ছিল রাণী প্রথম এলিজাবেথের রাজত্বকাল। এই কোম্পানি গড়ার মূল উদ্দেশ্য ছিল রেশম, কার্পাস এবং হীরের মতো মূল্যবান আকরিক ধাতুর বাণিজ্য করা।

ভারতে এসে ওরা অন্যান্য বিদেশী শক্তি বিশেষত ফরাসীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও শত্রুতার মুখোমুখি হয়েছিল। অন্যদিক থেকে এদেশে ওরা সাম্রাজ্যবিস্তারের সুযোগ পায় ভারতীয় দেশীয় রাজন্যবর্গের আত্মকলহের জন্য।

ষোলো শো তেরো খৃস্টাব্দে ইংরেজ প্রতিনিধি বাদশাহ জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে এক ফরমান বলে সুরাট, খোগা, আহম্মদাবাদ ও কাম্বেতে ব্যবসা-কেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি সংগ্রহ করে। মাত্র দু'বছর পরে ওরা সমস্ত মোগল-সাম্রাজ্যে বিনা বাধায় বাণিজ্য করার অনুমতি পেল দিল্লীর বাদশাহের কাছ থেকে। এই সুযোগে মাত্র তিন বছর পরে ওরা মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত আগ্রা, আহম্মদাবাদ, বুরহানপুর, বরোচ, সুরাট, মস্‌লিপট্টম ও নেগামপট্টমে ফ্যাক্টরি বা ঘাঁটি স্থাপন করল।

এইবার সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ এদেশে প্রভুত্ব বিস্তার করার জন্য কতকগুলো সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা হাতে নিল। ষোলো শো বাইশ খৃস্টাব্দ থেকে ওরা ওদের কর্মচারীদের ফৌজদারী অপরাধঘটিত শাস্তির ভার দেশের শাসনকর্তার হাত থেকে নিজেদের হাতে তুলে নিল এবং আরও ছেচল্লিশ বছর পর থেকে গুরুতর অপরাধে ভারতীয় আইনের শাস্তি থেকে রক্ষা করবার জন্য ওদের কোনো কর্মচারী আসামী সাব্যস্ত হলে তাকে খাস ইংলণ্ডে পাঠিয়ে দেওয়ার হুকুম আসে। ইত্যবসরে ষোলো শো পঁয়তাল্লিশ খৃস্টাব্দে ওরা সমগ্র মোগল সাম্রাজ্যে বিনা শুল্কে ব্যবসার অনুমতি লাভ করেছিল এবং তারও চৌত্রিশ বছর পরে ওরা বোম্বাইতে নাগরিকদের ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর কর আদায় করার অনুমতি পেয়েছিল। পলাশীর যুদ্ধের অনেক আগেই ওরা মাদ্রাজে দুর্গ নির্মাণ করেছিল ষোলো শো চল্লিশ খৃস্টাব্দে। তার উনত্রিশ বছর পরে বোম্বাইতে এবং বোম্বাইয়ের সাতাশ বছর পরে কলকাতায় ওরা আরও দুটো দুর্গ নির্মাণ করে সাম্রাজ্যবিস্তারের ভাবী পরিকল্পনার কথা মনে রেখে। এরই মধ্যে ষোলো শো একষট্টি খৃস্টাব্দে দ্বিতীয় চার্লসের কাছ থেকে কোম্পানির কাছে এল অতিরিক্ত পরোয়ানা। এই পরোয়ানার ফলে তখন থেকে ওরা বিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, শান্তি-চুক্তি প্রভৃতি করার অধিকার পেল।

কোম্পানি বাদশাহ আওরঙ্গজেবের অনুমতিক্রমে সুতানটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর—এই তিনটি গ্রাম কিনে নিল ষোলো শো উননব্বই খৃস্টাব্দে। ইজারা পত্তন নয়, তখন ইংরেজ দস্তুরমতো ভারতের জমির মালিক।

এরপর বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁয়ের বিরুদ্ধে কোম্পানি দিল্লীর ফররুখশিয়ারের কাছে নালিশ করেছিল এবং কলকাতার কাছে অবস্থিত অতিরিক্ত আটতিরিশটি জনপদ কিনে নিতে সক্ষম হল সতেরো শো পনেরো খৃস্টাব্দে।

সিরাজউদ্দৌলার শাসনসংক্রান্ত দুর্বলতার সুযোগে কিছু ধূর্ত শঠ স্বার্থান্বেষী পারিষদবর্গের কুপরামর্শে দেশের অস্থির অবস্থার চূড়ান্ত সুযোগ নিতে এগিয়ে এল আগ্রাসী ইংরেজ। নবাবের রাজ্যে গুরুতর অপরাধে দণ্ডিত হবার কথা রাজা দুর্লভচাঁদের পুত্র কৃষ্ণদাসের। সে পালিয়ে ইংরেজের কুঠীতে আশ্রয় নিল। ওকে সমর্পণ করার জন্য নবাবের সমস্ত অনুরোধ ও আদেশ উপেক্ষা করল ইংরেজ। তখন ওদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়া ছাড়া নবাবের গত্যন্তর রইল না। সতেরো শো ছাপ্পান্ন খৃস্টাব্দের ষোলো থেকে বিশে জুন পর্যন্ত নবাবের সৈন্য কলকাতা অবরোধ করে রাখল এবং ইংরেজ তখন পালিয়ে প্রাণরক্ষা করেছিল। অবশ্য, পরের বছরের জানুয়ারী মাসেই ইংরেজ কলকাতা দখল করে নেয়।

অতঃপর নবাবের সেনাপতি মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় পলাশীর যুদ্ধে সতেরো শো সাতান্ন সালের তেইশে জুন নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত হন এবং সেই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে দুই বীর সেনানী মীরমদন ও মোহনলাল নিহত হন। অতঃপর সিবাজউদ্দৌলাকে হত্যা করা হল এবং ইংরেজ মীরজাফরকে গদীতে বসাল।

এর মাত্র বার বছর পরে ইংরেজ হল বাংলার গভর্নর। এদেশের দেওয়ানী ও ফৌজদারী শাসনের ভার ওরা নিজেদের হাতে তুলে নিল। অতঃপর ওরা মীরজাফরকে গদীচ্যুত করে মীরকাশিমকে সেই আসনে বসাল। আবার মীরকাশিমকে সতেরো শো চৌষট্টি সালের দশই অক্টোবরে বক্সারের যুদ্ধে হারিয়ে মীরজাফরকে গদীতে বসানো হল। মাত্র কয়েকমাস পরেই তাঁর মৃত্যু হল। তখন সতেরো শো পঁয়ষট্টি সালের তেসরা মে থেকে ইংরেজ বাংলার সর্বেসর্বা হয়ে গদীতে বসল। বাংলার নাম-মাত্র নবাব, মীরজাফর-পুত্র, নাজিমুদ্দৌলাকে বাৎসরিক অর্থ সাহায্যের পরিবর্তে ইংবেজ তাঁর সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হল এবং অন্যদিকে দিল্লীর বাদশাহের কাছে দেওয়ানী ও নিজামত অর্থাৎ আর্থিক সংস্থা ও সেনাবিভাগের পূর্ণ অধিকার লাভ করে প্রকৃত শাসনকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হল।

শাসনের নামে শোষণ ও নির্যাতনের সূত্রপাত

এইবার শুরু হল সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের আর্থিক যথেচ্ছাচারিতা ও শিল্পনাশ। সতেরো শো চৌষট্টি সালে বাংলার নবাবের আমলে যেখানে রাজস্ব ছিল আট লক্ষ সতেরো হাজার পাঁচ শো তিপ্পান্ন পাউণ্ড, ইংরেজ সরকারের এই আদায়ের পরিমাণ মাত্র ত্রিশ বছর বাদে হয়েছিল ছাব্বিশ লক্ষ আশি হাজার পাউণ্ড। প্রতি পাউণ্ডের ভারতীয় মুদ্রায় তখন মূল্য নির্ধারিত হত দশ টাকায। ইংলণ্ডে ভারতীয় বস্ত্রের উপর উচ্চতম শুল্ক ধার্য করায় আমদানি বন্ধ হল। সঙ্গে সঙ্গে বিনা শুল্কে ম্যাঞ্চেস্টার ও ল্যাঙ্কাশায়ারে তৈরি বস্ত্র ভারতে আসতে লাগল। তাঁত-চরকা প্রায় বন্ধ হয়ে গেল, দেশী তাঁতের জায়গা দখল করল বিদেশী সুতো। বিজ্ঞানের নিত্য নতুন আবিষ্কার, শিক্ষা বিস্তার, রেলের সাহায্যে দূর-দূরান্তরের যাতায়াতের সুযোগ ইত্যাদি ইংরেজের সাম্রাজ্যবিস্তারে সহায়ক হল।

ওদের স্বচ্ছলতা এল এদেশের মানুষের শ্রম ও অর্থের বিনিময়ে। এই গ্রন্থের পরবর্তী অংশে ক্রমান্বয়ে এই অত্যাচার শোষণ বৈষম্য ও অপশাসনের বিস্তৃত ইতিহাস যখন আমরা তুলে ধরব তখন জানা যাবে কীভাবে সাম্রাজ্যবাদী শাসক ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতেব মানুষেরা স্বাধীনতা যুদ্ধে দীর্ঘদিন নিরবচ্ছিন্ন লড়াই চালিয়েছেন। ওদের অত্যাচারের বিচিত্র সব নমুনা ঃ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসন আরোহণের ষাট বৎসর পূর্তি উপলক্ষে লণ্ডনে বিরাট উৎসব হল। তার একটা মোটা টাকা বহন করতে হল ভারতকে উৎসবের খরচ হিসেবে। উনিশ শো তিন সালে সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠিত হল দিল্লীতে। সেই উপলক্ষে ভারতের ব্যয়ভার ধার্য করা হল কয়েক লাখ টাকা। অথচ এই ঘটনার মাত্র তিন বছর আগে এদেশের ব্যাপক অঞ্চলে দুর্ভিক্ষে মারা গিয়েছিল লাখ-লাখ লোক।

ইংরেজ তার ব্যবসা বিস্তারের স্বার্থে ভারতীয় শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী পাইয়ে দেবার প্রতিশ্রুতিতে সুদূর ফিজি, ত্রিনিদাদ, মরিশাস, সুরিনাম, বৃটিশ ও ডাচ গায়ানা প্রভৃতি দূর-দূরান্ত দেশে পাচার করেছিল। ওই শ্রমিকেরা স্বল্প মজুরীতে ওই সব দেশে চা, আখ, তুলো প্রভৃতি ফসলের আবাদ করেছে। ওরা খনিতেও কাজ করেছে। চূড়ান্ত অব্যবস্থা ও অসুস্থতায় অনেকে মারাও যেত। পৃথিবীর নানা দেশে ভারত থেকে নারী ও শিশু পাচার করতে ইংরেজ সরকারের বিবেকে বাধেনি। বিচার ব্যবস্থাও নিরপেক্ষ ছিল না। দ্বৈত শাসন ও বিচার-ব্যবস্থা চালু ছিল সাম্রাজ্যবাদী শাসক ইংরেজ আর ভারতীয় নেটিভ সম্প্রদায়ের মধ্যে। এইসব অপমানের জ্বালা থেকেই ভারতীয়দের বুকে ক্রমশ জেগে উঠেছে বিক্ষোভ, জ্বলে উঠেছে বিদ্রোহের আগুন।

পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তী পঁচিশ বছর

পলাশীর প্রান্তরে সেদিন যা ঘটেছিল তাকে যুদ্ধ নয়, যুদ্ধের প্রহসন বলা চলতে পারে। দু'পক্ষ মিলিয়ে সাকুল্যে এক হাজারের মতো লোকও ওই যুদ্ধে হতাহত হয়নি। ঘুষ, জালিয়াতি, নরহত্যা, মিথ্যাচার ছিল সেদিন ইংরেজদের সম্বল, অন্যদিকে অর্থলোভ, অপদার্থতা, বিশ্বাসঘাতকতা ও দেশদ্রোহিতা ছিল সিরাজউদ্দৌলার শিবিরের প্রধান উপকরণ। তবে যুদ্ধ ব্যাপক আকারে হোক বা না হোক, সেদিনের সেই প্রহসনে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হল বিদেশীদের হাতে আর সেই ক্ষমতা পরবর্তী একশো নব্বই বছর ব্যাপী এদেশের মানুষের আর করায়ত্ত হয়নি।

স্বাধীনচেতা মীরকাশিমকে পলাশীর যুদ্ধের মাত্র তিন বছর পরে বিশ্বাসঘাতক ও অপদার্থ মীরজাফরকে সরিয়ে ইংরেজরাই গদীতে বসিয়েছিল। ওঁকে ইংরেজরা হাতের পুতুল ভেবেছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বিনা শুল্কে ব্যবসা করার অধিকার আগেই পেয়েছিল। এইবার ইংরেজরা ব্যক্তিগত পর্যায়ে এই অধিকার দাবি করল।

মীরকাশিম রাজি হলেন না কিন্তু বলদর্পী ইংরেজ সে কথা শুনবে কেন? ছলে বলে কৌশলে সারা দেশ জুড়ে সাম্রাজ্যবিস্তারে তারা তখন মরীয়া। তাই, সংঘাত শুরু হল মীর কাশিমের সঙ্গে। কাটোয়া, মুর্শিদাবাদ, গিরিয়া, উদয়নালা, মুঙ্গের এবং শেষ পর্যন্ত সতেরো শো চৌষট্টি খৃস্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধে হেরে গিয়ে মীরকাশিমের দুই সঙ্গী নবাব সুজাউদ্দুল্লাহ্ ও সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলম ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হলেন। মীরকাশিম পালিয়ে গেলেন এবং তাঁর মৃত্যু হল সতেরো শো সাতাত্তর খৃস্টাব্দে।

শাহ্ আলমের সঙ্গে সন্ধির শর্ত অনুযায়ী গভর্নর ক্লাইভ সতেরো শো পঁয়ষট্টি সালের বারোই অক্টোবর বাংলা, বিহার ও ওড়িশার দেওয়ানী সনদের ফরমান লাভ করলেন। এর ফলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি পেয়ে গেল বাংলা, বিহার ও ওড়িশায় রাজস্ব আদায়ের অধিকার। এর জন্য অবশ্য কোম্পানি শাহ্ আলমকে প্রতি বছর ছাব্বিশ লক্ষ টাকা দেবে।

মীর কাশিমের পর ইংরেজ যাকে নবাবী মসনদে বসিয়েছিল, মীরজাফরের সেই ব্যক্তিত্বহীন পুত্র নাজিমুদ্দৌলাকে চাপ দিয়ে ওরা প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের অধিকারও আদায় করে নিয়েছিল।

গোটা দেশ জুড়ে তখন চলছে তুমুল অরাজকতা। দেশে শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। এই মাৎস্য ন্যায় ইংরেজের সম্পর্ণ ইচ্ছাকৃত একটা কদর্য কৌশল। এই সময় দেশে যে পরিবেশ তৈরি হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে তার বাস্তবসম্মত ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে বাংলা এগারো শো ছিয়াত্তর সালের সেই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি ইংরেজ রাজত্বের একটি কলঙ্কজনক অধ্যায়। লক্ষ লক্ষ লোক ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল সেদিন। কিন্তু দেশে সেদিন ভিক্ষা দেবার মতো মানুষ ছিল না। বাংলার মানুষ সেদিন গোরু, লাঙ্গল, জোতজমা মায় পরিবারের লোকজনকে বিক্রী করতে শুরু করেছিল কিন্তু সেখানেও ক্রেতার অভাব। অভাবে ও অনাহারে জর্জরিত হয়ে মানুষ সেদিন গাছের পাতা, ঘাস, আগাছা থেকে শুরু করে জীব-জন্তু ও পোকামাকড় খেতে শুরু করেছিল। এর ফলে গ্রাম-বাংলা প্রায় শ্মশানে পরিণত হল।

কিন্তু এই ভয়ঙ্কর অবস্থায় ইংরেজ সরকার যে কী অমানুষিক নৃশংসতার পরিচয় দেয় তার একটি নমুনা আমরা পেশ করছি। সতেরো শো বাহাত্তর খৃস্টাব্দের তেসরা নভেম্বর ওয়ারেন হেস্টিংস 'কোর্ট অফ ডিরেক্টরস্'-এর কাছে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, '১৭৭০ সালে এই প্রদেশগুলিতে যে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং সারা বছর জুড়ে চলে, তার কথা আপনাকে জানিয়েছি।... জনসংখ্যার অন্তত এক-তৃতীয়াংশ মারা গেলেও এবং তার ফলে কৃষির উৎপাদন হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও ১৭৭১ সালের নীট রাজস্ব আদায় ১৭৬৮ (অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের আগে ষোলো আনা ফসল জন্মানোর বছর : স্যার যদুনাথ সরকার) সালের আদায়কেও ছাড়িয়ে যায়।

সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ

সতেরো শো ষাট খৃস্টাব্দ থেকে পরবর্তী প্রায় চল্লিশ বছর ধরে ইংরেজ সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন তখনকার সমাজের বুদ্ধিজীবী-সন্ন্যাসী ফকিরেরা। এঁদের সঙ্গে সামিল হয়েছিলেন অত্যাচারিত কৃষকসমাজ কারিগরেরা। যে সব জমিদারেরা ইংরেজ শাসনে তাঁদের ক্ষমতা হারান, তাঁদের নিজস্ব সৈন্য, লাঠিয়াল, পাইক ও বরকন্দাজেরাও কখনও কখনও এই সন্ন্যাসী-ফকিরদের সঙ্গে আন্দোলনে যোগ দেয়। বিহার, উত্তরবাংলা, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি এলাকায় এরা সংঘবদ্ধভাবে, কখনও বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষে, ইংরেজ সরকারকে নাজেহাল করে। এদের শায়েস্তা করার জন্য ইংরেজ শাসক একটি হুকুমনামা জারী করে সন্ন্যাসী-ফকিরদের ছোট-বড় দল বেঁধে সমগ্র উত্তরভারতে যথেচ্ছ ঘুরে বেড়ানো নিষিদ্ধ করে। এই দলের বিশিষ্ট নেতৃবর্গের মধ্যে ইতিহাসে স্থান পেয়েছেন মজনু শাহ্ ও চেরাগ আলি। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসভুক্ত ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরাণীও এই দলভুক্ত।

সন্ন্যাসী বিদ্রোহ

বাবা তিলকা মাঝি

সাঁওতাল বিদ্রোহের পূর্বসূরী বাবা তিলকা মাঝি সতেরো শো চুরাশি খৃস্টাব্দে ইংরেজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেন। সাঁওতাল উপজাতির মানুষেরা বাংলা ও বিহারের সীমান্তে রাজমহল এলাকায় পুরুষ-পরম্পরায় যেসব অরণ্যের অধিকার ভোগ করে আসছিলেন, শাসক ইংরেজ সে সব এলাকাগুলো বেদখল করে তাদের আধিপত্য কায়েম করার ব্যবস্থা করে। এই ঘৃণ্য অপচেষ্টার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন ওই উপজাতির মানুষেরা। ওঁদের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন দুর্ধর্ষ সাঁওতাল নেতা বাবা তিলকা মাঝি, যাঁর আর এক নাম ছিল মুর্মু। সতেরো শো চুরাশি খৃস্টাব্দে মারাত্মক গুলতির আঘাতে তিলকা ভাগলপুরের দোর্দণ্ডপ্রতাপ কালেক্টর ক্লিভল্যাণ্ড সাহেবকে হত্যা করেন। তিলকা ভাগলপুরের কাছে তিলকপুরের জঙ্গলে আত্মগোপন করলে ক্ষিপ্ত ইংরেজ সেনাবাহিনী ওই জঙ্গলটিকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। দিনের পর দিন সংগ্রাম চলতে থাকে। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে এই অসম যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত বহু সাঁওতাল বিদ্রোহী হতাহত হন এবং আহত অবস্থায় তিলকা মাঝি ধরা পড়েন। আহত বন্দীর প্রতি সভ্য ইংরেজ শাসকেরা চূড়ান্ত বর্বরোচিত ব্যবহার করে। তারা ক্ষিপ্ত হয়ে তিলকাকে একটি ঘোড়ার লেজে বেঁধে ঘোড়াটিকে ভাগলপুর শহরের রাস্তায় ছুটিয়ে দেয়। ঘোড়াটি আহত ও মুমূর্ষু তিলকাকে যখন রাস্তা দিয়ে হেঁচড়াতে-হেঁচড়াতে নিয়ে যেতে থাকে তখন তিলকা সম্পূর্ণ অজ্ঞান হয়ে যান এবং তাঁর দেহটি ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। সরকারের প্রতিহিংসার আগুন তখনও প্রশমিত হয় না। তাদের নির্দেশে তিলকার দেহটি রাস্তা থেকে তুলে এনে প্রকাশ্য রাজপথের পাশে অবস্থিত একটি বটগাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

ইংরেজ শাসকেরা এদেশের সামাজিক পরিস্থিতি অনুধাবন করে জমিদার-ভূস্বামী শ্রেণীর ক্ষমতা ও আধিপত্য সম্পর্কে সঠিক ও সুস্পষ্ট ধারণা করে নিয়েছিল। তারা বুঝে নিয়েছিল, জমিদারেরা এক-একটি এলাকার অঘোষিত রাজা। তারা স্থানীয় জনসাধারণের ভয় ও ভক্তির পাত্র। তাই সতেরো শো তিরানব্বই সালে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' নামে ইংরেজ বাংলা, বিহার ও ওড়িশায় এমন একটি প্রথা চালু করল যার ফলে ওরা একদল একান্ত অনুগত জমিদার সৃষ্টি করে ওরা এদেশে ওদের আধিপত্যের সামাজিক ভিত্তি পাকা করল। ওই ঐতিহাসিক ঘোষণায় বলা হয়েছিল, 'যে সব জমিদার, স্বাধীন তালুকদার এবং যথার্থ ভূস্বামীদিগের সহিত অথবা তাঁহাদের তরফে বন্দোবস্ত সাব্যস্ত হইল তাঁহাদের প্রতি সপারিষদ্ বড়লাট ঘোষণা জানাইতেছেন যে বন্দোবস্তের মেয়াদ (দশ বৎসর) পূর্ণ হইলে তাঁহারা যে ধার্য খাজনা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তাহার কোন পরিবর্তন করা হইবে না—পরন্তু তাঁহারা, তাঁহাদের বংশধর এবং বৈধ উত্তরাধিকারীবর্গ ঐ ধার্য হারেই চিরতরে তাঁহাদিগের সম্পত্তি বজায় রাখিতে পারিবেন।'

চোয়াড় বিদ্রোহ ও লায়েক বিদ্রোহ

সতেরো শো আটানব্বই খৃস্টাব্দ থেকে প্রায় দু'বছর ধরে বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম ও মেদিনীপুর জেলার উত্তর-পশ্চিম অংশ জুড়ে যে বিরাট বিদ্রোহ ফেটে পড়ে, তারই নাম চোয়াড় বিদ্রোহ। চোয়াড় কিন্তু কোনো বিশেষ জাতি বা উপজাতির নাম নয়। ইংরেজ ও মেদিনীপুরের জমিদারবর্গের এক অংশ মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও মানভূমের জঙ্গলমহলের অধিবাসী আদিম ও অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষকে ঘৃণায় 'চোয়াড়' আখ্যা দিয়েছিল। বস্তুতপক্ষে, এঁরা ছিলেন খুব নিরীহ ও শান্তিপ্রিয় মানুষ। অরণ্য সম্পদের উপর নির্ভর করে আদিম প্রথায় চাষবাস করতেন। এই সম্পর্কে আমরা সতেরো শো আটানব্বই সালের পঁচিশে মে তারিখে মেদিনীপুরের কালেক্টর কর্তৃক রেভিনিউ বোর্ডের কাছে পাঠানো একটি চিঠির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি—'প্রাচীনকাল থেকে যারা জমি ভোগদখল করছিল, তারা যখন দেখল যে বিনা অপরাধে ও বিনা কারণে তাদের জমি কেড়ে নেওযা হচ্ছে বা তার উপরে তাদের সাধ্যাতীত মাত্রায় নতুন রাজস্ব ধার্য করা হচ্ছে আর আবেদন করেও কোন ফল হয় না তখন তারা যে অস্ত্র ধারণ করে অন্যায়ভাবে যে-জমি তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে, তা ফিরে পাবার চেষ্টা করবে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।'

এই বিদ্রোহে সামিল হলেন আর এক শ্রেণীর মানুষ। মোগল আমলে এক শ্রেণীর জমিদার ছিলেন যাঁরা গ্রামাঞ্চলে শান্তিরক্ষা করতে 'বিনা খাজনায় জমি ভোগকারী' একদল মানুষের উপর দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এদের বলা হত পাইক। এদের কাজ থেকে অব্যাহতি দিয়ে জমি কেড়ে নেওয়ার ফলে এরাও এই অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে চোয়াড়দের সঙ্গে যোগ দিলেন। এই বিদ্রোহীদের নেতা দুর্জন সিং-এর নেতৃত্বে এরা রায়পুর পরগণার ত্রিশটি গ্রামে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। দলে প্রায় দেড় হাজার বিদ্রোহী থাকলেও সশস্ত্র বাহিনীর কেন্দ্র গুনারি থানার কাছারি বাড়ি আক্রমণ করে সন্ধ্যা থেকে পরদিন সকাল দশটা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়েও বিদ্রোহীরা শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকারের হাতে পরাস্ত হন।

তবু চোয়াড়দের নিরস্ত করা যায়নি। তাঁরা অতঃপর আক্রমণ চালালেন শালবনী শহরে। ধ্বংস করলেন প্রধান তহশীলদারের কাছারি, সরকারী দপ্তর এবং সৈন্যদের ব্যারাক। হত্যা করলেন দু'জন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীকে, পুড়িয়ে ফেললেন জমিদারী সংক্রান্ত সব দলিলপত্র। কোনো কোনো জমিদারও তখন শাসক ইংরেজের বিরোধিতা করে চোয়াড়দের মদৎ দেন। এর ফলে ইংরেজের হাতে অনেক জমিদার বন্দীও হন। অবশ্য অস্ত্রশস্ত্রে বলীয়ান ইংরেজের বিরুদ্ধে চোয়াড় বিদ্রোহ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। সবচেয়ে দুঃখের কথা, দেশের মানুষের একটা অংশ তখন ওঁদের দমন করতে বিদেশী সরকারকে সহায়তা করেছিল।

প্রত্যেকটি বিদ্রোহ দমনের পিছনে এদেশের মানুষের বিশ্বাসঘাতকতা ছিল ইংরেজ শাসকের অন্যতম সহায়ক। লায়েক-বিদ্রোহেও এর নজির আমরা পাই। আঠারো শো ষোলো সালে মেদিনীপুরে বগড়ির জমিদারদের লায়েক প্রজারা অচল সিং-এর নেতৃত্বে শালবনীর জঙ্গল থেকে গেরিলা কৌশলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই চালান। ইংরেজের কামানের গোলায় শালবনীর বিশাল অরণ্য ধ্বংস হয়ে গেলেও অচল সিংকে ধরা গেল না। তাঁকে ধরিয়ে দিল স্থানীয় কয়েকজন বিশ্বাস-ঘাতক মানুষ। নির্দয় ইংরেজদের হাতে যথারীতি নির্মমভাবে নিহত হতে হল তাঁকে।

টিপু সুলতানের লড়াই

সমগ্র ভারতে রাজ্যবিস্তারের উদগ্র লালসায় ইংরেজ সরকার তখন ছলে-বলে-কৌশলে সমগ্র ভারত জুড়ে জাল বিস্তার করে বসেছিল। কিন্তু যেসব জায়গায় ওরা কঠিন বাধা পেয়েছিল, মহীশূর রাজ্য তাদের মধ্যে একটি। সতেরো শো বিরানব্বই খৃস্টাব্দে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরাজিত হলে লর্ড কর্ণওয়ালিশ টিপু সুলতানের দুই বালক পুত্রকে বন্দী করে নিয়ে যায়। কিন্তু টিপু আক্রমণকারীর কাছে মাথা নোয়াননি। তিনি বিপ্লবী ফরাসী রিপাবলিকের সঙ্গে মৈত্রীস্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন যা ওঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দেয়।

উনি অবশ্য শেষ রক্ষা করতে পারেন নি। সতেরো শো নিরানব্বই খৃস্টাব্দে ইংরেজদের সঙ্গে রাজধানী সিরাঙ্গাপত্তনের যুদ্ধে তিনি অস্ত্র হাতে লড়াই করতে করতে যুদ্ধক্ষেত্রেই শত্রুর হাতে প্রাণবিসর্জন দেন। ইংরেজ ওঁর রাজ্য দখল করেই ক্ষান্ত হল না। ওঁর এক ছেলেকে ভেলোর দুর্গে এবং অন্য ছেলেকে কলকাতায় এনে বন্দী করে রাখল।

টিপু সুলতান

পলিগার বিদ্রোহ

আঠারো শতকে পলিগাররা ছিলেন সামন্ত জমিদার। তাঁর-বাস করতেন তামিলনাড়ু অঞ্চলের টিনেভেলি অঞ্চলে। ওঁরা আর্কটের নবাবের আধিপত্য স্বীকার করলেও তাঁদের হালচাল ছিল স্বাধীন রাজার মতো। এমন কি, ওঁদের মধ্যে কারো-কারো দুর্গ ও সৈন্যবাহিনীও ছিল। তাই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যখন আর্কটের নবাবের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে ওঁদের দিকে হাত বাড়াল, তখন ওঁদের মধ্যে কেউ কেউ বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন। বিদ্রোহীদের নেতা ছিলেন পাঞ্জালালকুরিচির পলিগার বীর পাণ্ডেয়ম কাট্টাবোম্মান। এই জনপ্রিয় সামন্ত রাজার রাজধানী ছিল রামনাদে। সেখানে সতেরো শো সাতানব্বই খৃস্টাব্দে তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে এক সংগ্রামে লিপ্ত হন এবং লেফ্‌টেন্যান্ট ক্লার্ককে হত্যা করেন।

প্রতিশোধস্পৃহায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল ইংরেজ। ওরা পরের বছরে কাট্টাবোম্মানকে ধরার জন্য মেজর ব্যানারম্যানের নেতৃত্বে এক বিশাল সেনাবাহিনী পাঠায়। ব্যানারম্যানকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল পাঞ্জালালকুরিচি-দুর্গ অধিকার করার জন্য। কালেক্টর সাহেব সুকৌশলে কাট্টাবোম্মানকে ধরার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তিনি অসমসাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে ইংরেজ সেনানীর বেড়াজাল ভেদ করে পালিয়ে যান।

পরের বছর আবার তিনি আক্রান্ত হলেন। এ বারও তিনি ছোট দু'ভাইকে নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেন। তবে, এই বীর যোদ্ধা তাঁর প্রিয় দেশবাসীর বিশ্বাসঘাতকতায় ইংরেজের হাতে ধরা পড়লেন। বিচারের প্রহসন হল এবং অনিবার্যভাবেই কাট্টাবোম্মানকে গলায় পরতে হল ফাঁসীর দড়ি।

কিন্তু এখানেই পলিগারদের বিদ্রোহ শেষ হল না। তাঁর বিদেহী আত্মা বিপ্লবী অনুচরদের যেন নতুন করে স্বাধীনতা-মন্ত্রে উজ্জীবিত করল। কাট্টাবোম্মান নিহত হওয়ার মাত্র দু'বছর পরে বিপ্লবীরা জেল ভেঙে ওঁর দুই ভাইকে মুক্ত করে নিয়ে এলেন। এমন কি, যুদ্ধে ইংরেজ পরাজিত হল। এতে শাসকশ্রেণীর আত্মসম্মানে প্রচণ্ড আঘাত লাগে এবং ওঁদের শায়েস্তা করতে ইংরেজ এক বিশাল সৈন্যবাহিনী পাঠাল জেনারেল এ্যাগনিউ-এর নেতৃত্বে। তুমুল লড়াইয়ের পর কাট্টাবোম্মানের দুই ভাই এবং দুই মারুদু ভাই ওদের হাতে ধরা পড়েন এবং ওঁদের ফাঁসী হয়।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা দরকার। সেদিন যাঁরা পলিগার বিদ্রোহীদের পক্ষে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন, পলিগারদের সেইসব সাধারণ অনুগত অনুচরদের মধ্যে অনেকেই কিন্তু ছিলেন ওঁদের বাহিনীর সাধারণ সৈনিক বা কৃষক-সন্তান।

ভেলোর সেনা বিদ্রোহ

সিপাহী-বিদ্রোহের একান্ন বছর আগে ভারতীয় সিপাহীরা অস্ত্রাগার দখল করেছিলেন ভেলোরে। তারিখটা ছিল আঠারো শো ছয় সালের দশই জুলাই। তাঁরা শুধু অস্ত্রাগার দখল করেই ক্ষান্ত হন নি, তাঁরা ওই অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে চারশো ইংরেজ সৈন্য ও অফিসারকে আক্রমণ করেন। ওঁদের গুলিতে নিহত হন ভেলোর দুর্গের কম্যাণ্ডিং অফিসার কর্নেল ফ্যানকোর্ট ও তেইশ নম্বর রেজিমেন্টের কম্যাণ্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল কেরাস। সিপাহীদের আক্রমণে মারা পড়ে উনসত্তর নম্বর রেজিমেন্টের অর্ধেকের বেশি ইংরেজ সৈন্যও। সরকারি মতে নয় জন অফিসার সমেত মোট শ'খানেক ইংরেজ সৈন্য নিহত হয় ওই বিদ্রোহে। অবশ্য এই তুমুল সংঘর্ষে সিপাহীরা কিন্তু ইয়োরোপীয় অফিসারদের পরিবারের একজন নারী বা শিশুর গায়ে হাত দেননি।

ভেলোর দুর্গ দখল করে সিপাহীরা নেতা নির্বাচিত করলেন ওই দুর্গে বন্দী, টিপু সুলতানের এক পুত্র, মুইনুদ্দীনকে। বিদ্রোহের খবর দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল চারিদিক। তখন আর্কট থেকে ছুটে এল ইংরেজের এক বিরাট সৈন্যবাহিনী। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর তারা সিপাহীদের পরাজিত ও বন্দী করে। টিপু সুলতানের বন্দী ছেলেকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়ে তারা দুর্গের ভিতরে ও বাইরে প্রায় আটশো সিপাহীকে নির্বিচারে হত্যা করে।

কিন্তু সিপাহীদের এই বিদ্রোহ ও বিক্ষোভের কারণ কি? মাদ্রাজ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত তদন্ত কমিটির মতে এই বিদ্রোহের কারণ ভারতীয় সিপাহীদের পোশাক ও পাগড়ি-সম্পর্কিত নতুন নির্দেশ এবং টিপুর পুত্রের প্ররোচনা। কিন্তু তদন্ত কমিটির এই অভিমত সকলে একবাক্যে সমর্থন করেন নি। বিদ্রোহের আসল কারণ সম্পর্কে কেউ কেউ মনে করেন, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ক্র্যাডকের নৃশংস আচরণ। সিংহলের গভর্নর মেটল্যাণ্ডের মতে, লর্ড ওয়েলেসলির মতো ইংরেজ শাসকদের শাসন পদ্ধতি ও দেশীয় রাজ্য গ্রাসের ফলে ভারতীয়দের মধ্যে যে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দেয়, সেটাই বিদ্রোহের জন্ম দিয়েছিল। পোশাক সম্পর্কিত নির্দেশটা শুধু উপলক্ষ মাত্র। অবশ্য, এই বিদ্রোহের পিছনে আরও একটি কারণ ছিল। সেটা হল সিপাহীদের বেতন ও কাজকর্মের অবস্থা সম্পর্কিত বিধিনিষেধের ক্ষেত্রে নানা বর্ণবৈষম্যের অভিযোগ।

ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান ভেলু থাম্পি-পরিচালিত বিদ্রোহ

ইংরেজ যখন ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য গ্রাস করতে তার আগ্রাসী থাবা বাড়াল, তখন ওখানকার মানুষ প্রচণ্ড প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল দেওয়ান ভেলু থাম্পির পরিচালনায়। শোনা যায়, ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

করার সময় ভেলু নাকি ফরাসী ও আমেরিকানদের সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। আঠারো শো আট খৃস্টাব্দে যখন যুদ্ধ চলছিল তখন শোনা গেল তিনি আত্মসমর্পণ করেছেন। এই সংবাদে ইংরেজ সৈন্যবাহিনী আত্মসন্তুষ্ট হয়ে যুদ্ধদমনে শৈথিল্য দেখালে ভেলু এই সুযোগ নিয়ে ইংরেজ রেসিডেন্টকে হত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন এবং কুইলনে পালিয়ে গিয়ে এক সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন। বিশাল ইংরেজ সেনাবাহিনীর সঙ্গে তাঁর প্রচণ্ড সংঘর্ষ চলতে থাকে এবং পরের বছর ফেব্রুয়ারী মাসে ইংরেজ ত্রিবান্দ্রাম দখল করে। গুরুতর আহত হয়ে ভেলু থাম্পি গভীর অরণ্যে আশ্রয় নিলে সেখানে তাঁকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়।

রাজা রামমোহন রায়

ভারতের চতুর্দিকে ব্যাপক বিদ্রোহ ও বিক্ষোভের ইতস্তত সূত্রপাত ঘটলেও দেশ তখনও অজ্ঞানতা ও অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবে ছিল। সংস্কারমুক্ত মানসিকতা ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার অভাবের ফলে তখন বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ দাবানল হয়ে জ্বলে উঠতে পারছিল না। এই সময়ে ভারতের ভাগ্যাকাশে উদিত হলেন রাজা রামমোহন রায়ের মতো এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

সতেরো শো বাহাত্তর খৃস্টাব্দে তাঁর জন্ম, আয়ুষ্কাল মাত্র একষট্টি বছর। কিন্তু এই সময়সীমার মধ্যেই প্রায় একক প্রচেষ্টায় তিনি ভারতের নব জাগরণের সূত্রপাত করেছিলেন। তাঁর বিপুল ও বিচিত্র কর্মকাণ্ডের জন্য তাঁকে বলা হয় ভারতীয় রেনেশাঁসের প্রধান স্থপতি। তাঁর প্রত্যেক কাজের পিছনে ছিল ভারতের পুনর্গঠনের মহান প্রয়াস।

তিনি ভাবলেন নতুন কিছু গড়তে হলে প্রাচীন হিন্দুধর্মের সংস্কারের ভিতর দিয়ে জাতির মজ্জাগত ত্রুটি দূর করতে হবে। হিন্দুধর্মকে হেয় করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। এই ধর্মের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল।

তিনি এই ধারণার বশবর্তী হয়েই বেদের অভ্রান্ততা প্রমাণের দ্বারা ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে উদ্যোগী হলেন। যে সব কুপ্রথা সমাজের অগ্রগতি ব্যাহত করছে, মনুষ্যধর্মে ব্যত্যয় ঘটাচ্ছে, তিনি সেগুলোকে সমূলে উৎখাত করতে এগিয়ে এলেন। আঠারো শো আটাশ খৃস্টাব্দের চৌঠা ডিসেম্বর এদেশ থেকে আইনের সাহায্যে সতীদাহ প্রথাকে তিনি উৎখাত করলেন।

তিনি আত্মীয়-সভা ও ব্রাহ্মসভা প্রতিষ্ঠিত করেন যথাক্রমে আঠারো শো পনেরো এবং আঠারো শো আটাশ খৃস্টাব্দে। তাঁর প্রচারিত নতুন ধর্মমতের মূল সূত্র হল, এক ভগবান, এক ধর্ম, এক মানবজাতি। তিনি যেমন হিন্দুদের অন্ধ গোঁড়ামি দূর করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, তেমনি খৃস্টধর্মী পাদ্রীদের ধর্মপ্রচারে বাধা দান করতেও প্রয়াসী হয়েছিলেন। ক্ষুদ্র স্বার্থের মোহে, সমাজের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে এবং নতুন অভিজ্ঞতা ও পরিচয় লাভের আশায় সাধারণ দরিদ্র লোকেরা খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করেছিল। ওরা অধিকাংশই খৃস্টধর্মের মূলতত্ত্ব বুঝত না। অবশ্য মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তিও তখন খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

রামমোহন-প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মকে পেয়ে বহু চিন্তাশীল শিক্ষিত লোক খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন নি। ব্রাহ্মধর্ম সেই সময়ে হাজার-হাজার হিন্দুকে অ-কারণে, যৎসামান্য লাভের লোভে, নিজেদের সমাজ ও পরিজন ছেড়ে চলে যাওয়া থেকে বিরত করেছে। ধর্মান্তরিত হওয়ার ঢেউ তখন এদেশে এতই প্রবল হয়েছিল যে শোনা যায় সেন্ট জেভিয়ার একাই গোয়ায় দশ হাজারের চেয়ে বেশি সংখ্যক হিন্দুকে খৃস্টানধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন।

ভারতবাসীর সামগ্রিক কল্যাণ, বিশেষত রাজনৈতিক লাভ-ক্ষতির পরিপ্রেক্ষিতে রামমোহন ভেবেছিলেন প্রচলিত ধর্মমত, আচার-বিচার, সামাজিক রীতি-নীতি ভারতীয়দের মঙ্গলের প্রতিকূল। নানা শ্রেণীতে বিভক্ত ও বিবদমান হিন্দুসমাজ সহস্র প্রথার বন্ধনে বন্দী হয়ে একাত্মবোধের অভাবে সব ব্যাপারেই ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে ঘুরে মরছে। সৎসাহস নিয়ে নতুন পথে চলার শক্তি সে হারিয়ে ফেলেছে। স্বজাতি-

রাজা রামমোহন রায়

প্রেম তথা স্বাজাত্যবোধ পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর ধারায় প্রবাহিত হতে বাধ্য হয়েছে।

বিদেশী শাসকশ্রেণীর সঙ্গে তাঁর যেটুকু সংযোগ, সম্ভ্রম ও প্রীতি তার মূলে ছিল ভারতের কল্যাণচিন্তা। ইংরেজের সংকল্পে দৃঢ়তা, সাহস, কর্মকুশলতা, ক্লেশসহনশীলতা, জ্ঞানার্জন স্পৃহা, সর্বদা স্বদেশের হিত-চিন্তা এবং নিজেদের স্বার্থে সুনাম-দুর্নাম সম্বন্ধে বেপরোয়া হয়ে যাওয়ার গুণ বা দোষগুলো রামমোহনের দৃষ্টি এড়ায়নি। ইংরেজের শাসন সম্বন্ধে তিনি শ্রদ্ধাবান হয়ে উঠেছিলেন এবং অন্তত কিছুকালের জন্য ভারতে তার স্থায়িত্ব কামনা করেন।

রামমোহনের ধারণা ছিল, যতদিন ভারত বুঝবে ইংরেজের সহযোগিতায় তার সর্বাঙ্গীন কল্যাণের সম্ভাবনা আছে, ততদিন শিষ্য, বন্ধু, সহকর্মীরূপে ইংরেজের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনে দ্বিধা করবে না। কিন্তু এর ব্যতিক্রম ঘটলে ভারত ইংরেজের সঙ্গে বিপরীত বা বিরূপ আচরণ করতে বাধ্য হবে।

বিদেশীর শাসন-যন্ত্রণা ও পরাধীনতার গ্লানি রামমোহনকে ব্যাকুল করেছিল। এই ব্যাকুলতার ফলে তিনি তাঁর দেশবাসীকে আত্মনিয়ন্ত্রণে প্রবুদ্ধ হতে উৎসাহিত করেছেন। তাঁর সমকালে তাঁর মতো বিশ্বনাগরিক আর কেউ ছিলেন না। কোনো দেশ অন্য কেউ অধিকার করে নিলে তিনি বিষণ্ণ হতেন, আবার কোন দেশ যদি স্বাধীনতালাভ করত তাহলে তিনি হর্ষোৎফুল্ল হয়ে প্রকাশ্যে ভোজের ব্যবস্থাও করতেন।

রামমোহন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, স্বাধীনতার শত্রু এবং যথেচ্ছাচারের সমর্থকেরা কখনও সাফল্য লাভ করবে না। জাগ্রত দেশ আপন প্রচেষ্টায় একদিন স্বপ্রতিষ্ঠ হবেই। অত্যাচারী যত বড়ই শক্তিমান হোক, তাকে পরাভব স্বীকার করতেই হবে। বিপিনচন্দ্র পাল বলেছেন, 'রাজার মন অতি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে হলেও ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার কথা সর্বদা জাগরূক ছিল। তিনি চেয়েছিলেন, ভাষা ও শিক্ষাকে সচল ও সাবলীল করে তুলতে হবে। তবে নতুন-নতুন জ্ঞানের ধারক ও বাহক করে গড়ে তুলতে না পারলে সে মানবজাতির অগ্রগতির সঙ্গে তাল রাখতে পারবে না। রামমোহনের মতো চিন্তাশীল মানুষ বুঝতে পেরেছিলেন, ভারত যেহেতু ইংরেজ শাসনাধীন, সেজন্য এদেশে ইংরেজি ভাষার প্রবর্তন হওয়া খুবই জরুরী। তা ছাড়া, ইংরেজি ভাষা প্রবর্তনের ফলে সারা ভারতে একটা যোগসূত্র স্থাপিত হবে এবং এর ফলে দেশ জুড়ে একটা জাতীয়তার ভাবও গড়ে উঠবে।

মূলত এই ধারণার বশবর্তী হয়েই রামমোহন ইংরেজি ভাষা শিক্ষা করেছিলেন। পেশকার হওয়ার আগেই তিনি ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন বাংলা, সংস্কৃত, উর্দু ও ফার্সী ভাষায়। কিন্তু ইংরেজি ভাষা প্রসারে তাঁর ভূমিকা ছিল সর্বাগ্রগণ্য। ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপক বিস্তারের ক্ষেত্রে রামমোহন ডেভিড হেয়ারকে সহযোগী হিসেবে পেলেন। নতুন শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রথম সভা বসল আঠারো শো ষোলো সালের চোদ্দই মে এবং হিন্দু কলেজ স্থাপিত হল পরের বছর বিশে জানুয়ারী তারিখে। তখনও কিন্তু সরকার ইংরেজি শিক্ষা প্রসারে কোনো উদ্যোগ নেয় নি।

নিজের মত প্রচার ও বিপক্ষীয় দলের মত খণ্ডন করবার জন্য রামমোহন কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পুস্তক-পুস্তিকা ছাপিয়েছিলেন। আঠারো শো একুশ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'ব্রাহ্মণ সেবধি' পত্রিকা, 'মিশনারী সংবাদ' এবং 'সম্বাদ কৌমুদী'। পরের বছর আটই এপ্রিল তারিখে রামমোহন ফার্সী ভাষায় 'মিরাৎ-উল-আকবর' প্রকাশ করেন। ঠিক এক বছর পরে এই পত্রিকাটির প্রকাশ রামমোহন বন্ধ করে দেন সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণের সরকারী নীতির প্রতিবাদে।

পার্লামেন্টে রিফর্ম বিল অর্থাৎ শাসন সংস্কার বিধি আলোচনার সময় ইংরেজ জাতিকে ভারতের অবস্থা অবহিত করার জন্য তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকায় তাঁর প্রয়াস বহুলাংশে সফল হয়েছিল। একষট্টি বছর বয়সে রামমোহন ব্রিস্টলে লোকান্তরিত হন।

ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁর সংস্কার প্রয়াস-সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, 'এমন দিন আসতে পারে যখন তাঁর নগণ্য প্রচেষ্টাকে ভবিষ্যৎ ভারতবাসী যোগ্যদৃষ্টিতে দেখবে, হয়ত বা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবে।' রামমোহনের এই প্রত্যাশা তাঁর দেশবাসী পূরণ করেছে।

ডেভিড হেয়ার

এই বিদেশী শিক্ষাবিদ রামমোহনের প্রধান সহযোগী হিসেবে এদেশে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। আঠারো শো সতেরো সালে হিন্দু কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা তিনি এবং স্কুল বুক সোসাইটির প্রধান সংগঠক।

ডেভিড হেয়ার

পাইক অভ্যুত্থান

ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে শাসক ইংরেজের বর্বর হামলা ও অত্যাচারের অজস্র কাহিনী আমরা জানি। কিন্তু এরই পাশাপাশি এমন অনেক সদাশয়, মানবতাবাদী, বিবেকবান ইংরেজের পরিচয় আমরা পাই যাঁরা ধর্মসংস্কারে, শিক্ষার প্রসারে, সামাজিক আন্দোলনে ও জাতীয়তাবাদের অভ্যুত্থানে এদেশের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এমন কি, প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও তাঁরা যথাসম্ভব নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের লেখা অনেক চিঠিপত্র, ডায়েরি, বিবৃতি, দলিল ও গ্রন্থ থেকে সমকালীন সমাজের রাজনীতি ও অর্থনীতির যে চিত্র আমরা পাই, সেগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিচার করলে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসকের অত্যাচার ও নিপীড়নের অসংখ্য ঘটনা জানা যায়।

এমনই একজন বিদেশী হলেন কালেক্টর ওমালি। তাঁর দেওয়া একটি বিবরণ থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করলে আঠারো শো সতেরো খৃস্টাব্দ থেকে পরবর্তী আট বছর ধরে ওড়িশায় যে পাইক অভ্যুত্থান হয়েছিল তার সম্পূর্ণ ছবি পাওয়া যায়—'শুধু যে পাইকদিগকে আবহমান কাল হইতে অধিকৃত জমি হইতে উৎখাত করা হইয়াছে তাহা নহে, পরন্তু জোতদার ও সরবরাহকারী (সরকারী ঠিকাদার) শ্রেণীর লোকদের কাছে চূড়ান্ত অপমান ও শোষণের মুখে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। খাজনা আদায়কারী লোভী নায়েব ও গোমস্তা ও পুলিশের লোকেরা ইহাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করিয়াছে।'

পাইকরা জীবিকানির্বাহ করত রাজাদের দেওয়া 'চাকরান' জমিতে। ওদের মাইনে দেওয়া হত। কিন্তু ইংরেজ যখন জমিদারদের ক্ষমতা কেড়ে নিল তখন তারা পাইকদের সব 'চাকরান' জমিও নিয়ে ওদের একেবারে সর্বস্বান্ত করে দিল। পাইকদের তখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ছাড়া গত্যন্তর থাকল না। ওদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিলেন বক্‌শী জগবন্ধু, যিনি ছিলেন খুরদার রাজা দ্বিতীয় মুকুন্দদেবের প্রধান সেনাপতি। ওরা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কুঠী ও কাছারী বাড়িগুলো আক্রমণ করল।

ওদের আক্রমণে এক ইংরেজ সেনাপতি নিহত হলেন। তাঁর বাহিনীও ছত্রভঙ্গ হল। তখন ইংরেজ এক বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে পুরী দখল করল এবং রাজা মুকুন্দদেবকে বন্দী করল। বন্দী অবস্থায় মুকুন্দদেবের মৃত্যু হলেও অরণ্যে পালিয়ে যাওয়া বক্‌শী জগবন্ধু তাঁর অনুচরদের নিয়ে গেরিলা কায়দায় ইংরেজ সৈন্যদের পর্যুদস্ত করতে থাকেন। ওঁরা সাহায্য পেতেন ওড়িশার স্থানীয় গ্রামবাসীদের কাছ থেকে। তারা পাইকদের খাদ্য ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করত এবং ইংরেজদের গতিবিধির খবরাখবর দিত।

ইংরেজ সৈন্যরা জগবন্ধুকে ধরতে না পেরে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। ওঁর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার জন্য এক ঘৃণ্য চক্রান্ত করে ওঁর পরিবারের কুড়ি জন মহিলাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল এবং ওঁর যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল। তাতেও যখন ওঁকে শায়েস্তা করা সম্ভব হল না তখন ইংরেজ জগবন্ধুর

বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিল। জগবন্ধু ওদের কাছে ধরা দিলেন। বন্দী অবস্থায় মানসিক বিপর্যস্ত জগবন্ধু বেশি দিন বাঁচেন নি। আঠারো শো ঊনত্রিশ সালের চব্বিশে জানুয়ারী তার মৃত্যু হয়েছিল।

বাংলার জাগৃতি ঃ ডিরোজিও

ঊনিশ শতকের একেবারে গোড়া থেকেই অত্যাচারী ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সমগ্র দেশের সুদূর প্রত্যন্ত এলাকাতেও যে বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিল, তার কিছু নমুনা আমরা দেখলাম। পরবর্তীকালে এই আগুন কীভাবে দেশ জুড়ে ব্যাপক বিদ্রোহের বহ্নিশিখায় পরিণত হয়েছিল তা বিস্তারিতভাবে দেখার আগে কীভাবে সমগ্র বাংলায় সাহিত্য-শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশের ফলে সমাজ-সংস্কার ও রাজনৈতিক আন্দোলনে জোয়ার এসেছিল, সেই ইতিহাস একটু সংক্ষেপে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা যাক।

রামমোহনের পরবর্তীকালে বাঙালী জনমানসে যে দু'জন ব্যক্তি শিক্ষার ক্ষেত্রে তখন প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তাঁরা হলেন হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও ও ডেভিড লিস্টার রিচার্ডসন। এ ছাড়া, ডেভিড হেয়ারের কথা তো আমরা পূর্বেই স্মরণ করেছি।

এঁদের মধ্যে ডিরোজিওর বাঙালীয়ানা সর্ব বিষয়ে চোখে পড়ে। তাঁর জন্ম ও মৃত্যু কলকাতায়। আয়ুষ্কাল মাত্র বাইশ বছর। জন্ম আঠারো শো নয় সালে। ঊনিশ বছরে পা দিযে হিন্দু স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। ডেভিড হেয়ার ও রিচার্ডসন ওঁর চেয়ে যথাক্রমে চৌত্রিশ ও আট বছরেব বড় ছিলেন। ডিরোজিও মাত্র সাড়ে তিন বছর হিন্দু স্কুলে পড়িয়েছিলেন। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল তাঁর শিক্ষকতার রীতি। তিনি ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করতেন পুরোনো সংস্কার ভেঙে বেরিয়ে আসতে। তাঁর সভাপতিত্বে নিযমিত যে সব আলোচনা সভা বসত সেখানে বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোনো বিধিনিষেধ ছিল না। ওইসব আলোচনা সভাগুলোতে ছাত্র ছাড়াও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আসতেন। কখনও কখনও ডেভিড হেয়ারও উপস্থিত থাকতেন।

সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ডিরোজিওর ছাত্ররা ভগবান, ধর্ম, সমাজ, পুজো-পদ্ধতি, চিরাচরিত হিন্দু সংস্কার, সামাজিক রীতিনীতি ইত্যাদি যাবতীয বিষয়েই অবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল। ফলে, দেবতা ও ব্রাহ্মণ তাদের কাছে বিদ্রূপের বিষয় হয়ে উঠল। হিন্দুদেব নিষিদ্ধ খাদ্য ওবা খেতে থাকল। মদ্যপান করতে শুরু করল। ইংরেজি পোষাক পরতে শুরু করল এবং ওদের আদবকাযদাও রপ্ত করতে শুরু করল। হিন্দু সমাজেব যাবতীয় আচার ও সংস্কারেব বিরুদ্ধে ওবা যেন একেবারে বিদ্রোহী হয়ে উঠল।

কয়েকজন কৃতবিদ্য বাঙালী এই স্রোতে গা ভাসালে বাংলার বুকে খুব বড় আঘাত লাগে। এঁদেব মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন—কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৮৫), মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩), লালবিহারী দে (১৮২৪-১৮৯৪), কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯০৭) এবং তরু দত্তর বাবা গোবিন্দচন্দ্র দত্ত। এঁরা অবশ্য ধর্মান্তর গ্রহণ করেছিলেন সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসে। তবে দেশকে ও দেশে মানুষের সংস্কৃতিকে এঁরা প্রত্যেকেই ভালোবেসেছিলেন এবং নিজস্ব পদ্ধতিতে দেশকে খুবই সেবা করেছেন। চরিত্রবত্তা, দৃঢ়চিত্ততা, স্বাধীন মতে অবস্থিতি এবং জ্ঞানের বিশালতার জন্য কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ওঁদের সম্বন্ধে বলেছেন, 'স্বধর্ম তেয়াগী তবু স্বজাতের দল।'

এইসব প্রতিভাবান যুবকদের ঔদ্ধত্য ও দুর্বিনীত আচরণে শুধু যে হিন্দুসমাজ ভীত হয়ে পড়েছিল, তাই নয়। স্বয়ং রামমোহনও ভীত হয়ে উঠেছিলেন। ওঁদের আচার-আচরণের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে এবং সংঘবদ্ধ হয়ে সনাতনপন্থী ও পরিবর্তনকামীরা একজোট হলেন। ডিরোজিওকে এদের চাপে চাকরি ছাড়তে হল। কর্মত্যাগের আট মাস পরে ডিরোজিও লোকান্তরিত হন।

পরিবর্তনের ঢেউ

ডিরোজিওর ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে স্ব-মহিমায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। বাঙালীর সমাজ-জীবনে তৎকালীন বাংলায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৮৫), শিবচন্দ্র দেব (১৮১১-১৮৯০), রসিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮১০-১৮৫৮), রামতনু লাহিড়ী (১৮১৩-১৮৯৮), রাধানাথ শিকদার (১৮১৩-১৮৭০), দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮১৪-১৮৭৮), রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫-১৮৬৮) প্রভৃতি। এঁদের সঙ্গে সংযোগ ঘটেছিল প্রাক-ডিরোজিও হিন্দু স্কুলের কয়েকজন ছাত্র। বস্তুতপক্ষে তারাচাঁদ চক্রবর্তী (১৮০৪-১৮৫৫) এবং কাশীপ্রসাদ ঘোষ (১৮০৯-১৮৭৩) ডিরোজিওর নবীন ছাত্রদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সমগ্র বাংলাকে তোলপাড় করে তুলেছিলেন। এঁদের তখন সম্বোধন করা হত তারাচাঁদের দল বা 'চক্রবর্তী ফ্যাকশন' অথবা 'ইয়ং বেঙ্গল' বলে। গুরুর শিক্ষায় এঁরা ইংরাজী, ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ে পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। দেশের প্রতি আন্তরিক প্রেম, দেশের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধন, দেশবাসীর দুর্দশা দূর করার আপ্রাণ চেষ্টা, পত্রপত্রিকা প্রকাশ, প্রবন্ধ, বক্তৃতা ও আলোচনার সাহায্যে দেশীয় ভাবের প্রচারে এঁরা ছিলেন নিরলস কর্মী।

এই উজ্জ্বল প্রতিভাবান নব্যযুবকদের আত্মসম্মানবোধ ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং ইংরেজ জাতির দম্ভ ও শক্তিব প্রকাশকে এঁরা মোটেই সমীহ করতেন না। বিদেশী শাসকের লুণ্ঠন এবং শ্বেতাঙ্গদের প্রতি পক্ষপাতিত্বে তাঁরা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ ছিলেন। এজন্য তাঁরা সব সময়েই সচেষ্ট ছিলেন ইংরেজ শাসকের স্বরূপ চিনে এবং গোপন অভিসন্ধি বুঝে দেশবাসীর কাছে ওদের মুখোশ খুলে দিতে। তখনকার ব্যাপক নিরক্ষবতার দিনে সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করা সম্ভব ছিল না কিন্তু ধীরে ধীরে শিক্ষিতের মন স্পর্শ করে তাঁদের শাসকশ্রেণীব অত্যাচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে সতর্ক ও বিচারশীল করে তুলেছিল। তাঁদের বক্তৃতা ও প্রবন্ধে মনের ভাব স্বচ্ছভাবে প্রকাশিত হত। ইংরেজ-শাসননীতি আক্রমণ করার প্রয়োজনে তাঁরা কঠোর ভাষা প্রয়োগে কখনও কার্পণ্য করেন নি।

ভারতের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হলে এই 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর সদস্যেরা প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠতেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ছিল তাঁদের অন্যতম প্রধান দাবি। তখন ইংরেজের সঙ্গে বাজনীতির বিতণ্ডা এই দল প্রায় একাই বহন করত। শিক্ষা-প্রসাব, ব্যবসা-বাণিজ্য-চর্চা, বিজ্ঞান-সাধনা, বিদেশী জ্ঞান-আহরণ ও দেশের মধ্যে তার প্রচাব এবং বিশেষ করে সংবাদপত্রের পরিচালনায় ওঁরা ওঁদের নিজস্ব ব্যক্তিত্বের ছাপ বেখে গেছেন। তাই ওঁদেব শিক্ষক ডিরোজিও ওঁদের মধ্যে দেখেছিলেন 'ভবিষ্যৎ মুকুরে তাঁদের যশেব প্রতিফলন' এবং ডেভিড হেয়ার ছাত্রদলকে উদ্দেশ্য কবে বলেছিলেন যে, 'সমস্ত দেশ তাঁদের শিক্ষক ও সংস্কাবক রূপে দেখবার জন্যে একেবারে অধীর আগ্রহে দাঁড়িয়ে আছে।'

রিচার্ডসনের বেশ কিছু ছাত্র বাঙালী সমাজের নানা স্তরে তাঁদের প্রভাব বিস্তার করে গেছেন। এঁদের মধ্যে বাংলার জাতীয় জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন কবেছিলেন রাজনারায়ণ বসু ও শিবনাথ শাস্ত্রী। মধুসূদন দত্ত, প্যারীচরণ সরকাব, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর ও ভূদেব মুখোপাধ্যাযও তৎকালীন বাংলার সমাজ-মানসকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য গুপ্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা করে রাজনারায়ণ অসমসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

ইংরেজি শিক্ষার প্রসার

বাংলার চিন্তাশীল মনীষীরা ইংরেজি শিক্ষার ভিতর দিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার মিলন ও তার সুফলের কথা ভেবেছিলেন। পাদ্রীরা ভেবেছিলেন, এদেশে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে ভারতীয়দের ধর্মান্তরিত করা সহজ হবে। ভারতের নব ভাগ্যবিধাতা ইংরেজ শাসকেরা ভেবেছিলেন, ভারতবাসীদের যদি ইংরেজি শিক্ষায় কিছুটা শিক্ষিত করে তোলা যায় তাহলে কম মাইনে দিয়ে তাদের সরকারী প্রশাসনে

নিয়োগ করা যাবে। কারণ যা'ই হোক না কেন, অনুকূল হাওয়া পেয়ে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার দ্রুত-লয়ে ঘটতে থাকল।

সিপাহী বিদ্রোহ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার আগে ইংরেজি ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল আঠারো শো পঁয়ত্রিশ খৃস্টাব্দের দোসরা ফেব্রুয়ারী। এর চুয়ান্ন বছর আগে হেষ্টিংস প্রতিষ্ঠা করেন ক্যালকাটা মাদ্রাসা। এর ফলে সরকারী কাজের জন্য লোক পাবার আশায় মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রসারিত হল। বাংলার বাইরে, ইংরেজি শিক্ষার আদিযুগে সতেরো শো বিরানব্বই খৃস্টাব্দে হিন্দুদের সাহিত্য, ভাষা ও ধর্মচর্চা করার উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়েছিল বেনারস সংস্কৃত কলেজ।

স্কুল-কলেজের বাইরে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল এই কলকাতার বুকে। স্যার উইলিয়ম জোন্স সতেরো শো চুরাশি খৃস্টাব্দের পনেরোই জানুয়ারী উইলকিন্স, চেম্বার্স, শোর প্রভৃতি কয়েকজন বুদ্ধিজীবী সহকর্মীর সহায়তায় 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র পত্তন করেছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের লুপ্তপ্রায় প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডার জনসাধারণের গোচরে এনে তাদের দেশের সংস্কৃতি ও ইতিহাস সম্পর্কে আরও সচেতন করে তোলা। ঠিক পাঁচ বছর পরে ওই প্রতিষ্ঠান থেকে 'এশিয়াটিক রিসার্চেস' নামে একটি মুখপত্র প্রকাশিত হল। এই মুখপত্রের প্রধান লক্ষ্য ছিল দেশ ও বিদেশের প্রাচীন ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন, কলা, সাহিত্য, প্রাচীন লিপির কোষ্ঠীবিচার, মুদ্রাতত্ত্ব, প্রকৃতি পরিচয়, পুরাবৃত্ত প্রভৃতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান জনসাধারণের কাছে উপস্থাপিত করা। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, ভারতের যাদুঘর, ভূতত্ত্ব-বিভাগ, আবহ-নির্ণয় বিভাগ প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান ক'টি এশিয়াটিক সোসাইটির প্রেরণায় সৃষ্ট হয়েছে। আঠারো শো উনত্রিশ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত এখানে কোনো ভারতবাসী সমিতির সভ্য মনোনীত না হলেও বিদ্বান বিচক্ষণ ভারতীয়দের সঙ্গে বিদগ্ধ ইংরেজদের চিন্তাধারার আদান-প্রদান হত। জোন্স এবং জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের সম্মিলিত প্রয়াস এই প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কার্যক্রমকে রূপায়িত করে অনতিকালের মধ্যেই এটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত করেছিল।

স্কুল-কলেজের প্রসঙ্গে পুনরায় ফিরে আসি। শিক্ষা মানুষের মনে সৃষ্টি করে চেতনা, চেতনা ঘটায় বিপ্লব। তাই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাস জানতে গেলে ঊনিশ শতকের প্রথম দশক থেকে এদেশের মাটিতে শিক্ষা বিস্তার কীভাবে হয়েছে তা-ও জানা প্রয়োজন।

স্কুল-কলেজ

ওই সময়ে এদেশে গুরুমশায়ের পাঠশালা থেকে শুরু করে বড়-বড় সরকারী স্কুলে লেখাপড়া শেখানো হত। বাঙালী শিক্ষক ছাড়া অনেক সরকারী স্কুলে ইংরেজ অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক ছিলেন।

গুরুত্বপূর্ণ স্কুল-কলেজের কথা বলতে গেলে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কথা। এই কলেজটি স্থাপিত হয় আঠারো শো খৃস্টাব্দের নভেম্বর মাসে লর্ড ওয়েলেসলির উৎসাহে। কলেজটি মূলত স্থাপিত হয়েছিল স্বল্পবয়সী কিন্তু উচ্চ পদাধিকারী সরকারী কর্মচারীদের শিক্ষিত করে তোলার উদ্দেশ্যে। শেষ পর্যন্ত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি পরস্পরের ভাষা শিক্ষা করার কেন্দ্রে পরিণত হল। কেরী, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মনীষীদের ভাবের আদান-প্রদান ঘটানোর একটি কেন্দ্র হিসেবে এই কলেজটি আমাদের জাতীয় জীবনে একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে, কলেজটি কিছুদিন চলার পরে ভারতবাসীদের মধ্যে প্রাচ্যের বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার জন্য এরই অপর একটি বিভাগ খোলা হয়।

হিন্দু কলেজ আঠারো শো সতেরো খৃস্টাব্দের বিশে জানুয়ারী থেকে হিন্দু স্কুল নামে অভিহিত হলেও আট বছর পরেই এটি হিন্দু কলেজে রূপান্তরিত হয়। এই কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রামমোহনের আদর্শে, কিন্তু গোঁড়া হিন্দুদের আপত্তি হতে পারে বলে তিনি কখনও এই কলেজের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে

সংশিষ্ট ছিলেন না। বাংলার নবজাগরণের যুগে এই কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রেরা সমাজ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি বিশাল ভূমিকা পালন করেছিল। আঠারো শো তিপ্পান্ন খৃস্টাব্দে সরকার এই কলেজটি পরিচালনার ভার নিজের হাতে তুলে নিলে এর নতুন নাম হয় প্রেসিডেন্সী কলেজ।

হিন্দু স্কুল ও পরবর্তীকালে কলেজের সমসাময়িক তিনটি সংস্থা স্কুল বুক সোসাইটি, কলিকাতা স্কুল সোসাইটি এবং সাধারণ শিক্ষা সমিতি গঠন করা হলে পাঠ্যপুস্তক লেখা, সরবরাহ করা, পুরোনো স্কুলের সংস্কার ও নতুন স্কুলের স্থাপনের পথ সুগম হয়।

হেষ্টিংসের পৃষ্ঠপোষকতায় কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড আঠারো শো আঠারো খৃস্টাব্দে গড়ে তুললেন শ্রীরামপুর কলেজ।

জন-জাগরণের প্রশ্নে মেয়েরা যাতে পিছিয়ে না থাকেন, সেজন্য তৎকালীন বাংলায় প্রখ্যাত সমাজসংস্কারকেরা পরবর্তীকালে নানা ধরনের ভূমিকা পালন করলেও উনিশ শতকের আদিপর্বের অবস্থাটা আশাব্যঞ্জক ছিল না। তবু তারই মধ্যে কয়েকজন ক্রীশ্চান মহিলা অপ্রাপ্তবয়স্কা মেয়েদের শিক্ষাদানের জন্য হিন্দু স্কুল প্রতিষ্ঠার মাত্র দু'বছর পরে ফিমেল জুভেলাইন সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করলেন। এর পরিচালন সমিতিতে অবশ্য কোনো ভারতীয় মহিলা ছিলেন না। পাত্রী সম্প্রদায়ই ছিলেন মুখ্যত -এর পৃষ্ঠপোষক। অবশ্য, রাধাকান্ত দেবও এর পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন।

পাঁচ বছর পরে মেয়েদের শিক্ষিত করে তোলার উদ্দেশ্যে স্থাপিত হল লেডিজ সোসাইটি। কিন্তু একদল লোক রটিয়ে দিল এই প্রতিষ্ঠানটির মুখ্য উদ্দেশ্য মেয়েদের খৃস্টানধর্মে দীক্ষিত করা। গুজবের ফলে চারিদিকে এমন একটা হই-চই পড়ে গেল যে বড়লাট আতঙ্কিত হয়ে অর্থসাহায্য বন্ধ করে দিলেন এবং প্রতিষ্ঠানটি শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল।

এরপর কলকাতায় পাদ্রী মিডলটন প্রতিষ্ঠা করলেন বিশপ্‌স্ কলেজ আঠারো শো কুড়ি খৃস্টাব্দে। এই কলেজে প্রথম ন'বছর কোনো অ-খৃস্টীয় ছাত্রের প্রবেশাধিকার ছিল না।

হিন্দু স্কুলের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না হলেও রামমোহন ওই স্কুল প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছর পরেই এ্যাংলো হিন্দু স্কুল নামে একটি স্বতন্ত্র স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

এর এক বছর পরে স্কুল সোসাইটি একটি ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠা করল এবং এই স্কুলটির তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পেলেন শিক্ষাবিদ ডেভিড হেয়ার। তাই, এই স্কুলটির নাম পরে হেয়ার স্কুলে পরিণত হল। তৎকালীন প্রসিদ্ধ 'আড়পুলি পাঠশালা' পরে এর সঙ্গে মিশে যায়।

আঠারো শো চব্বিশ খৃস্টাব্দে সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত হল সংস্কৃত কলেজ। সংস্কৃত ভাষা চর্চা এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য থাকলেও চার বছর পর থেকে এই কলেজে ইংরেজি পড়াশোনাও চালু হল। কিন্তু কলেজটি প্রশাসনিক ও আর্থিক সংকটের জন্য সাত বছর পরে বন্ধ হয়ে যায়। ন'বছর বন্ধ থাকার পর সংস্কৃত কলেজ নব উদ্যমে পুনরায় চালু হয় আঠারো শো চুয়াল্লিশ খৃস্টাব্দ থেকে।

সরকারী প্রচেষ্টায় যেসব স্কুল তখন স্থাপিত হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে গৌরমোহন আঢ্য-কর্তৃক স্থাপিত ওরিয়েন্টাল সেমিনারী তখনকার দিনে প্রচুর খ্যাতিলাভ করেছিল। স্কুলটি চালু হয়েছিল আঠারো শো উনত্রিশ খৃস্টাব্দের পয়লা মার্চ তারিখে এবং এর বহু ছাত্র উত্তরকালে যশস্বী হয়েছিলেন।

আঠারো শো ত্রিশ খৃস্টাব্দে জেনারেল এ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন নামে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করলেন আলেকজাণ্ডার ডাফ। তেরো বছর পরে কলেজটির নাম ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশন নামে পরিবর্তিত হলেও লোকে এটিকে ডাফ কলেজ বলত। উনিশ শো আট খৃস্টাব্দে ক্রীশ্চান কলেজের সঙ্গে মিলিত হলে এটির নাম হয় স্কটিশ চার্চ কলেজ।

রক্ষণশীল দলের প্রতিবাদ উপেক্ষা করে বড়লাটের আদেশে এদেশে প্রথম মেডিকেল কলেজ খোলা হয় আঠারো শো পঁয়ত্রিশ খৃস্টাব্দের বিশে ফেব্রুয়ারী। প্রথমে হাসপাতালটির কাজ হত হিন্দু কলেজের পিছনে পেটি ফোর্ট জেলের জমিতে। তিন বছর পরে নিজস্ব গৃহে স্থানান্তরিত হলেও তখন রোগী ভর্তি

শুরু করা যায় নি। বর্তমান হাসপাতালে রোগী ভর্তি আরম্ভ হল আঠারো শো বাহান্ন খৃস্টাব্দের পয়লা ডিসেম্বর থেকে। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রায় তেরো বছর আগে থেকেই এদেশে আধুনিক চিকিৎসা-প্রণালী শুরু হয়ে যায় এবং সাত বছর আগে এদেশের ছাত্ররা শব-ব্যবচ্ছেদ করেন।

জন-শিক্ষা কমিটির নির্দেশে এবং সরকারী অর্থানুকূল্যে ঢাকা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় আঠারো শো পঁয়ত্রিশ সালে। মাত্র এক বছর পরে স্থাপিত হল চট্টগ্রাম জিলা স্কুল যেটি পরে কলেজে রূপান্তরিত হয়েছিল। ওই একই বছরে ফরাসী নাগরিক ক্লদ মার্তিন কলকাতায় ক্রীশ্চান নাগরিকদের শিক্ষার জন্য গড়ে তুললেন লা মার্তিনীয়ার কলেজ, হাজী মহম্মদ মহসীনের দানে স্থাপিত হল হুগলী কলেজ।

প্রায় তিন বছর পরে বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ক্যালকাটা মেকানিকাল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হলেও এই প্রতিষ্ঠানের আয়ুষ্কাল বেশি ছিল না।

মেয়েদের উচ্চশিক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র লরেটো হাউস আঠারো শো বিয়াল্লিশ খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হলেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোনয়ন পেতে এই বিদ্যালয়টিকে অপেক্ষা করতে হয়েছে পরবর্তী আরও সাতচল্লিশ বছর।

এই ধরণের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্থাপনার সঙ্গে সঙ্গে সমান্তরালভাবে কয়েকজন জাতীয়তাবাদী সমাজ-সংস্কারক এদেশের শিক্ষাপদ্ধতিতে পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার অনুপ্রবেশ দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিলেন। মূলত এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই দানবীর মতিলাল শীলের বদান্যতায় অবৈতনিক সীলস্ ফ্রী কলেজ স্থাপিত হল লরেটো হাউসের ঠিক এক বছর পরে।

এর তিন বছর পরে রিচার্ডসনকে অধ্যক্ষ করে কৃষ্ণনগর কলেজ-এর কাজ শুরু করেছিল। ওই একই বছরে সরকারী পরিচালনায় উত্তরপাড়া স্কুল স্থাপিত হলেও এটি কলেজে রূপান্তরিত হয় তেতাল্লিশ বছর পরে।

বাংলার নারী-শিক্ষা প্রসারের অন্যতম পুরোধা বেথুন, আঠারো শো উনপঞ্চাশ খৃস্টাব্দে বেথুন কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং আমৃত্যু কলেজটির ব্যয়ভার বহন করে গেছেন।

বর্তমান শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রথম গড়ে উঠেছিল রাইটার্স বিল্ডিংয়ের এক কোণে আঠারো শো ছাপ্পান্ন খৃস্টাব্দে। তখন এর নাম ছিল সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। ন' বছর পরে এই প্রতিষ্ঠানটি প্রেসিডেন্সী কলেজের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হয়। শিবপুরে নতুন বাড়ি তৈরি হলে পনেরো বছর পরে এটি একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়। প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে, আঠারো শো সাত খৃস্টাব্দ থেকে শুরু করে পরবর্তী ত্রিশ বছরের মধ্যে বাংলার প্রায় সব বড় বড় জেলায় গভর্নমেন্ট-সাহায্যপুষ্ট অনেকগুলো স্কুল চালু ছিল। এগুলোর মধ্যে ত্রিবেণী, উসেরপুর, বাঁকুড়া, যশোহর, কুমিল্লা, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল।

দেশের অন্যান্য অংশেও তখন কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। কিন্তু প্রশাসনিক সুবিধা এবং বাংলায় নবজাগরণের ঢেউ ইংরেজ সরকারকে বাধ্য করেছিল সেকালে সব কাজে কলকাতাকে অগ্রাধিকার দিতে। তাই দেশের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রতিষ্ঠা হয় এই কলকাতারই বুকে যথাক্রমে আঠারো শো সাতান্ন, আঠারো শো পঁয়ত্রিশ এবং আঠারো শো ছাপ্পান্ন খৃস্টাব্দে।

চান্নাম্মা ও রায়ান্নার সংগ্রাম

ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসের আদিপর্বের কথা বলতে-বলতে আমরা কিছুটা এগিয়ে এসেছি। আমরা লক্ষ্য করেছি পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে এদেশের সমাজ কীভাবে ক্রমশ সংস্কারমুক্ত ও বিজ্ঞানমুখী হয়ে উঠছে। কীভাবে শিক্ষালাভের জন্য আকুলতা বাড়ছে এবং এই মানসিকতার

পাশাপাশি ইংরেজ কীভাবে নিজেদেব সরকার পবিচালনাব প্রয়োজনে পরোক্ষভাবে শিক্ষাবিস্তারে সহায়তাও করছে। অবশ্য আমরা স্মরণ করেছি বিদেশীদের মধ্যে অনেক উদারমনা প্রগতিশীল বিশ্বনাগরিককে, এদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশে যাঁদের অবদান অনস্বীকার্য।

আমবা পুনর্বার ভাবতের বিভিন্ন রাজ্যে ইংরেজদের শোষণ ও নিপীড়ন এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যের অধিবাসীদের ব্যাপক বিদ্রোহ ও প্রতিরোধের চিত্র তুলে ধরব।

কর্ণাটক রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছোট্ট একটা রাজ্য ছিল কিট্টু। ইংরেজরা ওই রাজ্যটিকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়ে বাধা পেল জনপ্রিয় রানী চান্নাম্মার কাছে। নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে আঠারো শো চব্বিশ সালের ডিসেম্বর মাসে ইংরেজদেব হাতে বন্দিনী হন তিনি এবং পাঁচ বছর কারাগারে থেকে বন্দী অবস্থায় তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয়।

যুদ্ধ কিন্তু থামল না। ওই রাজ্যের সাঙ্গোলি নামক এক গ্রামের গরীব চৌকিদার রায়ান্নাকে বন্দী করা হয়েছিল চান্নাম্মার সঙ্গে। চান্নাম্মার মৃত্যু হলেও রায়ান্না কিছুদিন পরে ছাড়া পান। মুক্তির অব্যবহিত পরেই তাঁর অনুচরবাহিনী নিযে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন ইংরেজদেব বিরুদ্ধে। পোড়ানো শুরু করেন সরকারী দপ্তর, লুট করতে থাকেন সরকারী অর্থাগার, মাঝে মাঝে আচমকা হানা দিতেন সরকারী সেনাবাহিনীর উপর। এমন কি, ইংরেজদের দুর্গ আক্রমণ করে রায়ান্না সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে গেলেন।

দেশেব মানুষের কাছে তিনি ছিলেন অসামান্য জনপ্রিয়। রানী চান্নাম্মার যে বছর মৃত্যু হয় তার পরেব বছর জানুয়ারী মাসে রাযান্না সম্পাগাঁও শহবে হানা দিযে তালুকের সমস্ত সরকারী দলিল-পত্রসহ কাছারি পুড়িয়ে দেন। মাঝে মাঝে গেরিলা কাযদায তাঁর বিদ্যুৎ-আক্রমণে ধারওয়ার থেকে বোম্বাই পর্যন্ত ডাক-চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে বাধ্য হত ইংরেজ সরকার।

রায়ান্না অবশ্য ইংরেজের বেড়াজাল থেকে নিজেকে বেশিদিন লুকিয়ে রাখতে পারেন নি। ওই বছরেব এপ্রিল মাসেই তাঁকে শত্রুব হাতে ধরা দিতে হয এবং এই দেশপ্রেমিককে ইংরেজ ফাঁসী দেয বিচারের প্রহসন করে। দেশ স্বাধীন হলে বেলগাঁও শহরে তাঁর মূর্তি প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

টিপু গারোর নেতৃত্বে 'পাগলপন্থী' বিদ্রোহ

'সকল মানুষই ঈশ্বরের সৃষ্ট, কেহ কাহারও অধীন নহে, সুতরাং কেহ উচ্চ, কেহ নীচ এইরূপ প্রভেদ করা সঙ্গত নহে।'—এই কথা বলে টিপু গারো তাঁর এলাকার লোকদের দীক্ষিত করেন। এই গারোদের বলা হত 'পাগলপন্থী'। আঠারো শো পঁচিশ খৃস্টাব্দে টিপুর মতাবলম্বী শেরপুর পরগণায় অনেক প্রজা দলবদ্ধ হয়ে বিদ্রোহ করেন ও জমিদারকে খাজনা দেওয়া বন্ধ করেন। তাঁরা শেরপুর শহব দখল কবে এক নতুন গারো রাজ্য প্রতিষ্ঠা কবেন। ইংরেজবাহিনী ও তাদের তাঁবেদার জমিদারদের পাইক ও বরকন্দাজদেব বিরুদ্ধে টিপুব নেতৃত্বে বহু খণ্ডযুদ্ধ করে তারা প্রায় দু'বছর ওই শহরটিকে দখল কবে রাখেন। অতঃপর বংপুব থেকে যখন এক বিরাট সৈন্যদল এসে জামালপুরে ঘাঁটি গাড়ল তখন ওদের আক্রমণে টিপুকে বন্দী হতে হল এবং ময়মনসিংহের সেসন জজের বিচারে উনি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। পঁচিশ বছর কারাবাস করার পর কারাকক্ষেব অভ্যন্তরেই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় ওঁর পৌত্রও কাবারুদ্ধ ছিল।

ওয়াহাবি আন্দোলন

ওয়াহাবি ধর্মমতের উদ্ভব ঘটেছিল আরব দেশে। এই ধর্মমত ভারতে আমদানি করেন বেরিলির সৈয়দ আহমদ এবং ২৪ পরগণা জেলার বাদুড়িয়া অঞ্চলের তিতুমীর। ওই ধর্মমতকে কেন্দ্র করে ইংরেজ শাসক ও তাদের তাঁবেদার জমিদাব গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মুক্তিকামী মানুষদের এক প্রবল ও দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন চলে।

বারাসতের কাছে নারকেলবেড়িয়া গ্রামে তিতুমীর এক বাঁশের কেল্লা গড়ে ইংরেজ ও তাদের আশ্রিত জমিদারবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেন। ওঁর আক্রমণে কালেক্টরের বহু সৈন্য হতাহত হয় এবং কালেকটর ও জজ সাহেব পালিয়ে যান।

আঠারো শো একত্রিশ খৃস্টাব্দের চোদ্দই নভেম্বর ইংরেজ প্রবল বেগে আক্রমণ চালিয়ে তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা বিধ্বস্ত করে এবং তিতুর মৃত্যু হয়। ওরা আটশো জন বিদ্রোহীকে গ্রেপ্তার করে। দীর্ঘদিন বিচারের পর তিতুমীরের ভাগ্নে ও তাঁর দলের প্রধান সেনাপতি গোলাম মাসুমের ফাঁসী হয়। এছাড়া, সাড়ে তিনশো বিদ্রোহীর দ্বীপান্তর ও বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড হয়।

কোল অভ্যুত্থান

ছোটনাগপুর অঞ্চলে কোল, মুণ্ডা, হো প্রভৃতি উপজাতিদের অভ্যুত্থান ঘটেছিল ইংরেজদের সিংভূম দখলের ফলে। সিংভূমের পলিটিক্যাল এজেন্ট মেজর রাফ্‌শোজ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে একটি নোটে লিখেছিলেন 'এই বন্যেরা কুড়ুল হাতে অবিশ্বাস্য রকমের বেপরোয়াপনা ও কষ্টসহিষ্ণুতা সম্বল করে মাঝপথেই, খোলা ময়দানে আমাদের সৈন্যবাহিনীর আক্রমণের মুখোমুখি দাঁড়ায়।'

নানা ধরনের জবরদস্তি শোষণ, আদায় ও খাজনাবৃদ্ধির ফলে আঠারো শো ঊনত্রিশ খৃস্টাব্দের শেষদিকে সম্বলপুরে ওই উপজাতিদের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ ফেটে পড়ে। পরবর্তী দু'বছরের মধ্যে এই বিক্ষোভ রাঁচি, হাজারীবাগ, পালামৌ এবং মানভূমের পশ্চিম অঞ্চলে ব্যাপক গণ অভ্যুত্থানের রূপ নেয়। রাঁচি জেলার শোনপুর পরগণায় ইচাগুটার সিংরায় মঙ্কির (খাজনা আদায়কারী ইজারাদার) বারোটি গ্রাম বাইরের লোকদের ইজারা দেওয়া হয়েছিল যারা ওই মঙ্কির কাছ থেকে গ্রামগুলো বেদখল করে নেয় এবং তার দুই ছোট বোনের উপর বলাৎকার করে। হাণ্টারের 'স্ট্যাটিসক্যাল এ্যাকাউন্টস অফ বেঙ্গল (লোহারডাগা)' গ্রন্থে লেখা হয়েছে, এই ঘটনাই নাকি আঠারো শো একত্রিশ সাল থেকে কোল বিদ্রোহের পুঞ্জীভূত ক্ষোভকে হঠাৎ প্রজ্বলন্ত করে তোলে।

ওই অভ্যুত্থানে সামিল হয়েছিলেন মাত্র তিনশো কোল বিদ্রোহী। কিন্তু এই বিদ্রোহীদের দমন করতে সেদিন ইংরেজ পদাতিক, অশ্বারোহী এবং গোলন্দাজবাহিনী থেকে দু'হাজার সেনা নিয়োগ করেছিল আর স্যার জন শোরের হিসেব অনুযায়ী এই বিদ্রাহ দমন কবতে সেদিন সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে হয়েছিল প্রায় পাঁচ হাজার বর্গমাইল এলাকা।

ফারাজী আন্দোলন, শরিয়াতুল্লাহ্ ও দুদু মিঞা

দুদু মিঞার আসল নাম ছিল মহম্মদ মহসিন। তিনি ফরিদপুরের মুসলমান সন্ত, হাজী শরিয়াতুল্লাহ্‌র পুত্র। শরিয়াতুল্লাহ্ তাঁর অগণিত জোলা সম্প্রদায়ভুক্ত শিষ্যদের কাছে প্রচার করতেন এক ধরনের সহজ সাম্যবাদের মাহাত্ম্য। পিতার এই আদর্শের অনুবর্তী দুদু মিঞা ঘোষণা করেছিলেন, 'ভূমি আল্লার দান। সুতরাং ইহা ব্যক্তিগত ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বংশ পরম্পরায় দখল করিয়া রাখিবার এবং ইহার উপর কর ধার্য করিবার অধিকার কাহারও নাই।'

তাঁর পিতা দুদু মিঞাকে প্রায়ই বলতেন বিদেশী শাসক, নীলকর সাহেব, জমিদার ও গোঁড়া মোল্লাদের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তার কথা। শরীয়াতুল্লাহ্‌র অনুচরেরা ছিল ফারাজী ধর্মমতে বিশ্বাসী। দুদু মিঞা ওই অনুচরদের শুধু ধর্মীয় নয়, জমিজমা ও বিষয়সম্পত্তি সংক্রান্ত জটিলতারও মীমাংসা করতেন। এমন কি, সরকারী প্রশাসনযন্ত্রের সমান্তরালভাবে তিনি কোথাও কোথাও ফারাজী আদালত ও শাসনকেন্দ্রও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

দুদু মিঞার ওই ধরনের প্রচার ও তৎপরতার ফলে শুধু মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষই নন, বেশ কিছু হিন্দু কৃষক কারিগর ও নিম্নবর্ণের মানুষও তাঁর দলে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর প্রভাব ক্রমশ ছড়িয়ে

পড়ল ঢাকা, খুলনা ও চব্বিশ পরগণায়। দক্ষ সাংগঠনিক ক্ষমতায় তিনি একটি বিশাল লাঠিয়াল বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন এবং ওঁর নির্দেশে ওই লাঠিয়াল বাহিনী মোকাবিলা করতেন ইউরোপীয় সেনা, নীলকর এবং শাসক ইংরেজদের তাঁবেদার জমিদারদের সশস্ত্রবাহিনীর। ইংরেজ সরকার তাঁকে বারবার গ্রেপ্তার করেছে কিন্তু কাউকে তাঁর বিরুদ্ধে শত প্ররোচনা, লোভ ও ভয় দেখিয়েও সাক্ষ্য দেওয়ানো যায়নি। অতএব দুদু মিএগকে ইংরেজ কোনোদিন দণ্ড দিতে পারে নি। অবশেষে তাঁর জন্মস্থান বাহাদুরপুর গ্রামে আঠারো শো ষাট সালের চব্বিশে সেপ্টেম্বর তিনি লোকান্তরিত হন।

সমাজচেতনায় কয়েকটি বিশিষ্ট নাম

সাঁওতাল বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ এবং নীল বিদ্রোহ যখন ইংরেজ শাসকশ্রেণীকে চরম বিপর্যয়ের মধ্যে এনে ফেলেছিল, তার আগেই বাংলার সমাজ-মানস কয়েকজন বিশিষ্ট মানুষের চিন্তা ও চেতনায় গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

তারাচাঁদ চক্রবর্তী (১৮০৪-১৮৫৫) ছিলেন ইয়ং বেঙ্গলের নেতা। তিনি মনে করতেন, বিদেশী শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় ভারতীয়রা কোনো দিক থেকেই হেয় নন। তিনি চেয়েছিলেন মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, বৈষম্যহীন বিচার-ব্যবস্থা, নির্বাচনের মাধ্যমে বিধানসভার সভ্য মনোনয়ন, সরকারী অপব্যয় রোধ, সর্বস্তরে শিক্ষার প্রসার, ভারতের ন্যায্য দাবি পূরণ এবং জনসাধারণের সুখ-সমৃদ্ধি। তাঁরাচাদ একা নন, তাঁর অনুচরেরাও ওঁর মতের অনুবর্তী ছিল।

কাশীপ্রসাদ ঘোষ নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন ডিরোজিওর দেশপ্রেম ও কাব্যগুণের অনুসারক হিসেবে। তাঁর রচিত দেশপ্রেমমূলক কবিতায় পরাধীন দেশের বেদনা ফুটে উঠেছিল। তাঁর ধারণা ছিল ভারত একদিন স্বাধীন হয়ে জ্ঞানের সুউচ্চ শিখরে আরোহন করবে। সমসাময়িক বহু পত্রিকা তাঁর ইংরেজি ভাষায় রচিত কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিল।

ভোলানাথ চন্দ্র (১৮২২-১৯১০) বিদেশী পণ্য বর্জনে প্রচণ্ড উদ্যমী ছিলেন। তিনি সবাইকে বলতেন, যে সকল পণ্য দেশে উৎপন্ন হয় তার পরিবর্তে বিদেশী দ্রব্য কেনা গুরুতর অপরাধ। তাঁর যুক্তি ছিল, জীবিকার্জনের পথ যদি রুদ্ধ হয়ে যায় তাহলে জাতির মেরুদণ্ড দুর্বল হয়ে পড়বে। যে শক্তি দ্বারা বিদেশীর আক্রমণ প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করতে হবে, দেশ সে শক্তি হারিয়ে ফেলবে।

রামগোপাল ঘোষ বিদ্যা, বিত্ত, শ্রমশীলতা, পরার্থপরতা ও বাগ্মিতার গুণে সমকালীন বাংলায় একটি উল্লেখ্য স্থান দখল করেছিলেন। বেথুন আঠারো শো ঊনপঞ্চাশ খৃস্টাব্দে 'কালা-আইন'-এর প্রবর্তন করেন। এর ফলে ভারতীয়ের আদালতে শ্বেতাঙ্গ অপরাধীদের বিচার করার প্রস্তাব ছিল। কিন্তু বেথুনের এই আইন খসড়া আকারে উপস্থাপিত হতেই শ্বেতাঙ্গরা সম্মিলিতভাবে তার বিরোধিতা করে। তখন রামগোপাল নানা জায়গায় তাঁর যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতার দ্বারা শ্বেতাঙ্গদের বক্তব্যের অসারতা প্রমাণ করেছিলেন।

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের (১৮১৪-১৮৭৮) প্রবণতা ছিল ভারতীয় শাসন ও বিচার বিভাগীয় অনাচার এবং পুলিশের দুর্নীতি নিয়ে বেশি আলোচনা করার। তাঁর আপত্তির প্রধান কারণ ছিল শ্বেতাঙ্গদের প্রতি দেশীয় লোকের তুলনায় সরকারের বিশেষ পক্ষপাতিত্ব। একবার তিনি ভারতে ইংরেজ কর্তৃক অপশাসন ও শোষণের ওপর তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে তীব্র আক্রমণাত্মক ভাষণ দিচ্ছিলেন যা শুনতে শুনতে রিচার্ডসনের মতো শান্ত, ধীর, প্রসিদ্ধ শিক্ষক দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। রিচার্ডসন বলেছিলেন, তিনি হিন্দু কলেজকে 'রাজদ্রোহের আস্তানা' হতে দেবেন না।

পিয়ারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩) ছিলেন বঞ্চিত সহায়-সম্বলহীন প্রজাদের স্বার্থরক্ষায় যত্নবান। তিনি সর্বদা লক্ষ্য রাখতেন প্রজারা যাতে শক্তিশালী হয়ে পরাক্রমশালী শাসক ও শোষকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সক্রেটিস রীড্‌লি, লুথার, ল্যাটিমার প্রভৃতির নাম উল্লেখ করে প্রচার

করতেন, নির্যাতন নিপীড়ন ও প্রবল বাধা না পেয়ে জগতে কোনো বড় কাজ সম্পন্ন হয়নি। তিনি আরো বলতেন, বিদেশী শাসকবর্গকে যেটুকু সাহায্য করতে হয়, সেটা নিতান্ত বেঁচে থাকার জন্যই। ডিরোজিও-পন্থী কৃষ্ণমোহন যখন খৃস্টধর্ম গ্রহণ করার জন্য বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন তখন তাঁর বন্ধু দক্ষিণারঞ্জন তাঁকে আশ্রয় দেন এবং এজন্য তাঁর পিতা দক্ষিণারঞ্জনকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন।

রসিক কৃষ্ণ মল্লিক যে সকল রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ভারতের অবনতির কারণ এবং জনসাধারণের দুঃখ কষ্ট বাড়িয়ে তুলত, তার বিরুদ্ধে তাবাচাঁদের মতো প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসতেন। 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা ছিল রসিককৃষ্ণের প্রতিবাদের মুখ্য হাতিয়ার। এছাড়া 'দশশালা' বন্দোবস্তে প্রজাদের স্বার্থ সংরক্ষিত না হওয়ায় তিনি ওদের বিপদের গুরুত্ব বুঝে তার প্রতিবিধানের চেষ্টা করে গেছেন। তিনি শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে বলতেন, স্বেচ্ছাচারী সরকার নিজেই নিজের কবর খুঁড়ছে। কারণ দেশের আইন প্রণয়নে ও দেশের শাসনকার্যে এদেশের মানুষের কোনো স্থান নেই। সরকারে অংশগ্রহণের সুযোগ না থাকলে সেই সরকারের প্রতি মমত্ববোধ জাগতেই পারে না। অতএব, এদেশের মানুষের রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনো দায়িত্ব না থাকায় এদেশে রাজা ও প্রজার সংঘর্ষ চিরকাল লেগেই থাকবে।

রাধানাথ শিকদার (১৮১৩-১৮৭০) অঙ্কশাস্ত্রের মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি মাত্র উনিশ বছর বয়সে টিগনিমেট্রিকাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার কাজে যোগ দেন। উনচল্লিশ বছর বয়সে তিনি হিমালয়ের সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ এভারেস্ট আবিষ্কার করেন। অন্যান্য ডিরোজিও পন্থীদের মতো শিক্ষাবিস্তারে তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে তিনি ছিলেন বিশেষ উদ্যোগী। তাঁর বন্ধু প্যারীচাঁদ মিত্রের সঙ্গে 'মাসিক পত্র' নামে তিনি একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। এই পত্রিকায় এমন সহজভাবে নানা বিষয়ে রচনা প্রকাশ পেত যাতে মেয়েরা সেই পত্রিকার লেখাগুলো সহজেই বুঝতে পারতেন। মাতৃভাষার সহায়তায় শিক্ষালাভ সহজ হবে, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। বাল্য-বিবাহ নিরোধে তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না। তাঁর কর্মজীবনে উর্ধতন সাহেব-কর্তা কুলিদের বেগার খাটুনির নির্দেশ দিলে রাধানাথ তা অগ্রাহ্য করেন এবং সেজন্য তাঁর দু'শো টাকা জরিমানা হয়। কিন্তু তাঁকে দমানো যায় নি। তাঁর নির্ভীক প্রতিবাদের ফলে ওই 'বেগারী' প্রথা শেষ পর্যন্ত সরকার তুলে দিতে বাধ্য হয়।

প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৬) বাংলা উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর লেখা 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যে কথ্য ভাষায় লেখা প্রথম উপন্যাস। বইটি প্রকাশিত হয়েছিল আঠারো শো আটান্ন খৃস্টাব্দে। প্যারীচাঁদ ছিলেন জ্ঞানান্বেষণ সভার সভাপতি এবং 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ও 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকার নিয়মিত লেখক। তাঁর 'জমিনদার এ্যাণ্ড দ্য রায়টস' প্রবন্ধে তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের তীব্র সমালোচনা করেন।

প্রসন্নকুমার ঠাকুর (১৮০৩-১৮৬৮) ছিলেন অগাধ পাণ্ডিত্য ও বিত্তের অধিকারী। তিনি স্পষ্টভাষায় বলেছিলেন, শ্বেতাঙ্গদের ঔদ্ধত্যে বাঙালীর মন তিক্ত হয়ে উঠেছে এবং ইংরেজ রাজত্ব যেন বালুকাস্তূপের উপর গড়ে উঠেছে। ক্ষুব্ধ নাগরিকেরা সম্রাটের শক্তি কখনও বৃদ্ধি করতে পারে না। দায়িত্বপূর্ণ পদে এদেশের লোকদের কাজ করার কোনো অধিকার নেই। তিনি মনে করতেন, উচ্চশিক্ষিত যোগ্য বাঙালী চিরকাল নিম্নতর পদে নিযুক্ত থাকলে সেটা দেশের পক্ষে বিরাট ক্ষতি। এর ফলে দুই দল পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিহীন হয়ে কলহের জন্য প্রস্তুত হয়। কোনো আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন জাতির পক্ষে বিদেশীর পদানত হয়ে থাকার যৌক্তিকতা থাকতে পারে না।

কৈলাসচন্দ্র দত্ত হিন্দু কলেজের আর একজন উজ্জ্বল ছাত্র। তিনি আঠারো শো পঁয়ত্রিশ খৃস্টাব্দের জুন মাসে ক্যালকাটা লিটারারি গেজেট পত্রিকায় একশো বছর পরে সংঘটিতব্য ভবিষ্যতের চিত্র এঁকেছিলেন। একশো বছর আগে লেখা তাঁর এই ছবিতে তিনি ভবিষ্যৎ বিদ্রোহের একটি কাল্পনিক কাহিনী রচনা করেছিলেন অপূর্ব দূরদর্শিতায়। ওই কাহিনীতে আছে, বিদেশীর অকথ্য অত্যাচারে জর্জরিত

হয়ে স্বভাবভীরু বাঙালী পার্লামেন্টে বারে বারে আবেদন-নিবেদন করে কোনও প্রতিকার পায়নি বরং উত্তরোত্তর উৎপীড়ন বৃদ্ধি পেয়েছে। সহ্যের সীমা অতিক্রান্ত হলে উনিশ শো পঁয়তাল্লিশ সালে জনসাধারণ বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে। কৈলাসচন্দ্র কল্পনার চোখে দেখেছেন, বিদ্রোহ বিদ্যুৎগতিতে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক বিদ্রোহীদের নৃশংস অমানবিক কার্যকলাপের নিন্দা নানারঙে প্রকাশ করবে কিন্তু কৈলাসচন্দ্র জানতেন যে-সকল দেশপ্রেমিক বিদ্রোহীদের আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সরকারী চরম নিষ্ঠুরতার কবলে পড়েছেন, যাঁদের বাড়িঘর-দোর লুণ্ঠিত হয়েছে, পুড়িয়ে ছাই করে ফেলা হয়েছে, যাঁরা জঙ্গলে ও পর্বতগুহায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন, তাঁদের অন্তরের ব্যথা-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা যিনি নিরপেক্ষ মনে যতক্ষণ বুঝতে চেষ্টা না করছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত এই বিপ্লবের প্রকৃত কারণ জানা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না।

কৈলাসচন্দ্রের এই উপন্যাসে দারুণ তাণ্ডবের পরে বিপ্লব দমিত হল। একজন বিদ্রোহীর ফাঁসীর হুকুম হলে তাঁর মুখ দিয়ে দূরদর্শী কৈলাসচন্দ্র যে-বাণী উচ্চারিত করিয়েছেন, সেই ভাষা এই উপন্যাস লেখার প্রায় শতবর্ষ পরে মাস্টারদা সূর্য সেনের মুখের বাণী বললে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। দুই কালের দুই বিপ্লবী চরিত্রের ভাব ও ভাষার সাদৃশ্য বিস্ময়জনক। এই দিক থেকে বিচাব করলে এটা ঔপন্যাসিক কৈলাসচন্দ্রের কম সাহস ও কৃতিত্বের কথা নয়। তিনি তাঁর উপন্যাসের বিপ্লবী নায়ককে ফাঁসীতে প্রাণদণ্ড দিয়েছেন কিন্তু ফাঁসীর দড়িতে আত্মাহুতি প্রকৃতপক্ষে চালু হয়েছিল মহারাষ্ট্রে আঠাবো শো সাতানব্বই খৃস্টাব্দে এবং বাংলায় শুরু হয়েছিল আরও এগাবো বছর পরে।

পত্র-পত্রিকার ভূমিকা

একদিকে রাজনৈতিক মিটিং-মিছিলের অপ্রতুলতা, অন্যদিকে দেশের বাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিপার্শ্ব সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তোলাব প্রয়োজনে শিক্ষিত মানুষেবা পত্রিকা-প্রকাশনা শুরু করলেন।

গুরুত্বপূর্ণ পত্র-পত্রিকার দিকে লক্ষ্য কবতে গেলে প্রথমেই আমাদেব নজব পড়ে 'সমাচাব দর্পণ' 'দিগদর্শন' ও 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' পত্রিকাগুলোর ওপব। এগুলো শ্রীরামপুরেব পাদ্রীরা প্রকাশ কর্বেছিলেন আঠারো শো আঠারো খৃস্টাব্দে।

ওই একই বছরে প্রকাশিত হয়েছিল গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যেব 'বাঙ্গাল গেজেটি'। এর তিন বছর পরে ছাপা হয রামমোহনের 'ব্রাহ্মণ সেবধি' ও 'মিশনারী সম্বাদ' এবং ভবানীচরণ ভট্টাচার্য ও তারাচাঁদ দত্তের যুগ্ম সম্পাদনায় 'সম্বাদ কৌমুদী'। পবের বছর ওঁদের প্রতিপক্ষ ভবানীচবণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল 'সমাচার-চন্দ্রিকা' এবং ভবানীচরণ ভট্টাচার্যের একক সম্পাদনায় 'সমাচার দর্পণ'।

আঠারো শো আঠারো খৃস্টাব্দের দোসরা অক্টোবর জেমস সিল্ক বাকিংহ্যামের পরিচালনায় প্রকাশিত হয় 'ক্যালকাটা জর্নাল'। প্রথমে পত্রিকাটি সপ্তাহে মাত্র দু'বার প্রকাশিত হয় কিন্তু জনপ্রিয়তার জন্য সম্পাদক সাত মাস পরে পত্রিকাটিকে দৈনিকে পরিণত করেন। এতে ভারতের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক সংবাদগুলোর চুম্বক প্রকাশিত হত। যে সব গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হত, বাকিংহ্যাম এই পত্রিকায় তার পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করতেন। রামমোহনের সঙ্গে বাকিংহ্যামের ঘনিষ্ঠ প্রীতির সম্পর্ক ছিল। তাই রামমোহন তাঁর অনেক রাজনৈতিক বক্তব্য এই বন্ধুকে লিখে জানাতেন। ভারত-প্রীতির জন্য বাকিংহ্যামকে এদেশ থেকে নির্বাসিত করা হয়। কিন্তু এই মহৎ ভারতবন্ধুকে তবু নিবৃত্ত করা যায়নি। তিনি ইংলণ্ডে বসে 'ওরিয়েন্টাল হেরাল্ড' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে ভারতের স্বার্থ সংরক্ষণে সচেষ্ট হন।

বাকিংহ্যামের মতো এদেশের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য চার্লস ম্যাকলিনও নানা নির্যাতন ভোগ করেন এবং তাঁকেও ভারত থেকে নির্বাসিত হতে হয়েছিল। তাঁর সম্পাদিত দৈনিক 'বেঙ্গল হরকরা'র পাতায় ইংরেজ শাসকদের নানা অত্যাচরের স্বরূপ তুলে ধরা হত।

আঠারো শো একত্রিশ খৃস্টাব্দে ডিরোজিও 'ইস্ট ইণ্ডিয়া নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ডিরোজিওর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই পত্রিকাটি উঠে যায়। ওই একই সময়ে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইনক্যোয়ারার' পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের মনোরঞ্জন করে। পত্রিকাটির স্বাধীন মতবাদ এবং এতে মুদ্রিত প্রবন্ধগুলোর ভাব ও ভাষা সেকালের পাঠকদের কাছেও অভিনব বলে মনে হয়েছিল।

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় 'জ্ঞানান্বেষণ' নামে যে পত্রিকাটি আঠারো শো একত্রিশ সালে প্রকাশ করেছিলেন, রসিককৃষ্ণ মল্লিকের সম্পাদনায় সেটি প্রায় তেরো বছর চলেছিল। দক্ষিণারঞ্জন ছাড়া এই পত্রিকাটির পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন রামতনু লাহিড়ী, রামগোপাল ঘোষ এবং তারাচাঁদ চক্রবর্তী। শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে এদেশের মানুষের ক্ষোভ প্রকাশে পত্রিকাটি সেদিন এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল।

এই পত্রিকাটির সঙ্গে প্রায় একই সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সম্বাদ প্রভাকর'। এতে তৎকালীন সমাজ-জীবনের নানাবিধ প্রসঙ্গ স্থান পেত। দেশের ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি, প্রকৃতি, পুজোপার্বণ, ঐতিহাসিক ঘটনা, সামাজিক আচার, আদব কায়দা, নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা, অতি সাধারণ ভোজ্যদ্রব্য ইত্যাদি কোনো প্রসঙ্গই বাদ যেত না। ব্যঙ্গের কষাঘাতে লেখাগুলোর মধ্যে একটা নতুন মাত্রা সঞ্চারিত করাই ছিল গুপ্ত-কবির কাজ। দেশপ্রেম ও উগ্র জাতীয়তাবাদের ফলে তিনি দেশবাসীর মনে এমন একটা ভ্রাতৃভাব জাগাতে চেয়েছিলেন যার ফলে এদেশের মানুষ যেন বিদেশী ঠাকুর ফেলে এদেশের কুকুরকে কাছে টেনে নেয়। পত্রিকাটি সাড়ে আট বছব চলার পর শিবনাথ শাস্ত্রী এটির দায়িত্ব নিয়ে 'সম্বাদ প্রভাকর'কে দৈনিকে পরিণত করেন।

ই. মেসিন্‌ক ও পিটার রীড নামক দু'জন বিদেশীর যুগ্ম সম্পাদনায় 'ইণ্ডিয়া গেজেট' পত্রিকাটি প্রকাশিত হলে এর পাতায় বিতণ্ডামূলক প্রবন্ধ মুদ্রিত করে পত্রিকাখানি নব্য দলের প্রতি প্রকাশ্য সমর্থন জ্ঞাপন করেছিল। শুধু তাই নয়, ইংরেজের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় আঠারো শো তেতাল্লিশ খৃস্টাব্দের আটই ফেব্রুয়ারী কলকাতায় যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেটি মার্চ মাসের দু'টি সংখ্যায় পরপর মুদ্রিত করে এই পত্রিকা সাহসের পরিচয় দেয়।

নব্য বাংলার মতবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে আঠারো শো একত্রিশ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত 'ইণ্ডিয়ান রিফর্মার' কাগজটি প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রগতিশীল বাঙালীদের অন্যতম মুখপাত্র রূপে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। রামগোপাল ঘোষও যখন আঠারো শো বিয়াল্লিশ খৃস্টাব্দে 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' নামে একটি দ্বিভাষিক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করলেন তখন তাঁরও উদ্দেশ্য ছিল ওই পত্রিকাটির মাধ্যমে নতুন যুগের মানুষদের সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়িত্ববোধ সম্পর্কে আরও সচেতন করে তোলা। অনতিকালের মধ্যেই এই মাসিক পত্রিকায় এসে যোগ দিয়েছিলেন তারাচাঁদ চক্রবর্তী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্যারীচাঁদ মিত্র। মাসিক পত্রিকাটি ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। মাত্র পাঁচ মাস বাদে এটি পাক্ষিক এবং এক বছর বাদে সাপ্তাহিকে রূপান্তরিত হয়।

আঠারো শো ছেচল্লিশ খৃস্টাব্দ কাশীপ্রসাদ ঘোষের সম্পাদনায় একটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশিত হয়—'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার'। পত্রিকাটিতে অবশ্য কোনো ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক রচনা ছাপা হত না। দেশের সমকালীন সমস্যাদি এই কাগজটির পাতায় অকুতোভয়ে তুলে ধরা হত। এই পত্রিকার পাঠকদের কাছে একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল কাশীপ্রসাদের দেশাত্মবোধক কবিতাবলী। যে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা তখন এদেশে প্রবহমান ছিল সেই চেতনা রূপায়িত হয়েছিল দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য়। কাগজটি প্রকাশিত হয় আঠারো শো তেতাল্লিশ সালের ষোলোই আগস্ট এবং

এর সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। ধর্ম, শিক্ষা, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য, সদাচার প্রভৃতি সর্বাঙ্গীন বিষয়ে জাতির উন্নতিবিধানে এই পত্রিকাটির ভূমিকা ছিল অসামান্য। নীলচাষীদের দুর্দশা প্রকাশ করাও ছিল এর অন্যতম কাজ।

কালীপ্রসন্ন সিংহ আঠারো শো পঞ্চান্ন খৃস্টাব্দে 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' প্রকাশ করেছিলেন। ইয়ং বেঙ্গল দল সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যে প্রবল সুরতরঙ্গ তুলেছিল, তার প্রতিধ্বনি প্রায় সকল পত্রিকায় ঝঙ্কৃত হয়েছিল। এই কাগজগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটিই যে রাজনৈতিক সমস্যা আলোচনা করত তা নয় কিন্তু তখনকার চিন্তাশীল বিদ্বান লোকের মন যে কত দিকে প্রভাবিত হয়েছিল, তার অন্তত কিছুটা আভাস পাওয়া যায় এই পত্র-পত্রিকাগুলো অনুধাবন করলে।

সিপাহী বিদ্রোহের মাত্র এক বছর পরে আবির্ভূত দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকাটিতে সরকারী কার্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে আলোচিত হত এবং শোনা যায় সরকারী দপ্তরে সে-বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেবার আদেশও ছিল। প্রায় কুড়ি বছর পত্রিকাটি চালানোর পর দেশীয় সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ হলে দ্বারকানাথ পত্রিকার প্রচার বন্ধ করে দেন।

'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড' পত্রিকাটি প্রকাশকালের দিক থেকে 'সোমপ্রকাশ'-এর সমকালীন। প্রতিষ্ঠাতা জেমস হিউম, সম্পাদক কিশোরীচাঁদ মিত্র। এই কাগজটিতে দেশীয় স্বার্থ সংরক্ষণে বিশেষ সাহস ও দূরদর্শিতার পরিচয় দেওয়া হত। নীল রায়তদের দুঃখ-দুর্দশা ও অভাব-অভিযোগ প্রতিকারের চেষ্টায় এই পত্রিকাটি হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'হিন্দু পেট্রিয়টের' সমগোত্রীয় হয়ে উঠেছিল।

মুদ্রাযন্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইন

ছোট-বড় নানাধরণের ইংরেজি ও বাংলা পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ায় দেশবাসী তাঁদের রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়ার সুযোগ পাচ্ছিলেন। বৈষম্য, অত্যাচার ও শোষণের নানা তথ্য ও সংবাদ জেনে এদেশের মানুষেরা ক্রমশই ক্ষুব্ধ ও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছিলেন। শাসকশ্রেণী প্রমাদ গণতে বাধ্য হল।

ওয়েলেসলি ভারতের বড়লাটের পদে আসীন হন সতেরো শো নিরানব্বই খৃস্টাব্দে। মাত্র দু'বছর পরে তিনি দেশের হাওয়া বুঝে মুদ্রাযন্ত্রের উপর বাধা-নিষেধ আরোপ করেন। এই অবস্থা জারী থাকল প্রায় কুড়ি বছর। অবশেষে বড়লাট হেস্টিংস এই নিয়ন্ত্রণ আইনটি রদ করলেন আঠারো শো আঠারো খৃস্টাব্দের উনিশে আগস্ট তারিখে। কিন্তু মাত্র পাঁচ বছর পরে আবার এই কালা আইনের প্রয়োগ করতে শুরু করলেন অস্থায়ী লাট জন এ্যাডাম। ওঁরই রাজত্বকালে বাকিংহ্যামকে ভারত থেকে নির্বাসিত করা হয়েছিল। রামমোহন এই আইন রদ করার জন্য চেষ্টা করেও সফল হননি। প্রতিবাদে তিনি তাঁর ফার্সী পত্রিকা 'মিরাৎ-উল্-আখবর' বন্ধ করে দেন আঠারো শো তেইশ খৃস্টাব্দের চৌঠা এপ্রিল।

বড়লাট চার্লস থিওফিডাস মেটকাফ প্রায় এক যুগ পরে আঠারো শো পঁয়ত্রিশ খৃস্টাব্দের পনেরোই সেপ্টেম্বর ভারতের মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দান করেন।

সিপাহী-বিদ্রোহ পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই চলছিল। আঠারো শো ছাপ্পান্ন খৃস্টাব্দের তেরোই জুন নিয়ন্ত্রণ আইন আবার চালু করা হয়। শুধু তাই নয় কতকগুলো পত্রিকাও বন্ধ করে দেওয়া হয়।

কিন্তু ততদিনে বিপ্লবেব আগুন ধিকি ধিকি জ্বলতে শুরু করেছিল এদেশের মানুষের মনে। অত্যাচার, বৈষম্য ও শোষণের বিরুদ্ধে জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিল যার বিশাল বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল সাঁওতাল বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ ও নীল বিদ্রোহে। কিন্তু সেই ব্যাপক গণবিক্ষোভের প্রেক্ষিত, তথ্য ও পরিণতি বিশ্লেষণ করার আগে তৎকালীন সমাজে মানুষ কীভাবে সংঘবদ্ধ হতে শুরু করেছিল, কীভাবে সামাজিক আদান-প্রদানকে কেন্দ্র করে তারা শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে জোট বাঁধতে শুরু করেছিল, কোনো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হওয়ার আগেই কীভাবে এদেশের মানুষ সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন জনহিতকর কাজের প্রচার ও প্রসারে এগিয়ে এসেছিল সে-সম্পর্কে আমরা কিছু তথ্য নিবেদন করি।

সংঘবদ্ধ সমাজ-জীবনের প্রতিফলন

ডিরোজিও এ্যাকাডেমিক এ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করে উনিশ শতকের প্রথম পর্বে এমন একদল শিক্ষিত ছাত্রকে সমাজ, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্র-সম্পর্কে জাগ্রত করেছিলেন যাঁরা তাঁদের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন এদেশের মুক্তিকল্পে। বস্তুতপক্ষে তাঁদের চিন্তাধারাই এদেশের মানুষকে পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য উদ্বুদ্ধ করে। দেশের অবস্থা পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষায় দিকে দিকে বিভিন্ন সভা-সমিতি গড়ে উঠতে থাকে তখন থেকেই।

দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রসময় দত্ত প্রমুখ তৎকালীন বাংলার কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা মাতৃভাষার উন্নতি ও তার ফলে সাধারণের মধ্যে জ্ঞানবিস্তারের কাজে আত্মনিয়োগের উদ্দেশ্যে গোড়ীয় সমাজ স্থাপনা করেন আঠারো শো তেইশ খৃস্টাব্দে। এই সংস্থায় রক্ষণশীল ও প্রগতিবাদীরা সম্মিলিতভাবে কাজ করতেন। মাতৃভাষার প্রতি এই শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা থেকেই গড়ে উঠেছিল কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে প্রতিষ্ঠিত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা। এই সভা ইংরেজিভাষার অব্যাহত প্রভাবকে কতক পরিমাণে রোধ করার চেষ্টা করেছিল। এই সভার সদস্যদের একটি শর্ত মানতে হত, তাঁরা বাংলা ছাড়া অন্য ভাষা ব্যবহার করবেন না।

এরপর মাত্র চার বছরের ব্যবধানে এদেশে প্রথম রাজনৈতিক সভা প্রতিষ্ঠিত হল কালীনাথ রায়চৌধুরী, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, রামলোচন ঘোষ প্রভৃতির উদ্যোগে। এই সভারও কাজ ছিল বাংলার ভাষার ব্যাপক প্রসার কিন্তু এটিই এই সভার একমাত্র লক্ষ্য ছিল না। সদস্যরা শপথ নিয়েছিলেন, কোনো অধিবেশনে তাঁরা ধর্মচর্চা করবেন না। বরং ভারতের স্বার্থের হানিকর যে-সকল সরকারী ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে, তার প্রতিকারের উপায় আলোচনা করবেন। সবকাব যখন লাখেরাজ অর্থাৎ নিষ্কর জমি-জমার উপব কর ধার্য কবেছিল তখন এই সভা তার বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি জানিয়েছিল।

এইভাবে নানা দিক থেকে যখন শিক্ষিত, চিন্তাশীল ও জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত নাগরিকেরা মূলত সাংস্কৃতিক ও বাজনৈতিক অবস্থা পরিবর্তনের জন্য দিকে-দিকে সংঘবদ্ধ হচ্ছিলেন তখন এদেশের জমিদারদেরও একটি সংগঠন গড়ে উঠল এক বছর পরেই। এই সংস্থার নাম ছিল জমিদার সম্মিলন। সদস্য হওয়াব শর্ত ছিল, সদস্যকে জমির মালিক বা জমিদার হতে হবে। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে যে কোনো ব্যক্তি এই সংস্থার সদস্য হতে পারতেন। তবে, এক বছর পরেই এই সংস্থাটির নাম বদলে যায়। নতুন নাম হল ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটি। এই প্রতিষ্ঠান মুখ্যত জমিদারদের স্বার্থ সংরক্ষণে যত্নবান থাকলেও তাঁদের কর্মসূচীতে নতুন একটি ধারা যুক্ত হল। এই সোসাইটি অতঃপর সংবিধান-সম্মতভাবে ন্যায্য দাবি আদায় করবার জন্য সংগ্রামের রীতি-পদ্ধতি এবং সাহসের সঙ্গে তাদের ন্যায্য পাওনার কথা উত্থাপিত করতে ও মতামত প্রকাশের কায়দা-কানুন রপ্ত করতে শিক্ষা দেবে। ওই বছরেই তারাচাঁদ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠিত হল সাধারণ জ্ঞানার্জ্জনভিত্তিক সভা। সাধারণ সম্পাদক হলেন পিয়ারীচাঁদ মিত্র। এই প্রতিষ্ঠানটিতে যদিও সাধারণ জ্ঞান অর্থাৎ সাহিত্য, দর্শন, সমাজনীতি ও অর্থনীতির চর্চাই হত, কিন্তু তৎকালীন শিক্ষিত বাঙালীরা কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললে রাজনীতির আগুন তাকে স্পর্শ করতই। এক-এক সভায় বক্তারা নিজস্ব কায়দায় ইংরেজ শাসনের তীব্র সমালোচনা করতেন।

এর মাত্র এক বছর পরেই অক্ষয়কুমার দত্তের সহযোগিতায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করলেন তত্ত্ববোধিনী সভা। এই সভায় অবশ্য রাজনীতি আলোচনার কোনো অবকাশ ছিল না। শিক্ষা, সমাজ, ইতিহাস, নারী-কল্যাণ, অনুবাদ , প্রাচীন গৌরব, সরল বিজ্ঞান, মিশনারীদের আক্রমণের প্রতিবাদ ইত্যাদি কাজেই ছিল সভ্যদের আগ্রহ ও উৎসাহ।

ওই বছরেই লণ্ডনে ভারত-বন্ধু উইলিয়ম এ্যাডাম ভারতের কল্যাণে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক সভা ব্রিটিশ

ইণ্ডিয়ান সোসাইটি স্থাপনা করেন এবং মাত্র দু'বছর পরে তাঁরই সম্পাদনায় ইংলণ্ড থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এ্যাডভোকেট পত্রিকা। কাজের সুবিধার জন্য ল্যাণ্ড-হোল্ডার্স সোসাইটি এই সোসাইটির সঙ্গে মিলিত হয়ে যায়।

জর্জ টমসনকে বিলেত থেকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে দ্বারকানাথ ঠাকুর আঠারো শো তেতাল্লিশ খৃস্টাব্দে বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি স্থাপন করেন। এদেশের মানুষের প্রকৃত আর্থিক ব্যবস্থা, আইন কানুন দেশের প্রাকৃতিক ও অপরাপর সম্পদ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা এবং তার সাহায্যে সাংবিধানিক ও শান্তিপূর্ণভাবে ওগুলোর প্রয়োগ-ক্ষেত্র সৃষ্টি করা, সাধারণের কল্যাণ, তাদের ন্যায্য অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেশের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল-সাধন প্রভৃতিই ছিল এই সোসাইটির মুখ্য উদ্দেশ্য।

ধর্ম, শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে তখন এদেশে যে বিপুল আলোড়ন দেখা দিয়েছিল তার ভিত্তিমূলত গড়ে উঠেছিল একেশ্বরবাদে বিশ্বাস এবং পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ বিরোধিতার উপরে প্রতিষ্ঠিত রামমোহনের ধর্ম ও সমাজচিন্তা, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখের নানা কর্মকাণ্ড, কেশবচন্দ্রের 'সুলভ সমাচার' পত্রিকা প্রকাশ ও 'ওয়ার্কমেনস্ ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা, শিবনাথ ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগদান প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে।

এরই অনুরূপ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল সমকালীন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে। আঠারো শো চুয়াল্লিশ সালে সুরাটে দাদোবা পাণ্ডুরঙ্গ-প্রতিষ্ঠিত 'মানবধর্ম সমিতি' উদার মানবধর্ম প্রচারকে ব্রত হিসাবে গ্রহণ করে। পরের বছর বোম্বাইয়ে পাণ্ডুরঙ্গ-প্রতিষ্ঠিত পৌত্তলিকতা-বিরোধী 'পরমহংস মণ্ডলী' বিধবা বিবাহ প্রবর্তন করতে উদ্যোগী হয়। মনে রাখতে হবে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে এদেশে বিধবা বিবাহ আইন চালু হয়েছিল আঠারো শো ছাপ্পান্ন খৃস্টাব্দে। এছাড়া, 'পরমহংস মণ্ডলী'র সদস্যরা নারী-সমাজে এবং অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে উদ্যোগী হন। নারী উন্নয়নের জন্য আন্দোলন চালান পণ্ডিতা রমাবাঈ ও বেহ্‌রামজী মালাবারী। 'লোকহিতবাদী' গোপালহরি দেশমুখ ও জ্যোতিবা ফুলে তীব্র আক্রমণ চালান জাতিভেদ-প্রথা ও সমাজে ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের বিরুদ্ধে।

মেডিকেল কলেজ ও শবব্যবচ্ছেদ

অশিক্ষা ও কুসংস্কারের জাল ছিঁড়ে দেশবাসীরা সভ্যতার আলোকে যাতে নিজেদের স্বরূপ চিনে নিতে পারে এবং বিদেশী শাসকের শৃঙ্খল থেকে দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য তৎপর হয়, সমকালীন চিন্তাবিদ ও সংস্কারকদের এইটিই ছিল মূল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যের রূপায়ণকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হত তাঁদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড।

সমাজকে নানা দিক থেকে এগিয়ে নিয়ে যেতেই তৎকালীন সচেতন মানুষেরা সর্বদা তৎপর হয়েছিলেন। এই তৎপরতা থেকেই আঠারো শো পঁয়ত্রিশ খৃস্টাব্দের আটাশে জানুয়ারী কলকাতায় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হল। প্রাথমিক পর্যায়ে এই কলেজে কোনো লাইব্রেরী, মিউজিয়ম, যন্ত্রপাতি বা হাসপাতাল ছিল না। এছাড়া, অগ্রগতির পথে মস্ত বাধা ছিল শারীরতত্ত্ব চর্চা ও শবব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে বদ্ধমূল জাতীয় সংস্কার।

বাথগেট কোম্পানির মারফৎ ইংলণ্ড থেকে দু'টি কঙ্কাল ও শারীর-সংস্থান বিষয়ক সরঞ্জাম কেনা হয়। ডাঃ ব্রামলে ও ডাঃ গুডিভ শারীর-সংস্থান বিদ্যা শেখানোর জন্য মানবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ছবি দেখাতেন। তারপর ক্রমে ক্রমে তার বদলে তাঁরা ভেড়ার মগজ ও ছাগলের যকৃতের মডেল ব্যবহার করতেন। এই মডেলগুলো ছিল কাঠের বা টিনের দ্বারা নির্মিত।

ছ'মাস কেটে যাবার পর ডাঃ গুডিভ একদিন বক্তৃতা টেবিলে একটি গোটা মানবদেহ এনে উপস্থিত করলেন। তাতে জনসাধারণের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল।

মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার ঠিক এক বছর পরে দশই জানুয়ারী তারিখে পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত চারজন নির্ভীক তরুণ ছাত্রকে নিয়ে অত্যন্ত গোপনে ডাঃ গুডিভের পিছনে পিছনে কলেজবাড়ির লাগোয়া একটি বাড়িতে গেলেন এবং নিজের হাতে একটি শবব্যবচ্ছেদ শুরু করলেন। একজন ছাত্রের নাম ওই কলেজের পুরোনো নথিতে পাওয়া যায় নি। বাকি তিনজন ছাত্রের নাম হল বাবু উমাচরণ শেঠ, দ্বারকানাথ গুপ্ত, রাজকিশোর দে।

ভারতে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান প্রবর্তনের ইতিহাসে শবব্যবচ্ছেদের এই বিশেষ দিনটিকে চিহ্নিত করা উচিত। কারণ, সেদিন ভারতীয়রা সব পূর্বসংস্কার ও বদ্ধমূল কুসংস্কারের উর্দ্ধে উঠে তাঁদের দেশবাসীর সামনে উন্মুক্ত করলেন আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তার পথ।

মুক্তি বা স্বাধীনতা বলতে শুধু বিদেশী শাসন শৃঙ্খল থেকে স্বাধীনতা বোঝায় না। তার প্রকৃত অর্থ আমাদের নিজস্ব প্রাচীন কুসংস্কার থেকেও মুক্তি। কারণ আমাদের লক্ষ্য হল ভারতের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার জায়গায় এক আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা।

ভাই মহারাজ সিং

আঠারো শো পঁয়তাল্লিশ খৃস্টাব্দে ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ শুরু হয়েছিল পাঞ্জাবে। যুদ্ধ চলেছিল মাত্র দু'বছর। ওই যুদ্ধে শিখেরা পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হল এবং পাঞ্জাবে ইংরেজদের আধিপত্য কায়েম হল। তখন অবসাদগ্রস্ত পাঞ্জাবীদের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন ভাই মহারাজ সিং। তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে পাঞ্জাবীদের যুদ্ধে উদ্দীপিত করেন। মূলতানের গভর্নর দেওয়ান মূলরাজ, হালাবার গভর্নর সর্দার চাত্তার সিং আওরিতওয়ালা, উনার বেদি বিক্রম সিং এবং পাহাড় অঞ্চলের রাজপুত সামন্তদের অনুপ্রাণিত করে তিনি গড়ে তোলেন এক বৃটিশ বিরোধী সমাবেশ।

এর ফলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছিল তাতে প্রমাণ পাওয়া গেল এই আশ্চর্য সন্তযোদ্ধার সামরিক প্রতিভার। তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্য ইংরেজ বাহিনীর যাবতীয় প্রয়াস ব্যর্থ হচ্ছিল। ভাই মহারাজ সিংয়ের যুদ্ধের কৌশলই ছিল স্বতন্ত্র। তাঁর পরিচালিত বাহিনীর দ্রুত চলাচলের ফলে ইংরেজের সঙ্গে সরাসরি সংঘাত এড়িয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল। ইংরেজের শাসানি ও হুমকি অগ্রাহ্য করেও বিভিন্ন এলাকার সাধারণ মানুষ, ধনী সামন্ত সকলেই ভাই মহারাজ সিংকে টাকাকড়ি, রসদ, অস্ত্রশস্ত্র এবং সেনাবাহিনীর জন্য নতুন স্বেচ্ছাসেবক যুগিয়ে সহায়তা করতে থাকলেন। তাঁর অনুচরদের মধ্যে কেউ কেউ ধরা পড়ে সারাজীবন জেলে কাটালেন। কেউ বা হতাশ হয়ে যুদ্ধে নিরস্ত হলেন। কিন্তু ভাই মহারাজ সিং নিরস্ত হলেন না। এমন কি, ধর্মের ধুয়ো তুলে তাঁর বিরুদ্ধে মুসলমানদের প্ররোচিত করার অপচেষ্টা বন্ধ করার জন্য তিনি সহযোগিতার আবেদন পাঠালেন উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পাঠান নেতাদের এবং আফগানিস্তানের আমীরের কাছেও।

এ-হেন অবস্থায় প্রায় দু'বছর লড়াই চালিয়ে ভাই মহারাজ সিং অবশেষে ধরা পড়লেন ইংরেজদের হাতে। আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো সুযোগ না দিয়েই ইংরেজ সরকার তাঁকে অবিলম্বে নির্বাসিত করল সিঙ্গাপুর জেলে। সেখানেই আঠারো শো ছাপ্পান্ন সালের পাঁচই জুলাই তাঁর মৃত্যু হল সিপাহী-বিদ্রোহের মাত্র এক বছর আগে।

আরও দু'টি প্রতিষ্ঠান

এদিকে বাংলায় তখনও বিভিন্ন ধারা এক হয়ে মিলিত হবার পথ খুঁজছিল। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মানুষেরা তখনও শাসকশ্রেণীর সঙ্গে সংঘাত বা সংঘর্ষের পথে না গিয়ে সমন্বয়ের ও সহযোগিতার পথে হাঁটতে চাইছিলেন। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই আঠারো শো একান্ন খৃস্টাব্দের

উনত্রিশে অক্টোবর ল্যাণ্ড হোল্ডার্স সোসাইটি এবং বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি মিলিত হয়ে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন নামে একটি নতুন সংস্থা গড়ে তুলল।

এই এ্যাসোসিয়েশনের মুখ্য কাজ হল ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা, প্রতিষ্ঠানের প্রভাব বিস্তার করা ও ভারতীয় জনগণের কল্যাণ সাধন প্রচেষ্টায় নিরত থাকা। যে দুটি সংস্থা একত্র হয়ে এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলল, সেখানে ইউরোপীয় সভ্য ছিল। কিন্তু বেথুন-প্রবর্তিত 'কালা-আইন'-এর প্রতিবাদে ইংরেজদের যে প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া গেল, তাতে এই সংস্থায় একজনও ইউরোপীয় সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হল না।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি স্বল্পদিনস্থায়ী কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের কথা আমরা স্মরণ করতে পারি। যখন ইউরোপীয়রা 'কালা-আইন'-এর প্রতিবাদে গভর্ণমেণ্টকে নাজেহাল করে ছাড়ল এবং আঠারো শো তিপ্পান্ন খৃস্টাব্দে পার্লামেন্ট-কর্তৃক নতুন শাসন-সংস্কার আসন্ন হয়ে এসেছে, তখন সম্মিলিতভাবে জাতীয় স্বার্থরক্ষার কথা বড় হয়ে ওঠে। সেই উদ্দেশ্যে পাইকপাড়ার রাজবাটিতে আঠারো শো একান্ন খৃস্টাব্দের উনিশে সেপ্টেম্বর তৎকালীন সামাজিক প্রতিপত্তিশালী লোকদের এক বিশাল সমাবেশে জাতীয় সভা গঠিত হয়। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কালীনাথ রায়, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি। এই সভা গঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল 'বৈধ উপায়ে আইনসম্মত অধিকার প্রয়োগ করে দেশের উন্নতিবিধান করা' এবং 'স্থানীয় সরকার অথবা ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষের কাছে কোনো সংশোধন বা সংস্কার সম্পর্কে আবেদন করা'। এই সভার সম্পাদক হয়েছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রায় দেড় মাস পবে যখন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হল তখন জাতীয় সভা তার সঙ্গে মিলিত হয়ে যায়।

সাঁওতাল বিদ্রোহ

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিকতাবাদী ইংরেজ সরকারের শাসন ও শোষণে নিষ্পেষিত এদেশের মানুষেরা বিভিন্ন গণ-অভ্যুত্থানে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আঠারো শো পঞ্চান্ন খৃস্টাব্দের ত্রিশে জুন সাঁওতাল পরগণার ভাগনাডিহি গ্রামের মাঠে এক সভায় সাঁওতাল নেতা সিধু ও কানুর আহ্বানে ইংরেজ সরকার ও তাদের তাঁবেদার ব্যবসাযী, মহাজন, জমিদারদের শাসন-শোষণ ব্যবস্থার জায়গায় স্বাধীন সাঁওতাল রাজ্য প্রতিষ্ঠার শপথ নেন দশ হাজার সাঁওতাল। এর কারণ—জমিদার, গোমস্তা, সরবরাহকারী, পিওন, মহাজন, পুলিশ, নায়েব, সাজোয়াল এবং আদালতের কর্মচারীরা সবাই মিলে সাঁওতালদের উপর শোষণ, বলপূর্বক সম্পত্তি দখল, অপমান, প্রহার ও নানাভাবে উৎপীড়নের এক ভয়ঙ্কর ব্যবস্থা পত্তন করেছিল। ঋণের সুদ শতকরা পঞ্চাশ থেকে পাঁচশো টাকা আদায় কবা হচ্ছিল। তাঁদের ঠকানোব জন্য ভূযো দাঁড়িপাল্লা ব্যবহার করা হচ্ছিল। ব্যবসায়ীরা দলে দলে সাঁওতালদের এলাকায় ঢুকে ঋণের দায়ে ওদের সমস্ত শস্য টেনে বের করে নিয়ে যেত, এ দুষ্কার্যে তাদের সহায় পুলিশ। পুলিশ কর্মচারীরাই ওই অঞ্চলের প্রকৃত শাসক বলে গণ্য হত।

ভাগনাডিহির মাঠের ওই সভা থেকে আবও ঘোষণা করা হয়েছিল যে ইংরেজ তাঁবেদারদের বিরুদ্ধে যে লড়াই সংঘটিত হবে তাতে সাঁওতালদের পাশে দাঁড়াবেন কুমার, তেলি, কামার, মোমিন সম্প্রদায়ের জোলা, চামার ও ডোমেরা। এ দিনই বিশাল এক বাহিনী কলকাতার দিকে এগোতে থাকে। পথে তাঁদের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে বহু অত্যাচারী মহাজন ও দারোগা নিহত হয়।

সাঁওতাল-বিদ্রোহের প্রেক্ষিত খুঁজতে গেলে ক্ষমতাশালী শাসক ও শোষক ইংরেজদের বিরুদ্ধে নিরীহ সরল সাঁওতালদের জাগরণের ঐতিহাসিক পশ্চাৎপট জানা দরকাব।

দামিন-ই-কো কথার অর্থ হচ্ছে পাহাড়ের ওড়না। বীরভূম এবং ভাগলপুরের বিস্তীর্ণ পাহাড় ও

জঙ্গলবেষ্টিত পাথর ওই নামেই পরিচিত ছিল। সেখানে বহুদিন ধরে বসবাস করছিল কিছু পাহাড়িয়া আদিবাসী। ওই পাহাড়ের সানুদেশ ছিল গভীর জঙ্গলে পূর্ণ। ইংরেজ শাসক শক্তিকে বারবার আক্রমণ করে ওই পাহাড়িয়া আদিবাসীরা ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল।

এইভাবে বারবার বিপর্যস্ত হয়ে ইংরেজ শাসক তার কৌশল পরিবর্তন করল। তারা ঠিক করল ওখানে বসতি স্থাপন করবে। কিন্তু এবারও তারা কৃতকার্য হল না। তখন তারা সাঁওতাল উপজাতির কৃষকদের ডেকে আনল। উনিশ শতকের প্রথম দিকে ওই কৃষকরা দামিন ই কো তে বসতি স্থাপন করতে শুরু করল।

সিধু

আঠারো শো বত্রিশ থেকে তেত্রিশ খৃস্টাব্দের মধ্যে জন পেটি ওয়ার্ডের নেতৃত্বে সার্ভেয়ার ক্যাপ্টেন ট্যানার দামিন ই কোর সীমানা নির্ধারণের কাজ শেষ করেন। ভাগলপুর মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূম জেলার প্রায় এক হাজার তিনশো ছেষট্টি বর্গমাইল এলাকা দামিন ই কো এলাকা হিসেবে চিহ্নিত হয়। এর মাত্র পাঁচশো বর্গমাইল এলাকা ছাড়া সবটাই ছিল পাহাড়। এই পাঁচশো বর্গমাইল এলাকার মধ্যে মাত্র দু'শো চুয়ান্ন বর্গমাইল ছিল আবাদযোগ্য জমি বাকিটা গভীর অরণ্য।

বড়লাট লর্ড বেন্টিঙ্ক এই জঙ্গল পরিষ্কার করে বসবাস করার জন্য সাঁওতালদের আহ্বান জানালেন। ওঁর ডাকে সাড়া দিয়ে দলে দলে সাঁওতাল কৃষক কটক ধলভূম মানভূম বরাভূম ছোটনাগপুরের পালামৌ, হাজারীবাগ মেদিনীপুর বীরভূম ও বাঁকুড়া থেকে দামিন ই কোতে প্রবেশ করতে লাগল। তারা শুধু ওখানে গ্রামই পত্তন করল না জঙ্গল পরিষ্কার করে হাজার হাজার বিঘা জমিও তৈরি করল। সেই জমিতে ফলতে শুরু করল সোনার ফসল।

একদিকে উদয়াস্ত হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে ফসল ফলানোর কাজ অন্য দিকে তাদের রাত কেটে যেত নাচে গানে আনন্দে বিভোর হয়ে। কিন্তু স্বপ্নভঙ্গ হতে তাদের বেশি দেরী হল না। তারা বুঝতে পারল, সরকার তাদের যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সে সব তারা আর রাখছে না। সরকার থেকে সাঁওতাল কৃষকদের বলা হয়েছিল খাজনা দিতে হবে না। কিন্তু ওদের অভিজ্ঞতায় ওরা দেখল বড়লাট বেন্টিঙ্কের এই প্রতিশ্রুতি একটা ভাঁওতা মাত্র। দামিন ই কো থেকে আঠারো শো আটত্রিশ খৃস্টাব্দে ইংরেজ সরকার বছরে মোট দু'হাজার টাকা খাজনা আদায় করত। মাত্র তেরো বছর বাদে সেই টাকা বেড়ে দাঁড়াল তেতাল্লিশ হাজার ন'শো আঠারো টাকা তেরো আনা সাড়ে পাঁচ পয়সা। অর্থাৎ মাত্র তেরো বছরের ব্যবধান খাজনার বোঝা বেড়ে গেল প্রায় বাইশ গুণ।

শুধু তাই নয়, এর সঙ্গে জমিদার, নায়েব, গোমস্তা, পেয়াদা, বরকন্দাজেরা আরও বেশি টাকা আদায় করত অন্যান্য উপায়ে। টাকা দিতে না পারলে ওদের নানাভাবে অত্যাচার করা হত। এমন কি, জমিও কেড়ে নেওয়া হত। এর সঙ্গে ছিল মহাজনদের অত্যাচার। বাবা-মা মারা গেলে তাদের পারলৌকিক কাজকর্মের জন্য মহাজনদের কাছ থেকে সাঁওতালরা টাকা ধার করলে সেই দেনা থেকে উদ্ধার পাওয়া ওদের পক্ষে সম্ভব হত না। অত্যন্ত চড়া সুদ চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তে বাড়তে কয়েক বৎসরের মধ্যেই দশ-পনেরো গুণ হয়ে যেত। অতএব এই ঋণ কখনও পরিশোধ হত না। 'দ্য অ্যানাল্‌স অফ রুরাল বেঙ্গল' গ্রন্থে তৎকালীন সাঁওতালদের জীবনচিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে ডব্লু. ডব্লু. হান্টার লিখেছেন--- 'যে মুহূর্তে কোনো সাঁওতাল জমিদার বা মহাজনের কাছ থেকে ঋণ করত, সেই মুহূর্ত থেকেই সেই হতভাগ্য সাঁওতাল জমিদার-মহাজনের শোষণ জালে আবদ্ধ হয়ে পড়ত। সমস্ত বছর ধরে সে যতই পরিশ্রম করুক না কেন, জমিদার বা মহাজন তার সমস্ত ফসলই নিজের গোলায় তুলত। বছরের পর বছর এভাবে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সাঁওতালটি তার শোষকের জন্য খেটে মরত। যদি কখনও সে অতিষ্ঠ হয়ে জঙ্গলে পালাবার চেষ্টা করত তখনই পূর্বে কোনও রকম সতর্ক না করেই পেয়াদা ও পাইক এসে দরিদ্র সাঁওতালের গরু, মোষ, বাসন-কোসন ও অন্যান্য গেরস্তালির জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যেত। এমন কি, স্ত্রীলোকের সম্মানের চিহ্ন লোহার বালাও বাদ যেত না। স্ত্রীলোকের হাত থেকে সেগুলো জোর করে কেড়ে নেওয়া হত।'

জমিদার-মহাজনদের সহযোগী ছিল থানার দারোগা। তারা শাসক শ্রেণীর ঘুষ খেয়ে সাঁওতালদের প্রতি কখনও নিরপেক্ষ ভূমিকা নিত না। এ ছাড়া, দূরবর্তী ভাগলপুর বা মুর্শিদাবাদ আদালতে গিয়ে মিথ্যে মামলার বিরুদ্ধে আইনগত লড়াই চালাবার মতো সঙ্গতিও এদের ছিল না। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল নীলকর সাহেবদের অত্যাচার। এই প্রসঙ্গে এক সাঁওতাল কৃষকের বক্তব্য উদ্ধৃত করছি ঃ 'সাহেবরা যখন নীল কাটার জন্য হুকুম দিত তখন নীলকুঠি পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কাউকে ছাড়া হত না। নীল কেটে ভেজানো হত আবার জল থেকে তুলে কুঠি পূর্ণ করা হত। নীলকুঠি পূর্ণ না করলে নিস্তার নেই, রাত্রেও দিনের মতো নীল কেটে জলে ভিজিয়ে কুঠি পূর্ণ করতে হত। রাত্রে বাঘের ভয়। কী করে নীল কাটবে? সে সময় ভেলা তেলের মশাল জ্বালিয়ে নিয়ে যেত এবং সেই আলোতে নীল কাটা হত। যত বৃষ্টিই হোক না কেন আগুন নিভত না।'

এই উক্তি থেকেই নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের মাত্রা সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়। তারা কোনোরকম আইন-কানুনের পরোয়া করত না। প্রতিবাদ করলে তাদের বরাতে জুটত প্রহার অথবা তাদের অন্যত্র স্থানান্তর করা হত। এভাবেই সাঁওতাল কৃষকদের মনে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে হতে বিস্ফোরণের অপেক্ষায় গুমরে মরছিল।

এত অত্যাচারেও ওদের রেহাই ছিল না। রেলের ঠিকাদার ও কর্মচারীরা সাঁওতালদের বাড়ি থেকে মুরগি, ছাগল ইত্যাদি বিনামূল্যে এবং বিনা অনুমতিতে নিয়ে যেত। শুধু জীবজন্তু নিয়েই তারা ক্ষান্ত হত না, অত্যাচারীদের লালসা থেকে সাঁওতাল যুবতীরাও রেহাই পেত না। আঠারো শো ছাপ্পান্ন খৃস্টাব্দে 'ক্যালকাটা রিভিউ'তে লেখা হয়েছিল 'রেলপথে যে-সমস্ত ইংরেজ কর্মচারী কাজ করত, তাবা বিনামূল্যে সাঁওতাল আদিবাসীদের কাছ থেকে জোর করে ছাগল, মুরগি প্রভৃতি কেড়ে নিয়ে যেত এবং সাঁওতালরা প্রতিবাদ করলে তাদের ওপর অত্যাচার করত। দুজন সাঁওতাল স্ত্রীলোকের উপর পাশবিক অত্যাচার ও একজন সাঁওতালকে হত্যাও করা হয়েছিল।'

সাঁওতাল রমণীদের উপর অত্যাচার যেন আগুনে ঘৃতাহুতির কাজ করল। দাবানলের মতো দিকে দিকে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ল। বস্তুতপক্ষে, বিদ্রোহ করা ছাড়া তখন অত্যাচারিতদের সামনে বিকল্প কোনো পথও খোলা ছিল না। ইংরেজ বিচারক ও ম্যাজিস্ট্রেটরা মত্ত থাকতেন রাজস্ব আদায়ে। ছোট-ছোট বিষয়ে মনোনিবেশ করার মতো তাঁদের সময়ও থাকত না। দেশীয় আমলারা ছিল তাদের হাতের পুতুল, আর পুলিশ লুটের অংশ পেয়েই খুশি থাকত।

ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী নিজ কায়েমী স্বার্থ সিদ্ধ করার জন্যই ভারতীয় গ্রাম-সমাজকে ধ্বংস করেই জমিদার-মহাজনশ্রেণী সৃষ্টি করেছিল। শাসকশ্রেণী একদিকে যেমন কৃষি-জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠা করে জমিকে ক্রয়-বিক্রয়ের সামগ্রী করেছিল, অন্যদিকে তেমনই ইংলণ্ডের ভূস্বামীগোষ্ঠীর অনুকরণে ইংরেজ শাসনের সুদৃঢ় স্তম্ভরূপে এইদেশে ভূস্বামী-গোষ্ঠী তৈরি করেছিল। এর ফলে সাঁওতাল কৃষকেরা জমিদার-মহাজনের শিকারে পরিণত হয়।

সমস্ত দিক থেকে শোষণ ও অত্যাচার যখন বেড়েই যাচ্ছিল, সুবিচার পাওয়ার কোনো পথই যখন খোলা ছিল না তখন বিদ্রোহ করা ছাড়া সাঁওতাল কৃষকদের আর কোনো গত্যন্তর রইল না। তাই সিধু ও কানুর আহ্বানে দশ হাজার সাঁওতাল সমবেত হল, যে কথা আমরা আগেই বলেছি। ওই সমাবেশে সিদ্ধান্ত হল 'হুন' বা বিদ্রোহ করার। তারা জমিদারদের আর কোনো খাজনা দেবে না। নিজেদের রাজ কায়েম করবে।

'দ্য সান্তাল ইন্সারেকসন অফ ১৮৫৫-৫৭'গ্রন্থের ষোলো পৃষ্ঠায় কে. কে. দত্ত লিখেছেন, 'সাঁওতাল নেতারা ঘোষণা করলেন যে, তারা বাঙালি ও পশ্চিমী মহাজনদের উচ্ছেদ করে এবং সাঁওতাল অধ্যুষিত অঞ্চল দখল করে নিজস্ব স্বাধীন শাসন ব্যবস্থা স্থাপন করবেন। কুম্ভকার, তেলি, কর্মকার, মোমিন (মুসলমান তাঁতি), চর্মকার প্রভৃতি কয়েকটি সম্প্রদায়ের লোকদের কোনরকম আক্রমণ করা হবে না বলে স্থির করা হয়। কারণ, সাঁওতালদের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তারা সাঁওতালদের নানাভাবে সাহায্য করে থাকে।'

যখন বিদ্রোহ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, তখন বিদ্রোহীরা ছড়িয়ে পড়ল বিভিন্ন জায়গায়। ইতিমধ্যে ওদের কাছে খবর এল, অত্যাচারী মহেশ দারোগা আমগাছিয়ার গর্ভ মাঝি ও পিপড়ার হাড়মা মাঝিকে মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে আছে অভিযোগকারী কুখ্যাত মহাজন কেনারাম ভকত। বিদ্রোহীরা গুমানী ও মোরেল নদীর সংযোগস্থলে দারোগা ও মহাজনকে কুড়ুলের আঘাতে খুন করে বন্দীদের মুক্ত করে আনল এবং বিদ্রোহীদের এই অসমসাহসিকতার খবর দাবানলের মতো দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল।

এরপর বিদ্রোহীরা বারহেটে বাজারের ব্যবসায়ী ও মহাজনদের গদি লুট করল। ব্যবসায়ী ও মহাজনদের কাছে ক্রীতদাস হিসাবে থাকা সমস্ত কামিয়া ও মুনিশদের মুক্তি দিল। এরপর তারা পাঁচক্ষেতিয়ার বাজারে এসে পাঁচজন মহাজনকে হত্যা করল। এইভাবেই বিদ্রোহ বিভিন্ন এলাকায় ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ল। বিশাল এলাকা বিদ্রোহীদের দখলে চলে গেল।

এতগুলো ঘটনা পরপর ঘটে যাওয়ায় ইংরেজবাহিনী হকচকিয়ে গেল। তারা বিভিন্ন দিক থেকে সাঁওতাল বিদ্রোহীদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগল কিন্তু কয়েকটি যুদ্ধে তারা বিদ্রোহীদের কাছে হেরে গেল। ইংরেজ শাসকেরা ভাগলপুর, সিউড়ি, প্রভৃতি প্রশাসনিক কেন্দ্রগুলিকে সুরক্ষিত করার সঙ্গে সঙ্গে দানাপুর সেনানিবাস থেকে আরও ফৌজ এনে বিদ্রোহের মোকাবিলা করে। সাধ্যমতো সৈন্য পাঠাবার জন্য বাঁকুড়া, সিংভূম, হাজারীবাগ, মুঙ্গের ও পূর্ণিয়ার ম্যাজিস্ট্রেটদের কাছে চিঠি লেখেন ভাগলপুরের কমিশনার। তবু ইংরেজ সৈন্য বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে তারা সামরিক আইন বা মার্শাল ল জারি করল। জেনারেল লয়েড ও ব্রিগেডিয়ার বার্ডের নেতৃত্বে চোদ্দ শো সুশিক্ষিত ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত সেনাবাহিনী একের পর এক সাঁওতাল গ্রাম ধ্বংস করতে শুরু করল। সাঁওতালদের বহু ঘর-বাড়ি তারা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিল। কিন্তু এত অত্যাচার সত্ত্বেও বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করল না। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ব্রিটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে সাধারণ অস্ত্রশস্ত্র, টাঙ্গি, বল্লম আর তীর-ধনুক নিয়ে যুদ্ধ করতে করতে হাজার হাজার সাঁওতাল যুবক মৃত্যুবরণ করল। দীর্ঘকাল ধরে বর্বর ধ্বংসলীলা ও গণহত্যা চালিয়ে সাঁওতাল বিদ্রোহ দমন করা হয়েছিল। বিদ্রোহী ছটরায় দেশমাঝির বিবরণ থেকে জানা যায়, বিদ্রোহের নেতা সিধু-কানুকে ফেব্রুয়ারী মাসে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং বিচারের প্রহসনের পর তাঁদের দু'জনকে ফাঁসী দেওয়া হয়েছিল।

এই বিদ্রোহ দমন করার জন্য মুর্শিদাবাদের নবাব পাঁচশো অশ্বারোহী সৈন্য, চল্লিশটি হাতি, দু'টি কামান এবং বহু সংখ্যক অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ দিয়ে ব্রিটিশ বাহিনীকে সাহায্য করেছিলেন। হেতমপুরের রাজা ও অন্যান্য জমিদারগণও মুর্শিদাবাদের নবাবের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বিদেশী শাসকের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেশের মানুষদের প্রতি নৃশংস আচরণ করেন। এতবড় সম্মিলিত বিশাল শক্তির বিরুদ্ধে সাঁওতাল কৃষকেরা দীর্ঘ সাত মাস ধরে যুদ্ধ চালিয়ে পরাজিত হন। এই বিদ্রোহে পঞ্চাশ হাজার মানুষ যোগ দিয়েছিলেন যদিও পঁচিশ হাজার বিদ্রোহীকে হত্যা করা হয়। ভারতবর্ষে আর কোনও কৃষক বিদ্রোহে এত মানুষের প্রাণদানের ঘটনা ঘটেনি।

অবশ্য এই মর্মান্তিক গণহত্যায় নির্লজ্জ অত্যাচারীদের অনুশোচনার কোনো নজির আমরা পাইনি কিন্তু বীরত্ব ও আত্মত্যাগের দিক থেকে এই বিদ্রোহের কোনো তুলনা নেই। একথা ঠিকই যে, বিদ্রোহীরা জমিদার, মহাজন, দারোগা, গোমস্তা প্রভৃতি অত্যাচারীদের হত্যা করেছিল। অবশ্য এই হত্যার পিছনে যুক্তিও ছিল। যে সমস্ত অত্যাচারী শোষকেরা সাঁওতাল কৃষকদের সুখশান্তি নষ্ট করে, জমিছাড়া করে, স্থায়ী ক্রীতদাসে পরিণত করেছিল, যারা মহিলাদের ইজ্জত কেড়ে নিয়েছিল তাদের প্রতি ক্রোধ স্বাভাবিক। কিন্তু সুসভ্য বলে নিজেদের দাবি করে যে ইংরেজ তারা যেভাবে নিরীহ সাঁওতালদের উপর বর্বরোচিত অত্যাচার চালিয়েছিল, সাতশো নিরপরাধ মানুষকে ফাঁসীকাঠে ঝুলিয়েছিল, যেভাবে ঘর-বাড়ি জ্বালিয়েছিল, এটা ইতিহাসে লজ্জাজনক কলঙ্কিত অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

এ-প্রসঙ্গে আমরা ব্রিটিশ সেনানায়ক জার্ভিস-এর স্পষ্ট স্বীকারোক্তি স্মরণ করতে পারি। তাঁর ধারণা ইংরেজ শাসক সেদিন যা করেছিল তা যুদ্ধ নয়, গণহত্যা।

সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় কোনো রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে ওঠেনি, বাইরের কোনো সংগঠিত শক্তিও এই বিদ্রোহ সংগঠিত করেনি। তা সত্ত্বেও ব্যাপকতা ও গভীরতায় এর শিকড় ছিল বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। কারণ সাঁওতাল কৃষকেরা লেখাপড়া না জানলেও জীবনের কঠোর বাস্তবতায় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, শোষণ-বঞ্চনার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেছেন।

লড়াইয়ে গেরিলা যুদ্ধের কৌশলও বিদ্রোহীরা প্রয়োগ করেছিলেন। যাঁরা আদিবাসী নন, নিম্নশ্রেণীর সেই কৃষকেরাও সাঁওতাল বিদ্রোহে সামিল হয়েছিলেন। কারণ একই জমিদার-মহাজনদের শোষণের শিকার ছিলেন তাঁরাও। সাঁওতাল বিদ্রোহের অবসান হল। অশিক্ষিত সাঁওতালরা রক্ত দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক গৌরবজনক ইতিহাস রচনা করে গেলেন। প্রতিরোধ সংগ্রামের যে স্বাক্ষর তারা রেখে গেলেন, ভারতের মুক্তিকামী মানুষের অন্তরে তা চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

বিদ্রোহ দমনের পর ব্রিটিশ শাসক সাঁওতাল পরগণা নামে একটি নন-রেগুলেটেড জেলা তৈরি করে সাঁওতালদের শান্ত করার চেষ্টা করেছিলেন এবং বিভিন্ন ধরণের সুযোগ-সুবিধা ঘোষণা করেছিলেন। সুচতুর ইংরেজ বণিক অন্যান্য জনগণ থেকে সাঁওতালদের বিচ্ছিন্ন করে বিচ্ছিন্নতাবাদের বীজ বপন করেছিল। কিন্তু সাঁওতাল বিদ্রোহীদের অতুলনীয় দেশপ্রেম ও আত্মহত্যা বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের উপর বিরাট প্রভাব ফেলেছিল। বাংলা ও বিহারের সংগ্রামী মানুষ তাই ক্ষেপে উঠেছিল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে। সিপাহী বিদ্রোহ যা ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, সাঁওতাল-বিদ্রোহের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। ইংরেজ শাসকেরা আতঙ্কিত হয়ে এর প্রভাব-সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে শুরু করেছিলেন। নীল-বিদ্রোহের উপরেও যে সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রভাব পড়েছিল সেটা দেখতে পাওয়া যায় নীল বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধানে তৎকালীন ভারত সরকারের মুখ্য সচিব ডব্লু. এস. সাটন কার. সি. এস.-এর নেতৃত্বে গঠিত কমিশনের নিকট সাক্ষ্যে। সাক্ষ্য দিতে গিয়ে পাদ্রী. জি. এস. কাথবার্টসন বলেন, 'সাঁওতাল বিদ্রোহ ও সিপাহী বিদ্রোহের আদর্শে নীল চাষীরা অনুপ্রাণিত হয়েছে। অর্থাৎ ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিদ্রোহ যে সাঁওতাল বিদ্রোহ দ্বারা হয়েছে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

ভারতবর্ষের সমাজ-ব্যবস্থায় জমিদারী-মহাজনী যে শোষণ সেই শোষণ ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করেছিল সাঁওতাল বিদ্রোহ। প্রথমাবস্থায় জমিদার-মহাজনদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হলেও অচিরেই এই

ব্যবস্থার জনক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল বিদ্রোহীদের মুখোমুখি। ভারতবর্ষের জাতপাত-ভিত্তিক দলগুলো বা আদিবাসী দরদের নামে মুখোশধারী দলগুলো এই সত্যকে আড়াল করার চেষ্টা করেন। বিদ্রোহে বিভিন্ন জ্ঞাতিগোষ্ঠীর শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যকে আড়াল করে দিয়ে শুধুমাত্র সাঁওতালদের বিদ্রোহ বলে দেখানোর প্রয়াস চালান। কিন্তু ইতিহাস অন্য কথা বলে। আজও ভারতবর্ষে সাঁওতাল কৃষকসহ সর্বস্তরের কৃষকের উপর জোতদার-মহাজনদের শোষণ অব্যাহত। এই শোষণের হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম প্রয়োজন। এটাই সাঁওতাল বিদ্রোহের শিক্ষা।

সিপাহী বিদ্রোহ

সিপাহী বিদ্রোহ কোনো একটি আকস্মিক ঘটনা নয়। নানা ক্ষেত্রের, নানা স্তরের অনাচার সঞ্চিত হয়ে অসন্তোষ বিরাট আকার ধারণ করে ফেটে পড়ে। ভারতের বিভিন্ন অংশে মাঝে মাঝে সিপাহীদের ছোট-বড় অভ্যুত্থান নানা সামরিক ছাউনিতে ঘটেছে, সেগুলোর গুরুত্ব এতটা ছিল না। কৃষক বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী ও ফারাজী বিদ্রোহ ইত্যাদি মিলে দেশের অবস্থা বরাবরই কম-বেশি উত্তাল ছিল। তা সত্ত্বেও ভারতে ইংরেজ রাজত্ব ধীরে ধীরে কায়েম হয়ে বসেছে-এবং পরবর্তী শত বছরের মধ্যে এমন দৃঢ় শিকড় গেড়েছিল যে, তাকে আর সম্পূর্ণ বিতাড়ন করা সম্ভব হচ্ছিল না।

ব্যারাকপুরে নিযুক্ত চৌত্রিশ নম্বর নেটিভ ইনফ্যানট্রির তরুণ সিপাহী মঙ্গল পাণ্ডে আঠারো শো সাতান্ন সালের ঊনত্রিশে মার্চ বিকেল পাঁচটায় সিপাহীদের কাছে বিদ্রোহের আহ্বান জানান। এতে সামরিক ছাউনির চারদিকে একটা বিশাল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। খবর পেয়ে রেজিমেন্টের সার্জেন্ট মেজর হিউসন ও একটু পরে অ্যাডজুট্যান্ট, লেফটেন্যান্ট বগ্ ছুটলেন তাঁকে গ্রেপ্তার করতে। মঙ্গল পাণ্ডের গুলিতে বগ্ আহত হন--হিউসনেরও আঘাত লাগে কিছুটা। এঁদের পালটা আঘাতে মঙ্গল পাণ্ডে গুরুতর আহত হন।

ছয়ই এপ্রিল তারিখে আহত মঙ্গল পাণ্ডেকে সামরিক আদালতের সামনে হাজির করা হল। বিচারের সাময়িক প্রহসন অনুষ্ঠিত হবার পর ওই দিন-ই তাঁর মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হল। ঠিক হল, আটই এপ্রিল ভোর সাড়ে পাঁচটায় তাঁর ফাঁসী হবে। ফাঁসীর দড়িতে মঙ্গল পাণ্ডের আত্মবিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র উত্তর ভারত দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। বহরমপুর মীরাট অযোধ্যা আগ্রা দিল্লী কানপুর লক্ষ্ণৌ বুন্দেলখণ্ড পেশোয়ার ফরাক্কাবাদ আরা রাঁচী লোহারডাগা সম্বলপুর পালামৌ প্রভৃতি স্থানে গুরুতর বিক্ষোভ হতে থাকে এবং ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে সংগ্রামে বহু নিরীহ লোক হতাহত হয়। স্থানে স্থানে দারুণ নৃশংস ও বীভৎস কাণ্ড ঘটেছে।

সাধারণত ওই আন্দোলন 'সিপাহী বিদ্রোহ' নামে খ্যাত হলেও ওটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত শুধু সিপাহীদের বিদ্রোহ ছিল না। এ দেশের ব্যাপক ভূ-খণ্ড জুড়ে শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে ওই আন্দোলন শেষ পর্যন্ত 'হিন্দু-মুসলমানের এক মিলিত জাতীয় বিদ্রোহ হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল। ওই অভ্যুত্থানের সময় কার্ল-মার্কস সিপাহী বিদ্রোহ-সম্পর্কে এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। তিনি সিন্ধিয়ার মতো রাজন্যবর্গের অপদার্থতার নিন্দা করলেও তার প্রতি-তুলনায় তিনি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন অযোধ্যার সাধারণ মানুষের ভূমিকার।

বৃদ্ধ সম্রাট বাহাদুর শাহ্ জাফর মোটের উপর প্রতীক হিসেবেই অধিষ্ঠিত ছিলেন মহাবিদ্রোহের নেতৃত্বের ভূমিকায়। তবে বিদ্রোহ দমনের পর বন্দী সম্রাটকে রেঙ্গুনে পাঠাবার সময় তাঁকে প্রাণভিক্ষা চাইতে বলায় তিনি দৃপ্তকণ্ঠে উত্তর দেন, 'আত্মসম্মানের সৌরভ যতদিন যোদ্ধাদের অন্তরে থাকবে ততদিন ভারতের দাপট একদিন না একদিন লণ্ডনে পৌঁছবে।' বন্দী অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

ইংরেজ সরকার হিন্দু ও উর্দুতে ইনাম ঘোষণা করেছিল, মহাবিদ্রোহের অন্যতম প্রধান নেতা, নানা

সাহেবকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় হাজির করতে পারলে লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। তাঁকে অবশ্য ইংরেজ সরকার পায়নি। ইংরেজ বিদ্রোহ দমন করলে তিনি নেপালে আশ্রয় নেন এবং সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ অসমসাহসিক যুদ্ধ চালিয়ে নিহত হন ইংরেজ বাহিনীর হাতে। মহাবিদ্রোহের শ্রেষ্ঠ সেনানায়ক তাঁতিয়া টোপি বন্দী হন শত্রুসৈন্যের হাতে এবং তাঁকে ফাঁসী দেওয়া হয়। তার বাহিনীর সেনাপতি জওলাপ্রসাদেরও ফাঁসী হয়।

মঙ্গলপাণ্ডে

'ফৈজাবাদের মৌলভি' নামে সুপরিচিত মৌলভি আহমদুল্লাহ্ দৃঢ়চরিত্রের নেতা এবং দক্ষ সেনাপতি ও সংগঠক ছিলেন। এক বিশ্বাসঘাতক রাজা তাঁকে হত্যা করে তাঁর রক্তাক্ত মুণ্ডু ইংরেজ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে উপঢৌকন দিয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা বকশিশ আদায় করে।

বিহারে জগদীশপুরের বিদ্রোহী জায়গীরদার কুয়র সিং ইংরেজবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে আহত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। ছোটনাগপুর, সিংভূমেও যে বিদ্রোহ ঘটে তাতে বেশ কিছু অফিসার ও দু'শোর বেশি ভারতীয় সিপাহী নিহত হয় এবং বিদ্রোহী নেতার ফাঁসী হয়।

হরিয়ানার বিদ্রোহী জায়গীরদার রাও তুলারাম বিদ্রোহীদের পরামর্শে রাশিয়া থেকে অস্ত্র ও অর্থ সাহায্যের সন্ধানে তিন সঙ্গী নিয়ে গোপনে ইরান ও আফগানিস্তানের পথে পাড়ি দেন। দীর্ঘ ও দুর্গম যাত্রাপথের কষ্টে শেষ পর্যন্ত কাবুলে তাঁর মৃত্যু হয়। আফগান সরকার সেখানে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় এবং তাঁর সম্মানে কাবুলে একটি স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হয়। ওড়িশার সম্বলপুরের বিদ্রোহী নেতা সুরেন্দ্র সাঁই একত্রিশ বছর বয়সে পদার্পণ করার পর থেকেই বৃটিশ বিরোধী তৎপরতার জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহ চলাকালীন সময়ে বিদ্রোহীদের সাহায্যে মুক্তিলাভ করেই তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করেন কিন্তু পরাজিত হন। পরবর্তী চার বছর তিনি আত্মগোপন করে থাকেন। পরে গ্রেপ্তার হয়ে আবার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। আঠারো শো চুরাশি সালের আঠাশে ফেব্রুয়ারী অন্ধ অবস্থায় জেলেই তাঁর মৃত্যু হয়। জেলখানাতে তাঁর দুই ভাইও মারা যান।

সিপাহী বিদ্রোহের চক্রান্তে লিপ্ত থাকার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন আসামের মণিরাম দেওয়ান ও পিয়ালী বড়ুয়া।

আঠারো শো সাতান্ন সালের পাঁচই সেপ্টেম্বর জার্মানিতে 'ইলাসত্রিয়ের্ত ৎসাইতুঙ্গ' পত্রিকায় অভ্যুত্থান দমনে ইংরেজের পাশবনীতির বিরুদ্ধে রচনা ও ছবি প্রকাশিত হয়।

রাশিয়ায় চার্নিয়েশেভস্কি, ডব্রোলিউবভ প্রমুখ বিখ্যাত মনীষী মহাবিদ্রোহ দমনে ব্রিটিশ নীতির তীব্র নিন্দা করেন।

মহাবিদ্রোহ দমনের পর ইংরেজ ভারত শাসনের ভার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে সরাসরি নিজের হাতে তুলে নেয় এবং প্রতিষ্ঠা করে এক তথাকথিত 'ভারত সরকার'। আঠারো শো আঠারো

সালের পয়লা নভেম্বর সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার এক ঘোষণা অনুযায়ী কোনো-কোনো দাবি আংশিকভাবে মেটানো হয়েছিল। এখন থেকেই ভারতবর্ষ শাসনের ভার সরাসরি ইংলণ্ডের হাতে চলে গেল। একজন ভারত-সচিব নিযুক্ত হলেন এবং তাঁকে মন্ত্রীপরিষদে গ্রহণ করা হল। ইংলণ্ডেশ্বরের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি হিসেবে এখন থেকে বড়লাট ভারত শাসন করবেন--এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। সিপাহী-বিদ্রোহের সবচেয়ে বড় তাৎপর্য হল, দুর্ধর্ষ অপরাজেয় সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের সঙ্গে ভারতীয়েরা যে মরণপণ সংগ্রাম চালাতে পারে, বিদ্রোহ পর্যুদস্ত হলেও এই অভিজ্ঞতা ভারতীয়দের মধ্যে একটা নতুন উদ্দীপনা সঞ্চার করল। সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজ-জীবনেও তার প্রতিফলন পড়ল।

নীল বিদ্রোহ

নীল চাষের শুরু থেকেই নানরকম উপদ্রব শুরু হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে, বাঙালীর জীবনে নীল চাষ একটি কুখ্যাত অধ্যায়। দাদন দিয়ে, সময়-সময় বিনা দাদনে চাষ করতে বাধ্য করা, শাসনসহায়তায় বিচারের প্রহসন, ছল-ছুতোয় নানারূপে নির্যাতন, দলবদ্ধ হয়ে অত্যাচারের ভীতি প্রদর্শন, লাঠিয়ালের সাহায্যে লুঠপাট, অগ্নিসংযোগ, রাহাজানি, জাল-জালিয়াতি, পেযাদা-বরকন্দাজের জবরদস্তি, চামড়ার চাবুক (ছট্‌কি) অথবা চামড়া-বাঁধানো মোটা লাঠি দিয়ে প্রহার, নারীর শ্লীলতাহানি, চাষের বলদ অপহরণ, অনাহারে এবং নিরম্বু অবস্থায় বন্দী করে রাখা, হত্যা করা—প্রভৃতি শাসকশ্রেণীর উর্বর মস্তিষ্কে যতরকম অত্যাচার, অবিচার, নিপীড়নের ফন্দী আবিষ্কার করা সম্ভব, সবই অসহায় নিরস্ত্র রায়তদের উপর একক বা সমষ্টিগতভাবে প্রযুক্ত হত। একবার চুক্তিবদ্ধ করে নিতে পারলে আমরণ রায়তদের আর মুক্তি ছিল না। দাদনের মেয়াদ কখনও শেষ হত না। অগ্রিম-দেওয়া ঋণ পরিশোধ হবার লক্ষণ ছিল না। ধানচাষের ভাল জমি নজরে পড়লে অথবা ওই লোভনীয় সংবাদ কুঠীতে কেউ পৌঁছে দিলে নীলকরদের লোক এসে জোর করে চিহ্নিত করে দিয়ে কড়া হুকুম দিয়ে যেত—ওখানে সে-বছর নীল চাষ হবে, ধান নয়।

নীল-চাষীর উপর অত্যাচারের যখন সীমানা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল তখন হঠাৎ যেন সদাশয় ইংরেজ শাসক রায়তদের দুঃখে ব্যথিত হলেন। রায়তদের কষ্ট কিছুটা লাঘব করার জন্য আঠারো শো ঊনষাট খৃস্টাব্দের বিশে ফেব্রুয়ারী সরকার নির্দেশ দিলেন, কারও অমতে বা অনিচ্ছায় দাদন গছিয়ে দেওয়া চলবে না আর মালিকের ইচ্ছের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষেতে নীলচাষ করা চলবে না।

এই সংবাদ প্রচারিত হলেও রায়তদের উপর অত্যাচার আগের মতই চলতে থাকে। বিভিন্ন স্থানে সরকারী আদেশ উপেক্ষিত হতে থাকল কারণ বিচারের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন শ্বেতাঙ্গ প্রভু। নানারকম হাকিমী ব্যাখ্যা করে ওঁরা আইনের ফাঁক খুঁজে বের করতেন। এজন্য নিপীড়িত রায়তদের ক্ষোভ তো প্রশমিত হলই না বরং দিকে-দিকে প্রতিবাদের ধ্বনি শোনা যেতে লাগল।

শ্বেতাঙ্গ হাকিমদের হাতে রায়ত নীলকরদের মামলার ভার থাকত। দেশীয় মুন্সেফ বা বিচারক দেওয়ানী আদালতে শ্বেতাঙ্গদের বিচার করতে পারতেন না। যদি কোনো হাকিম রায়তদের পক্ষে একটু দুর্বলতা প্রকাশ করতেন তাহলে তৎক্ষণাৎ নীলকরেরা সুপ্রিম কোর্টে অভিযোগ পেশ করতেন এবং সংশ্লিষ্ট হাকিমকে বদলি করে দেওয়া হত। এর ফলে, কোনো হাকিম নীলকরদের বিরাগভাজন হতে চাইতেন না। অবশ্য টমাস ব্যাবিংটন মেকলে আঠারো শো ছত্রিশ সালের একাদশ আইন বলে দেওয়ানী মামলায় সুপ্রিম কোর্টে আবেদনের সুযোগ বন্ধ করে দেন। এতে শ্বেতাঙ্গ নীলকরদের বেশ কিছুটা অসুবিধা দেখা দেয়।

আরও কিছু সমকালীন ঘটনা রায়তদের অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে সাহস যুগিয়েছিল। ফারাজি (মুসলিম) আন্দোলন আঠারো শো ত্রিশ খৃস্টাব্দ থেকে শুরু হয় এবং মাঝে মাঝে গুরুতর আকার ধারণ

করেছে। আন্দোলনকারীরা হিন্দু জমিদার ও বিদেশী গভর্নমেন্টের সম্পত্তি লুঠ করত। এক দশক পরে এই আন্দোলন প্রশমিত হয়ে যায়। ফারাজিদের মধ্যে অনেকেই লাঠি সড়কি এবং বিভিন্ন অস্ত্রচালনায় নিপুণ ছিল। সবচেয়ে বড় কথা, ওরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়বার মনোবল পেয়েছিল। এদের অনেকেই ছিল রায়তদের দলভুক্ত। স্বভাবতই এই কারণে নীল-বিদ্রোহ অশেষ শক্তিসঞ্চয় করেছিল।

এ ছাড়া, ভারতের বুকে সমকালীন দুটো বড় বিদ্রোহ অর্থাৎ সাঁওতাল-বিদ্রোহ ও সিপাহী-বিদ্রোহ এবং শাসকশ্রেণীর নিপীড়নের বিরুদ্ধে ইতস্তত সংঘটিত সংঘাত ও সংঘর্ষের নানাবিধ সংবাদও রায়তদের আত্মসচেতন করে তুলছিল।

ফ্রেডারিক হ্যালিডে সাঁওতাল-বিদ্রোহেব দু'বছর আগে বাংলার ছোটলাট হিসেবে নিযুক্ত হন। তাঁর কাছে নদীয়ার রায়তদের সঙ্গে সম্ভ্রান্ত কয়েক হাজার লোক সই করে এক আবেদন পেশ করেন। কিন্তু 'কাল্পনিক' অ্যাখ্যা দিয়ে হ্যালিডে ওই আবেদনপত্রের গুরুত্বকে লঘু করে দেখেন। অথচ, ওই দরখাস্তে তখন যা লেখা ছিল, নীল-চাষীদের প্রকৃত অবস্থা ছিল আরও অনেক বেশি ভয়ঙ্কর।

সৌভাগ্যবশত, পিটার গ্র্যান্ট এই সময় নীল-চাষীদের ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে বাংলায় এলেন। হাঙ্গামার প্রধান কেন্দ্র বারাসতে ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এলেন এ্যাশলে ইডেন। আগেকার সরকারী আদেশকে উনি আরও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করলেন। ওই আদেশবলে ঠিক হল, জমি রায়তের, তারা যে-ফসল ইচ্ছা উৎপাদন করবে, জোর করে কেউ তাকে অন্য চাষ করতে বাধ্য করতে পারবে না। তারপর জে. এইচ. ম্যাঙ্গলস এসে প্রকাশ্যভাবেই রায়তদের মতের সমর্থন জ্ঞাপন করেন। এ ছাড়া, যোগাযোগের ফলে রায়তরা কতকটা বেপরোয়া হয়ে উঠতে শুরু করে।

আঠারো শো উনষাট খৃস্টাব্দের শরৎকালে বেশ বড় রকমের গোলমাল বেধে গেল। আন্দোলন ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ল নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও দিনাজপুর জেলায়। কোনো কোনো জমিদারও রায়তদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে শুরু করলেন। নড়াইলের বড়-তরফের রামরতন রায় এবং তাঁর নদীয়া-জমিদারীব নায়েব মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাণাঘাটের গোপাল পালচৌধুরী ও তাঁর ভাই শ্যামচন্দ্র পাল চৌধুরীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের সঙ্গী নবীন বিশ্বাসও রায়তদের সহযোগিতা করতে এগিয়ে এসেছিলেন।

রায়তদের প্রকাশ্য সংঘর্ষ বাধল নদীয়ার আওরঙ্গাবাদ-কুঠীর সাহেব-মালিকদের সঙ্গে। নীলকরেরা জোর করে কয়েকজন রায়তকে আটক করে রাখল। আঠারো শো ষাট খৃস্টাব্দের তেইশে ফেব্রুয়ারী আওরঙ্গাবাদে মরদ বিশ্বাস, সুহাস বিশ্বাস এবং কালাচাঁদ সাহার নেতৃত্বে কয়েক শো লোক দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নীলকরদের কবল থেকে ধৃত ব্যক্তিদের মুক্ত করে নিয়ে আসে। এইটিই নীলকরদের বিরুদ্ধে রায়তদের প্রথম প্রকাশ্য সংগ্রাম।

তখন থেকে রায়তরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হল যে তারা নীল চাষ বন্ধ করবে, ঢাক বাজিয়ে বিভিন্ন গ্রাম থেকে লাঠিয়াল জমায়েত করবে এবং সাধারণ তহবিলের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করবে। ওদের এই সংগঠিত প্রয়াসে পুলিশমহল দারুণ আতঙ্কিত হয়ে পড়ে আর রায়তরা নিজেদের ইচ্ছে মতো প্রতিরোধ করে।

নদীয়ায় চৌগাছায় বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস নীল-বিদ্রোহের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন। প্রথমে তাঁরা লোক পাঠিয়ে দূর-দূর গ্রামের প্রজাদের নীল-চাষ করতে নিষেধ করে পাঠান। গোবিন্দপুর গ্রামের একজন প্রজাও নীলচাষ করতে সম্মত না হওয়ায় শ্বেতাঙ্গ নীলকরের পক্ষে শতাধিক লাঠিয়াল চাষীদের শায়েস্তা করতে হাজির হল। অনেকে আবার হাতির পিঠেও চড়ে এসেছিল। দিগম্বর বিশ্বাসের লাঠিয়ালেরা ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে ওরা রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হল। শুধু লোকবল দিয়েই নয়, দিগম্বর ও বিষ্ণুচরণ লোকবল ছাড়া প্রচুর টাকাকড়ি দিয়েও সাহায্য করেছিলেন। আর্থিক সাহায্য করতে গিয়েই দিগম্বর একেবারে নিঃস্ব হয়ে যান এবং মৃত্যুবরণ করেন। জমিদার-রায়তদের সম্মিলিত সার্থক

প্রতিরোধের কাহিনী যথেষ্ট পাওয়া যায়।

রায়তরা ক্রমে আত্মশক্তিতে আস্থাবান হয়ে উঠেছিল এবং ওদের মধ্যে থেকেই এক-একজন নেতৃত্ব গ্রহণ করে অসীম সাহসের পরিচয় দিয়েছে। ওরা শিখে গেল কীভাবে সংঘর্ষের সময় দ্রুতগতিতে সমবেত হতে হয়। কীভাবে যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহ করতে হয়। আর সেই যুদ্ধের সময় অত্যাচারীদের আধুনিক মারণাস্ত্রকে ওরা মোকাবিলা করত তীরধনুক, গুলতি, ইট, কাঁচা বেল, ধাতব থালা, স্ত্রীলোকদের পরিত্যক্ত মাটির তৈজসপত্র, ডজন-খানেক ভয়ঙ্কর সড়কিধারী লোক ইত্যাদির সাহায্যে।

রায়তরা দেশীয় সহানুভূতিসম্পন্ন লোকদের সমর্থন ছাড়াও বিদেশী খৃস্টীয় পাদ্রীদের সমর্থন পেয়েছেন। ওঁরা রায়তদের প্রতি যে প্রকাশ্যভাবে সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তা ওই সময়ে প্রকাশিত পিয়ারীচাঁদ মিত্রের 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড' এবং হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকা দু'টি পড়লেই জানা যায়।

নীলকরদের অত্যাচার রুখতে স্থানীয় যে সব আইনজীবী রায়তদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন বা মোক্তারেরা ওদের সহায়তা করেছিলেন তাঁদের শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিস্ট্রেটদের কোপানলে পড়তে হয়েছিল। এঁদের অনেকে জেলও খেটেছেন। অথচ এইসব সহানুভূতিশীল ব্যক্তিদের প্রেরিত ঘটনাবলীর বিবরণী কলকাতার বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হলে সেগুলো প্রতিপত্তিশালী লোকদের নজরে পড়ত এবং রায়তদের প্রতি ওঁদের সহানুভূতির উদ্রেক করত। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন প্রতিবাদী জনমত গড়ে তোলার ব্যাপারে বিশেষ সহায়তা করেছিল।

আঠারো শো ষাট খৃস্টাব্দের মার্চ মাস পর্যন্ত নীলকুঠির সাহেবদের অত্যাচার বন্ধ করা যায় নি। চব্বিশে মার্চ তারিখে বড়লাটের আইনসভার এক নির্দেশমতে সমস্ত ব্যাপারের তদন্তের জন্য এক কমিশন গঠন করার কথা ওঠে এবং নয়ই এপ্রিল এক তদন্ত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কমিশনের কাজ শুরু হয় আঠারোই মে। নভেম্বর মাসে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। নীলকরদের অনাচার সম্বন্ধে যে সকল সংবাদ মুখে মুখে প্রচারিত হচ্ছিল এবং যার অনেকখানি কাল্পনিক ও অবিশ্বাস্য বলে পরিত্যক্ত হচ্ছিল, তার সমস্তই সমর্থিত হয়। গ্র্যান্টের সুপারিশ প্রায় সম্পূর্ণভাবে ভারত-সচিব কর্তৃক গৃহীত হয়। কুখ্যাত নীলচাষ এই আঘাতেই মুমূর্ষু হয়ে পড়ে। পরে জার্মানীতে যৌগিক নীল আবিষ্কৃত হলে ভারতীয় নীল-চাষ প্রায় অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

নীলদর্পণ

উনিশ শতকে বাংলার প্রখ্যাত নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র 'নীলদর্পণ' নামে একটি নাটক লেখেন। এই নাটকটি প্রকাশিত হয় আঠারো শো ষাট খৃস্টাব্দে।

যখন নীল-বিদ্রোহ সারা বাংলায় অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছে, তখন এই নাটকটির মধ্য দিয়ে দীনবন্ধু প্রকৃত ঘটনার নিখুঁত চিত্রাঙ্কন করেছিলেন। নাটকটি পাঠকের মনে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করতেও সমর্থ হয়। এতদিন নীল নিয়ে লিখিত ছড়া লোকের মুখে-মুখে চলছিল। নাটকটি মঞ্চস্থ হলে লোকে চোখের সামনে অত্যাচারের রূপ দেখে উন্মত্তপ্রায় হয়ে ওঠে এবং নীলকর সাহেবদের ওপর মন তিক্ত-বিষাক্ত হয়। ইংরেজজাতি, নীলকর ম্যাজিস্ট্রেট ও সঙ্গে সঙ্গে সরকারের উপর বিরুদ্ধভাব সৃষ্টি করতে 'নীলদর্পণ' নাটকটির দান অপরিসীম।

এই নাটকটির ইংরেজি অনুবাদ করে দেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং অনুবাদ গ্রন্থটি প্রকাশ করেন পাদ্রী জেমস্ লঙ। উত্তেজিত নীলকরেরা চুপ করে থাকল না। তারা মানহানিকর ও মিথ্যে প্রচারের অজুহাতে লঙের নামে নালিশ রুজু করল। বিচারকের রায়ে লঙের এক মাস কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানা ধার্য হল। কালীপ্রসন্ন সিংহ তখনই জরিমানার টাকা আদালতে জমা দেন।

কিন্তু এই সূত্রে বইখানির খুব প্রচার হয়ে যায়। শিক্ষিত মহলে ইংরেজ জাতের উপর বিরূপ মনোভাব তীব্রতর হয়ে ওঠে। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় শুধু নির্ভীক রিপোর্ট ও মন্তব্যই প্রকাশ করেন নি, নীলকরদের সাথে মামলা লড়তে লড়তে মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে সর্বস্বান্ত হয়ে হাসপাতালে মারা যান। নীল-বিদ্রোহে বাংলার কৃষকদের ভূমিকা অমর হয়ে রয়েছে হরিশচন্দ্রের লেখায়।

সরকারী নির্দেশে নাটকটির অভিনয় বন্ধ হয়ে যায়। বইখানি নিষিদ্ধ পুস্তকের তালিকায় স্থান না পেলেও সব রকমে এর প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সন্দেহভাজন ব্যক্তির বাড়িতে তল্লাসী চালাতে গিয়ে এই বইখানি পেলেই পুলিশ বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যেত।

দীনবন্ধু মিত্র

হাইকোর্টের বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালেই ওয়েল্‌স্‌ তাঁর এক রায়ে সমস্ত বাঙালী জাতিকে মিথ্যাবাদী, জালিয়াৎ, শঠ প্রভৃতি কুৎসিত বিশেষণে চিহ্নিত করেন। কিন্তু এই রায়ের বিরুদ্ধে তখন তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য প্রতিবাদ হয়নি। লঙের মামলায় ওয়েলস যেদিন রায় দেন, অর্থাৎ তাঁর উক্তির প্রায় দু'বছর বাদে রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের শোভাবাজার রাজবাড়ির নাটমন্দিরে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। হাইকোর্টের কোনো বিচারপতির পক্ষে একটা গোটা জাতকে অশালীন উক্তির দ্বারা হেয় করতে চেষ্টা করা যা অত্যন্ত গর্হিত কাজ—সে বিষয়ে অতি কঠোর ও তীব্র ভাষায় উল্লেখ করা হয়। লঙ-মামলার রায় যদি অন্যরকম হত তাহলে তখন এই সভার আয়োজন হত কিনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তৎকালীন বাঙালী-সমাজে এক অসাধ্য কাজ ছিল এটি। প্রায় বিশ হাজার লোকের স্বাক্ষরিত এক প্রতিবাদ-লিপি ভারত-সচিব চার্লস উডের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে অবশ্য জজসাহেবকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করা হয়।

নীল বিদ্রোহের আগুন স্বল্পকাল পরে প্রশমিত হলেও প্রতিহিংসাপরায়ণ নীলকরেরা হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে তাঁর নির্ভীক সাংবাদিকতার জন্য ক্ষমা করতে পারে নি। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় এক নীলকর সাহেবের নৈতিক চরিত্র নিয়ে তীব্র সমালোচনা প্রকাশিত হলে তাঁর নামে মানহানির মোকদ্দমা রুজু হয়েছিল। মামলা চলাকালীন অবস্থাতেই হরিশচন্দ্র পরলোকগমন করেন। ওঁর মৃত্যুতে নীলকর সাহেবরা শান্ত হল না। তারা চাইছিল, পত্রিকাটি একেবারে বন্ধ করে দিতে। মামলার রায়ের হরিশচন্দ্রের এক হাজার টাকা জরিমানা হলে অতি দুরবস্থার মধ্যেও তাঁর স্ত্রী অতিকষ্টে প্রয়াত স্বামীর জরিমানার টাকা শোধ দেন। সাঁওতাল-বিদ্রোহ, সিপাহী-বিদ্রোহ ও নীল-বিদ্রোহের ফলে ভারতবর্ষের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে একটা বিশাল পরিবর্তন এল। ভারতবর্ষের জন-মানসে নিজেদের অধিকার-বোধ সম্পর্কে যেমন একটা সচেতনতা গড়ে উঠল, তেমনি বিদেশী শক্তিও পুরোনো শাসনপদ্ধতির কিছুটা সংস্কার করতে বাধ্য হচ্ছিল। এই দুই শক্তির সংঘাতের মাঝখানে কয়েকজন প্রখ্যাত সমাজ সংস্কারক দেশের কয়েকটি অভ্যন্তরীণ সমস্যা নিয়েও পাশাপাশি এমন এক ধরনের আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন যার সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য আমাদের দেশের সামাজিক আন্দোলনে একটা নতুন মাত্রা যুক্ত করেছিল। এই প্রসঙ্গে রাজা রামমোহন রায়ের পরেই যে নামটি আমাদের জাতীয় ইতিহাসে সমধিক গুরুত্বপূর্ণ, সেটি হল পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)

উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের অন্যতম পথপ্রদর্শক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহণ করেন আঠারো শো কুড়ি খৃস্টাব্দের ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর। তাঁর জন্ম হয়েছিল মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে, এক দরিদ্র পরিবারে। পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা ভগবতী দেবী।

গ্রামের পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর তিনি মাত্র ন'বছর বয়সে কলকাতার সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন এবং ব্যাকরণ কাব্য অলঙ্কার বেদান্ত স্মৃতি ন্যায় প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন। এর পাশাপাশি তিনি ইংরেজি ভাষাও শেখেন। মাত্র উনিশ বছর বয়সে হিন্দু ল' কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেন। এর আগেই মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয় ক্ষীরপাই নিবাসী শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্যের কন্যা দিনময়ী দেবীর সঙ্গে।

একুশ বছর বয়সে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগে প্রধান পণ্ডিতের পদ গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি ইংরেজি ও হিন্দী ভাষা শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। পাঁচ বছর পরে তিনি সংস্কৃত কলেজে সহকারী সচিবের পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু কলেজ-সংস্কারের প্রশ্নে সম্পাদক রসময় দত্তের সঙ্গে মতবিরোধের ফলে আঠারো শো সাতচল্লিশ খৃস্টাব্দে ওই পদত্যাগ করেন। পরের বছরেই তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে যুক্ত হন এবং তারও দু'বছর পরে তিনি সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে সংস্কৃত কলেজের সঙ্গে যুক্ত হন। আরও এক বছর পরে রসময় দত্ত যখন অবসর গ্রহণ করলেন তখন বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ রূপে নিযুক্ত হলেন। বলা বাহুল্য, তখন তাঁর বয়স মাত্র একত্রিশ বছর।

একদিকে তখন শাসক ইংরেজের বিরুদ্ধে দেশের আকাশে-বাতাসে বিদ্রোহের আগুন ধূমায়িত, অন্যদিকে নানারকম সামাজিক কুসংস্কারে দেশের অবস্থা আবিল। বিদ্যাসাগর জানতেন, শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড তৈরি করে। বিদেশী শাসনের হাত থেকে শুধু মুক্তি অর্জন করলেই চলবে না, দেশকে উন্নত ও গতিশীল করে তুলতে হলে চাই শিক্ষার ব্যাপক প্রসার। তিনি তাই পাঠ্যতালিকার পুনর্বিন্যাস এবং শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারে মনোনিবেশ করলেন।

কলেজ-পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর প্রচেষ্টায় গৃহীত সংস্কারগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য : অষ্টমী আর প্রতিপদের বদলে রবিবারকে সাপ্তাহিক ছুটির দিন ধার্য করা, কলেজে অব্রাহ্মণ ছাত্রদের প্রবেশাধিকার দান এবং ছাত্রদের কাছ থেকে মাসিক বেতন গ্রহণের রীতি প্রচলন।

বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শিক্ষার সহজতর পন্থা উদ্ভাবনের জন্য তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হয়েই ওই বছরে জটিল সংস্কৃত ব্যাকরণ 'মুগ্ধবোধ' এর পরিবর্তে নিজেই রচনা করলেন 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা' এবং ন'বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে লিখলেন 'ব্যাকরণ কৌমুদী'। পাঠক্রম সংস্কারে বিদ্যাসাগরের এই প্রয়াস যুগান্তকারী কীর্তি। এ ছাড়া তিনি কলেজে ইংরেজি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করলেন, স্টুয়ার্ট মিল-এর লজিক পড়ানোর ব্যবস্থা করলেন, ইংরেজি ভাষায় গণিতশাস্ত্র শিক্ষা দিতে শুরু করলেন এবং সংস্কৃত পাঠক্রমের প্রয়োজনভিত্তিক পুনর্বিন্যাসও করলেন।

শত রকমের ব্যস্ততা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর নানা বয়সের ছাত্র এবং দেশের সংস্কৃতিমনস্ক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের জন্য অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থরচনা করেছেন। সাতাশ বছর বয়সে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের জন্য 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' হিন্দী থেকে অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। মাত্র চার বছর পরে বাংলায় জনশিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে তিনি 'বোধোদয়' প্রকাশ করেন এবং তারও বার বছর পরে শিশুদের মাতৃভাষার সঙ্গে পরিচিত করার উদ্দেশ্যে তিনি লেখেন 'বর্ণপরিচয়' এবং ওই একই বছরে তিনি রচনা করেন 'শকুন্তলা'। এর পরের বছরে প্রকাশিত হয় তাঁর দুটি ভিন্নধর্মী গ্রন্থ 'চরিতাবলী' ও 'কথামালা'। আরও চার বছর পরে তিনি লেখেন 'সীতার বনবাস'।
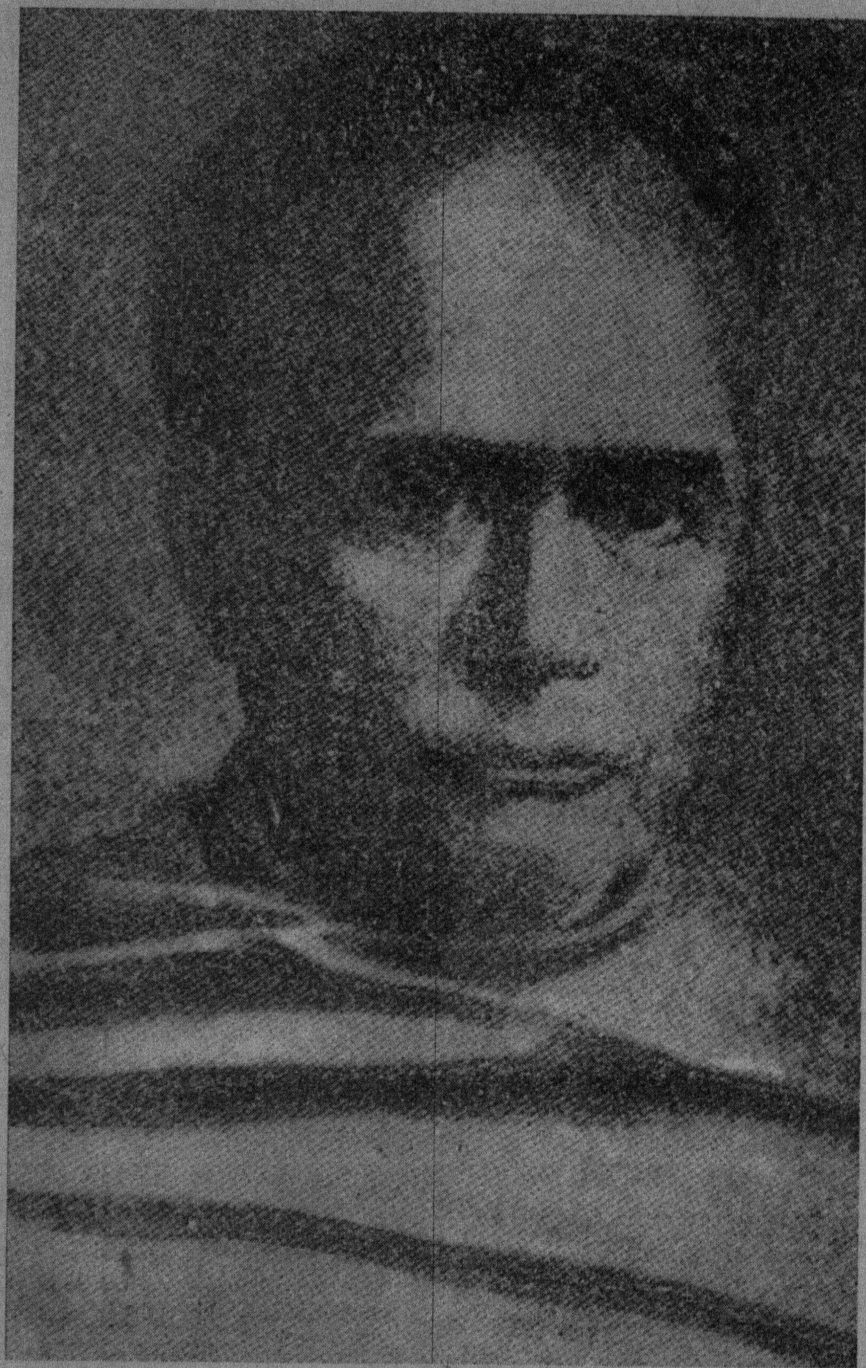
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির এই অসাধারণ প্রবক্তা 'রঘুবংশম', 'কুমারসম্ভবম্‌', 'কাদম্বরী', 'উত্তর রাম-চরিত' প্রভৃতি সংস্কৃত সাহিত্যের সম্পাদনা করে আধুনিক বাঙালী মানসে কালিদাস, বাণভট্ট, ভবভূতি প্রভৃতি ধ্রুপদী শিল্পীদের অনবদ্য অবদান সম্পর্কে সচেতন করতে প্রয়াসী হন। চুয়াল্লিশ বছর বয়সে তিনি 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' রচনা করেন এবং তারও পাঁচ বছর পরে শেক্সপীয়রের 'এ কমেডি অফ এররস্‌'—এর অনুবাদ করেন 'ভ্রান্তিবিলাস' নামে।

শিক্ষা-প্রসার ও সামাজিক আন্দোলনে চূড়ান্তভাবে জড়িয়ে থাকার জন্য তিনি লেখালিখির দিকে গভীরভাবে নিজেকে জড়িয়ে দিতে পারেন নি। যখন তিনি 'বর্ণপরিচয়' বা 'কথামালা' লিখছেন, সেই একই সময়ে তদানীন্তন ছোটলাট ফ্রেডারিক হ্যালিডের সহায়তায় বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় মাত্র ছয় মাসের মধ্যে প্রায় কুড়িটি মডেল-স্কুল স্থাপন করেন। তাঁরই তত্ত্বাবধানে শিক্ষণ-শিক্ষার উদ্দেশ্যে সংস্কৃত কলেজে স্থাপিত হয়েছিল নর্মাল স্কুল। আঠারো শো ঊনষাট খৃস্টাব্দে কলকাতায় ট্রেনিং স্কুল স্থাপিত হলে তিনি তার সেক্রেটারির পদটি গ্রহণ করেন। ওই প্রতিষ্ঠানটি পরে নাম হয়েছিল হিন্দু মেট্রোপলিটান ইনিস্টিটিউশন। কয়েক বছর পরে স্কুলটি তাঁর কর্তৃত্বে এলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনক্রমে বিদ্যাসাগর সেই প্রতিষ্ঠানকে কলেজে রূপান্তরিত করেন। বিদ্যাসাগরের চেতনায় শিক্ষার প্রসার ও সমাজ-সংস্কার একই মর্যাদা পেয়েছিল। আঠারো শো তিপ্পান্ন খৃস্টাব্দে বয়স্কশিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে তিনি বীরসিংহ গ্রামে খেতমজুরদের নিয়ে নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এদেশে এই ধরনের প্রচেষ্টার এটিই প্রথম নজির। তার চার-পাঁচ বছর পরে স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে বিভিন্ন জেলায় বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকারী পর্যায়ে আর্থিক আনুকূল্য না পেয়ে বিদ্যাসাগর নিজেই ওই স্কুলগুলোর আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

এর আগেই, আঠারো শো ঊনপঞ্চাশ খৃস্টাব্দে বিদ্যাসাগর ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন-প্রবর্তিত বালিকা বিদ্যালযটির অবৈতনিক সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন, যেটির বর্তমান নাম বেথুন কলেজিয়েট স্কুল।

ঊনিশ শতকে আমাদের দেশের রক্ষণশীল আবহাওয়ায় মেয়েরা নানারকম সামাজিক অন্যায় ও অবিচারের শিকার হত। সমাজ-সংস্কারক ও দরদী মনের অধিকারী বিদ্যাসাগর এই সমস্যাগুলো দূর করতে সচেষ্ট হন। বিধবা-বিবাহ প্রস্তাব রচনা করে কলকাতার তৎকালীন সমাজে তিনি প্রবল আলোড়নেব সৃষ্টি করেন। বিদ্যাসাগব-পন্থী এবং রক্ষণশীল সমাজের মধ্যে তুমুল দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। নানা বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও প্রায় পাঁচ বছর সংগ্রামের পর আঠারো শো ছাপ্পান্ন খৃস্টাব্দে বিধবা-বিবাহ আইন পাশ হয়েছিল এবং ওই বছরেই তাঁর উদ্যোগে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রথম বিধবা-বিবাহ কবেছিলেন। তার চৌদ্দ বছর পরে বিদ্যাসাগর তাঁর পুত্র নারায়ণের বিবাহ দেন জনৈকা বিধবার সঙ্গে।

বিদ্যাসাগর এখানেই থামলেন না। নারায়ণের বিবাহের পরের বছরেই তিনি বিবাহ-সংক্রান্ত আর একটা সংস্কারমূলক কাজে হাত দিতে চাইলেন। তখনকার কুলীন ব্রাহ্মণেরা অসংখ্য বিবাহ করতেন। কন্যাদায় থেকে মুক্ত হবার জন্য পাত্রীপক্ষ মেয়েদের সামাজিক পণ্যে পরিণত করেছিলেন। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুল সর্বস্ব', মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' এবং আরও পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বামুনের মেয়ে' প্রভৃতি নাটক-উপন্যাসে এই সমস্যাটিকে গুরুতররূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে। বিদ্যাসাগর বহু-বিবাহপ্রথা বিলোপ আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করলেন। তিনি ওই ধরণের আন্দোলনের সমর্থনে প্রবন্ধ রচনা করলে রক্ষণশীল সমাজ তাঁর বিরোধিতা করতে শুরু করল। অনমনীয় বিদ্যাসাগর তখন 'অতি অল্প হইল' এবং 'আবার অতি অল্প হইল' শীর্ষক দুটি রচনা প্রকাশ করে রক্ষণশীল সমাজকে মুখের মতো জবাব দিয়েছিলেন। তাঁর সর্বশেষ রচনা 'বিদ্যাসাগর চরিত', প্রয়াণের বছরেই প্রকাশিত।

বিজ্ঞানচর্চাতেও বিদ্যাসাগরের গভীর আগ্রহ ছিল। প্রখ্যাত চিকিৎসক ও বিজ্ঞানী ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার যখন বিজ্ঞানসভা প্রতিষ্ঠা করলেন তখন বিদ্যাসাগর স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হয়ে এক হাজার টাকা ওই প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে দান করেন।

বিদ্যাসাগরের পরিচয় ছিল 'দয়ার সাগর' বলে। আর্ত ও নিপীড়িতের বেদনা লাঘব করার জন্য তিনি সারা জীবন তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর কারুণ্য বলিষ্ঠ, পুরুষোচিত। দুঃখ, অকল্যাণে মানুষ পীড়িত হলে অযথা অশ্রুপাত না করে তিনি তার বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে যুদ্ধ ঘোষণা করতেন। ফ্রান্সে ঋণগ্রস্ত মাইকেল মদুসূদন দত্তকে অর্থসাহায্য পাঠিয়ে ঋণমুক্ত করে তিনি দেশে ফিরিয়ে আনেন। তাই 'দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব।'

জীবনের শেষ অধ্যায়ে তিনি কার্মাটারে আদিবাসী সাঁওতালদের মধ্যে দিনযাপন করেছিলেন এবং আঠারো শো একানব্বই খৃস্টাব্দের উনত্রিশে জুলাই কলকাতায় স্বগৃহে লোকান্তরিত হন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

দেশীয় মধ্যবিত্ত জীবনের প্রতি বিরূপতা এবং ব্যক্তিজীবনের নানাবিধ সংকট মধুসূদনকে ইংলণ্ড এবং ইংরেজি সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি মোহগ্রস্ত করে তুললেও তিনি সমকালীন স্বদেশ ও সমাজের পরিবর্তনকামী গণ-আকুলতা সম্পর্কে অন্ধ ছিলেন না। খ্রীস্টান ধর্মের প্রতি মধুসূদনের আস্থা থাকলেও বিশেষ কোনো আকর্ষণ ছিল না, বরং দেশের ধর্মানুষ্ঠানের প্রতিই তাঁর সহৃদয় অনুকূলতা ছিল। শুধু সাহেব হবেন এবং বিলেত যাওয়া সহজ হবে—এই আকর্ষণেই তিনি খৃস্টান হলেন কিন্তু তাঁর ভাগ্যে বিলেতে যাওয়া ঘটল না। খৃস্টান হয়েছিলেন বলে মধুসূদন প্রথমে বিশপ্স কলেজে ছাত্র হিসেবে এবং পরে মাদ্রাজে স্কুল-শিক্ষকরূপে গ্রীক-লাটিন-সংস্কৃত প্রভৃতি ধ্রুপদী ভাষা ও সাহিত্য ভালো করে পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন।

মধুসূদন চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সে মাদ্রাজে অবস্থানকালে ইংরেজিতে 'ক্যাপটিভ লেডি' এবং 'ভিসনস্ অফ দ্য পাস্ট' প্রভৃতি কবিতা লিখলেও এবং জীবনের শেষ পর্বে 'হেক্টর বধ' আখ্যায়িকা এবং 'মায়াকানন' নাটক লিখলেও সেগুলো তৎকালীন সমাজে স্বাদেশিকতার প্রেক্ষিতে তাৎপর্যপূর্ণ রচনা হিসেবে স্বীকৃতি পেতে পারে না। বরং তাঁর 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' সর্বাপেক্ষা আন্তরিক, গুরুত্বপূর্ণ এবং তার স্বাদেশিক চেতনার এক উজ্জ্বল উদাহরণ।

বাংলা নাট্যের হীনতা দেখে মধুসূদনের রসজ্ঞ শিল্পী মানস বেদনাহত হয়েছিল। আবার, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে যেন বাজি রেখে মধুসূদন বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ চালাতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিলেন। এই মানসিকতার ফলেই ঘটেছিল বাংলা কবিতা ও নাটকে যুগান্তর সংঘটন।

মধুসূদনের জীবনবোধে ও জীবনচর্যায় ছিল বিদ্রোহী মনোভাব। গতানুগতিকতার বাইরে তিনি নিজেকে ছড়িয়ে দিতে চাইতেন। উনিশ শতকের নবজাগরণের ঢেউ তাঁর এই অভীপ্সার জমি তৈরি করেছিল। দেশে যখন বিদ্রোহের বাতাবরণ, তখন ওঁর মতো একজন কবির শিল্পীসত্তাও সেই আন্দোলনের অভিঘাতে আলোড়িত হয়েছে। তাই ছত্রিশ বছর বয়সে যখন তাঁর প্রথম কাব্য 'তিলোত্তমাসম্ভব' প্রকাশিত হল, তখন তিনি দেখালেন, দেবতারা দৈববশে সুন্দ-উপসুন্দের হাতে পরাজিত। তাঁরা গ্রীক দেবতাদের মতো 'বিধাতার অধীন, তাঁর পদাশ্রিত'। দেবতাদের প্রতি প্রচলিত ভক্তিতে মধুসূদনের হৃদয় আপ্লুত নয়। শক্রনিপাত হলে ইন্দ্র বলেছেন, তাঁর শত্রু 'অকালে কপাল দোষে' যমালয়ে গেছে।

'মেঘনাদবধ কাব্য' গ্রন্থে মধুসূদন মেঘনাদকে বিদ্রোহী ভারত-আত্মার প্রতিমূর্তি করে গড়ে তুলেছেন। রাবণের প্রতি আমাদের ঘৃণা মধুসূদন সশ্রদ্ধ করুণায় রূপান্তরিত করেছেন। স্বয়ং শিব বলেছেন, 'হায় দেবি, দেব কি মানব, কার হেন সাধ্য রোধে প্রাক্তনের গতি?' রাম বলেছেন, 'কেমনে লঙ্ঘিব দৈবের

নির্বন্ধ ভাই?' রাবণ বলেছে, 'বিধির বিধি কে পারে খণ্ডাতে'? স্বয়ং মধুসূদনও বলেছেন 'প্রাক্তনের গতি, হায়, কার সাধ্য রোধে?' অর্থাৎ ভবিতব্য, দৈব বা নিয়তির বিধান ছাড়া রাবণকে রামচন্দ্রের পক্ষে বিনাশ করা সম্ভব ছিল না।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

বাংলা রচনায় হাত দেবার আগে মধুসূদন ভালো করে সংস্কৃত সাহিত্য, বিশেষত কালিদাসের কাব্য ও নাটক পড়েছিলেন। তাঁর রচনায় হোমার, ভর্জিল ও দান্তের পরোক্ষ প্রভাব ছিল, প্রত্যক্ষভাবে তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন ওভিদ, পেত্রার্ক, তাস্‌সো ও মিলটন পড়ে। কিন্তু এইসব চিরায়ত বিদেশী শিল্পীকুল

তাঁকে যত না প্রভাবিত করেছিলেন তার চেয়ে তিনি অনেক বেশি অনুসারক হয়েছেন ভারতীয় কবি ও নাট্যকার দ্বারা। তিনি বইয়ের নামকরণ থেকে বাক্য ও বাক্যাংশগঠন পর্যন্ত সর্বত্র গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছেন মাঘ, ভট্টি ও কালিদাসের দ্বারা।

ছেলেবেলা থেকে মধুসূদনের গভীর আগ্রহ ছিল রামায়ণ-মহাভারতের রসে অবগাহন করার। পরবর্তী জীবনে বিদেশী প্রাচীন ও নবীন সাহিত্যের বিচিত্রমধুর রস পান করেও তিনি ভারতীয় মহাকাব্য-কাহিনীর স্বাদ ভুলতে পারেন নি। মহাকাব্য দু'টির দুই কেন্দ্রীয় ট্র্যাজিক চরিত্র, সীতা ও দুর্যোধন, মধুসূদনের কবিকল্পনায় দীর্ঘতর ছায়া ফেলেছিল। তাঁর নিজের জীবনের ব্যর্থতা সম্ভবত এই দু'টি ট্র্যাজিক চরিত্রের প্রতি তাঁকে কখনও উদাসীন থাকতে দেয়নি। সীতার সম্বন্ধে চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে তিনি তো স্বীকারই করেছেন, 'অনুক্ষণ মনে মোর পড়ে তব কথা, বৈদেহী!'

উনিশ শতকের সূত্রপাত থেকে বাংলার সমাজ-সংস্কারকেরা নারী-মুক্তি সম্পর্কে যেভাবে চিন্তা করেছেন, আন্দোলন করেছেন, রামমোহনের সতীদাহ প্রথা রদ ও বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ ও বহু-বিবাহ বিষয়ক আন্দোলন ও নারীশিক্ষার প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন প্রভৃতি ঘটনা আমাদের মনে পড়িয়ে দেয় নারীদের অসহায়তার প্রতি ওঁরা কতটা সংবেদনশীল ছিলেন। মধুসূদনও ব্যক্তিগত জীবনের আলোকে মেয়েদের সামাজিক অবস্থানের প্রতি দৃকপাত না করে পারেন নি। তাই আমরা লক্ষ্য করি, হৃদয়পাশে বন্দিনী হয়ে যে-নারী অদৃষ্টের নির্যাতন সইছে, সেই নারীই মধুসূদনের কাব্য ও নাটকেব নায়িকা। নাটকগুলোতে শর্মিষ্ঠা দেবযানী পদ্মাবতী কৃষ্ণকুমারী ও বিলাসবতী, 'তিলোত্তমা সম্ভবে' আপন রূপমুগ্ধ তিলোত্তমা, 'মেঘনাদ বধে' সীতা-প্রমীলা, 'ব্রজাঙ্গনা'য় রাধা এবং 'বীরাঙ্গনা'য় সব ক'টি নায়িকা অদৃষ্টের ফাঁসে অথবা প্রেমের পাশে বন্দিনী। এঁদের মধ্যে দু'জন নারী সবার উপবে প্রাধান্য লাভ করেছেন—ভাগ্যবঞ্চিতা সীতা আর বল্লভবঞ্চিতা রাধা।

'ব্রজাঙ্গনা' ও 'বীরাঙ্গনা'-এই দুই অঙ্গনা-কাব্যে দুই ভিন্ন জাতীয় ও ভিন্ন দেশীয় নারী হৃদয়বৃত্তির প্রকাশ। ব্রজাঙ্গনায় বাংলা সাহিত্যের চিরকালেব একমাত্র বিরহিনীব একতান, বীরাঙ্গনায় সংস্কৃত সাহিত্যেব দূরকালের বিদেশিনীর ছায়াবহ মনস্বিনীদের নানা অনুরাগ।

রামাযণের কাহিনীর প্রতি কবির আবাল্য অনুরাগমিশ্রিত কৌতূহল ছিল। তবে কৃত্তিবাসের কাব্যের ভালোমানুষ বৈষ্ণবপ্রকৃতির রামচন্দ্রকে মধুসূদন কখনও পছন্দ করেন নি। তাঁকে উত্তেজিত করত মেঘনাদের হত্যার ঘটনা। তাঁর কিশোর মনেব সবটুকু সমবেদনা রাক্ষসকুল অধিকার কবেছিল।

পরবর্তীকালে তিনি বাল্মীকির মূল রচনা পড়ে রাক্ষসদের বীরোচিত প্রাণবান মহিমা অনুভব করেছিলেন। তখন তাঁর অনুভবে রাবণের বীরপুত্র মেঘনাদ 'was a fine fellow' বাবণ নিজে 'a grand fellow' এবং রাবণের প্রবল ব্যক্তিত্ব সঙ্গত কারণেই তাঁর কবি-কল্পনাকে উত্তেজিত করেছিল। 'I hate Ram, and his rabble' মধুসূদনের এই উক্তিতে অনেকেই মনে করেন যে রামের উপর মধুসূদনের অকারণ বিদ্বেষ ছিল। তাই তিনি রামকে কাব্যের নায়ক তো করেন-ই নি, উপরন্তু রামচরিত্রের অবনয়ন করেছেন এ ধারণা অত্যন্ত ভ্রান্ত।

বাল্মীকির মতো মধুসূদনও রামকে মানুষ বলেই গ্রহণ করেছেন, অবতার বলে নয়। একথা অবশ্য সত্যি, লঙ্কায় যুদ্ধরত রামকে মধুসূদন উপেক্ষা করেছেন শুধু নয়, অবজ্ঞা করেছেন এবং তিনি রামকে যেটুকু সমীহ করেছেন তা-ও যেন বন্দিনী সীতার মুখ চেয়ে। কিন্তু এটা বাল্মিকীর মহাকাব্যে বর্ণিত রাম চরিত্রের দৌর্বল্যের জন্য নয়, এ কেবল রামের বানর-বাহিনীর দরুণ। পশু-সেনার হাতে দেবজিৎ রাক্ষস বাহিনীর পরাজয় ঘটানো মধুসূদনের ভালো লাগে নি। মধুসূদন যে লিখেছেন 'I despise Ram and his rabble' তার আসল মানে হচ্ছে, ড. সুকুমার সেনের মতো আমরাও মনে করি—'I despise Ram because of his rabble'.

মধুসূদনের জীবদ্দশায় তাঁর কবিতার মর্মগ্রাহী এদেশে বিশেষ ছিল না। সেকালের সাহিত্য-ব্যবসায়ীরা প্রধানত ছিলেন সংস্কৃতভক্ত পণ্ডিত, মধুসূদনেব ব্যঙ্গোক্তির সূত্র ধরে বলা যেতে পারে 'barren rascals',

যাঁদের চিন্তায় ও রুচিতে কোনো মৌলিকতা ছিল না। অন্যদল ছিল ইংরেজিনবীশ, যাঁদের সম্বন্ধে মধুসূদন লিখেছেন, 'The poor devils don't know Bengali enough to understand what they read!' এঁরা কিন্তু নবীন কবিতার প্রতি উদাসীন ছিলেন না, কেননা নবীন কবিতার মধ্যে ইংরেজি কবিতার প্রতিধ্বনি বিরল ছিল না। মধুসূদন প্রধানত এঁদের সমর্থন পেয়েছিলেন। প্রাচীনপন্থীদের দৃষ্টি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল একটু দেরিতে। তাঁরা অমিত্রাক্ষর ছন্দের শক্তি ও মাধুর্য সহজে ধরতে পারেন নি। সাধারণ পাঠকদের মধ্যেও মধুসূদনের কাব্যের অনুরাগী ছিল, প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে 'মেঘনাদ-বধ' বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য হয়েছিল এবং এইসব সম্ভাব্য কারণে প্রাচীন ছাঁদের কবিতার বাজার দর ত্বরিৎ-গতিতে নেমে গিয়েছিল।

মধুসূদন বাংলায় নতুন কবিতার স্রষ্টা কিন্তু তাঁর রচনার সঙ্গে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' ছাড়া বাংলা কবিতার পূর্বাপর ধারাবাহিকতা নেই। তাঁর রচনা রসের দিক থেকে একেবারে স্বতন্ত্র এবং রূপের অর্থাৎ আঙ্গিকের দিক থেকে, সনেটের নির্মাণ রীতিতে এবং ছন্দে সেটা সফল। মধুসূদনের প্রতিভার পরিচয় যেটুকু সাহিত্যে প্রকাশ পেয়েছে তার তুলনায় সম্ভাবনা ছিল অনেক বেশি। ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি শুধু নয়, ইউরোপীয় সাহিত্যের চিরায়ত কবি-লেখকদের প্রতি তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধাসত্ত্বেও মধুসূদন মূলত ভারতীয় তথা বাঙালী। বাংলার নাট্যসমাজের অধোগতি দেখে ব্যথিত হয়ে তিনি কলম ধরেছিলেন, বাংলা কাব্যের বিরক্তিকর আঙ্গিক তাঁকে দিয়ে সৃষ্টি করিয়ে নিয়েছিল অমিত্রাক্ষর ছন্দের অননুসরনীয় প্রবর্তনা, তাঁর সাহেবী কায়দায় কোট-প্যাণ্টলুন পরিহিত দেহের অভ্যন্তরে সাহিত্যরসপিপাসু হৃদয়টিকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত রেখেছিলেন বাল্মীকি, বেদব্যাস ও কালিদাস এবং দূরপ্রবাসে অবস্থানকালে এই কবির স্মৃতি ও সত্তা আপ্লুত করে রেখেছিল তার দেশের মা, মাটি ও মানুষ। মাত্র ঊনপঞ্চাশ বছরে প্রয়াত এই কবি ইউরোপ প্রবাসকালে প্রয়াণের মাত্র আট বছর আগে লিখেছিলেন 'বঙ্গভাষা' কবিতাটি যেখানে মাতৃভাষার প্রতি তাঁর অপ্রমেয় শ্রদ্ধা অভিব্যক্ত হয়েছে।

রেল শ্রমিক ধর্মঘট

বিদ্যাসাগর ও মধুসূদনের কর্মধারাকে কেন্দ্র করে আমরা সমকালীন দেশের অবস্থা কিছুটা চি... নিলাম। এইবার আমরা তৎকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনের ঢেউয়ে প্লাবিত এদেশের জীবনযাত্রাকে বুঝে নেওয়ার মূল স্রোতে আবার ফিরে আসি।

কাজের নির্দিষ্ট পরিমাণ সময়-সীমা বেঁধে দেবার দাবিতে আঠারো শো ছিয়াশি সালের পয়লা মে শিকাগো শহরের হে মার্কেটে শাসকদের সঙ্গে শ্রমিকদের যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছিল, শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের গৌরবময় ইতিহাসে ওই দিনটি তাই 'মে দিবস' হিসাবে স্বীকৃত হয়ে পালিত হয়ে আসছে বিশ্ব জুড়ে। কিন্তু, তারও চব্বিশ বছর আগে আঠারো শো বাষট্টি সালে হাওড়া স্টেশনে বারো শো রেলওয়ে শ্রমিকের আট ঘণ্টা রোজের দাবিতে যে ঐতিহাসিক ধর্মঘট হয়েছিল, সমকালীন 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় তার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।

'প্রথম আন্তর্জাতিক' ও কলকাতা

আঠারো শো একাত্তর খৃস্টাব্দে কলকাতা শহর থেকে এক অজ্ঞাতনামা অধিবাসী এই শহরে 'প্রথম আন্তর্জাতিক'-এর শাখা গঠনের অনুমতি চেয়ে যে চিঠি লেখেন, ওই বছরের পনেরোই আগস্ট তা বিবেচিত হয় 'আন্তর্জাতিক'-এর সাধারণ সংসদের এক সভায়।

আলোচনার শেষে সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কলকাতার পত্রলেখককে যে উত্তর পাঠানো হয় তার অংশ বিশেষ ঃ 'সম্পাদককে নির্দেশ দেওয়া হল যে শাখা খোলার পরামর্শ দিয়ে লিখতে, তবে তাঁকে বলা হল লেখককে জানাতে যে ওই শাখাকে স্বনির্ভর হতে হবে। সমিতিতে স্থানীয় অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত

করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিতেও তাকে বলা হল।' (প্রথম আন্তর্জাতিকের সাধারণ সংসদের ১৫ আগস্ট, ১৮৭১ তারিখের সভার কার্যবিবরণী থেকে)।

কুকা বিদ্রোহ

সিপাহী বিদ্রোহের পরেই কুকা বিদ্রোহের প্রস্তুতিপর্ব শুরু হয়ে যায় এবং নয় বছর ধরে এই বিদ্রোহ চলার পর শেষ ছ'বছর চলে এই বিদ্রোহের চূড়ান্ত পর্ব। গুরু রাম সিং-এর ধর্মীয় শিক্ষায় ('নামধারী' শিখ সম্পর্কিত) দীক্ষিত কুকা আন্দোলনে আত্মশক্তিতে বিশ্বাস, বিদেশী সরকারের সঙ্গে অসহযোগ, সরকারী যন্ত্রের বিকল্প ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং সশস্ত্র বিদ্রোহ—সব রকমই দেখা যায়, এমন কি শত্রুর শত্রুকে মিত্রজ্ঞান করে জারতন্ত্রী রাশিয়ার কাছ থেকে অর্থ ও অস্ত্র সাহায্যলাভের চেষ্টাও।

কুকা বিদ্রোহের নেতা গুরু রাম সিং রুশ সাহায্য প্রার্থনা করে গুরুচরণ সিংহকে তাসখন্দে পাঠান।

এই বিদ্রোহকে নৃশংসভাবে দমন করার জন্য ইংরেজ সরকার সব রকমের ঘৃণ্য আশ্রয় নিয়েছিল। তারা কুকা বিদ্রোহের অন্যতম দুই নেতা লোহনা সিং ও হীরা সিংকে তোপের মুখে উড়িয়ে দিয়েছিল। এজন্য তারা কোনো লজ্জা অনুভব তো করেইনি, বরং সদম্ভে ওই বর্বরোচিত হত্যাকে তারা 'মার্সি কিলিং' বলে আখ্যা দিয়েছিল। সমসাময়িক ভারত-পর্যটক রুশ শিল্পী ভেরেশ্চাগিনকে এই নৃশংসতা এত ব্যথিত করে যে তিনি ওই পাশবিকতার একটি ছবিও এঁকেছিলেন।

শহীদ শের আলি

শের আলি ছিলেন ওয়াহাবি পাঠান। আন্দামানে নির্বাসিত দীর্ঘমেয়াদী বন্দী। তাঁর বুকের মধ্যে সবসময়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলত। সমুদ্রবেষ্টিত নির্জন দ্বীপে বাস করে ইংরেজের বিরুদ্ধে একক প্রচেষ্টায় কিছু করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

কিন্তু তিনি নিতান্ত আকস্মিকভাবে প্রতিশোধ নেবার সুযোগ পেয়ে গেলেন। ভাবতেব বড়লাট লর্ড মেয়ো আন্দামান পরিদর্শনকালে আঠারো শো বাহাত্তর খৃস্টাব্দের আটই ফেব্রুয়ারী জোন্স টাউন জেটির কাছে শের আলির ছুরিকাঘাতে নিহত হলেন। শের আলি ধরা পড়লেন এবং তাঁকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হল।

অন্তিম বিবৃতিতে এই বিপ্লবী বীর বলেছিলেন, 'নিজের জীবন দিয়া যদি আর দশজনের অত্যাচাবের মাত্রা কিছু কমাইতে পারি, যদি তাহাদের সকলের দুঃসহ দুঃখের বোঝা সামান্যও হালকা করিতে পাবি, তবেই আমার এই মৃত্যুবরণ গৌরবের হইবে। এই কথা মনে করিয়াই আমি স্বেচ্ছায় এই কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। যাহা করিয়াছি তাহার জন্য আমি বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত নই। উপযুক্ত পাঠান সন্তানের মতো মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে পারিতেছি বলিয়া আপনাকে (নিজেকে) ভাগ্যবান মনে করিতেছি।'

পাবনা কৃষক বিদ্রোহ

মূলত দু'টি বিষয়কে কেন্দ্র করে পাবনা জেলায় কৃষক সমিতি গড়ে উঠেছিল। এই দুটি বিষয়ের মধ্যে একটি ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে প্রজাদের খাজনা বৃদ্ধির প্রতিবাদ । অন্যটি ছিল, রায়তি স্বত্বের নানা সমস্যার মোকাবিলা করা। আন্দোলন যখন ক্রমশ দানা বেঁধে উঠল, তখন এর প্রভাবে অন্যজেলাতেও রায়তদের মধ্যে অল্পবিস্তর আলোড়ন দেখা দিল। এজন্য আঠারো শো পঁচাশি খৃস্টাব্দে সরকার শেষ পর্যন্ত বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন বিধিবদ্ধ করতে বাধ্য হয়। প্রজারা সেদিন ঈশানচন্দ্র রায় নামে এক সাধারণ ভূ-স্বামীর নেতৃত্বে এক প্রবল আন্দোলন গড়ে কিছুটা দাবি আদায় করতে পেরেছিলেন। অবশ্য সেদিন তারা জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করতে পারেননি, জমিদারদের প্রজা উচ্ছেদের নিরঙ্কুশ অধিকার বন্ধ করতে পেরেছিলেন।

ভারতের প্রথম শ্রমিক-পত্রিকা

ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট সদস্য, বরাহনগর-অধিবাসী শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় আঠারো শো চুয়াত্তর খৃস্টাব্দের মে মাসে 'ভারত শ্রমজীবী' নামে একটি সচিত্র মাসিকপত্র প্রকাশ করতে শুরু করেন। এটিই ভারতের প্রথম শ্রমিক পত্রিকা। পত্রিকাটি প্রকাশনার চার বছর আগে তিনি বরানগরেই শ্রমজীবী সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয় শিবনাথ শাস্ত্রীর 'শ্রমজীবী' কবিতা।

মহাজন বিরোধী সংগ্রাম

মহাজনদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পুণায় ও আহমেদনগরে প্রজারা বিদ্রোহ করে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই হাঙ্গামাকারীদের লক্ষ্য ছিল মহাজনদের হাত থেকে দলিলপত্র ছিনিয়ে নিয়ে সেগুলোকে নষ্ট করে ফেলা। 'ডেকান রায়টস্ কমিশন রিপোর্ট' অনুযায়ী পুণায় ও আহমেদনগরে যথাক্রমে পাঁচশো ঊনষাট ও তিনশো বিরানব্বই জন গ্রেপ্তার বরণ করেন। ওই দুই এলাকায় দণ্ডিতের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে তিনশো এক ও দু'শো। ম্যাজিস্ট্রেটের সব থেকে অসুবিধে হয়েছিল হাঙ্গামাকারীদের বিরুদ্ধে নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য সংগ্রহের কাজে। আন্দোলনকারীদের প্রতি স্থানীয় জনসাধারণের দৃঢ় নৈতিক সমর্থন ছিল।

চৈত্রমেলা বা হিন্দুমেলা

শুধু ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত আন্দোলন নয়, মৌখিক প্রতিবাদ নয়, দেশের শিক্ষিত ও চিন্তাশীল মানুষেরা বুঝলেন, ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হলে গঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়ে দেশের লোককে সজাগ করে তুলতে হবে। নিছক ইংরেজ-বিরোধিতার পথে না গিয়ে নিজেদের দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা জাগিয়ে তুলতে হবে। এই উদ্দেশ্যকে রূপায়িত করতেই চৈত্রমেলা বা হিন্দুমেলার আবির্ভাব। সমসাময়িক কালে এবং তার পরেও বহু বছর ধরে চৈত্রমেলার মতো সাংগঠনিক দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায় নি।

ভারতের অতীত গৌরব, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সব কিছুর প্রভাব এদেশের জনজীবন থেকে মুছে ফেলে দিতে উদ্যোগী হয়েছিল ইংরেজি সভ্যতার প্রতি এক শ্রেণীর মানুষের প্রবল উৎসাহ। কিন্তু এই প্রবণতার বিরুদ্ধে প্রবলবেগে রুখে দাঁড়ালেন ঋষি রাজনারায়ণ বসু। তিনি বুঝেছিলেন, আমাদের জাতীয় সম্বিৎ জাগিয়ে তুলতে গেলে শুধু ব্যক্তিগত প্রয়াসের উপর নির্ভর না করে একটি বৃহৎ সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। জাতিকে যদি পরনির্ভরতা ও পরমুখাপেক্ষিতা থেকে বাঁচাতে হয় তাহলে জনসাধারণকে বোঝাতে হবে, ইংরেজ শাসনের মোহ ছেড়ে নিজেদের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য তাদের নিজস্ব কর্তব্য করে যেতে হবে।

মেদিনীপুরে অবস্থানকালে আঠাবো শো একষট্টি খৃস্টাব্দে তিনি জাতীয় গৌরব সম্পাদনী বা সঞ্চারিনী সভার পত্তন করেন। স্বাস্থ্য, ভাষা, সাহিত্য, বাক্য ও পত্রালাপ, সংগীত আলোচনা, বক্তৃতা, বেশভূষা, আদব কায়দা প্রভৃতি সকল ব্যাপারে ভারতীয় আচরণের গৌরব বৃদ্ধি করাই এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। বিদেশী নানা প্রভাব জাতিকে আত্মভোলা করে ছাড়ছে, এটিই ছিল রাজনারায়ণের দৃঢ় বিশ্বাস।

প্রসঙ্গত আমরা স্মরণ করতে পারি, সঞ্চারিনী সভার প্রতিষ্ঠা-বর্ষেই মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র আত্মপ্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম। অর্থাৎ দেশ-কালের মধ্যে আসন্ন পরিবর্তনের আভাস।

এই সঞ্চারিনী সভা পরিচালনার অভিজ্ঞতা থেকে তিনি মাত্র পাঁচ বছর পরে জাতীয় কর্মবিধি বা কর্মসূচী প্রণয়ন করেন। রাজনারায়ণের মতে যেসব কার্যক্রম রচনা করলে জাতির গৌরব প্রতিফলিত

হত এবং যে-সকল নতুন কার্যকলাপ দেশ-প্রীতির সঙ্গে জাতিকে উন্নতিব পথে নিয়ে যেতে পারে, তিনি সে সকল বিষয়কে চর্চা করাব ব্যাপারে অগ্রাধিকার দিলেন। তাঁর জাতীয় গৌরব সঞ্চারিনী সভার পক্ষে আচরিত কর্মতালিকার সঙ্গে নানাবিধ ব্যায়াম, কুস্তি, ঘোড়ায় চড়া, লাঠি খেলা, নৌকা চালানো জিমনাষ্টিক প্রভৃতি প্রচলন করে কর্মক্ষেত্র বিস্তারের পরামর্শ দেন।

এ ছাড়া, ওই বছরেই রাজনারায়ণ শিক্ষিত বাঙালীর জাতীয়ভাব পরিবর্ধনকল্পী সমিতি গঠনে অংশ গ্রহণ করেন। এ প্রতিষ্ঠানের সভ্যদের সবরকমে, এমন কি, কথ্যভাষার মধ্যেও বাঙালিত্ব বজায় রাখবার নীতি গৃহীত হয়।

এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় নবগোপাল মিত্র চৈত্রমেলা বা হিন্দুমেলার প্রবর্তন করেন। মেলার প্রথম অধিবেশন হয়েছিল আঠারো শো সাতষট্টি খৃস্টাব্দের বারোই এপ্রিল। শুরু থেকেই এই মেলার প্রতি উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর। শেষোক্ত জন হয়েছিলেন প্রথম অধিবেশনের সম্পাদক, আর তাঁর সহকারী হলেন নবগোপাল মিত্র।

মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনটি নানাকরণে স্মরণীয় হয়ে আছে। ওই অধিবেশনে গণেন্দ্রনাথ স্পষ্টভাষায় সব সদস্যকে বললেন, এটি খোস-গল্প করার জন্য একটি গতানুগতিক সাধারণ মিলনসভা নয়। এই সভাকে চিন্তা করতে হবে 'স্বদেশের জন্য, ভারতভূমির জন্য'—পরের শাসনে থেকে জীবন-ধারণ করা অত্যন্ত লজ্জাজনক হীন অবস্থা। আত্মনির্ভরতা লাভের জন্য জাতিকে কৃতসংকল্প হতে হবে। এই অধিবেশনে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুবের দেশানুরাগরঞ্জিত, ভারতের মহামহীয়ান অতীতের স্তব-গাথা, 'মিলে সবে ভারত-সন্তান' সংগীতটি সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হয়। বিভিন্ন অধিবেশনে স্বদেশী দ্রব্যের প্রদর্শনী, ব্যায়াম প্রতিযোগিতা, জিমনাস্টিক, দেশীয় ক্রীড়া, লাঠি চালনা, ঘোড়ায় চড়া, নৌকো-প্রতিযোগিতা, পাইকের খেলা, বাঁশবাজী প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হত। বিখ্যাত গায়ক, দক্ষ শিল্পী, শিকারী প্রভৃতিরা কৃতিত্বের জন্য পুরস্কৃত হতেন।

দ্বিতীয় অধিবেশনে মনোমোহন ঘোষ বলেছিলেন যে তাঁরা সেখানে 'ঐক্যনামা মহাবীজ ক্রয় করিতে আসিয়াছেন। সেই বীজ থেকে যে মনোহর বৃক্ষ উৎপন্ন হবে, তাতে 'জাতি-গৌরব-রূপ পত্রাবলী'র জন্ম সংঘটিত হবে এবং 'সৌভাগ্য পুষ্প বিকশিত' হবে। তা থেকে যে ফল প্রসূত হবে, 'অপর দেশের লোকেরা তাকে স্বাধীনতা নামে পবিচয় দেবে।'

এই গুরুত্বপূর্ণ মেলাটি প্রায় পনেরো বছর ধরে চলেছিল। কিন্তু পরে এটি বন্ধ হয়ে গেলেও নবগোপাল মিত্র ও তাঁর সঙ্গীরা জাতীয় ভাবের গঠনমূলক দিকটা জাগিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং তার ফলও হয়েছিল যথেষ্ট সুদূরপ্রসারী। এই সময় নবগোপাল 'ন্যাশন্যাল পেপার' নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনেব ইতিহাসের আদিপর্বে রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুব, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুব, মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতি মনীষীদের অবদান আমাদের জাতীয় জীবনকে অনেকটা এগিয়ে দিয়েছে।

আঠারো শো আশি খৃস্টাব্দ পর্যন্ত চোদ্দটি মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সমকালীন বাঙালীর সমাজ-মানসে এই মেলা এমনই প্রভাব বিস্তাব করেছিল যে মাৎসিনি গ্যারিবল্ডির জীবনীকার যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ 'হিন্দু মেলা'-র পরিবর্তে 'ভাবত মেলা'-ব নামকরণের প্রস্তাব করেছিলেন।

স্বাদেশিক-চেতনায় সমকালীন বাংলা সাহিত্যের অবদান

জাতীয় ভাবের রাজ্যে বিরাট বিপ্লবের সঙ্গে সাহিত্যের নতুন ধারার আবির্ভাব ঘটেছে। দেশীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে একদল গভীর মননশীল শক্তিমান লেখক বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গণে প্রায় সমসময়ে আবির্ভূত হয়ে বাঙালীর প্রাণে নবচেতনা সঞ্চার করেছিলেন। তাঁদের চিন্তাধারায় বাংলা সাহিত্য নব প্রেরণা পেয়ে নব কলেবর ধারণ করেছে।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯) ভালো গদ্য লিখতে না পারলেও তিনি স্কুল কলেজের ছাত্রদের নবীন পদ্য-রচনা প্রকাশ করার জন্য তাঁর পত্রিকা 'সংবাদ-প্রভাকর'-এর দরজা সর্বদাই উন্মুক্ত রেখেছিলেন। তা ছাড়া কবিতা রচনা করার ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সর্বদা প্রাণের টান অনুভব করতেন। এটা তাঁর নিতান্ত শখের ব্যাপার ছিল না। আধুনিককালে ভারতবর্ষে কবিতা-স্কুলের বা কবি-মণ্ডলীর প্রথম গোষ্ঠীপতি বলে ঈশ্বর গুপ্তের নাম স্মরণ করতে হবে। ঈশ্বর গুপ্ত যে কবি-গোষ্ঠী তৈরি করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন তাতে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ অধিকারী, দীনবন্ধু মিত্র ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়--এই চার মুখ্য শিষ্যের মধ্যে একমাত্র রঙ্গলাল-ই শেষ পর্যন্ত কবিতাকে ছাড়েন নি। দ্বারকানাথের অকাল মৃত্যু হয়। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে সিদ্ধিলাভ করেন, দীনবন্ধু স্মরণীয় হয়ে থাকলেন নাট্যকার হিসেবে। ঈশ্বরচন্দ্র 'সংবাদ-প্রভাকর'-এর সম্পাদক, প্রধান লেখক এবং প্রায়ই একমাত্র লেখক ছিলেন। উনিশ বছর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র যখন 'সংবাদ প্রভাকর'-কে কেন্দ্র করে বাংলা-সাহিত্যে আবির্ভূত হলেন তার কিছুদিন পরেই একটি যুগান্তকারী ঘটনা ঘটল। সরকারী নির্দেশে আদালত কালেক্টরির কাজে সাধারণ বিষয়ব্যবহারে ফারসীর চলন বন্ধ হয়ে বাংলাভাষার ব্যবহার চালু হল। উচ্চ আদালতে ও রাজকার্যে অবশ্য ফাবসীর পরিবর্তে ইংরেজি কায়েম হল।

এই নির্দেশের ফলে বাংলা শেখা ও লেখার আগ্রহে বাঙালীদের মধ্যে একটা উৎসাহের প্লাবন বয়ে গেল। ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত জানতেন, ফার্সীভাষাতেও তাঁর কিছুটা জ্ঞান ছিল, বাংলাভাষা তো তাঁর সম্পূর্ণ করায়ত্ত। ইংরেজি তিনি এত কম জানতেন যা তাঁর সাহিত্যবোধ জাগাতে আনুকূল্য করেনি।

ঈশ্বর গুপ্তের সাহিত্য-সাধনায় আধুনিকতার প্রকাশ তাঁর ইতিহাস চেতনায় প্রতিবিম্বিত। অবোধ এবং অস্ফুট হলেও এটুকু সচেতনতা তাঁর আগে বাংলাসাহিত্যে আর কোনো লেখকের রচনায় ও প্রচেষ্টায় দেখা যায়নি। এই ইতিহাসচেতনাই তাঁকে রামপ্রসাদ-ভাবতচন্দ্র প্রভৃতি কবির এবং লালু-নন্দলাল প্রভৃতি কবিওয়ালার জীবনী ও রচনার সংগ্রহে প্রবৃত্ত করিয়েছিল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে গবেষণার প্রচেষ্টাও এই প্রথম। মাস-পয়লার 'সংবাদ-প্রভাকর'-এ তিনি পুরোনো কবি ও কবিওয়ালাদের যে পরিচয় ও রচনা উদ্ধার করে ছাপাতেন তা তাঁর সর্বাপেক্ষা সার্থক কাজ। রামপ্রসাদের 'কালীকীর্তন' তিনিই উদ্ধার করেছিলেন এবং ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান প্রায় সবটা তাঁরই সংগ্রহের ফল। ঈশ্বর গুপ্তের এই ইতিহাস চেতনার মূলে ছিল তাঁর অবিসংবাদিত দেশপ্রেম।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭--১৮৮৭) ইংরেজি কাহিনী-কাব্যের রোমান্স-রসের যোগান দিয়ে নবযুগের দিকে বাংলা সাহিত্যের মুখ ফেরালেন। তিনি ঐতিহাসিক পটভূমিকায় দেশপ্রেমকে কাব্যের বিষয়রূপে গ্রহণ করলেন। ইংরেজি শিক্ষিতের অবচেতনায় পরাধীনতার বেদনা যে অস্বস্তি জাগিয়েছিল তাতে কিঞ্চিৎ প্রলেপ যুগিয়েছিল টডের রাজস্থান কাহিনী। রাজপুত-বীরত্বের গল্পে বাঙালীর মন দেশগৌরববোধে আচ্ছন্ন হতে চেয়েছিল।

ইংবেজি-শিক্ষিত প্রথম বাঙালী কবি রঙ্গলাল তাই টডের ভাণ্ডার থেকে কাব্যের বিষয় নির্বাচন করলেন। শেকস্পীয়র, স্কট ও বায়রণের কবিতার ছায়া, রঙ্গলালের রচনায় কিছু কিছু আছে, তবে টমাস মূরের ছায়া গাঢ়তর। রঙ্গলালের লেখা সেদিন যাঁদের অন্তরের মৌন স্বীকৃতি লাভ করেছিল সেই নব-প্রবুদ্ধ ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালীর ভবিষ্যতের আশা তখনও তেমনি অস্ফুট ও সংশয়বিজড়িত ছিল। 'পদ্মিনী উপাখ্যান'-এ শিক্ষিত বাঙালী আপনার মনের কোনো কোনো ভাবনাকে কতকটা বাঙ্ময় দেখে আশ্বস্ত হল। অবশ্য, রঙ্গলালের রচনার কবিত্ব মূল্য খুব একটা বেশি নয়। কিন্তু তিনি 'নিশীথিনীর মৌন যবনিকা' অপসারণের প্রথম সংকেত ধ্বনিত করেছিলেন। তাই ইতিহাসে তাঁর বিশিষ্ট মূল্য আছে। কাব্যরঙ্গভূমিতে মধুসূদনের প্রবেশের আগে রঙ্গলাল অবশ্যই নান্দী-গায়কের সম্মান পেতে পারেন।

বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে রঙ্গলালের মূল্য শুধু নতুন কবিতার নান্দী-গায়ক রূপেই নয়, প্রথম সাহিত্য সমালোচক রূপেও তাঁর অগ্রগামী কৃতিত্ব স্মরণীয়। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের রসগ্রাহী ছিলেন। শুধু

বাঙালীর কাছে নয়, ওড়িয়া সাহিত্যকে ওড়িশার বাইরের সকলের কাছে পরিচয় করিয়ে দেবার প্রথম সাধু প্রচেষ্টা রঙ্গলালেরই।

স্বাদেশিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ কবি রঙ্গলালের ভাষা-নির্বিশেষে সাহিত্য-রসবোধের এবং বাঙলা সাহিত্যের প্রতি প্রবল অনুরাগের পরিচয় আছে। বীটন সোসাইটির পূর্ববর্তী অধিবেশনে হরচন্দ্র দত্ত ইংরেজি কবিতার সঙ্গে তুলনা করে বাংলা কবিতার নিন্দা করেছিলেন। তারই প্রতিবাদে রঙ্গলাল পাঠ করেছিলেন তাঁর লেখা 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' শীর্ষক অম্লমধুর রচনাটি। রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২—১৮৯১) 'বিবিধার্থসংগ্রহ গ্রন্থ' নামে যে সচিত্র ও স্বল্পমূল্য মাসিক পত্রটি প্রকাশ করেছিলেন, তাঁর সেই উদ্যোগে সহায়তা করেছিল ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি। পত্রিকাটির ছ'টি সংখ্যা সম্পাদনা করেছিলেন রাজেন্দ্রলাল, পরবর্তী পর্যায়ে সম্পাদনা করেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। এই পত্রিকাটিকে কেন্দ্র করেই রাজেন্দ্রলাল তাঁর বহুমুখী চিন্তাধারা প্রকাশের সুযোগ পান। যদিও তিনি লিখেছেন খুবই কম কিন্তু 'প্রাকৃত ভূগোল' থেকে 'ব্যাকরণ প্রবেশ' তাঁর বহুমুখী চিন্তাধারার পরিচায়ক। সমাজ-সংস্কারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনা যেমন ছিল তেমনি স্বাদেশিকতার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর 'শিবাজীর চরিত্র' গ্রন্থে। 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'র সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল, মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতাও বেরিয়েছিল। এমন কি, এই পত্রিকাটি বাল্যকালে পড়ে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃত উপকার পেয়েছিলেন। এই দিক থেকে বিচার করলেও আমাদের জাতীয় জীবনে এই পত্রিকাটির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২-১৯২৩) তাঁর সমকালে স্কুল-কলেজে লেখাপড়া শিখেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদালয় স্থাপিত হলে প্রথম এনট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়েছিলেন। তারপরে বিলেতে গিয়ে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রথম ভারতীয় হিসেবে এই মর্যাদা পেয়ে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় হিসেবে এই চাকরিতে যোগদান করেন। ব্যক্তিজীবনে তিনি অত্যন্ত বাস্তবমুখী ছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথও সমকালীন অনেক সমাজ-সংস্কারকের মতো স্ত্রী-স্বাধীনতার সমর্থক ছিলেন। 'আমার বাল্যকথা'য় তিনি লিখেছেন, 'আমি ছেলেবেলা থেকেই স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী।.. John Stuart Mill-এর subjection of Women গ্রন্থ আমার সাধের পাঠের পুস্তক ছিল; আর তাই পড়ে 'স্ত্রী-স্বাধীনতা' নামে এক pamphlet বের করেছিলুন।'

বিভিন্ন বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথের কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হলেও তাঁর 'কৃষ্ণকুমারীর ইতিহাস' বইটির একটি স্বতন্ত্র গুরুত্ব রয়েছে কারণ এই প্রবন্ধটি মাইকেল মধুসূদন দত্তকে তাঁর 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক রচনায় প্রেরণা দিয়েছিল। সেকালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দেশাত্মবোধক সংগীত 'মিলে সবে ভারত সন্তান' তাঁরই রচনা।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮ -১৯০৩) বঙ্কিমচন্দ্রের সমবয়সী এবং তরুণ কবি হিসেবে মাইকেল মধুসূদন দত্তের রচনার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র সটীক সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন। সমসাময়িক কবিদের মধ্যে তাঁর স্থান মধুসূদনের পরেই। প্রেসিডেন্সি কলেজের উজ্জ্বল ছাত্র হেমচন্দ্র ওকালতি পাশ করে কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করেছিলেন। হেমচন্দ্রের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'বীরবাহু কাব্য' নিছক বর্ণনাত্মক কাব্য হলেও এতে তিনি যে সক্রিয় দেশপ্রিয়তা মুখরিত করলেন তা অবিলম্বে প্রথমে চৈত্রমেলা-হিন্দুমেলায় ও পরে জাতীয় আন্দোলনে প্রতিধ্বনিত হল এবং প্রাণনাথ দত্ত, হরলাল রায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির নাট্যরচনায় বিশেষভাবে প্রতিমূর্ত হল।

'ভারতসঙ্গীত' হেমচন্দ্রের সবচেয়ে জনপ্রিয় কবিতা। এই কবিতাটির মাধ্যমে তিনি জাতীয় আন্দোলনের পরিপুষ্টি ঘটিয়েছিলেন। 'বীরবাহু কাব্যে' যে সুরের সূত্রপাত, 'ভারতসঙ্গীতে' তারই চূড়ান্ত পরিণতি। দেশ-প্রেমের এমন উচ্ছ্বাসপূর্ণ ও উত্তেজনাময় প্রকাশ খুব কম বাংলা কবিতায় আছে।

এই প্রসঙ্গে একথা মনে রাখতে হবে, 'ভারতসঙ্গীত' লিখে হেমচন্দ্র দেশের রাজশক্তির কাছে যে অপরাধ করেছিলেন, ছ'বছর পরে 'ভারতভিক্ষা' কবিতাটি লিখে তিনি যেন তার প্রায়শ্চিত্ত করলেন। আঠারো শো পঁচাত্তর খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় প্রিন্স অব ওয়েলসের আগমন উপলক্ষে দেশময় রাজভক্তির একটা প্রবাহ বহানো হয়। তখনকার দিনের লব্ধ প্রতিষ্ঠ এবং অখ্যাত কতিপয় কবি সেই উৎসবে সুরোচ্ছ্বাস তুলেছিলেন পুরস্কারলোভে অথবা কর্তব্যজ্ঞানে। হেমচন্দ্রের 'ভারতভিক্ষা'ও এই উপলক্ষে লেখা। তবু, বাংলা কাব্যে হেমচন্দ্রের বিশেষ দান হল স্বদেশপ্রেমের উত্তেজনাসঞ্চার। ভারতের স্বাধীনতা-হীনতা ও আনুষঙ্গিক দুরবস্থা কবির যৌবনে যে ক্ষোভের সঞ্চার করত, তার মধ্যে ভবিষ্যৎ আশার আশ্বাসও ছিল।

মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২) ঈশ্বরগুপ্তের অন্যতম শিষ্য ছিলেন। তিনি ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না। অতীতের গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলো স্মরণ করে তিনি প্রচুর পৌরাণিক নাটক লিখেছেন এবং তাঁর রচনা 'দিনের দিন সবে দীন' নামক দেশাত্মবোধক গানটি সমকালীন বাঙালী জনমানসে বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫) ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। নাট্যরচনায়, অভিনয়ে, অনুবাদ কর্মে, সংগীতে, ব্যবসায়ে এবং দেশহিতৈষিতায় তিনি অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন। বাংলায় তথা ভারতে আধুনিক সংস্কৃতির ইতিহাসে জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের প্রযত্ন অগ্রগণ্য। ব্যক্তিগত প্রতিভার প্রকাশ ছাড়াও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আনুকূল্য যে রবীন্দ্রনাথের সর্বাতিশায়ী প্রতিভাকে বিচিত্রভাবে বিকাশের সুযোগ দিয়েছিল, সেকথা স্মরণীয়।

প্রাচীনতার পক্ষপাতী আদি ব্রাহ্মসমাজ থেকে সরে গিয়ে নব্যপন্থী কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮—১৮৮৪) ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেছিলেন। স্ত্রী-স্বাধীনতা ও বর্ণভেদ অস্বীকার ইত্যাদি কোনো কোনো বিষয়ে এই নতুন ব্রাহ্মসমাজে কিছুটা উগ্রতা দেখা দিয়েছিল। খৃস্টান উপাসনারীতির অনুসরণও এই সমাজের এক নতুন রীতি হল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সমাজ-সংস্কারক মন এইসব উৎকেন্দ্রিকতায় ব্যথিত হল এবং তিনি 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' নামে একটি একাঙ্ক প্রহসন লিখলেন। স্ত্রী-স্বাধীনতা বিষয়ে ওঁর মত পরে পরিবর্তিত হয়েছিল। সেজন্য এই প্রহসনটি পরে আর মুদ্রিত হয়নি। এরপর তিনি রচনা করলেন 'পুরুবিক্রম নাটক'। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির উদ্যোগে হিন্দুমেলার মধ্য দিয়ে যে দেশানুরাগের উৎসাহ জাগছিল, সাহিত্যে তার মুখ্য অভিব্যক্তি হল এই নাটকে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই নাটকে অকৃত্রিম দেশানুরাগ-রস উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। লেখকের মধ্যম অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ রচিত 'মিলে সবে ভারত সন্তান' গানটিতে নাটকের মর্মকথাটি গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছে। নাটকে অপর যে দুটো স্বদেশী সংগীত আছে সেগুলো সেকালে খুব চালু হয়েছিল।

এই নাটকটি লেখার অল্পকাল পরেই জ্যোতিবিন্দ্রনাথ লিখলেন, 'সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটক'। এটিও দেশানুরাগাত্মক নাটক। এর অন্তর্গত 'জ্বল জ্বল চিতা, দ্বিগুণ দ্বিগুণ' রবীন্দ্রনাথ-রচিত। তৃতীয় মৌলিক রচনা 'অশ্রুমতী' নাটকেও দেশপ্রেমের পটভূমিকা রয়েছে। এখানেও রবীন্দ্রনাথেরও 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' থেকে সংকলিত হয়েছে 'গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে' গানটি। অতঃপর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ফরাসী ভাষা থেকে অনুবাদ করেছিলেন আটটি গ্রন্থ, সংস্কৃত থেকে সতেরোটি গ্রন্থ এবং ইংরেজি থেকে একটি নাটক এবং দুটি নিবন্ধ। তিনি মারাঠীভাষা শিখে তুকারাম ও 'ঝাঁসির রাণী' বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর কর্মবহুল জীবনের শেষ বড় কাজ মহারাষ্ট্রকেশরী বাল গঙ্গাধর তিলকের 'শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতারহস্যে'র অনুবাদ।

নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭—১৯০৯) হেমচন্দ্রের চেয়ে বয়সে ছোট হলেও সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে সমসাময়িক। তাঁর চব্বিশ বছর বয়সে লেখা 'অবকাশরঞ্জিনী'তে দেশের অতীত গৌরবের স্মৃতি কবিকে

যে ব্যথাতুর করে তুলেছে তা সহজেই অনুমেয়। ঐতিহাসিক গাথা-কাব্য 'পলাশির-যুদ্ধ' লিখে তিনি বাংলা সাহিত্যে তুমুল সাড়া জাগান। রঙ্গলাল-হেমচন্দ্রের রচনায় ভারতের স্বাধীনতাহীনতার ক্ষোভ মুসলমান শাসনের পটভূমিকায় জনান্তিকে অভিব্যক্ত হয়েছিল। আর পলাশির মাঠে ইংরেজের কাছে বাঙালীর স্বাধীনতার বিনাশ তখনকার শিক্ষিত যুবকদের মনে যে লজ্জা জাগাতে শুরু করেছিল বাংলা কাব্যে তার স্পষ্ট প্রকাশ হল নবীনচন্দ্রের 'পলাশির-যুদ্ধে'। অবশ্য নবীনচন্দ্র প্রত্যক্ষভাবে সিরাজউদ্দৌলাকে সমর্থন করেন নি। কেননা তখনও সিরাজের ইতিহাস একতরফাই জানা ছিল--ইংরেজ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে। আর, সরকারী চাকরির খাতিরে ক্লাইভের বিরুদ্ধে কিছু বলাও নবীনচন্দ্রের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অগত্যা মোহনলালকে কাব্যের নায়ক করে নবীনচন্দ্রকে রফা করতে হয়েছিল। রাজপুত ইতিবৃত্তের বকলম এড়িয়ে নবীনচন্দ্র তাঁর কাব্যে দেশের পরাধীনতার যে মর্মবেদনা ধ্বনিত করলেন তা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর বিশিষ্টতার পরিচায়ক। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র এবং আমাদের আলোচ্য অন্যান্য কবি ও নাট্যকারের সামগ্রিক সাহিত্যকর্ম আমরা বিশ্লেষণ না করে তাঁদের যেসব রচনায় মূলত স্বাদেশিকতা ও সমাজ সচেতনতার পরিচয় ফুটে উঠেছে, সেইসব রচনাকেই আমরা আমাদের আলোচনায় গুরুত্ব দিয়েছি। এই প্রসঙ্গে আমরা যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (১৮৪৫-১৯০৪)-এর 'ম্যাট্‌সিনি ও গ্যারিবল্ডীর জীবনবৃত্তান্ত ও গোবিন্দচন্দ্র রায় (১৮৩৮-১৯১৭)-এর 'ভারত বিলাপ' গ্রন্থ দু'টিকে স্মরণ করতে পারি কারণ সমসাময়িক সমাজে এ বই দুটি দেশপ্রেমের প্রাসঙ্গিকতায় যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল।

আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংবাদপত্র

সিপাহী-বিদ্রোহের পরে জাতীয় আন্দোলনের গতি ও শক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। একালে যোগসূত্র খুঁজতে গেলে পত্র-পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সর্বাগ্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই পত্রিকাগুলোর সূত্রপাত থেকে বোঝা যাবে দেশের ইতিহাস ভাবীকালে কোন্ পথ ধরে এগিয়ে যাবে।

আঠারো শো আটান্ন সালে 'সোমপ্রকাশ' আবির্ভূত হয়েছিল এবং সেই যুগে স্বাধীন মতবাদ প্রচারে ওই পত্রিকাটির ভূমিকা ছিল অতুলনীয়। ভার্নাকুলার প্রেস এ্যাক্ট পাশ হওয়ায় আত্মসম্মান-সম্পন্ন সম্পাদক অন্তত সাময়িকভাবে এই পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

'সোমপ্রকাশ'-এর আবির্ভাবের ঠিক তিন বছর পরে যেসব জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলো প্রকাশিত হতে শুরু করে তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল 'ইণ্ডিয়ান মিরর'। প্রধান উদ্যোক্তা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যুগ্ম সম্পাদনায় ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মনোমোহন ঘোষ। পরে অবশ্য কেশবচন্দ্র কিছুদিন পত্রিকার ভার গ্রহণ করেছিলেন।

এর পরের বছর প্রকাশিত হল ইংরেজি সাপ্তাহিক 'বেঙ্গলী'। সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ। সতেরো বছর পরে এই পত্রিকাটিকে সুরেন্দ্রনাথ দৈনিকে পরিণত করেন এবং সেই সময় থেকে বঙ্গভঙ্গ ও সুরাট কংগ্রেসের বিরোধ পর্যন্ত এই পত্রিকাটির সম্পাদকীয় স্তম্ভ জনমতের প্রধান বাহক ছিল। উনিশ শো ছয় খৃস্টাব্দে অনুষ্ঠিত বরিশাল কনফারেন্স নিয়ে এ-পত্রিকায় যে-সকল উগ্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তার তুলনা দুর্লভ।

'বেঙ্গলী' পত্রিকা প্রকাশের ছ'বছর পরে যশোহর থেকে শিশিরকুমার ঘোষ সপ্তাহে দু'সংখ্যায় বাংলা ভাষায় প্রকাশ শুরু করেন 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র। পরবর্তী বছর থেকে পত্রিকাটি ইংরেজি ও বাংলা দ্বিভাষিকে পরিণত হয় এবং তার দু'বছর পর থেকে এটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। বাংলা সংবাদপত্রের উপর সরকারী নিষেধাজ্ঞা জারী হলে এটি রাতারাতি ইংরেজি পত্রিকায় পরিণত হয় এবং আঠারো শো একানব্বই খৃস্টাব্দ থেকে পত্রিকাটি দৈনিকে রূপান্তরিত হয়। প্রগতিবাদী পত্রিকা হিসেবে বরাবরই এটি সুনাম রক্ষা করে চলেছে। মতিলাল ঘোষের সম্পাদনাকালে এবং 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় অগ্নিবর্ষী প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার আগে পর্যন্ত লোকে 'অমৃত বাজার পত্রিকা'-কে 'বেঙ্গলী'র চেয়ে বেশি সমাদর

করত। পরে 'বেঙ্গলী'র সুর একটু নরম হয়ে পড়ে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মতিলাল ঘোষের মধ্যে মতবিরোধ নিয়ে 'অমৃত বাজার পত্রিকা' কেবল 'বেঙ্গলী' পত্রিকা নয়, সুরেন্দ্রনাথকেও ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছে এবং সুধী পাঠক তা পড়ে মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর মাসিকপত্র 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ করেন আঠারো শো বাহাত্তর খৃস্টাব্দে। যদিও সাহিত্যই এর মুখ্য বিষয়বস্তু কিন্তু জাতীয় জাগরণ ও ভারতের সর্বাঙ্গীন উন্নতি প্রচেষ্টায় এই পত্রিকাটি একটি বিশাল ভূমিকা পালন করেছে। পত্রিকায় প্রকাশিত অর্থনীতি সংক্রান্ত রচনাগুলো শুধু পরাধীন দেশের উন্নয়নের পক্ষেই প্রয়োজনীয় ছিল না, আজকের সামাজিক উন্নয়নেও তা প্রাসঙ্গিক। এই পত্রিকাটি প্রকাশের পাঁচ বছর পরে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় মাসিক 'ভারতী' আত্মপ্রকাশ করে। জাতীয় জাগরণের নানা রকমের সংবাদ, মন্তব্য এবং জাতির সমস্যাবলী এই পত্রিকায় আলোচিত হয়েছে এবং পরে 'বিলাতি ঘুষি বনাম দেশী কিল' মন্ত্র যুবকগণের মনে ঔদ্ধত্যের 'দাওয়াই' বাৎলে মনের দিক থেকে অবসাদের স্থলে সাহস উৎপাদন করেছে।

এক বছর পরে প্রকাশিত হয় 'আর্য্যদর্শন' পত্রিকা। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ-সম্পাদিত এই পত্রিকাটি স্বল্পকাল স্থায়ী হলেও যুবকদের মনে নতুন পথের সন্ধান বহন করে এনেছিল। ইউরোপের পরাধীন দেশগুলোর নেতাদের জীবনদর্শন, কর্মপদ্ধতি, ত্যাগ ও শৌর্যের কাহিনী প্রচার করে বাঙালী পাঠককে চমকিত করে দেয়। ওই লেখাগুলো পড়ে মনে হয়েছিল, চেষ্টা করে ভাবতবাসীও নির্দিষ্ট পথে চললে ওই পরম পদ লাভ করতে পারে; দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানুষের কাছে অসাধ্য অলভ্য কোনো বস্তুই নেই। এই পত্রিকায় প্রচারিত রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মতবাদ দেশের চিরাচরিত প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করেছিল।

এই পত্রিকাটি প্রকাশের পাঁচ বছর পরে কৃষ্ণকুমার মিত্র, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন দেশপ্রেমিক মিলে সাপ্তাহিক 'সঞ্জীবনী' প্রকাশ করে সাধারণেব মনে নতুন শক্তি যোজনা করেন। এই গুরুত্বপূর্ণ পত্র-পত্রিকাগুলো ছাড়াও ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার আগে এদেশে নিম্নলিখিত পত্র-পত্রিকাগুলো প্রকাশিত হয়, আমাদের জাতীয় জীবনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে যেগুলো প্রভাব বিস্তার করেছিল ঃ

এক. মুখার্জ্জির্স্ ম্যাগাজিন। পরিচালক শম্ভুনাথ মুখার্জ্জি। মূলত রাজনৈতিক পত্রিকা।
দুই. পরিদর্শক। সম্পাদক মদনমোহন তর্কালঙ্কার। প্রথম প্রকাশ ১৮৬১।
তিন. বামাবোধিনী পত্রিকা। সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্ত। প্রথম প্রকাশ ১৮৬৩।
চার. ন্যাশন্যাল পেপার। সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সহযোগী নবগোপাল মিত্র। প্রথম প্রকাশ ১৮৬৫।
পাঁচ. অবলা বান্ধব। সম্পাদক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ঢাকা থেকে প্রথম প্রকাশ ১৮৬৯।
ছয়. সুলভ সমাচার। সম্পাদক কেশবচন্দ্র সেন। সাপ্তাহিক পত্রিকাটিব প্রথম প্রকাশ ১৮৭০।
সাত. বঙ্গবন্ধু। সম্পাদক বঙ্গচন্দ্র রায়। ঢাকা থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক পত্রিকা।
আট. সাধারণী। অতি উচ্চশ্রেণীর মাসিক পত্রিকা চুঁচুড়া থেকে প্রকাশিত। প্রথম প্রকাশ ১৮৭৩।
নয়. সমালোচক। সম্পাদক শিবনাথ শাস্ত্রী। সাপ্তাহিক পত্রিকা।
দশ. তত্ত্বকৌমুদী। সম্পাদক শিবনাথ শাস্ত্রী। পাক্ষিক পত্রিকা।
এগারো. পরিচারিকা। সম্পাদক প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।
বারো. ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন। সম্পাদক কালীনাথ দত্ত।
তেরো. পঞ্চানন্দ। সম্পাদক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
চোদ্দ. দিবাকর। সম্পাদক দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। বীরভূম থেকে প্রথম প্রকাশ ১৮৭৮।
পনেরো. পরিদর্শক। সম্পাদক বিপিনচন্দ্র পাল। শ্রীহট্ট থেকে এই সাপ্তাহিকের প্রথম প্রকাশ ১৮৮০।
ষোলো. বঙ্গবাসী। প্রথম সম্পাদক জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, পরে যোগেন্দ্রনাথ বসু। সাপ্তাহিক এই পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ ১৮৮১।

রাজনীতি, ভূমি-ব্যবস্থা, সাহিত্য, সমাজ প্রভৃতি ব্যাপারের আলোচনার জন্য শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'রইস এ্যাণ্ড রায়ট' নামে একটি ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৮৮২ সালে।

এর এক বছর পরে প্রকাশিত হয় 'ইণ্ডিয়ান নেশন'। পত্রিকাটির সম্পাদক এল. এন. ঘোষ ছিলেন ইংরেজের সঙ্গে ভারতের সম্প্রীতির সমর্থক। ফলে, তিনি সমকালীন রাজনৈতিক উত্তালতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে পারেন নি। বরাবরই 'মডারেট' নীতির প্রচারক ছিল এই পত্রিকা। অবশ্য এতে ভারতীয় সমস্যার কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হত।

এই বছরেই জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস কর্তৃক 'সময়' এবং দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী কর্তৃক 'নব্যভারত' প্রকাশিত হয়।

প্রার্থনা সমাজ ও আর্যসমাজ

আঠারো শো সাতষট্টি সালে রানাডে, তেলাং ও ভাণ্ডারকার কলকাতার ব্রাহ্মসমাজের আদলে প্রার্থনা সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন বোম্বাইয়ে। শিক্ষাপ্রসারের উদ্দেশ্যে মাদ্রাজে পাচাইয়াপ্পা তাঁর বিশাল সম্পত্তি নিয়োগ করেন। কিছুটা ব্রাহ্ম সমাজের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শ্রীধারালু নাইডু স্থাপন করেন 'বেদ সমাজ'। সুন্দরম পিল্লাই প্রমুখ তামিল লেখকদের সাহিত্যে কিছুটা সাম্যচিন্তা দেখা যায় এবং কেরলে শ্রীনারায়ণ গুরু 'মানুষের এক জাতি, এক ধর্ম ও এক ঈশ্বর' মন্ত্রে নবচেতনার সূচনা করেন এজাভা, তিয়ারা প্রভৃতি সমাজের অনুন্নত অংশের মধ্যে। আর অন্ধ্রপ্রদেশে বীরেশলিঙ্গম তাঁর বহুমুখী কর্ম ও রচনায় প্রবল সংগ্রাম চালান সব রকম সামাজিক অন্যায় অবিচারের বিপক্ষে।

আঠারো শো পঁচাত্তর খৃস্টাব্দের পাঞ্জাবে দয়ানন্দ সরস্বতী-প্রতিষ্ঠিত 'আর্য সমাজ'-এর এবং স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ প্রতিষ্ঠিত আলিগড় এ. এম. ও. কলেজের ভূমিকা যথাক্রমে হিন্দু সমাজে জাতিভেদ বিরোধের ক্ষেত্রে এবং মুসলমান সমাজে শিক্ষাবিস্তারের কাজে উল্লেখযোগ্য। দেওবন্দের 'দারুল উলুম' ইসলামী শাস্ত্রচর্চার প্রতিষ্ঠান হলেও ছাত্রদের বৃটিশবিরোধী মুক্তি-আন্দোলনে অনুপ্রাণিত করে।

অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা

'আর্য সমাজ' প্রতিষ্ঠার ঠিক এক বছর পরে শিবনাথ শাস্ত্রী, বিপিনচন্দ্র পাল, ডাঃ সুন্দরীমোহন দাশ, কালীশঙ্কর সুকুল, গগনচন্দ্র হোম প্রমুখ তরুণ অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হন। এই মন্ত্রের সাতটি প্রতিজ্ঞার মধ্যে একটি এইরকম ঃ

'স্বায়ত্ত শাসন-ই আমরা একরকম বিধাতৃ-নির্দিষ্ট শাসন বলিয়া স্বীকার করি। তবে দেশের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলের মুখ চাহিয়া আমরা বর্তমান গভর্নমেন্টের আইন-কানুন মানিয়া চলিব, কিন্তু দুঃখ, দারিদ্য, দুর্দশার দ্বারা নিপীড়িত হইলেও কখনও এই গভর্ণমেন্টের অধীন দাসত্ব স্বীকার করিব না।'

সঞ্জীবনী সভা ('হাম্‌চু পামূহাফ্‌')

সঞ্জীবনী সভার প্রতিষ্ঠা আনুমানিক আঠারো শো ছিয়াত্তর সাল নাগাদ। ওই সভার সমস্ত অনুষ্ঠান রহস্যে আবৃত ছিল, তার কার্যবিববণী রাখা হত সাংকেতিক ভাষায়। ওই সাংকেতিক ভাষায় 'সঞ্জীবনী সভার নাম--'হাম্‌চু পামূহ্রাফ্‌'।

এই সভা-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'জ্যোতিদাদা এক গুপ্ত সভা স্থাপন করেছেন। একটি পোড়ো বাড়িতে তার অধিবেশন, ঋগ্‌বেদের পুঁথি, মড়ার মাথার খুলি আর খোলা তলোয়ার নিয়ে তার অনুষ্ঠান, রাজনারায়ণ বসু তাঁর পুরোহিত, সেখানে আমরা ভারত উদ্ধারের দীক্ষা পেলাম।'

বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসু রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বয়সে পঁয়ত্রিশ বছর বড় ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন বারো বছরের বড়। কিন্তু এই সংস্থার সদস্য হবার ক্ষেত্রে বয়স কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। ওঁরা সকলেই এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিলেন।

আরও কয়েকটি গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠান

আঠারো শো পচাঁত্তর খৃস্টাব্দে শিশিরকুমার ঘোষ কয়েকজন সহযোগীকে নিয়ে ইণ্ডিয়া লীগ গড়ে তোলেন। ওঁদের চেষ্টায় অনেক জেলায় রায়ত সভা গড়ে ওঠে এবং জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বেশ বড় বড় প্রজা-সভার আয়োজন করা হয়। আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী প্রমুখ নেতা, ওই সব কার্যক্রমে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

কলকাতায় 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন' স্থাপিত হওয়ার পরের বছরেই ফার্দুনজি নওরোজির উদ্যোগে বোম্বাইতে 'বম্বে এ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ছিলেন স্কুলের শিক্ষক এবং তাঁর ছাত্র ছিলেন স্বয়ং দাদাভাই নওরোজি। ওই ছাত্রদের নিয়ে তিনি ওই বছরেই বাংলার 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর মতো বোম্বাইতে গড়েছিলেন 'ইয়ং বম্বে' গোষ্ঠী। আবার ওই বছরেই মাদ্রাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'মাদ্রাজ নেটিভ এ্যাসোসিয়েশন।' এই সংস্থার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন গজালু লক্ষ্মীনারায়ণ বাসু চেট্টি। ওই সব প্রতিষ্ঠান ভারতীয়দের অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের জন্য দরখাস্ত পাঠাত কর্তৃপক্ষের কাছে।

দাদাভাই নৌরজী

আঠারো শো সত্তর খৃস্টাব্দে মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে, বিষ্ণুশাস্ত্রী চিপলুঙ্কর, আঘারকার, গোখলে প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা পুনে শহরে একটি 'সার্বজনিক সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। ওই সভার মুখপত্র হিসেবেই 'কেশরী' পত্রিকার আবির্ভাব ঘটে। এর ছাব্বিশ বছর পরে 'চরমপন্থী' বাল গঙ্গাধর তিলক 'নরমপন্থী' গোখলের জায়গায় 'সার্বজনিক সভা'র সম্পাদক হন এবং 'কেশরী'র সম্পাদনা ও পরিচালনার ভার হাতে আসে তিলকের।

কলকাতার 'ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন'-এর অনুসরণে পাঞ্জাবে শ্রীশচন্দ্র বসু কয়েকজন সহযোগীকে নিয়ে ভাবতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মাত্র দু'বছর আগে গড়ে তোলেন 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল সোসাইটি'। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় সংকলিত 'জাতীয় সংগীত' পাঠে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি ওই বছরেই 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল সঙ্গস্ এ্যাণ্ড লিরিকস্' নামে একটি ইংরেজি সংকলন প্রকাশ করেন।

বাসুদেও বলবন্ত ফাড়্কে

মহারাষ্ট্রের চিৎপাবন ব্রাহ্মণ ও জমিদার বংশের সন্তান বাসুদেও বলবন্ত ফাড়্কে কিছুটা ইংরেজি স্কুলে পড়ার পর মিলিটারি ফিনান্স ডিপার্টমেন্টে চাকরি করতেন। তিনি বিবাহিত ও এক কন্যার পিতা ছিলেন। তবু এসব সত্ত্বেও মাত্র একত্রিশ বছর বয়সে তিনি রামোশিস, কোল, ভীল, ধাঙড় প্রভৃতি উপজাতির প্রায় তিনশো তরুণকে সুসংগঠিত করেন। এমন কি, ধর্মের গণ্ডী ভেঙে উদারমনা ফাড়্কে মুসলমান রোহিল্লা তরুণদেরও তাঁর দলে সামিল করেন। ফাড়্কের নেতৃত্বে এই বাহিনী প্রথমে অত্যাচারী সাহুকার বা মহাজন ও পরে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালান।

ফাড়্কে এক বছর পরেই গ্রেপ্তার হলেন। তাঁকে এদেশে প্রথম রাজদ্রোহের মামলার আসামী হিসেবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হল এবং সুদুর এডেন জেলে পাঠানো হল। সেই জেলের নির্জন

সেলে তাঁর উপর নির্মম অত্যাচার চালায় সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর জল্লাদেরা। প্রতিবাদে তিনি অনশন করতে থাকেন। অনশনরত অবস্থাতেও এই স্বাধীনতা-সংগ্রামী অমানুষিক বর্বরতার হাত থেকে রেহাই পাননি। শেষ পর্যন্ত মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সেই তাঁর মৃত্যু হয় সেখানে। আদালতের সামনে তিনি তাঁর পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করতে গিয়ে বলেছিলেন : 'আমি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ আগে থেকেই লোক পাঠিয়ে বিদ্রোহ ঘটাতাম। দেশের নানা স্থানে ওই রকম যুগপৎ অভ্যুত্থানে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠত ইউরোপীয়রা। ডাক বন্ধ হয়ে যেত, রেলপথ ও টেলিগ্রাফের তারকাটা হত, বন্ধ হত যাতায়াতের যানবাহন ব্যবস্থা। খুলে যেত জেলের দরজা। আমাদের বাহিনীর শক্তির খবর কেউ জানতে পারত না, জানতে পারত না কোথায় আমাদের অবস্থান। ..... ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশদের তাড়িয়ে আমাদের এক স্বাধীন ভারতীয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য সার্থক হত পূর্ণভাবে। হে আমার দেশবাসী! তোমরা মার্জনা কোরো আমার ব্যর্থতা।'

ইলবার্ট বিল

আঠারো শো ছিয়াত্তর খৃস্টাব্দে ইংরেজ সরকার 'নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন' পাশ করে এদেশে নাট্য-আন্দোলনে এক চরম আঘাত হানেন। ক্রমবর্ধমান সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জনমতকে রুখতে দু'বছর পরেই শাসকেরা আরও দুটো দমনমূলক আইন প্রবর্তন করলেন--'ভারতীয় অস্ত্র আইন' এবং 'দেশীয় সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইন।' এর প্রতিবাদে শিক্ষিত সমাজ গর্জে উঠল। বিশেষত শেষোক্ত আইনের প্রতিবাদে 'সোমপ্রকাশ', 'সহচর', 'নব বিভাকর' ও 'সাধারণী' পত্রিকার কর্তৃপক্ষ তাঁদের পত্রিকাগুলো বন্ধ করে দেন আর 'অমৃতবাজার পত্রিকা' রাতারাতি ইংরেজি পত্রিকায় পরিণত হয়। এই বছরের সতেরোই এপ্রিল তারিখে 'ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন'-এর 'উদ্যোগে কলকাতার টাউন হলে এই নিপীড়নের প্রতিবাদে যে সভা অনুষ্ঠিত হয়, তাতে যোগ দিয়েছিলেন পাঁচ হাজার প্রতিবাদী মানুষ।

এই ঘটনার মাত্র পাঁচ বছর পরে সপরিষদ গভর্নর জেনারেলের আইন সচিব কোর্টনে ইলবার্ট একটি নতুন ধরনের প্রস্তাব আনলেন। এই প্রস্তাব কার্যকর হলে দেশের বিচার ব্যবস্থায় একটি বৈপ্লবিক সংস্কার সাধিত হবে। এতদিন চালু ছিল, ব্রিটিশ বিচারকেরাই ব্রিটিশ অপরাধীদের বিচারের একমাত্র অধিকারী, কোনো ভারতীয় নয়। এই বর্ণবৈষম্যমূলক আইনের জায়গায় ইলবার্ট ভারতীয় বিচারকদেরও সেই অধিকার দানের প্রস্তাব করলেন।

ইলবার্টের এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু করল এদেশের ইংরেজ ও এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সমাজ। চা-কর ও নীলকর সাহেবরা যে এই আন্দোলনের অগ্রণী ছিল এবং তাদের আন্দোলন যে খুবই অসংযত ও ভারত-বিদ্বেষী, তা বলাই বাহুল্য। 'ইংলিশম্যান' পত্রিকা সেদিন ওদের ওই আন্দোলনের মুখপত্র ছিল। আর, এই ধরনের অনাচারের বিরুদ্ধে ইলবার্ট বিলের সমর্থনে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন 'ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন', 'সঞ্জীবনী', 'বেঙ্গলী' ও 'অমৃতবাজার পত্রিকা'। বিডন স্কোয়ারে এক বিশাল সভার আয়োজন করেছিলেন ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন। ইংরেজ ও অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পক্ষের ব্যারিস্টার ব্রানসন, কেশুয়িক মিলার প্রমুখের অসংযত ভাষণের বিপক্ষে তীব্র শ্লেষভারে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন--'গেল রাজ্য, গেল মান/ডাকিল, ইংলিশম্যান,/ডাক ছাড়ে ব্রান্‌সন্, কেশুয়িক মিলার,/নেটিবের কাছে খাড়া/নেভার-নেভার।'

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার বেশ কয়েক দশক আগে থাকতেই দেশ জুড়ে যে রাজনৈতিক প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা শুরু হয়েছিল এবং সেই অস্থিরতার আবর্তে ভারতীয় সমাজ কীভাবে আন্দোলিত হচ্ছিল, বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংবাদপত্র, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সংস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা

সেই পরিস্থিতি তুলে ধরার চেষ্টা করছি। এবার আমরা আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির চিন্তা ও চেতনার আলোক সমকালীন সমাজ-মানসকে বুঝে নিতে চেষ্টা করব যাঁদের জীবনের পরিধি ও কর্মের বিস্তার প্রায় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়কালকে ছুঁয়ে গেছে।

রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) এবং বিহারীলাল গুপ্তের (১৮৪৯-১৯১৬) সঙ্গে আই. সি. এস. পরীক্ষা দেবার জন্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একসঙ্গে মাত্র একুশ বছর বয়সে বিলেতের উদ্দেশে রওনা হন। সুরেন্দ্রনাথের পরীক্ষায় বসার বয়স নিয়ে ঝামেলা হল। ফল বেরোলে দেখা গেল, তাঁর বয়স পরীক্ষার নির্দিষ্ট সীমা থেকে সামান্য কিছু বেশি। এর প্রতিবাদে সুরেন্দ্রনাথকে মামলা করতে হল। তিনি এই মামলায় জয়লাভ করে চাকরিতে নিযুক্ত হলেন।

এই ঘটনার সংবাদ এদেশে পৌঁছলে শিক্ষিত মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে ভারতের এক যুবক যে অসমসাহসিকতার পরিচয় দিয়ে নিজের অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছে সেই সংবাদে গোটা দেশ গর্বিত হয়।

এর পরের অধ্যায় ভারতীয় রাজনীতিতে বিপর্যয় ঘটাবার মাহেন্দ্রক্ষণ। সুরেন্দ্রনাথের চাকরি নিয়ে গোলমাল বাধল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। নিত্য-নৈমিত্তিক সই করার জন্য পেশকার যে মামুলি কাগজপত্র দাখিল করে এবং হাকিম হিসেবে কেবল দস্তখত করতে হয়, তারই একটা সূত্র ধরে চাকরি থেকে সুরেন্দ্রনাথকে বরখাস্ত করা হল।

বিলেত থেকে সুরেন্দ্রনাথ ফিরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ভারতীয় রাজনীতির আবর্তে। গোটা দেশ যেন এই রকম একজন নেতার জন্য এতদিন অধীরভাবে অপেক্ষা করছিল। ব্যক্তিজীবনে তখন তাঁর চলছিল এক ঘোর সংকটকাল। চাকরি গেছে, বিলেত প্রবাস-কালে যথেষ্ট অর্থব্যয় হয়েছে, পিতৃবিয়োগ হয়েছে, তিনি অকূল-পাথারে পড়লেন। সমস্ত পরিবারের প্রতিপালনের ভার তিনি কীভাবে পালন করবেন।

তখন তাঁর সংকটমোচনের দায়িত্ব নিয়ে এগিযে এলেন সংকটত্রাতা বিদ্যাসাগর। তিনি সুরেন্দ্রনাথকে মেট্রোপলিটন কলেজের এক অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করলেন। অধ্যাপক হিসেবে সুরেন্দ্রনাথ অচিরে জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। তাঁর শিক্ষাদান প্রণালী, উদাত্ত বাচনভঙ্গি এবং দেশ-বিদেশের স্বাধীনতার কাহিনী বিবৃত করায় তাঁর ছাত্রমহলে তিনি অত্যন্ত সমাদৃত ও সম্মানিত অধ্যাপক হিসেবে পরিগণিত হলেন।

কলেজের গণ্ডীর মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ নিজেকে বন্দী করে রাখলেন না। বাইরের রাজনৈতিক সভায় তিনি জনসাধারণের সামনে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করতেন। এজন্য অনতিকালের মধ্যেই তিনি অতুলনীয় বাগ্মী ও দেশপ্রেমিক বলে যশস্বী হয়ে উঠলেন। ওঁর সমকালে একমাত্র কেশবচন্দ্র সেন ছাড়া আর কেউ এতটা জনপ্রিয়তা পাননি। বক্তা হিসেবে অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী রামগোপাল ঘোষ জনপ্রিয়তায় সুরেন্দ্রনাথের সমকক্ষ হলেও তিনি তখন প্রয়াত, লালমোহন ঘোষ তখনও আসরে পূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হন নি। রাজনীতিক্ষেত্রে, বিশেষত ইংরেজ শাসনের দোষত্রুটি এবং কূট অভিসন্ধি দেশবাসীর সামনে তুলে ধরায় সুরেন্দ্রনাথ প্রতিদ্বন্দ্বিবিহীন দেশনায়ক বলে সমাদর অর্জন করলেন— দেশ বিদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সেনাপতিদের পরিচয় দিয়ে যুবমন উদ্বেল করে তুলেছিলেন।

সমগ্র ভারতে ঐক্যসূত্র স্থাপন করতে শিবাজীর স্বপ্ন সুরেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় ফুটে উঠেছিল। তাঁর আগে আর কেউ এই ঐক্যচিন্তা কার্যে পরিণত করার জন্য এই পথ অবলম্বন করেন নি।

লর্ড সল্সবেরী ভারত-সচিব হয়ে এদেশে এলেন আঠারো শো চুয়াত্তর খৃস্টাব্দে. যে-বছর সুরেন্দ্রনাথ কর্মচ্যুত হয়ে বিলেত থেকে ফিরে আসেন। মাত্র দু'বছর বাদে সল্স্বেরী একটি কূটনৈতিক চাল চাললেন। ভারতীয়দের আই. সি. এস. পরীক্ষা থেকে বাদ দেবার জন্য পরীক্ষার্থীদের উচ্চতম বয়স একুশ থেকে নামিয়ে উনিশ করলেন, অর্থাৎ ভারতীয় বিদ্যা-অর্জন করে কঠিন আই. সি. এস. পরীক্ষার জন্য উনিশ বছর বয়সের মধ্যে বিলেতে পৌঁছে পরীক্ষার হল-এ স্থান গ্রহণ করতে হবে। এই অন্যায় সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সর্বভারতীয় জনমত গড়ে তোলার জন্য সুরেন্দ্রনাথ পরের বছরে সারা উত্তর ভারতের বড়-বড় শহরে বক্তৃতা দিলেন এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপন করলেন।

তার পরের বছর তিনি গেলেন সমগ্র দক্ষিণভারত পরিক্রমায়। এর ফলে, উত্তর এবং দক্ষিণ ভারত থেকে একবাক্যে দাবি উঠেছিল সরকারী প্রস্তাবের বিরুদ্ধে।

ভারতের রাজনৈতিক স্বার্থে আলোচিত বিষয়বস্তু তাঁর হৃদয়গ্রাহী প্রাঞ্জল ভাষায় উচ্চারিত হয়ে শ্রোতাকে যেন বন্যার স্রোতের মুখে তৃণের মতো ভাসিয়ে নিয়ে যেত। অচিরকালের মধ্যে তিনি ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ বাগ্মী বলে পরিগণিত হলেন। তাঁকে সমঝদার লোকে গ্রীসের অসাধারণ বাগ্মী ডিমস্থিনিসের সঙ্গে তুলনা করত। উত্তর ও দক্ষিণভারত পরিভ্রমণের ফলে তাঁর নাম ভারতের শিক্ষিত, এমন কি শহরের আবহাওয়া থেকে দূরে অবস্থিত অশিক্ষিতদের মধ্যেও সসম্ভ্রমে উচ্চারিত হত।

সুরেন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তায় ইংরেজ সরকার সর্বদা সন্ত্রস্ত ছিল এবং সুযোগ পেলেই ওঁকে শাস্তি দেবার অপেক্ষায় ছিল। কাছারিতে শালগ্রামশিলা নিয়ে হাজির করার হুকুমের বিরুদ্ধে 'বেঙ্গলী'তে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হলেই সরকারের হাতে এই সুযোগ এসে গেল। হাইকোর্ট অবমাননার দায়ে সরকার ওঁকে দু'মাস কারাগারে বন্দী করলেন।

এই ঘটনায় দেশের শিক্ষিত জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। চারিদিকে অসংখ্য সভা-সমিতি সংগঠিত হতে থাকল, বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল ছাত্ররাও এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করল। সুরেন্দ্রনাথের মুক্তির দিন তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছাত্রদলের নেতৃত্ব করেছিলেন, আর শত শত ছাত্রদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শিশিরকুমার ঘোষ (১৮৪০-১৯১১) সুরেন্দ্রনাথের আগে থেকেই পুঁথিপত্র, বক্তৃতা ও লেখনীর সাহায্যে ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সংবাদপত্র পরিচালনা, সংবাদপত্রে সরকারের নানাবিধ অত্যাচারের সংবাদ-পরিবেশন, নীল-উপদ্রব-সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণ, অত্যাচারিত দুর্বলের সমিতি স্থাপন, 'ইণ্ডিয়ান লীগ' সৃষ্টি প্রভৃতি ছিল তাঁর সফল কর্মসূচীর কয়েকটি নমুনা। ইংরেজ রাজকর্মচারীর অনাচার তিনি অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে নির্ভীকভাবে জনসাধারণের নজরে এনেছেন। ভক্তির পথে আত্মদর্শন ও আত্মনিবেদনে তিনি ছিলেন বৈষ্ণবপ্রধান। এইসব কারণে তিনি বাংলার রাজনীতি ও সমাজনীতিতে একটি বিশেষ স্থান গ্রহণ করেছেন।
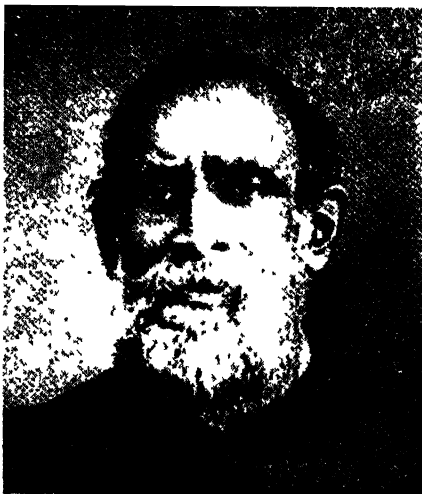
মতিলাল ঘোষ (১৮৪৭-১৯২২) অন্তরঙ্গ সহকর্মী হিসেবে পেয়েছিলেন তদানীন্তন ভারতের তিনজন মহান দেশনেতা, বালগঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপৎ রাই ও বিপিনচন্দ্র পালকে। বাংলায় উগ্রমতাবলম্বী রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ভূমিকা ছিল তাঁর। অখিল ভারতীয় কংগ্রেস, প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্স, হোমরুল লীগ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের তিনি ছিলেন কেন্দ্রীভূত শক্তি।

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (১৮৪৫-১৯০৪) সাময়িকপত্র পরিচালনায় নির্ভীক আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, অটল দেশপ্রেম এবং যোগ্যতা অর্জন করতে না পারলে স্বাধীনতা লাভ করলেও তাকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। জাতীয় ঐক্যের উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন এবং বলতেন, সে-অবস্থা সৃষ্টি করতে না পারলে স্বাধীনতালাভের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে।

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৪-১৯০৬) এবং রাসবিহারী ঘোষ (১৮৪৫-১৯২১) রাজনীতির

বঙ্গমঞ্চে দুই বিশিষ্ট নেতা। দু'জনেই প্রখ্যাত আইনবিদ। ভাবতেব জাতীয কংগ্রেসেব প্রথম সভাপতি হলেন উমেশচন্দ্র। বাসবিহাবীব কর্মক্ষেত্র বহুবিস্তৃত। জাতীয শিক্ষা, কংগ্রেসেব দ্বন্দ্ব, উদ্ধত লর্ড কার্জনেব বক্তৃতাব সমুচিত প্রত্যুত্তব প্রভৃতিব ব্যাপাবে বাসবিহাবী ভাবতীয বাজনীতিতে স্মবণীয় হয়ে আছেন। তিনি উনিশ শো সাত ও আট খৃস্টাব্দে পবপব দু'বছব কংগ্রেসেব সভাপতি পদে নির্বাচিত হযেছিলেন। দেশেব শিল্পোন্নযনে, শিক্ষাব বিভিন্ন ক্ষেত্র বিস্তাবে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বক্ষায তিনি ছিলেন অতন্দ্র প্রহবী। সিভিল বাইট্‌স্ কমিটি পবিচালনা তাঁব আব একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ। দেশেব সর্বাঙ্গীন কল্যাণে তিনি অকাতবে অর্থ দান কবতেন।

বমেশচন্দ্র দত্ত

কল্পনাতীত দানে বাসবিহাবী সঙ্গী হিসেবে পেযেছিলেন হাইকোর্টেব অন্যতম ব্যবহাবজীবী তাবকচন্দ্র পালিতকে (১৮৩১-১৯১৪)। বিভিন্ন সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানে পবম নিষ্ঠায অজস্র অর্থব্যয কবতেন স্যাব নীলবতন সবকাব (১৮৬১-১৯৪৩)।

ব্যাবিস্টাব আনন্দমোহন বসু (১৮৪৭-১৯০৬) ছিলেন বাসবিহাবীব সঙ্গী। দেশে ও বিদেশে প্রসাবিত ছিল তাঁব বিদ্যাব খ্যাতি, জাতীয আন্দোলনেব ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন এক মহান যোদ্ধা। ধর্মপ্রাণ, ধীব, পূতচবিত্র, দৃঢচিত্ত, স্বভাবে ও আচবণে বিনযেব প্রতীক হলেন আনন্দমোহন। 'ভাবত সভা' স্থাপনে অন্যতম প্রধান ভূমিকা ছিল তাঁব। তিনি ছিলেন বযকট বা বিদেশী পণ্যবর্জন যজ্ঞেব হোতা। স্বদেশী আন্দোলনেব স্তম্ভরূপে বাঙালীব অন্তবে তিনি দেবতাব আসন পেযেছিলেন। মুমূর্ষু অবস্থায চেযাব-বাহিত হযে তিনি মিলন-মন্দিবেব ভিত্তিপ্রস্তব স্থাপন কবতে গিযেছিলেন। এই সভাতেই সর্বপ্রথম ভাবতেব জাতীয পতাকা উত্তোলিত হযেছিল। স্বল্পকালেব মধ্যেই তিনি লোকান্তবিত হন।

জন্মসাল ধবে বিচাব কবতে হলে এঁবা হলেন সুবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাযেব অগ্রগামী দল। অনেককেই সমবযস্ক বলাও চলে। বাজনীতিক্ষেত্রে সকলেই সহকর্মী এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে জডিযে ছিলেন। তবে সুবেন্দ্রনাথেব দীপ্তিব পাশে এঁদেব জ্যোতি কিছুটা ম্লান হযে পডেছিল।

বমেশচন্দ্র দত্ত ও সুবেন্দ্রনাথ জন্মেছেন একই সালে। কঠোব পবিশ্রমে লিপ্ত থাকাকালে ববোদায বমেশচন্দ্রেব মৃত্যু হয বাষট্টি বছব বযসে। সবকাবী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থেকে স্বাধীনচেতা বমেশচন্দ্র যা দেখিযে গেছেন, তাব তুলনা বিবল। অর্থনীতি, ইতিহাস, পুবাবৃত্ত, উপন্যাস, অনুবাদ, প্রবন্ধ প্রভৃতি সবই তাঁব স্পর্শ পেযে সজীব হযে উঠেছিল। লর্ড কার্জনেব মতো ধুবন্ধবেব সঙ্গে ভাবতে দুর্ভিক্ষেব কাবণ নিযে সম্মুখ-সমবে অবতীর্ণ হতে পিছিযে আসেন নি তিনি। তিনিই বলেছিলেন, শাসনেব রূপ পবিবর্তন আব অবাধ শোষণ বন্ধ না হলে সশস্ত্র বিপ্লব ঠেকিযে বাখা যাবে না।

সবকাবী পদস্থ কর্মচাবী হযেও দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায আব বমেশচন্দ্র দত্ত সবকাবী ব্যবস্থাব যে নগ্নরূপ প্রকাশ কবে দেশবাসীব সামনে তুলে ধবেন, তাতে তাঁদেব দেশপ্রেম ও সৎসাহস প্রকট হযে উঠেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৬-১৮৯৪)

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলায আধুনিক উপন্যাসেব অর্থাৎ নভেলেব পত্তন কবেছিলেন। তিনি ছোট স

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায

সর্বসমেত পনেবোখানি উপন্যাস-উপন্যাসিকা প্রকাশ কবেছিলেন। প্রথম বইটি ইংবেজিতে লেখা, নাম 'বাজমোহন'স ওয়াইফ।'।

বঙ্কিমচন্দ্রের ঔপন্যাসিক হিসেবে শিল্পসিদ্ধি কতটা ঘটেছিল, তা আমাদের বিচার্য বিষয়, নয়। আমরা উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের এই পুরোধা পুরুষের শিল্পভাবনা কতটা সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রভাবিত হয়েছিল শুধুমাত্র সেটুকুই বিচার করব।

বিধবা-বিবাহ প্রচলন বঙ্কিমচন্দ্রের একেবারেই মনঃপূত ছিল না। তিনি সমগ্র ব্যাপারটিকে দেখে ছিলেন পুরুষের তরফ থেকে। বালবিধবার তরফ থেকে তিনি বিচার করেন নি। আসল কথা, প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধতার জন্য ততটা নয় যতটা বিদ্যাসাগরের প্রতি প্রতিকূল মনোভাব তাঁর এই ভাবনার জন্য বিশেষভাবে দায়ী। যেমন, 'রাজসিংহ' উপন্যাসের মূল কাহিনীতে বহুবিবাহের সমর্থন আছে। বিদ্যাসাগরের বহু-বিবাহের প্রচণ্ড বিপক্ষতা সর্বজনবিদিত। আমরা ধরে নিতে পারি, 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাস দু'টিতে বিধবাবিবাহ এবং 'রাজসিংহ' উপন্যাসে বহু বিবাহের প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র।
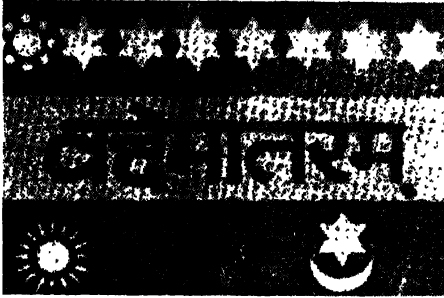
যদিও 'আনন্দমঠ' উপন্যাসটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মাত্র তিন বছর আগে কিন্তু উপন্যাসটির আখ্যানভাগের সূত্র আঠারো শতকের শেষ পর্বে পরিকল্পিত। তখন নবাবী ও কোম্পানীর শাসনদ্বন্দ্বে, উত্তরবঙ্গে বিশেষভাবে অরাজকতা চলছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসটির আইডিয়া পেয়েছিলেন তাঁর মধ্যমাগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের উপন্যাস 'কণ্ঠমালা'য় 'মহাকুলীন'-উপাধিধারী 'শুভানুধ্যায়ী সম্প্রদায়'-এর কাছ থেকে।

উপন্যাস হিসেবে 'আনন্দমঠ'-এর দোষগুণ যেমনই হোক, সাধারণ পাঠকের কাছে বইটি অত্যন্ত সমাদর লাভ করেছিল। 'কর্মণ্যে ব্যধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'—গীতার এই মহৎ বাণীকে আশ্রয় করে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-কল্পনা অপরূপ রূপকথার সৃষ্টি করে বাঙালীকে স্বাধীনতা লাভের জন্য উদগ্রীব করে তুলেছিল। স্বামী বিবেকানন্দের রামকৃষ্ণ মিশন ও বেলুড়-মঠ পরিকল্পনায় 'আনন্দমঠ' বিশেষ প্রেরণা দিয়েছিল। অপরদিকে ইংরেজ শাসনের উৎখাতকামী অনুশীলন-সমিতিকে গুপ্তহত্যাকাণ্ডেও রসদ যুগিয়েছিল। 'বন্দেমাতরম্' গানটি প্রথমে বাংলায় ও পরে ভারতবর্ষে প্রথম জাতীয় সংগীতরূপে পরিগৃহীত হয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবৎকালে তাঁর উপন্যাসগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সমাদৃত হয়েছিল 'দেবী-চৌধুরাণী'। এই উপন্যাসটির প্রকাশকাল 'আনন্দমঠ'-এর ঠিক দু'বছর পরে এবং কাহিনী-পরিকল্পনার বিচারে এই উপন্যাসটি 'আনন্দমঠ'এর উত্তরকাণ্ডের মতো। উভয় উপন্যাসেই দেশ ও কাল প্রায় অভিন্ন। 'আনন্দমঠ'-এর ঘটনা হেস্টিংস-এর আমলের প্রথম দিকের আর 'দেবী-চৌধুরাণী'র ঘটনা শেষের দিকের। 'আনন্দমঠ'-এর পরিণামে ব্যর্থতা, দেবী-চৌধুরাণী'ব পরিণামে সার্থকতা। 'আনন্দমঠ-এর সঙ্গে 'দেবী চৌধুরাণী'র পার্থক্য প্রধানত এই যে প্রথম উপন্যাসে দেশোদ্ধারে লেগেছিল সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা, দ্বিতীয় উপন্যাসে ব্যক্তিগত উদ্দীপনা।

আঠারো শো ছিয়াত্তর খৃস্টাব্দে চুঁচুড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বন্দেমাতরম্' গানটি রচনা করেন আর ছ'বছর পরে তিনি ওই গান সন্নিবিষ্ট করেন তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে। তারও চোদ্দ বছর পরে ওই গানটি কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ নিজে সুর দিয়ে গেয়েছিলেন। আজ জাতীয়তার ভাবোদ্দীপক ধ্বনি হিসেবে 'বন্দেমাতরম' সর্বজনপরিচিত। ওই ধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী মৃত্যু বা নির্যাতন বরণ করেছেন।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস

বাংলায় ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন এবং ওই সংগঠনের আদলে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও পাঞ্জাবে রাজনৈতিক সমিতি স্থাপিত হওয়ার পর ওই সমিতি ও সংস্থাগুলোর সুসমন্বয়ে একটি সর্বভারতীয় রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের আয়োজনের চেষ্টা শুরু হয়। তারই ফলে আঠারো শো তিরাশি খৃস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় এ্যালবার্ট হলে প্রথম ন্যাশন্যাল কন্‌ফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। দু'বছর পরে আরো ব্যাপকভাবে যখন কলকাতাতেই ন্যাশন্যাল কন্‌ফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশনের আয়োজন চলছে, ঠিক সেই সময়েই বোম্বাই শহরে 'ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের' প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতিত্বে।

কাদম্বিনী

কংগ্রেসের জন্মলগ্নে এ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম ও উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণের মতো ইংরেজ রাজপুরুষের প্রত্যক্ষ ভূমিকা এবং একেবারে গোড়ায় ভারতের বড়লাট ডাফরিনের কিছুটা নেপথ্য সহায়তা আমাদের জাতীয় জীবনে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। তার পিছনে ছিল, অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হতে হতে যাতে বিস্ফোরণে না পরিণত হয় তার জন্য 'সেফ্‌টি ভাল্ব' হিসাবে কংগ্রেসকে ব্যবহার করা।

এর চার বছর পরে কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনে প্রথম ছ'জন নারী প্রতিনিধি যোগ দেন। এঁরা হলেন— **কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়, স্বর্ণকুমারী ঘোষাল,** পণ্ডিত রমাবাঈ, রমাবাঈ রাণাডে, বিদ্যাগৌরী নীলকণ্ঠ এবং শ্রীমতি নিকম্ব।

স্বর্ণকুমারীদেবী

কংগ্রেসের অধিবেশন ও আসাম চা-শ্রমিক

'কুলী' নামে পরিচিত, আড়কাঠি মারফৎ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দাসত্ব শর্তে সংগৃহীত আসাম চা-বাগিচার শ্রমিকদের দুরবস্থা ও তাঁদের উপর চা-করদের নির্মম অত্যাচারের সরেজমিন তদন্তের জন্য ব্রাহ্মসমাজের দুই বিশিষ্ট সদস্য, রামকুমার বিদ্যারত্ন ও দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী 'ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন'-এর পক্ষ থেকে আসামে যান ও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গোপনে বহু তথ্য সংগ্রহ করেন। ওই তথ্য কৃষ্ণকুমার মিত্র তাঁর সম্পাদিত 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশ করেন এবং প্রতিবেদন হিসেবে কিছু তথ্য গভর্নরের কাছেও পেশ করা হয়। দ্বারকানাথ বহু চেষ্টার পর কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনে আসাম চা-শ্রমিক প্রসঙ্গে প্রস্তাব তোলেন।

মণিপুরে বিদ্রোহ

মণিপুবেব বাজপবিবাবেব সন্তান টিকেন্দ্রজিৎ সিং এবং সেনাপতি থঙ্গল ইংবেজেব বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কবাব অপবাধে আঠাবো শো একানব্বই খৃস্টাব্দেব তেবোই আগস্ট যথাক্রমে বত্রিশ এবং পঁচাশি বছব বযসে ফাঁসীকাঠে মৃত্যুববণ কবেন।

সমকালীন ভারতীয় জীবনধারার কয়েকজন প্রখ্যাত রূপকার

জগদীশচন্দ্র বসু

আনন্দবাম ঢেকিযাল ফুকন (১৮২৯-৫৯) ছিলেন বিখ্যাত অসমীযা সাহিত্যিক ও সমাজ সংস্কাবব্রতী। এঁব আন্দোলনেব ফলেই স্কুল ও আদালতে অসমীযা ভাষাব প্রবর্তন হয়।

ফকিবমোহন সেনাপতি (১৮৪৩-১৯৩৮) আধুনিক ওডিযা সাহিত্য ও জাতীযতাবাদেব অন্যতম প্রধান পুরুষ। ওডিশাব সাধাবণ মানুষেব জীবনেব প্রতিফলন দেখা যায তাঁব গল্প ও উপন্যাসে। শোষিত ও নিপীডিত মানুষেব অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকাব হিসেবে তিনি দেশবাসীব কাছে ছিলেন একজন সম্মানিত শিল্পী।

ভাবতেন্দু হবিশচন্দ্র (১৮৫০-১৮৮৫) মাত্র পঁযত্রিশ বছব বযসে লোকান্তবিত হন কিন্তু ওই স্বল্পকালীন জীবনে তিনি আধুনিক হিন্দী ভাষাব জনকেব মর্যাদা পেযেছেন। নাট্যকাব ও সাংবাদিক হিসেবে সামাজিক শোযণ ও বৈষম্য ছিল তাঁব প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয।

গুবাজাদা আপ্পাবাও (১৮৬১-১৯১৬) কবিতা, নাটক, গল্প ও সমালোচনাব ক্ষেত্রে তেলুগু সাহিত্যে এক নতুন পথেব নিশানা বেখেছেন।

ভাই বীব সিং (১৮৭২ ১৯২৪) কে বলা হয আধুনিক পাঞ্জাবী সাহিত্যেব জনক।

কুমাবণ আসান (১৮৭৩ ১৯২৪) ভাই বীব সিং-এব সমসাময়িক এবং তাঁব মতোই ওঁব আযুষ্কাল দীর্ঘ নয। তিনি মালযালাম সাহিত্যেব বিশিষ্ট কবি এবং অনগ্রসব এঝাঙা সম্প্রদাযেব সংগঠক।

এঁবা ছাডাও ভাবতেব এমন তিন মহান বিজ্ঞানীকে স্মবণ কবতে হবে যাঁবা প্রত্যক্ষভাবে বাজনীতি সংশ্লিষ্ট না হযেও বিজ্ঞানেব ক্ষেত্রে ভাবতেব শিব উন্নত কবে তুলে ধবেছেন বিশ্বেব দববাবে। এই তিন বিজ্ঞানী হলেন পদার্থবিদ ও প্রাণী-বিজ্ঞানী **জগদীশচন্দ্র বসু** (১৮৪৮-
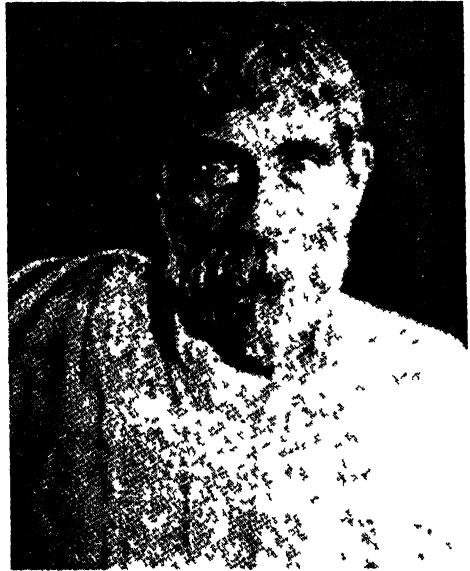
প্রফুল্লচন্দ্র বায

১৯৩৭), রসায়নবিদ **প্রফুল্লচন্দ্র রায়** (১৮৬১-১৯৪৪) এবং গণিতবিদ রামানুজম (১৮৮৭-১৯২০)। এঁদের মৌলিক গবেষণা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতের স্থানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)

ইংরেজ শাসনের নিষ্পেষণে সিপাহী-বিদ্রোহের আগুন সবে নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে, মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা অনুযায়ী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে প্রশাসনিক দায়িত্ব ইংরেজ সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, সাঁওতাল, সিপাহী ও নীল বিদ্রোহের চূড়ান্ত অস্থিরতার পর দেশে একটা আপাত-প্রশান্তির ছায়া নেমে এসেছে, তখন বাংলার সবচেয়ে সংস্কৃতিসম্পন্ন পরিবারে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পিতামহ ও পিতা ইতিমধ্যেই সমাজ ও রাষ্ট্রের নানাবিধ চিন্তায় দিশারীর ভূমিকা পালন করেছেন, অগ্রজেরা কৃতবিদ্য সংস্কৃতিসম্পন্ন এবং সমাজ সংস্কারক। পারিবারিক পরিবেশ উনিশ শতকের নবজাগরণের আন্দোলনে বিপুলভাবে আন্দোলিত। এই আবহাওয়ায় রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

সুদীর্ঘ আশি বছর ধরে এই বিশ্ববন্দিত শিল্পী যত না চিরায়ত শিল্পসৃষ্টি করেছেন, তার সঙ্গে সমান্তরালভাবে সামাজিক, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রনৈতিক সংস্কারে সচেষ্ট থেকেছেন। বস্তুতপক্ষে ভারতীয় রাজনীতির প্রতিটি পর্বে তাঁকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হয়েছে। তাই, ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে তিনি নিজেই একটি বিশাল অধ্যায়। বর্তমান পর্বে আমরা তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকার একটি সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্র আঁকলেও পরে স্বাধীনতার ইতিহাসে আমরা তাঁর বারংবার উপস্থিতি লক্ষ্য করব প্রাসঙ্গিকতার শর্ত পূরণ করতে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ থেকে ভারতের মুক্তি সম্পর্কে, রাজা রাজ্য ও রাজনীতি সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত পৃথক ও বিশিষ্ট চিন্তা তিনি অবিচ্ছিন্ন ধারায় পরিবেশন করেছেন। সমাজতন্ত্র বলতে কবি বুঝেছেন সমাজ-শাসন। তার কেন্দ্রে কোনো বৃহৎ পরাক্রান্ত শক্তির অলক্ষ্য অথচ সর্বব্যাপী প্রভাব কিছু ছিল কিনা তা তিনি বলেন নি। এ সমাজ রাজশক্তির প্রভাব-নিরপেক্ষভাবে সমৃদ্ধ হওয়া এক অস্তিত্ব। সমস্ত কিছু নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করে দেওয়ার কাজে সে যেন অছির মতো। তারই জোরে, প্রভাবে আমাদের আত্মরক্ষা, অগ্রগমনের অবিচ্ছিন্নতা। 'ভারতবর্ষীয় সমাজ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, অন্য দেশে 'নেশন' নানাবিধ রাষ্ট্রিক বিপ্লবের মধ্যে আত্মরক্ষা করে জয়লাভ করেছে। তার থেকেও অনেক বেশি সময় ধরে ভারতবর্ষীয় সমাজ সমস্ত রকম সংকটের মধ্যে আত্মরক্ষা করেছে। অধঃপাতের সর্বশেষ সীমায় ভারতবাসী যে তলিয়ে যায় নি, মনুষ্যত্ব এবং সাধুতা যে অদ্যাবধি আমাদের সম্বল তার প্রেরণা আমাদের এই পুরোনো সমাজের নিত্যসংক্রমিত শক্তি। আত্মসুখ তার সারার্থসার নয়, কল্যাণ পুণ্য এবং ধর্মের মন্ত্রই তার মহার্ঘ অবলম্বন।

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন দেশের কল্যাণশক্তি প্রকৃতপক্ষে সমাজের মধ্যেই ধর্মরূপে আমাদের সমাজের সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে আছে। এই ধর্মকে সমাজকে রক্ষা করাই ভারতবর্ষ আত্মবক্ষার প্রকৃত উপায় বলে জেনে এসেছে। রাজত্ব তার উদ্দিষ্ট গন্তব্য ছিল না, সমাজের দিকে তার দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধা। আর এই হেতুই সমাজের স্বাধীনতা ভারতবর্ষের যথার্থ স্বাধীনতা।

রবীন্দ্রনাথ অসামান্যভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, 'অনাত্মীয় মণ্ডলে' ইউরোপীয় সভ্যতার মশালটি 'আলো দেখাবার' জন্য নয়, 'আগুন লাগাবার জন্য'। সেই ভূমিকাই প্রত্যক্ষ করা গেছে যখন কামানেব গোলা আর আফিমের পিণ্ড যুগপৎ বর্ষিত হয়েছে হতভাগ্য চীনবাসীদের উপর।। এইভাবে সোনার লোভে ধ্বংস হয়েছে আমেরিকার 'মায়া' জাতি। শুস্টারের 'স্ট্র্যাংলিং অফ পারসিয়া' গ্রন্থপাঠে কবি অবগত হয়েছেন, তরুণ পারসিকের দল যখন পারস্যকে তার স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত কববার আন্তরিক প্রযত্ন-নিয়েছিল, সভ্য ইউরোপ কী মর্মান্তিকভাবে তার সেই অভিপ্রায়কে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। এ রকম সভ্য শাসনের দৃষ্টান্ত রয়েছে আফ্রিকার কঙ্গো প্রদেশে বা আমেরিকার কৃষ্ণবর্ণের নিগ্রোজাতির ক্ষেত্রে।

সভ্য ইউবোপেবই আব এক কৃতী ছাত্র জাপান। তাবই অমানবিক হৃদযহীন ভূমিকা সকলেব মতো কবিও প্রত্যক্ষ কবেছেন। কোবিযা ও চীন ক্ষতবিক্ষত হযেছিল। স্বদেশে সেই সাম্রাজ্যবাদেবই আব এক নগ্ন বর্বব রূপ দেখা গেছে জালিযানওযালাবাগে। জীবনেব একেবাবে প্রথম দিকে তথাকথিত সভ্য ইউবোপেব যেটুকু আব্রুও ছিল, জীবনেব শেষপ্রান্তে পৌঁছে কবিব চোখেব উপব একেবাবেই তাব পর্দা

ববীন্দ্রনাথ ঠাকুব

সবে গিযেছিল। যে-জার্মানী ইউবোপীয সভ্যতাব আলো জ্বালাবাব কাজে সবচেযে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেমেছিল, সেই জার্মানীব শেষ ভূমিকা হিটলাবেব অভিপ্রাযে। যে-বুর্জোযা ডেমোক্র্যাসিকে তাব বাষ্ট্রভাবনা পবম মডেল ভেবে এবং প্রার্থনা কবে অনেক কিছু কল্পনা এক সময আমবা কবেছি, সাম্রাজ্যবাদ চূড়ান্ত পবিণতিব দিনে মনে হয সেসব অর্থহীন লুপ্ত ধ্বংসাবশেষেব প্রতিচিত্র ভিন্ন অন্য কিছু নয়

ববীন্দ্রনাথেব 'নৈবেদ্য' কাব্যেব বচনা ও প্রকাশকাল নিযমতান্ত্রিক জাতীয আন্দোলনেব প্রথম পর্বে

স্বদেশী-আন্দোলন তখনও ভাবীকালের গর্ভে। সেই সময়ে 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থে ঈশ্বরানুভবের পাশাপাশি প্রকাশ পেল সাম্রাজ্যলিপ্সুদের প্রতি অনর্গল ধিক্কার। এই ধিক্কার আরও এইজন্য যে, এইসব সাম্রাজ্যলিপ্সুরা নিজেদের প্রয়োজনে জাতিপ্রেমকেই করে তুলেছে মূলধনের মতো।

ধনতান্ত্রিক সভ্যতার বহিরঙ্গ প্রকৃতির বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ বরাবরই এক অতুলন স্বচ্ছদৃষ্টির অধিকারী। একেবার উন্মেষপর্ব থেকেই। আঠারো শো আটাত্তর খৃস্টাব্দে প্রকাশিত 'কবি কাহিনী' কাব্যেও তার বীজ আছে। এর তিন বছর পরে প্রকাশিত 'চীনে মরণের ব্যবসা', তারও এক বছর পরে 'ডুব দেওয়া' এবং আরও আট বছর পরে 'য়োরোপ যাত্রীর ডায়ারী' তাঁর এ-সংক্রান্ত প্রাথমিকতম পর্যায়ের আলোচনা বিশেষ।

এর এক বছর পরে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'সমাজ'-এর অন্তর্গত 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' প্রবন্ধ, যেখানে তিনি গ্ল্যাডস্টোন-ডিজরেলি অধ্যুষিত ভিক্টোরীয় গণতন্ত্রের প্রদীপ জ্বলতে দেখেছেন। এই প্রবন্ধে দেখা গেল সেই ইউরোপীয় সভ্যতা 'তলে তলে জড়ত্বের' যে প্রকাণ্ড মরুভূমি সৃজন করে চলেছে তাও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। ওই বছরেই বেরিয়েছে অনুরূপ মনোধর্ম-সমন্বিত আরও চারটি প্রবন্ধ—'স্ত্রী মজুর', 'কর্মের উমেদার', 'ক্যাথলিক সোশ্যালিজম্' এবং 'সোশ্যালিজম্'। বিশ্বসমস্যা-সম্পর্কে প্রখরতর সচেতনতা এক্ষেত্রে উল্লেখ্য। তালিকায় আর একটি প্রবন্ধ, 'ইংরেজ ও ভারতবাসী'। সাম্রাজ্যলিপ্সুরা কিভাবে দুর্বল উপনিবেশগুলোর উপর আক্রমণ চালিয়েছে এইসব প্রবন্ধে কবি তার পরিচয় দিয়েছেন। গণতন্ত্র, সভ্যতা, জাতীয়তা বা মানবতার দোহাই পেড়ে জগৎ জুড়ে যারা তূরী-ভেরী বাজিয়ে বেড়ায় তাদের নগ্নরূপ তিনি ধরার চেষ্টা করেছিলেন এই সব রচনায়। সেই নগ্নরূপের ভাবগত পরিচিতি হল 'অখ্রীষ্টানের গালে খ্রীষ্টানি চড়।

এ ছাড়াও এই শতাব্দীর একেবারে সূচনায় প্রকাশিত 'বিরোধমূলক আদর্শ', 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রভৃতি রচনাগুলো অবশ্যই স্মরণীয়। কলোনীর প্রজা হিসেবে প্রতীচীর সভ্যতাকে আগ্রাসী বা নিপীড়নমূলক অস্তিত্ব ছাড়া আর কিছু মনে হয় নি তাঁর। 'বিরোধমূলক আদর্শ' প্রবন্ধে জাতিপ্রেম সম্বন্ধে যে কথা লিখেছেন অবিকল সেই কথাই রয়েছে 'নৈবেদ্য' কাব্যের কবিতাতেও। চৌষট্টি-সংখ্যক কবিতাটিতে ছিল—

> 'শতাব্দীর সূর্য আজি রক্ত মেঘ মাঝে
> অস্ত গেল, হিংসার উৎসবে আজি বাজে
> অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিনী
> ভয়ঙ্করী। দয়াহীন সভ্যতানাগিনী
> তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমিষে
> গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি তীব্র বিষে।...'

পঁয়ষট্টি সংখ্যক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> 'স্বার্থ যত পূর্ণ হয় লোভ ক্ষুধানল
> তত তার বেড়ে ওঠে—বিশ্বধরাতল
> আপনার খাদ্য বলি না করি বিচার
> জঠরে পুরিতে চায়। বীভৎস আহার
> বীভৎস ক্ষুধারে করে নির্দয় নিলাজ—
> তখন গর্জিয়া নামে তব রুদ্র বাজ।
> ছুটিয়াছে জাতিপ্রেম মৃত্যুর সন্ধানে
> বাহি স্বার্থতরী, গুপ্ত পর্বতের পানে।'

এই একই সূত্রে বাঁধা রয়েছে 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের ছেষট্টি-সংখ্যক কবিতাটিও ঃ

'এই পশ্চিমের কোণে রক্তরাগরেখা
নহে কভু সৌম্যরশ্মি অরুণের লেখা
তব নব প্রভাতের। এ শুধু দারুণ
সন্ধ্যার প্রলয়দীপ্তি। চিতার আগুন
পশ্চিম সমুদ্রতটে করিছে উদ্‌গার
বিস্ফুলিঙ্গ, স্বার্থদীপ্ত লুব্ধ সভ্যতার
মশাল হইতে লয়ে শেষ অগ্নিকণা।...'

এই উদ্ধৃতিগুলো থেকে একথা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, চিন্তায় ও সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কোনো দ্বৈততা নেই অর্থাৎ হৃদয় ও মেধায় রয়েছে এক অপরূপ সাযুজ্য।

এই ক্ষোভ ও ব্যথার আরও পরিচয় আছে 'পত্রপুট' কাব্যের 'আফ্রিকা' কবিতায়। 'নবজাতক' কাব্যের বহুবিদিত 'প্রায়শ্চিত্ত', 'বুদ্ধভক্তি', 'পক্ষিমানব' কবিতাগুলোও অনায়াসে ভাবা যায়। 'প্রান্তিক'কাব্যও। ভারতীয় রাজনীতির অনেক বিশ্রুতকীর্তি পুরুষই সে সময় জাপান এবং ইংল্যাণ্ডকে এক সঙ্গে নিন্দা করতে সঙ্কুচিত হতেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ হন নি। মিত্র ও অক্ষ—দুই শক্তিকেই তিনি সময়মতো যথোচিত ধিক্কার দেন। অবশ্য, শেষ পর্যন্ত মিত্রপক্ষকে আপেক্ষিকভাবে বরণীয় মনে হয় তাঁর। তার অর্থ এ নয়, এদের সাম্রাজ্যবাদী পরিচয় ঘুচে গেল। তার অর্থ ইতিহাসের এই পর্বে এরা আক্রান্ত এবং হিটলারের সেই মুহূর্তের ভূমিকা প্রকৃতই প্রলয়ঙ্কর।

'জন্মদিনে' কাব্যের একুশ-সংখ্যক কবিতাটিতে কবি যাকে বলেছেন 'লোভ-রিপু'র তাড়না আমরা তাকে বলতে চাই সাম্রাজ্য বিস্তৃতির একান্ত বাসনা। সেই বাসনার ধারা তথা ইতিহাসও এক অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ ঃ

'যে লোভ রিপুরে
লয়ে গেছে যুগে যুগে দূরে দূরে
সভ্য শিকারীর দল পোষমানা শ্বাপদের মতো।
দেশ বিদেশের মাংস করেছে বিক্ষত
লোলজিহ্ব সেই কুকুরের দল
অন্ধ হয়ে ছিঁড়িল শৃঙ্খল
ভুলে গেল আত্মপর;
আদিম বন্যতা তার উপাড়িয়া উদ্দাম নখর
পুরাতন ঐতিহ্যের পাতাগুলো ছিন্ন করে
ফেলে তার অক্ষরে অক্ষরে
পঙ্কলিপ্ত চিহ্নের বিকার।'

প্রয়াণের মাত্র কয়েকমাস আগে কবি লিখেছিলেন, 'প্রচ্ছন্ন পশু'। বিষয়বস্তু প্রায় একই। অনেক বছর আগে 'কালান্তর'-এর 'লড়াইয়ের মূল' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, সাম্রাজ্যবাদেরই আর এক প্রকাশ সামরিকতাবাদ। এ হল প্রতিযোগিতা, অতএব সংঘর্ষের মূল। এই সংঘর্ষ প্রকৃতপক্ষে এক বণিকের সঙ্গে আর এক বণিকের। বণিক যে আজ ক্ষত্রিয়বৃত্তি গ্রহণ করেছে তার হেতু এই আধিপত্য লাভের আকাঙ্খা—'জার্মান পণ্ডিতও যে তত্ত্ব আজ প্রচার করিতেছে এবং যে তত্ত্ব আজ মদের মতো জার্মানীকে অন্যায় যুদ্ধে মাতাল করিয়া তুলিল সে তত্ত্বের উৎপত্তি তো জার্মান পণ্ডিতের মগজের মধ্যে নহে, বর্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের মধ্যে।'

রাষ্ট্রনীতির বিদগ্ধ ছাত্রও এত সহজ করে সাম্রাজ্যলিপ্সু শক্তির কেন্দ্রীয় প্রবর্তনা প্রকাশ করে বলতে পারতেন না, যা রবীন্দ্রনাথ পেরেছেন।

বলাই বাহুল্য, নরমেধ যজ্ঞের হোতাদের প্রতি ধিক্কার রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজীবনের একেবারে শুরু থেকেই। দ্বিতীয় মহাসমরে তা নতুন মাত্রা পেয়েছিল। এই বীভৎসতাও সর্বত্রব্যাপী। মানুষ আর তার বহু পরিশ্রমে তিল-তিল করে নির্মিত যে সভ্যতা তা এত অল্প সময়ে সমূহে বিনাশপ্রাপ্ত হতে পারে। জীবন আর সভ্যতা যে এত ভঙ্গুর এবং সে ভঙ্গুরতা যে কোনো দেশকাল বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ কিছু নয়, তা যে সর্বত্রই সাধারণ সঙ্কট, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তাই ঘনীভূত হয়েছে। সভ্যতার এই সর্বস্বান্তরূপ রবীন্দ্রনাথের কল্পনার অতীত। জীবনের শেষ প্রবন্ধে কবি প্রকাশ করেছেন সেই বেদনাকে আর সেই সঙ্গে উন্মোচিত করলেন এক অনপনেয় কলঙ্কচিত্রের বাতাবরণ। কবি শুধু যে এই সভ্যতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েছেন তাই নয়। সেই সঙ্গে এই সভ্যতার অর্থহীন ধ্বজাবাহী 'সভ্য ইংরেজ' তার শাসনাভিভূত হতভাগ্য ভারতবর্ষকে দিনে দিনে কী মর্মান্তিক নিঃস্ব অবস্থায় আসতে বাধ্য করেছে তার অসংকোচ ঘোষণাতেও তিনি মুখর।

রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে রবীন্দ্রনাথ কোনো দিনই প্রধান আসন দেন নি। তিনি আস্থা রেখেছেন আত্মশক্তির উদ্বোধনে, ঐক্যের প্রতিষ্ঠায়। তাঁর 'সভ্যতার সংকট'-এ সেইসব পুরোনো প্রত্যয়ের অনেকগুলোই রুক্ষ জিজ্ঞাসার মুখোমুখি।

স্থূল-সূক্ষ্মভেদ বাদ দিলে 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধটির মোট তিনটি পর্যায়। একটি পর্যায়ে ইংরেজদের বহু শ্রুত ন্যায়, গণতন্ত্র ও সভ্যতাভিমানের কাছে হতভাগ্য ভারতবর্ষের অবিচ্ছিন্ন লাঞ্ছনা। দ্বিতীয়ত, তার এই লাঞ্ছনা বা শোচনীয়তার জন্য পরাধীনতাই যে একমাত্র দায়ী তার অসংকোচ ঘোষণা। 'স্বাধীন শাসনের অভাবই' যে দুষ্ট সমস্যার সূত্র এই কথা স্পষ্ট করে সম্ভবত 'ছোটো ও বড়ো' প্রবন্ধেই তিনি প্রথম বলেছেন। রচনাকাল উনিশ শো সতেরো খৃস্টাব্দ 'সভ্যতার সংকট' রচনার চব্বিশ বছর আগে।

আর তৃতীয়ত, রোমান্টিক ও ভিক্টোরীয় সভ্যতার যে প্রতিবেশে আধুনিক ভারতীয় হিসেবে তাঁর মানসিক পুষ্টি ও ক্রমবিকাশ, সেই ইউরোপীয় সভ্যতার বহুবিধ নেতিধর্ম সত্ত্বেও তার অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দান সম্পর্কে যে শ্রদ্ধাবোধ তারও বিনষ্টি ঘোষণা। অবশ্যই এন্ড্রুজদের কথা তাঁর মনে ছিল।

রবীন্দ্রনাথের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চারিত্র্য নিশ্চিতভাবেই তাঁর সত্তার পক্ষে, মনন ও সৃষ্টির প্রেক্ষিতে একটি অবিসংবাদিত ব্যাপার। কোনো রাজনীতিক বাক্‌সর্বস্বতা নয়, পরন্তু কংগ্রেসী রাজনীতির একরকম সূচনা পর্ব থেকে মৃত্যু-মুহূর্ত পর্যন্ত এই বিরোধিতার ক্রম তিনি অনুসরণ করেছেন। অবশ্যই ইতিহাসগত ভাবে নয়। কবি তাঁর মনের ধর্ম অনুসরণ করেছেন মাত্র।

কিন্তু পাঠকের কাছে সে ক্রম আপনিই ধরা পড়ে। ধরা পড়ে একজন জীবনশিল্পীর সৃষ্টিতে মননে জীবনের প্রকৃত ও সম্ভাব্যরূপের পরিপূর্ণ চিত্রটিই। তাতে ধনবাদের প্রলয়ঙ্কর রূপ বাদ পড়বে কেন? বিশেষ করে যে বাতাবরণে তাঁর জন্ম বৃদ্ধি ক্ষয় তাকে তো এই সাম্রাজ্যলিপ্সু ধনবাদই নিরন্তর আচ্ছন্ন করে রয়েছে এবং স্বভাবতই অত্যন্ত নেতিবাচকরূপে। রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যকে তা ব্যাহত বা আহত করে না।

ইংরেজদের কাছে যে প্রত্যাশা সেই প্রত্যাশা নিয়মতান্ত্রিক কংগ্রেসী রাজনীতিরই একটা অংশ। সেই প্রত্যাশা যে কোনো ভাবেই হোক বর্তমান ছিল সাতচল্লিশ সাল অবধি অর্থাৎ স্বাধীনতা-প্রাপ্তি পর্যন্ত। কংগ্রেসের রাজনীতি যখন আরাম-মঞ্চের সীমানা পেরিয়ে বহুদূরে প্রসারিত হয়েছে তখনও ইংরেজ শেষ পর্যন্ত একটা সমঝোতায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ভারতবর্ষ ছেড়ে যাবে এ বিশ্বাস কোনো না-কোনোভাবে আমাদের মধ্যে অনড়। যে কংগ্রেস ব্রিটিশ-ভারতে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেছে নির্বাচনে অংশ নিয়েছে সেও তো তার ধনবাদী সাম্রাজ্যলিপ্সু চরিত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবগত ছিল। তথাপি তার দাক্ষিণ্য নিতান্তই খণ্ডিত এবং অপমানকর জ্ঞানে বর্জন করেনি। যদি বলা হয়, এই ব্যাপারটি রণনীতিগত, তাহলে তার সঙ্গে ভাবগতভাবে রবীন্দ্রনাথের ইউরোপের সভ্য-শাসনের কাছে প্রত্যাশা কার্যত পৃথক হয় না।

রবীন্দ্রমননের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় কথা মনের দ্বন্দ্ব ও দ্বৈরাজ্যের অভিভবকে জীবনধর্ম অনুযায়ী যতটা সম্ভব তিনি অতিক্রম করেছিলেন। ইংরেজ-ই তখন তিল-তিল অবক্ষয় আর মৃত্যুর হেতু-স্বরূপ। সাম্রাজ্যলিপ্সু পরাক্রান্ত শক্তি হিসেবেই তার প্রলয়ঙ্কর বিস্তার। একথা তিনি আর সত্য বলে বিশ্বাস করেন না, 'আমাদের নিজেদের দেশ যে আমাদের নিজের হয় নি তার প্রধান কারণ এ নয় যে, এদেশ বিদেশীর শাসনাধীনে। আসল কথাটা এই যে...সেবার দ্বারা, তপস্যা দ্বারা, জানার দ্বারা বোঝার দ্বারা সম্পূর্ণ আত্মীয় করে..একে অধিকার করতে পারিনি।' বরং তিনি বিশ্বাস করেন, সভ্য শাসনের অভাব আর লোলুপ পররাজ্যলোভী বিদেশী শাসনই সর্ববিধ দুর্দৈবের কেন্দ্রে। জীবনের শেষ পর্বে কবির প্রবন্ধগুলোর ভাষা এই। কিন্তু পাঠভিত্তিক আলোচনায় একথাও স্পষ্টতর বিদেশী শাসন সম্পর্কে তিনি যে কেবল জীবনসায়াহ্নে এসেই নির্মোহ হলেন একথাটা যথোচিত পর্যবেক্ষণের ফল নয়। রবীন্দ্রনাথ আজীবন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এবং এই মনোভাব-প্রকাশে তিনি মুক্তকণ্ঠ। যে-প্রত্যাশাবোধ বারবার আমাদের এবং তাঁকেও ছুঁয়ে গেছে, আগেই বলেছি, তাকে ভারত-ইতিহাসের বহতা ধারাতেই দেখতে হবে। কথা সেটা নয়। কথা হল, এই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের গড়ন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মূলত ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক প্রবক্তা হলেও ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের মত ও আদর্শ বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাই, তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক মতামতের একটি রূপরেখা এখানে দেওয়া হল। তিনি আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে যে অসামান্য ভূমিকা পালন করেছেন, সেগুলো পর্যায়ক্রমে প্রাসঙ্গিকভাবে আমরা পরবর্তী স্তরে আলোচনা করব।

স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২)

যখন দেশবরেণ্য নেতৃবর্গ জাতীয় চেতনার উদ্বোধন করছেন, তখন কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান এসে গেল এক অভাবনীয় অপ্রত্যাশিত কেন্দ্র থেকে।

ঋষি অরবিন্দ যখন 'ইন্দু প্রকাশ'-এ জাতীয়তাবাদ প্রচার করতে আরম্ভ করেছেন, তখন স্বামী বিবেকানন্দ আঠারো শো তিরানব্বই খৃস্টাব্দের এগোরোই সেপ্টেম্বরে শিকাগো ধর্ম-মহাসম্মেলনে নিজ প্রতিভায়, ওজস্বিতায়, পাণ্ডিত্যে, ব্যক্তিত্বে, বাগ্মিতায় আমেরিকা তোলপাড় করে তুললেন। অরবিন্দের প্রবন্ধাবলী মুষ্টিমেয় অতি-শিক্ষিত লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ব্যাপক ক্ষেত্রে তার প্রয়োগের কাল আবির্ভূত হতে তখনও অনেক বিলম্ব। বিবেকানন্দ সেই ক্ষেত্রটি প্রস্তুত করলেন। কিন্তু ঘটনাস্রোত তখন অতি দ্রুত এগিয়ে চলছিল। বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের তত্ত্ব প্রচার করলেন আমেরিকায় এবং পরে ইউরোপে। সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি ভাবলেন, যে দেশে এই ধর্ম উদ্ভূত হয়েছে, সে-দেশ অতি গরীয়ান, অতি মহীয়ান। কালের দোষে ধর্মের নামে আচার-বিচার ও কুসংস্কারের বাঁধনে হিন্দুরা তাদের ধর্মের মূলতত্ত্ব থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে। এর ভিত্তি অনেক দৃঢ়, ভাঙ্গন ধরেছে উপরের কাঠামোতে। সুতরাং তার সংস্কার সাধন করে দিতে পারলে অনন্তকাল ধরে হিন্দুধর্ম মানুষের আধ্যাত্মিক পিপাসা মেটাতে পারবে। একদিন মানুষের ধর্মসমন্বয় ঘটবে, পারস্পরিক বিবাদ-বিদ্বেষ দূর হবে।

আমেরিকা ও ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলিতে তিনি নানা দোষ-ত্রুটি দেখতে পান; কিন্তু সে-সকল দেশের নরনারীর স্বাস্থ্য, কর্মশক্তি, দৈহিক বল, আত্মবিশ্বাস, অজানার সন্ধানে বেরিয়ে আপদ-বিপদ উপেক্ষা করার ক্ষমতা, দেশের ও জাতির কল্যাণে স্বার্থত্যাগে উন্মুখতা প্রভৃতি গুণ তিনি প্রচার করেছিলেন তাঁর দেশবাসীর কাছে।

তাঁর মন্ত্র ছিল 'অভীঃ' অর্থাৎ ভয় পরিত্যাগ করতে হবে। মনের বল থাকলে দৈহিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'—তিনি জানতেন ভয়-ই ভারতবাসীর অগ্রগতির পক্ষে প্রধান অন্তরায়। দুর্বল, ক্ষীণ, নিত্যরোগী, মানসিক দৃঢ়তাহীন মানুষ নিতান্তই জড়তুল্য। সমস্ত জাতিকে শক্তিশালী হতে হবে। গীতা-ভাগবত-চর্চায়, কৃচ্ছ্রসাধনে দেহ জীণ-শীর্ণ হলে মনুষ্যত্ব নষ্ট হবে; বিড়ম্বনাময় জীবনের

বিবেকানন্দ

বোঝা দুর্বহ হবে। চাই শক্তি—কাযিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক—যাব বলে আকাশচুম্বী পর্বত ও সীমাহীন সাগবেব বাধা তুচ্ছ হযে যাবে।

তাঁর সকল উপদেশের মূল কথা—নিজে মানুষ হও, অপরকে মানুষ করো। তবেই নিজের মঙ্গল, দশের মঙ্গল, দেশের কল্যাণ। ইতর, ভদ্র, অন্ত্যজ, পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলকে ভাই বলে গণ্য করা। ভারতের বনজঙ্গল, তৃণগুল্ম, নদ-নদী, গিরি-উপত্যকা, মরুভূমি কান্তার সব মিলিয়ে ভারতবর্ষ, আমাদের মাতৃভূমি। তার মাটি ভারতবাসীর স্বর্গ। কাজ করে যেতে হবে, মোক্ষ নিয়ে ভাবলে চলবে না।

ব্যষ্টি সমষ্টি সমাজ—প্রত্যেকের কল্যাণ বাঞ্ছনীয়। প্রত্যেক নরনারী পরাধীনতার বন্ধন থেকে মুক্ত থাকবে। এক দেশের লোক অপর দেশের কাছে কুক্ষিগত হয়ে থাকবে না। দেশাত্মবোধে প্রত্যেকের অন্তর ভরে থাকবে। পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, দাসসুলভ দুর্বলতা প্রভৃতি দোষ উচ্চাধিকার লাভের পরিপন্থী। লজ্জাকর কাপুরুষতার সাহায্যে বীরভোগ্যা স্বাধীনতা-লাভ অসম্ভব। প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জন না করতে পারলে পরের দাস হয়ে থাকতে হবে অনন্তকাল। বিবেকানন্দ স্বয়ং ভারতের মুক্তির জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। দেশীয় রাজন্যবর্গকে সংঘবদ্ধ করে বিদেশী অস্ত্র নির্মাতার কাছ থেকে হাতিয়ার সংগ্রহ করে তিনি সামরিক অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা করে বিফল হয়েছিলেন। একথা ভাবতেও আজ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়তে হয়।

তিনিই প্রথম বিপ্লবীদের কাছে মৃত্যুর আহ্বান জানিয়ে গেলেন! সর্বশক্তির আদিভূতা 'মা'কে পেতে হলে সুখ-সমৃদ্ধি, এমন কি জীবনকেও তুচ্ছ করতে হবে। তিন বললেন ঃ

'Who dares misery love
And hugs the form of Death,
Dances in Destruction's dance
To him the Mother comes'.

ইনিই মৃত্যুরূপা মাতা। উপরি-লিখিত উদ্ধৃতি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদে দাঁড়াচ্ছে—

'সাহসে যে দুঃখ-দৈন্য চায়,
মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে
কাল নৃত্য করে উপভোগ,
মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।'

বাংলার লুপ্ত শক্তি এই উদাত্ত আহ্বানে জেগে উঠেছিল। বিশ্ববরেণ্য সর্বত্যাগী কর্মময় সন্ন্যাসীর বজ্রনির্ঘোষের কাছে সাধারণ বক্তৃতা, লিখিত প্রবন্ধ, আন্দোলন, বিক্ষোভ প্রভৃতি ক্ষীণশক্তি হয়ে পড়ে। আলস্যে জর্জরিত, কর্মবিমুখ জাতিকে উদ্দীপ্ত উজ্জীবিত করে দিয়েছিলেন বিবেকানন্দ। রম্যাঁ রলাঁ বলেছেন—'ধূমায়িত ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি স্বামীজির শ্বাসের বায়ুতে প্রজ্বলিত শিখা হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল।' অরবিন্দ বলেছেন, 'বিবেকানন্দ দেশকে গভীরভাবে ভালবাসতেন। দেশের পরাধীনতা তাঁকে গভীরভাবে পীড়া দিত। সন্ন্যাসী হয়েও তিনি দেশের স্বাধীনতার কথা অবিরত চিন্তা করতেন। এমনও বলা হয়, তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের কথাও ভাবতেন'। অরবিন্দ আরও বলেন, 'প্রত্যক্ষভাবে তিনি যে কাজ নিজে করেন নি, তাঁর শিষ্যাকে তিনি সে-কাজের ভার দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'ভারতবর্ষকে বুঝতে গেলে বিবেকানন্দকে জানতে হবে।'

মাত্র এক ব্যক্তি যে জাগরণ সম্ভব করেছিলেন, তা অপর অনেকের সমষ্টিগত প্রচেষ্টাকেও ম্লান করে দিয়েছে। রামমোহনের অভ্যুদয় থেকে যে গাঢ় অন্ধকার অপসৃত হতে থাকে, বিবেকানন্দ সেখানে নির্মেঘ আকাশে প্রভাত সূর্যের দীপ্তি এনে দিয়েছিলেন। বাঙালী যেন নিজেকে নতুন করে গড়ে নিয়ে ভবিষ্যতের কঠোর সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হবার প্রেরণা লাভ করেছিল। তিনি অরবিন্দের কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত করে অকালে চিরবিদায় গ্রহণ করলেন।

চাপেকার ভ্রাতৃত্রয় ও মহাদেও রাণাডে

আঠারো শো সাতানব্বই খৃস্টাব্দে পুণায় প্লেগ মহামারী উৎসাদনের নামে নরনারীর উপরে যথেচ্ছ অত্যাচারের জন্য 'প্লেগ' কমিশনার র‍্যাণ্ড ও তাঁর সহকারী লেফ্‌টেন্যান্ট আয়ার্স্টকে ও পরে বিশ্বাসঘাতক দুই দ্রাবিড় ভাই গণেশ ও রামচাঁদকে হত্যার অপরাধে দামোদব, বালকৃষ্ণ ও বাসুদেও—তিন চাপেকার ভাই এবং মহাদেও রাণাডের ফাঁসী হয় যথাক্রমে আঠাবোই এপ্রিল, বারোই মে, আটই মে ও দশই মে। এঁরা সকলেই ছিলেন বিখ্যাত বিপ্লবী বিনায়ক দামোদর সাভাবকরের অনুবর্তী।

বীরসা মুণ্ডা (১৮৭৪-১৯০০)

রাঁচী, চাইবাসা অঞ্চলে জমিদাব, মহাজন, লুথেরাণ ও ক্যাথলিক মিশন, ঠিকাদার, ক্ষুদে রাজকর্মচারী পুলিশ ও সর্বোপরি উচ্চতর সাহেব অফিসাররা বহুদিন যে শোষণ, বঞ্চনা ও অত্যাচার চালিযে আসছিল তার বিরুদ্ধে ১৮৯৯-১৯০০ সালে যে বিশাল মুণ্ডা-অভ্যুত্থান হয, বীরসা মুণ্ডা তাব অদ্বিতীয় নেতা।

বীবসা মুন্ডা

দরিদ্রের সন্তান বীবসা চাইবাসায় খৃস্টান মিশনারী স্কুলে কিছুটা লেখাপড়া শিখেছিলেন কিন্তু ১৮৮৬ -৮৭ সালে তিনি মিশনারীদেব স্বরূপ বুঝতে পেবে বলেছিলেন, 'সাহেব, সাহেব এক টোপি হ্যায'। অর্থাৎ রাজপুরুষ বা মিশনারী—সব সাহেবেব একই টুপি।

এবপর তিনি এদের বিরুদ্ধে এই অঞ্চলের মুণ্ডাদের সংগঠিত করতে থাকেন এক ধবনের ধর্মীয় মতবাদ প্রচাব মারফৎ। মূলত কৃষি-সংশ্লিষ্ট ও বাজনৈতিক চবিত্রের মানুষ হযে বীরসাব আন্দোলনেব লক্ষ্য ছিল স্পষ্টভাবে না হলেও স্বাধীন এক মুণ্ডারাজ প্রতিষ্ঠা। এব জন্য আঠাবো শো পঁচানব্বই খৃস্টাব্দে তাঁব দু'বছব জেল ও জরিমানা হয়। দু'বছব পবে যখন তিনি হাজারীবাগ জেল থেকে মুক্তি পেলেন তখন বীবসা আবাব তাঁর মত-প্রচাব ও সংগঠনের কাজ চালাতে থাকলেন।

দু'বছর পবে তাঁব অভ্যুত্থান তীব্র ও ব্যাপকরূপ ধারণ কবে। উভয় পক্ষেই বেশ কিছু লোক হতাহত হল। অবশেযে ইংবেজ সবকাব চাবদিক থেকে বিপুল সংখ্যক সেনাবাহিনী এনে উনিশ শো খৃস্টাব্দেব তেসরা জানুয়ারী বীরসাকে গ্রেপ্তার করল। ওই বছরেই নয়ই জুন তাঁর মৃত্যু হল রাঁচী জেলে।

'বেঙ্গলী' পত্রিকাব বিশেষ সংবাদদাতা তেইশে মে তাবিখে প্রকাশিত প্রতিবেদনে লেখেন. ...'গোড়ায় যাদের গ্রেপ্তার করা হযেছিল তাঁদেব মধ্যে কতজনেব কারারুদ্ধ অবস্থায় মৃত্যু হযেছে সেটা একটা জানবার মতো খবব। আবো বেশি কৌতূহলোদ্দীপক খবর হল তথাকথিত দাঙ্গার সময়ে কতজনকে নৃশংসভাবে গুলি কবে খুন করা হয়েছে। হযতো দু'এক দিনেব মধ্যেই আমি বলতে পারব সেই হত্যাকাণ্ডের সংখ্যা।'

যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বা নিরালম্ব স্বামী (১৮৭৭-১৯৩০)

'বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের ব্রহ্মা' যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উনিশ শো দুই খৃস্টাব্দে বরোদা থেকে কলকাতায় এসে ১০৮, সার্কুলার রোডে একটি বিপ্লবী কেন্দ্র গড়ে তোলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পরও 'নিরালম্ব স্বামী' নামে পরিচিত ওই বিপ্লবী উনিশ শো ছয় খৃস্টাব্দে পাঞ্জাবে যান এবং ভগৎ সিং-এর বাবা ও দুই কাকাকে বিপ্লবের পথে আকৃষ্ট করেন। তাঁর সঙ্গে বিপ্লবীদের যোগ বরাবরই অক্ষুণ্ণ ছিল।

বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে কংগ্রেস-ই ছিল একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যেখানে দেশের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ বছরে একবার মিলিত হয়ে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা করতেন। তাতেও বিক্ষোভের প্রাবল্য তেমন কিছু একটা থাকত না, সরকারও এই মিলন-মেলাকে খুব একটা গুরুত্ব দিতেন না। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক উত্তাপ কংগ্রেসকে যখন ক্রমশ উত্তপ্ত করতে শুরু করে তখন সমান্তরালভাবে কংগ্রেসের প্রতি সরকারী বিরূপতাও দেখা দেয়। ভারতের স্বার্থের বিরোধী কার্যকলাপ তখন কংগ্রেসের ক্ষোভের কারণ হত এবং কখনও-কখনও সে-সকল বিধি-ব্যবস্থা নিয়ে কংগ্রেসের অধিবেশনে তীব্র আলোচনা-সমালোচনা হতে থাকল।

উনিশ শতকের শেষ দিকে ব্রিটিশ সরকার বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করার চেষ্টা করছিল। ওরা দেখেছিল, ওদের সরকারী শোষণ, অত্যাচাব ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশী প্রতিবাদ ধ্বনিত হচ্ছিল বাংলা থেকে। অতএব বাংলাকে শায়েস্তা করা দরকার।

ওরা একটা যুক্তি খাড়া করল বাংলা ভাগের। ওরা বলতে শুরু করল, এতবড় একটা বিরাট অঞ্চল, —বাংলা, বিহার, ওড়িশা, অসম, দেখাশোনা করার পক্ষে ওদের প্রশাসনিক অসুবিধে সহ্য করতে হচ্ছে। কার্জনের আমলে এই যুক্তি তো ছিল-ই, তার সঙ্গে যুক্ত হল বড়লাটের দুষ্টবুদ্ধি—বাঙালীকে জব্দ করতে হবে, তাদের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করতে হবে। হিন্দু-মুসলমানে বিভেদ সৃষ্টি করাব মতলব যোগ হল এই দুষ্টবুদ্ধির প্রসারে, আব তখন থেকে গোড়ার কথা ভুলে শেষের কারণটাই মুখ্য হয়ে দাঁড়াল।

এই বিভাজন-নীতির প্রথম সূত্রপাত ঘটেছিল আঠারো শো ছেষট্টি সালে ওড়িশার দুর্ভিক্ষকে উপলক্ষ করে। তদানীন্তন সেক্রেটাবি অফ স্টেট বা ভারত সচিব স্যার স্ট্যাফোর্ড নর্থকোট বলেছিলেন, রাজধানী কলকাতা থেকে অত দূবে দুর্ভিক্ষের মতো একটা দুর্দৈব ঘটলে যথোচিত মনঃসংযোগ করা সম্ভব হয় না। যাই হোক আলোচনা তখন এর বেশি গড়ায় নি। কিন্তু সদ্য-সদ্য কিছু না হলেও, মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে, আঠারো শো চুয়াত্তর খৃস্টাব্দে অসমকে একজন চিফ কমিশনারের কর্তৃত্বে স্থাপন করা হয়েছিল। এই সময়ে তিনটি বাঙালী প্রধান অঞ্চল—সিলেট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়া তার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে বাংলাব ছোটলাট চার্লস ইলিয়টের আমলে, আঠারো শো ছিয়ানব্বই সালে। ইলিয়ট ছোটলাট হবার আগে বাংলায় কখনও আসেন নি। তিনি বাংলার অবস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হবাব আগেই আসামের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের খানিকটা যোগ করে দেবার প্রস্তাব তোলেন।

ইলিয়ট অবশ্য তড়িঘড়ি কিছু করে বসার আগে তাঁর প্রস্তাবের উপর জনমত গ্রহণের চেষ্টা করেন। নানা দিক থেকে আপত্তি উঠেছিল। অপরাপর প্রতিষ্ঠানেব সঙ্গে তিনি হাইকোর্টের মতামত জানতে চেয়েছিলেন। হাইকোর্ট সরাসরি বলে দিল যে 'অত্যন্ত ভুল পথ ধরা হয়েছে। ইংরেজ অধিকারের শুরু থেকে যে-সকল অঞ্চল অঙ্গাঙ্গিভাবে পরস্পরের সাহায্যে গড়ে উঠেছে, তাকে বিচ্ছিন্ন করতে গেলে

সকলগুলিরই বিষম ক্ষতি হয়ে যাবে। সেই হিসাবে বলা যায়, যদি চট্টগ্রাম বিভাগকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করা হয়, তাতে চট্টগ্রামের সমস্ত উন্নতি ব্যাহত হবে এবং তার পরিণাম অশুভ হওয়া অবশ্যম্ভাবী।' এই সমালোচনায় ইলিয়ট নিরস্ত হলেন।

অতঃপর বড়লাট লর্ড কার্জন উনিশ শো দুই খৃস্টাব্দে ভারতসচিব লর্ড জর্জ হ্যামিলটন বেরারকে মধ্যপ্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করে দেবার সুপারিশ করলে তিনি বাংলার রাষ্ট্রীয় বিভাগ সম্পর্কেও কিছু মন্তব্য করেন। কার্জন খোলাখুলি বলে বসেন, 'বাংলার শাসন বিভাগ মস্ত বড়, একজনের পক্ষে এই শাসন পরিচালনা করা সম্ভব নয়।'

কয়েকটা মাস কেটে যাবার পর উনিশ শো তিন খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের সচিব রিজলী বাংলার মুখ্যসচিবকে লিখিত ইস্তাহার প্রকাশ করেন। এতে অসম, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম বিভাগ, ঢাকা ও ময়মনসিংহ নিয়ে এক রাষ্ট্রীয় বিভাগ গঠনের সুপারিশ করা হয়েছিল। ওড়িশাকে স্বতন্ত্র করে দেওয়ার যে-কথা পূর্বে একবার উঠেছিল, তাকে নাকচ করা হয়। রিজলীর মনে একটা দ্বন্দ্ব ছিল, তাই ভারত সরকারের ঝানু সেক্রেটারি মনে বেশ বুঝেছিলেন যে বাঙালী জাতি এই প্রস্তাব বিনা প্রতিবাদে মেনে নেবে না। বাংলা সরকারকে একটু সতর্ক করে দেওয়ার অছিলায় তিনি লিখেছিলেন, সপারিষদ বড়লাট বাহাদুর মনে করেন যে, প্রস্তাবটি তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হবে এবং সম্ভবত একে দাঁড়াতে হবে তীব্র বিরোধিতার সামনে। এটা কার্জনের ব্যক্তিগত অভিমত হলেও তিনি পিছু হটার পাত্র নন। তিনি এই প্রস্তাবটি বাংলার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার তীব্র চেষ্টা করেছিলেন। আন্দোলন বা হুমকিতে ভয় পাবার লোক তিনি ছিলেন না।

বঙ্গবিভাগের প্রস্তাবের বিপক্ষে শুধু সারা বাংলা নয়, ভারতবর্ষব্যাপী বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। প্রতিবাদের ঝড় সমস্ত দেশকে উদ্দাম করে তুলল।

দেশীয়, এমন কি বিদেশী মালিক-পরিচালিত পত্রপত্রিকার তরফ থেকে অনেকে এই সরকারী প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। উনিশ শো তিন খৃস্টাব্দের তেরোই ডিসেম্বরে 'ইণ্ডিয়ান মিরর'-এ, চোদ্দই 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য়, পনেরোই 'বেঙ্গলী', 'ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার', 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ও 'চারু মিহির' পত্রিকায়, সতেরোই 'জ্যোতিঃ', 'সঞ্জীবনী' ও 'ট্রিবিউন' পত্রিকায়, তেইশে 'ইংলিশম্যান'-এ ও ছাব্বিশে 'প্রতিনিধি'-তে প্রকাশিত মন্তব্যগুলো উল্লেখযোগ্য। এরপর 'ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ'-এ প্রকাশিত অভিমতটি সরকারকে রীতিমতো ভাবিয়ে তোলে।

তবে কেউ কেউ এর মধ্যে মঙ্গলের চিহ্নও দেখতে পেয়েছিল। পরের বছরে বারোই জানুয়ারী 'চারু মিহির' পত্রিকা বলেছিল যে, এটা অভিশাপের বদলে আশীর্বাদ বলেই গ্রহণ করা সমীচীন। ষোলোই জানুয়ারী 'ট্রিবিউন' পত্রিকা পূর্ববাংলার আন্দোলনের কথা বেশ ফলাও করে প্রচার করেছিল। ওই কাগজটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, ওই প্রস্তাবটি কেন্দ্র করে সেদিন যে সোরগোল উঠেছিল, ভারতবর্ষে ইতিপূর্বে কোনো ব্যাপারে তেমন চাঞ্চল্য দেখা যায় নি। বঙ্গচ্ছেদ কারও উপকারে আসবে না। উপরন্তু লক্ষ লক্ষ লোকের ক্ষতিসাধন করবে। মানসিক উত্তেজনার তো কথাই নেই। সুতরাং সরকারের এই পরিকল্পনা যে কার্যক্ষেত্রে প্রযুক্ত হবে না, এ কথা মনে করা যেতে পারে।

তেইশে জানুয়ারী বিদেশী-পরিচালিত পত্রিকা 'ইংলিশম্যান' সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছিল। সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল, 'বাংলার অধিবাসীর কাছে বঙ্গচ্ছেদ ব্যবস্থা যে মহা-আপত্তিকর, সে কথা বেশি লিখে কাকেও বোঝাবার প্রয়োজন নেই। অতি উচ্চ, অতি কোমল সকল পর্দায়, সকল খাদে ধিক্কার ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে। কেবল ভাবজগতে নয়, জাগতিক বুদ্ধির বিচারে এ-পরিকল্পনা কোনোরকমেই গ্রহণযোগ্য নয়। কেবল বড় বড় সম্প্রদায় নয়, একই সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মহল থেকে প্রতিরোধের চেষ্টা হচ্ছে। ভাবের জগৎ থেকে যে প্রবল ঘৃণা প্রকাশ পাচ্ছে, তাতে যাঁরা এ-আন্দোলন

শুরু করেছেন, তাঁরাও এর রূপ দেখে বিস্মিত হয়ে উঠেছেন। গভর্নমেন্টের সমর্থনে অতি ক্ষীণ একটা শব্দও শোনা যায় নি। এর যদি সামান্য সম্ভাবনাও থাকতো, সেটাও সমস্ত বাঙালী জাতির কর্ণভেদী তীব্র নিনাদের কাছে নীরব বা শব্দলেশহীন হয়ে পড়তো। সামান্য বিচারেই নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে, সাধারণ নিবীহ বাঙালীকে বিক্ষুব্ধ করে তোলবার এক প্রকৃষ্ট পন্থা আবিষ্কৃত হয়েছে, এবং একটা সমগ্র প্রদেশকে রুখে দাঁড়াবার জন্য সর্বাপেক্ষা ত্বরিত এবং সহজ উপায় আবিষ্কার করা হয়েছে।'

মাসখানেকের মধ্যে ওই পত্রিকায় পুনশ্চ লেখা হয়েছিল, 'যারা আপত্তি জানাচ্ছে তারা যে দুরভিসন্ধি প্রণোদিত হয়ে করছে—এটা প্রমাণ কববার জন্য মুষ্টিমেয় যে ক'জন সমর্থক আছে তারা যেন অন্য যুক্তি আবিষ্কার করে,' অর্থাৎ সরকার বঙ্গ-ভঙ্গের জন্য যে-যুক্তি খাড়া করেছিল, 'ইংলিশ ম্যান' তার বিকল্প খুঁজতে সরকারকে পরামর্শ দিয়েছিল।

উনত্রিশে জানুয়ারী 'দি ইণ্ডিয়ান ডেইলী নিউজ' পত্রিকায় সরকারকে কটাক্ষ করে ব্যঙ্গের সুরে লেখা হয়েছিল, 'পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী মনে করত যে ভারত-সরকার অতি দ্রুত আমূল পরিবর্তনের প্রতীক। ব্যাপার দেখে মনে হয়, জনমতের বিপক্ষে অহেতুক এতবড় পরিবর্তন সাধন করতে গেলে যে অশান্তি ও সংঘাত বাধবার সম্ভাবনা বহন করেছে, তাতে ভারত-সরকারের র‍্যাডিক্যাল বা দ্রুত আমূল পরিবর্তনের সব লক্ষণই বর্তমান।

সকল জেলা থেকেই প্রতিবাদের ধ্বনি উঠতে থাকে। উনিশ শো পাঁচ ও ছয় খৃস্টাব্দে অর্থাৎ কংগ্রেসের পরপর দু'টি অধিবেশনেই নিন্দাসূচক প্রস্তাব গৃহীত হয়। পয়লা মার্চ বেঙ্গল ল্যাণ্ডহোল্ডার্স এ্যাসোসিয়েশন তাঁদের লিখিত মতামত বাংলা সরকারকে জানান। এই এ্যাসোসিয়েশনের সভ্য ছিলেন বাংলার প্রায় সমস্ত বিত্তশালী, বড় ও প্রভাবশালী জমিদার। তাঁরা বললেন, 'বাংলা ভাগ করা কিছুতেই উচিত হবে না। এখানে হিন্দু-মুসলমানের কোনো মতানৈক্য নেই।' নিতান্ত স্বার্থান্ধ ব্যতীত এই ব্যবস্থা কেউ সমর্থন করবেন না বলে তাঁরা দীর্ঘ স্মারকলিপি শেষ করেন।

ওই বছরের আঠারোই মার্চ তারিখে কলকাতার টাউন হলে নাটোরের মহারাজার পরিচালনায় এক বিবাট সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অম্বিকা মজুমদার, সীতানাথ রায়, লাল-মোহন ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি জানিয়েছিলেন।

সরকার প্রচার করেছিল, বঙ্গভঙ্গ সমর্থনের ব্যাপারে মুসলমান-সমাজে কোনো দ্বিমত নেই। এই প্রচার সর্বৈব ভ্রান্ত। জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক, বহু সম্ভ্রান্ত জমিদার, আইনজীবী, শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রভৃতি সকল স্তরের মুসলমান এই আন্দোলনে নেতৃত্ব করেছিলেন। সভা-পরিচালনা, বক্তৃতা-দান এবং সভা-সমিতিতে উপস্থিত থেকে দায়িত্বপূর্ণ অংশগ্রহণের বহু উদাহবণ আছে। যে-সব জাতীযতাবাদী মুসলমান নেতৃবৃন্দ জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন এলাকার সভা-সমিতিতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের কয়েকজনের নাম ও সংশ্লিষ্ট এলাকাব উল্লেখ করে আমবা সরকাবী মিথ্যা-প্রচারের জবাব দিতে পারি ঃ কাজি রিয়াজুদ্দিন (কুমিল্লা), মুন্সী জিলার রহমান (তালিবপুর), রাজা আনোয়ারউদ্দিন খাঁ চৌধুরী (ভাঙ্গা, ফরিদপুর) মৌলভী মুশাররফ্ হোসেন (জলপাইগুড়ি) সৈয়দ মোতাহার হোসেন বার-এ্যাট ল (পিরোজপুর, বাখরগঞ্জ) মুন্সী রেজা সাহেব (দিনাজপুব), ডাঃ বাবা শেখ, এ. কে. গজনবী, ওযাজের আলি, আবুল কাশিম, এ রসুল (কলকাতা)। এরা ছাড়াও জাতীয় আন্দোলনে সেদিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন কবেছিলেন মৌঃ এক্রাম খাঁ, আবদুল হোসেন, দেদার বক্স, মৌলভী হেদায়েতুল্লা, আবদুল [illegible] লিযাকত হোসেন, আসবাফ্উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী প্রভৃতি মুসলমান নেতৃবৃন্দ।

সারা বাংলা জুড়ে শত-শত সভা-সমিতি হয়েছিল সেদিন। যেসব জেলায় মুসলমানদের প্রাধান্য ছিল, সেখানে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ ছিল। সেজন্য সরকার-বিরোধী আন্দোলনে এই দুই সম্প্রদায়ের মানুষ একত্রে সামিল হতেন। এই দুই সম্প্রদায়ের প্রীতির মধ্যে পরবর্তীকালে ইংরেজ সরকার তিক্ততার বীজ বপন করেছিল, যে কুৎসিত প্রয়াস শুরু করেছিলেন বড়লাট লর্ড মিন্টো।

বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রবল সমর্থন আছে বলে লর্ড কার্জন তাঁর সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের মাধ্যমে দেশব্যাপী তুমুল প্রচার চালিয়েছিলেন। অথচ, নবাব সৈয়দ আমীর হোসেন কেন্দ্রীয় মুসলিম সমিতির সম্পাদক হিসেবে বাংলার চিফ সেক্রেটারীকে একটি চিঠি লিখে জানালেন, 'পার্টিশন সম্পূর্ণ অনাবশ্যক ও অবাঞ্ছিত। যদি এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়, তা হলে বহু শতাব্দীর আচরিত ব্যবস্থা ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।'

কিন্তু সরকার এইসব পরামর্শে কর্ণপাত করেনি। প্রতিবাদ প্রবলবেগে দানা বেঁধে উঠতে থাকে। উনিশ শো পাঁচ খৃস্টাব্দের দশই জানুয়ারী তারিখে টাউন হলে অনুষ্ঠিত এক সভায় সঙ্ঘবদ্ধভাবে বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে আপত্তি জ্ঞাপন করলেন মফঃস্বল থেকে আগত প্রায় তিন শো জন-প্রতিনিধি। বাংলার সমস্ত জেলা থেকে ধনী, লব্ধপ্রতিষ্ঠ, প্রভাব-প্রতিপত্তিসম্পন্ন মানুষেরা সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সেদিন ওই সভায় সমবেত হয়েছিলেন। এমন কি, অনেক রাজভক্ত দেশবাসীও এসেছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্যার হেনরী কটন। তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, বক্তারা যেন ওই সভায় রাজপুরুষদের বিপক্ষে কোনো আপত্তিকর ভাষা ব্যবহার না করেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি সরকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ক্ষোভপ্রকাশ করেন এবং যাতে বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব রদ হয়, সরকারের উদ্দেশ্যে সেই অনুরোধ জানান। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাম্‌স-উল-হুদা, রাজা পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায়, এ.এইচ. গজনবী, অম্বিকাচরণ মজুমদার, এ চৌধুরী প্রভৃতি। সুরেন্দ্রনাথ প্রতিবাদের বার্তা প্রতি জেলায় বহন করে নিয়ে যেতে বলেন এবং অনুরোধ জানান, কেউ যেন জাতির ওই সংকট মুহূর্তে পুলিশের ভয়ে অভিভূত না হন।

কার্জন দেশের উত্তেজনার পরিমাপ করার জন্য তাঁর নিজস্ব গোয়েন্দা বিভাগকে কাজে লাগাতে শুরু করলেন। পত্র-পত্রিকাব ভাষা আর সাধারণ লোকের তীব্র বিরোধিতার প্রমাণ পেয়ে কার্জন বুঝলেন, তাঁর পক্ষে একটা বড় দলীয় সমর্থন প্রয়োজন। তিনি বঙ্গভঙ্গের উপকারিতা বোঝাতে পূর্ববাংলার উদ্দেশে রওনা দিলেন। চট্টগ্রাম হয়ে ঢাকায় পৌঁছলেন। ওখানে তিনি কয়েকজন মুসলমান নেতার সমর্থন পেয়ে উল্লসিত হয়ে ময়মনসিংহে গেলেন। তিনি ওখানকার মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরীব আতিথ্য গ্রহণ করলেন। এতবড় একজন প্রভাবশালী জমিদারের সাদব অভ্যর্থনায় পুলকিত কার্জন সূর্যকান্তের সমর্থন চেয়ে নিরাশ হলেও কলকাতায় ফিবে এসে প্রচার করলেন, পূর্ববঙ্গের মুসলমান সমাজ ওঁর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। আসলে, কার্জন চোদ্দ লক্ষ টাকা নামমাত্র সুদে ঋণ দিয়ে ঢাকার নবাব বাহাদুরকে কিছুটা হাত করতে পেরেছিলেন।

ভারত সরকার তখনও গোপনে অন্য খেলা খেলছিলেন। কার্জন বিলেতে ভাবতসচিবের কাছে নথিপত্র পেশ করে তাঁর চক্রান্তের সমর্থনে সর্বোচ্চ রাজপ্রতিনিধিদের কাছ থেকে সবুজ সংকেত চাইছিলেন। অবশেষে বিলেত সম্মতি দিল। উনিশ শো পাঁচ খৃস্টাব্দের নয়ই জুন ভারত সচিব ব্রোডরিক সাহেব তাঁর সমর্থন জানালেন। সংবাদ উদ্ধৃত করে রয়টার আটই জুলাই জানাল, 'স-পারিষদ ইণ্ডিয়া কাউন্সিল সকল দিক বিবেচনা করে মত দিয়েছেন যে, নয়া ব্যবস্থা অতিমাত্রায় যুক্তিযুক্ত।' তবে একটু সংশোধন না করলে ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের পদমর্যাদা ও ইজ্জত রক্ষা হয় না। তাই, ভারত-সরকার নতুন প্রস্তাবিত প্রদেশের নাম দিয়েছিল 'নর্থ ইস্টার্ন প্রভিন্সেস'। ইণ্ডিয়া কাউন্সিল এই নাম পরিবর্তন করে সুপারিশ করল 'ইস্টার্ন বেঙ্গল এ্যাণ্ড আসাম' রাখতে। যেহেতু বিশ্বের বাজারে অসমের চা পরিচয় লাভ করেছে, তাই অসমকে চোখের সামনে দেখতে না পেলে একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে এবং চা-শিল্পের কিছুটা ক্ষতিও হয়ে যাবাব সম্ভাবনা। কিন্তু এইসব প্রশাসনিক পদক্ষেপের প্রশ্নে ভারতবাসীর পক্ষ থেকে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে যে-সব আপত্তি উত্থাপিত হয়েছিল, সে সম্পর্কে সরকার সম্পূর্ণ নীরব ও উদাসীন ছিল।

ভারত সচিবের অভিমত পাকাপাকিভাবে প্রচারিত হবার আগেই গুজবে যখন সংবাদটা জনগোচর হল তখন 'ট্রিবিউন' পত্রিকা লিখল, 'রাজভক্ত ও শান্তশিষ্ট শান্তিপ্রিয় একটা জাতিকে রাজ্য পরিচালনার ব্যাপারে আস্থাহীন এবং বিদ্রোহী করে তুলতে যদি কোনো কূটবুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞ তাঁর সমস্ত সর্বনাশা দুরভিসন্ধি নিয়ে এ-কাজে মনঃসংযোগ করতেন, তা হলেও বর্তমান-আচরিত কু-ব্যবস্থার সমপর্যায়ে উঠতে পারতেন না।'

'কেশরী' পত্রিকা লিখল, 'এইসব সুদূরপ্রসারী গুরুতর অমঙ্গল জোর করে চাপিয়ে দেওয়ায় সাম্রাজ্যের ভিত টলে উঠেছে, তার বিপদ ঘনিয়ে আসছে।

উনিশ শো পাঁচ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাসে পার্লামেন্টে যখন ব্যাপারটা আলোচনা বা সমর্থনের জন্য উত্থাপিত হয়, তখন একজন ভূতপূর্ব ভারত-সচিব স্যার হার্বার্ট রবার্টস ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেন যে, এতবড় একটা গুরুতর ব্যাপারে পার্লামেণ্টকে একেবারে অন্ধকারে ডুবিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে। তখন ব্রোডরিক বলেছিলেন, যতদিন না পার্লামেণ্ট পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সংশ্লিষ্ট সমস্ত কাগজপত্র বিচার করে দেখবার সুবিধা পাচ্ছে, ততদিন বর্তমান ব্যবস্থাই অব্যাহত থাকবে।

কার্যত কিন্তু সবটাই ভাঁওতা। সব ব্যাপারটাই ভারতবর্ষে বসে ঠিক করা হয়েছিল। পরবর্তী ভারতসচিব লর্ড মর্লি বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, এটা নিতান্তই শাসনবিধির কথা এবং যারা এর কুফলের দ্বারা প্রপীড়িত হচ্ছে, তাদের অধিকাংশেরই অমতে হয়েছে এই বঙ্গবিভাগের পরিকল্পনা।

ইত্যবসরে কার্জনের দুরভিসন্ধি বেশ দানা বেঁধে উঠেছিল। সিমলা থেকে উনিশে জুলাই তারিখের ২৪৯১ নম্বর ইস্তাহারে বলা হয়েছিল যে, কার্জন পূর্ববাংলা সফরকালে স্পষ্টভাষায় বলেছিলেন, পূর্ববাংলা অসমের সঙ্গে জুড়ে নতুন রাষ্ট্রীয় প্রদেশ সৃষ্ট হবে। আরও বলা হল, ইতিমধ্যে ছোটলাটের অভিমত গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁর মতে, অসমের সঙ্গে চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগ এবং পাবনা, বগুড়া ও রংপুর জেলা যোগ করে দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

এক বিবৃতিতে ভারত সরকার আরও জানাল, ছোটলাটের বিশেষ অভিমত হল, এই অংশের সঙ্গে রাজসাহী, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, মালদহ ও কুচবিহার সংযুক্ত করে দেওয়া হোক।

তাহলে ঢাকা, সম্পূর্ণ রাজসাহী বিভাগ, মালদহ ও ত্রিপুরা উপস্থিত অসমের সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে।

এইবার ঘটনা-প্রবাহ দ্রুত হয়ে উঠল। পার্লামেন্টের বিষয় ধামা-চাপা পড়ে রইল। শেষ পর্যন্ত সরকার ঠিক করল, ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, ত্রিপুরা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, রাজসাহী, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, রংপুর, বগুড়া, পাবনা ও মালদহ—পূর্ববাংলার এই জেলাগুলো অসমের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। আরও সিদ্ধান্ত হল, উনিশ শো পাঁচ খৃস্টাব্দের ষোলোই অক্টোবর বঙ্গচ্ছেদ কার্যকর হবে।

এই সিদ্ধান্তকে আইনমতে কার্যকর করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এগারোই আগস্ট কেন্দ্রীয় আইনসভার অধিবেশন হবে বলে স্থির হয়। কারণটা জানা নেই, তবে আটই সেপ্টেম্বরে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং নয়া প্রস্তাব বিচারের জন্য আলোচ্য বিষয়-তালিকায় উপস্থাপিত হয়েছিল। তখন বঙ্গভঙ্গ বিলের খসড়া সভ্যদের গোচরীভূত হল।

এই ব্যাপারে সরকার আরও একটি নতুন কায়দা অবলম্বন করল। বড়লাট-পরিষদে কয়েকজন ভারতীয়কে বে-সরকারীভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল। তাঁরা পেলেন 'অতিরিক্ত সভ্য' পদ। ঠিক হল, শুধু আইন প্রণয়ন বা জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণের সময় তাঁরা উপস্থিত থাকবেন। এই সময়ে মোট সাতজন বে-সরকারী সভ্য লাট কাউন্সিলে ছিলেন। এঁদের মধ্যে উনিশ শো তিন খৃস্টাব্দের বাইশে মে

গোপালকৃষ্ণ গোখেল এবং উনিশ শো চার খৃস্টাব্দের একুশে সেপ্টেম্বর দ্বারভাঙ্গার মহারাজা রামেশ্বর সিং সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন।

গোপালকৃষ্ণ গোখেল

কিন্তু এই সাতজনের একজনকেও সভায় উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানানো হয় নি। অতএব, উপস্থিত থাকার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তবে এ ব্যাপারে কোনো ভারতীয় সদস্য তখন কোনো ক্ষোভ প্রকাশ করেন নি। এমন কি, গোখেল-ও না। অবশ্য পরে পার্লামেন্টে আলোচনা-কালে একাধিক সভ্য এই ঘটনা নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন।

আটই সেপ্টেম্বরের পর মুলতুবী সভা উনত্রিশে সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় বিনা প্রতিবাদে বঙ্গভঙ্গ বিল পেশ হয় এবং ওই দিনই বড়লাট-বাহাদুরের স্বাক্ষর লাভ করে আইনে পরিণত হয়ে যায়— উনিশ শো পাঁচ খৃস্টাব্দের সাত নম্বর আইন।

এর প্রথম স্তবকে অসম সরকারের এবং দ্বিতীয় স্তবকে পূর্ববাংলার বিচ্ছিন্ন অংশের তালিকা দেওয়া হল। প্রথম : গোয়ালপাড়া, কামরূপ, দারাং, নওগাঁ, শিবসাগর, লখিমপুর, সিলেট, কাছাড়, গারো

পর্বতমালা, খাসিয়া ও জয়ন্তী পাহাড়. নাগা ও লুসাই পর্বতপুঞ্জ থাকবে 'খাস অসম' বলে পরিচিত।
দ্বিতীয় ঃ ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, ত্রিপুরা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল, রাজসাহী, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, রংপুর, বগুড়া, পাবনা ও মালদহ হবে 'পূর্ব বাংলা।'

সে-যুগে দু'আনা তিন পাই অর্থাৎ ন'পয়সা দামের ছোট একখানি বই (উনিশ শো পাঁচ খৃস্টাব্দের সাত নম্বর আইন) বিরাট অশান্তির কারণ হয়ে উঠেছিল। ওই ছোট্ট পুস্তিকাটি হয়ে উঠেছিল একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। কার্জনকে মনে করা হতে লাগল ভারতের স্বাধীনতা লাভের সর্বপ্রধান অভিনেতা। বহু পত্রিকার পাতায় বহু চিন্তাশীল বিদ্বান বাঙ্গালীর কণ্ঠস্বরে এই এক ব্যঙ্গোক্তি ধ্বনিত হয়েছিল সেদিন।

যখন শাসনক্ষেত্রে বাংলাদেশকে দু'টুকরো করা হল, তখন তার প্রতিবাদে চরমপন্থী, নরম পন্থীদের আপত্তি একই সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে। ভাষার তীব্রতার পার্থক্য ছিল, কিন্তু বঙ্গভঙ্গের ব্যাপারটা যে ভারতের স্বার্থহানি ঘটিয়েছে, এ বিষয়ে দ্বিমত ছিল না। সমর্থনে যে ক্ষীণ ভাষা ছিল, সেটা অপরপক্ষের তুমুল কলরবে চাপা পড়ে গিয়েছিল।

উপসংহারে, ধীর স্থির, নরমপন্থী কংগ্রেসের একবিংশ অধিবেশনের সভাপতি গোপালকৃষ্ণ গোখেলের অভিমত উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বঙ্গভঙ্গকে সরকারের একটি নিষ্ঠুর অত্যাচার বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, 'যে আন্দোলন উদ্ভূত হয়েছে, সেটা তীব্রতা ব্যাপকতা ও স্বতঃস্ফূর্ততাব বিচারে ভারতের সকল রাজনৈতিক বিক্ষোভকে অতিক্রম করেছে। জনসাধারণের ক্ষোভের এই বিরাট উদ্গিরণ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় জাতির প্রস্তুতির পথে এক গভীর রেখাপাত করবে। বাইরের কোনো উস্কানি ছাড়াই সকল শ্রেণীর লোকই দেশের এই বিরাট অমঙ্গলের প্রতিবিধানে তৎপর হয়ে উঠেছে।

ঘৃতাহুতি

যখন কার্জন এসে ভারত-শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তখন উদারপন্থী দলের প্রভাব হ্রাস পেতে চলেছে এবং কার্জনী শাসনের ফলস্বরূপ তাঁরা লোপ পাবার পথ ধরতে বাধ্য হয়েছেন। যখন মহারাষ্ট্রে রাজকর্মচারী হত্যা, অরবিন্দের অভ্যুদয়, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বারীন্দ্রের গুপ্ত সমিতি গঠন, রাজনৈতিক আন্দোলনের নতুন পথ গ্রহণ প্রভৃতি ঘটেছে, তখন কার্জনের শাসনকাল বছর দুই উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও তিনি চোখ খুলে সমস্ত অবস্থা পর্যবেক্ষণের সময় করতে পারেন নি বা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই চলেছেন। বিপ্লবের আসন্ন ঘনঘটা তাঁর বিচারশক্তি আচ্ছন্ন করে রেখেছে বলে মনে হয়। সরকারী ব্যবস্থা জনসাধারণকে ক্রমশ বিদ্রোহী করে তুলল। ভাবতবর্ষের জনসাধারণের মনে হল, কার্জনের আবির্ভাব ও ক্রিয়াকলাপ মহারাষ্ট্রের র‍্যাণ্ডের অত্যাচার কাহিনীকে ম্লান করে ফেলেছে। এদেশের আপামর জনসাধারণকে রাজনৈতিক আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে যদি কেউ উৎসাহিত করে থাকেন, তিনি পরোক্ষভাবে লর্ড কার্জন ছাড়া আর কেউ নন।

এই সময়ের ঘটনা পরম্পরায় ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের গতি-প্রগতি উত্তাল হয়ে ওঠে। ভারতে ইংরেজ শাসন চিন্তাশীল শিক্ষিত ভারতবাসী মাত্রেরই মন বিষাক্ত করে রেখেছিল। জনসাধারণের আর্থিক দুর্দশা দ্রুত বেড়েই যাচ্ছিল।

কার্জন বলেছিলেন, ইংলণ্ড সম্বন্ধে ভারতবাসীর মধ্যে দুটি বিরুদ্ধ দল থাকতেই পারে না। এই বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে উনিশ শো পাঁচ খৃস্টাব্দের কংগ্রেস অধিবেশনে ফিরোজ শা মেহ্‌তা বলেছিলেন, 'এ আশা পোষণ করা নিতান্ত অযৌক্তিক, কারণ সেটা কখনই সম্ভব নয়। যখন, সমস্ত প্রজার মধ্যে যে সমতার উল্লেখ ছিল সেটা ছাপার অক্ষরে তুলে রেখে প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিপালিত হয় না, পরন্তু উপেক্ষিত হয়—

যখন, মহারানীর মহান ঘোষণামতে জাতি-ধর্ম-দেশ-নির্বিশেষে সকল পার্থক্য তিরোহিত হলেও কার্যক্ষেত্রে বিশেষ গুণ বা শক্তির ছলনায় বর্তমান ভারতীয়কে অযোগ্য বলে পরিত্যাগ করা হয় এবং শ্বেতাঙ্গ মনোনীত হয়—

যখন, বিশাল সাম্রাজ্যের অসহনীয় বোঝা সমস্ত উপনিবেশের সঙ্গে ভারতকে সমানভাগে ভাগ করে নেবার কথা, সেখানে অশোভন পক্ষপাতিত্বে একা ভারতের ধনভাণ্ডারের উপর সেই ভার চাপানো হয়—

যখন, সামরিক প্রয়োজনে ইংরেজের স্বার্থে এবং নিরাপত্তার অজুহাতে অবলম্বিত সমস্ত ব্যয় ভারতের ক্ষীণ অর্থসঙ্গতির উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়—

যখন, শ্বেতাঙ্গ জাতির গোপন স্বার্থে ও ছলনার আশ্রয়ে আচরিত নীতি দ্বারা ভারতীয় নাগরিক তাদের ন্যায্য, সঙ্গত দাবি ও প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় এবং যে-সকল আচরণকে কোনো কোনো ব্রিটিশ মন্ত্রী বুয়র যুদ্ধের কারণ বলে মনে করেন, আর সেই সব নীতি ভারতে প্রযুক্ত হয়—যখন, দুই দেশের অর্থবণ্টন নীতি ও বিলি-ব্যবস্থা গরীয়ান দেশ ভারতবর্ষের স্বার্থ উপেক্ষা করে বলবানের পক্ষে প্রযুক্ত হয়—

যখন, ইংলণ্ডের স্বার্থে ভারতের শিল্প প্রচেষ্টা ব্যাহত করা হয়—

যখন, শাসনকর্তাদের অন্তরে ভারতের প্রতি অত্যুগ্র প্রেম গর্ভজ সন্তানের প্রতি অতি স্বাভাবিক প্রেমের মতো মনে হয়—

যখন, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের নির্ভরযোগ্য অকপট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশ, স্বেচ্ছাচারী আদেশে ভণ্ডুল করা হয়—

যখন, অস্ত্র আইন প্রয়োগে একটা সমগ্র জাতিকে শক্তিহীন করে ইংলণ্ড ও ভারত উভয় দেশের স্বার্থহানি করা হয়—

যখন... যাক্‌গে, ভারতের আপত্তিকর ও তার বিরুদ্ধ-স্বার্থে পরিকল্পিত সরকারী ব্যবস্থার তালিকা আর দীর্ঘ করে লাভ নেই।'

এই যখন মডারেট বা নরমপন্থী একজন সর্বজনমান্য নেতার মনোভাব তখন এইসব ব্যাপারে চরমপন্থীদের অভিমত কতটা উগ্র হতে পারে তা' সহজেই অনুমান করা যায়।

আঠারো শো আটানব্বই সালের ডিসেম্বর মাসে লর্ড কার্জন যখন বড়লাট হয়ে ভারতে আসেন তখন তাঁর অভ্যর্থনার কোনো ত্রুটি হয়নি কারণ তখনও এই অত্যাচারী শাসকের স্বরূপ প্রকাশ পায় নি। বিশেষ করে, বড়লাট মনোনীত হবার পরে ইংলণ্ড ছেড়ে আসার প্রাক্কালে তিনি যে 'সুদুর্লভ মনোহারী বচন' দিয়ে ভারতীয়দের মন অভিভূত করে ফেলেছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কার্জন বলেছিলেন, 'আমি ভারতকে ভালোবাসি, ভালোবাসি তার জনসাধারণকে; তার ইতিহাস, তার শাসনব্যবস্থা, তার সমস্যাসঙ্কুল সভ্যতা এবং তার জীবনের ধারা।'

কিন্তু কার্জনের আসল চেহারা চেনা গেল যখন ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন থেকে তাঁকে লাটপ্রাসাদে অভিনন্দন জানাবার তোড়জোড় করা হয়। সুরেন্দ্রনাথ-প্রমুখ এক বিশিষ্ট নাগরিকদল তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে, দু'জনের পায়ে দেশীয় জুতো থাকাতে কার্জন তাঁর সেক্রেটারীকে দিয়ে ওই দু'জনকে লাটপ্রাসাদ থেকে বিদায় করে দেন। ক্ষুব্ধ অপমানিত ভদ্রলোক দু'জন চলে যাবার পর সেদিন দালানে লাটমূর্তির আবির্ভাব ঘটেছিল।

এরপরই কার্জন উনিশ শো এক খৃস্টাব্দে সিমলায় শিক্ষা-সম্বন্ধীয় এক গোপন বৈঠকের ব্যবস্থা করেন। ওই বৈঠকে কোনো ভারতীয়কে ডাকা হয়নি। ওই সভাতেই তিনি বলেন, যেখানে জনসাধারণের স্বার্থ জড়িত, সেখানে গোপনীয়তা মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়। অথচ এই অনুষ্ঠানেরই আলোচ্য বিষয় ও গৃহীত সিদ্ধান্ত কখনও প্রকাশিত হয় নি।

কলকাতা পুরসভা পরিচালনায় 'যেটুকু স্বাধীনতা জনপ্রতিনিধিদের ছিল, তা খর্ব করে তিনি এটিকে সরকারের তাঁবেদারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। বিক্ষোভ হয়েছিল, কিন্তু কোনো ফলই হয় নি। রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছিলেন, 'প্রকৃত জনপ্রিয় শাসন ভেঙে পড়ল'।

ভারতের রাজনীতিতে ও প্রশাসনে কার্জন যখন তাঁর প্রভাব বিস্তার করতে চলেছিলেন, তখন অর্থনৈতিক দিক থেকে ভারতের এক ঘোর দুঃসময়। দুর্ভিক্ষ ও দারুণ অন্নাভাব দেশকে জর্জরিত করে তুলেছিল। সেই সময় কয়েকটি ব্যয়বহুল অনুষ্ঠানে ও অবান্তর যুদ্ধাভিযানে কোটি কোটি টাকা অনর্থক ব্যয় করেছেন কার্জন। ভারতের জনগণ তখন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল।

এদিকে কার্জনও কংগ্রেসের উপর খাপ্পা হয়ে উঠেছিলেন। তিনি ইংলণ্ডের কর্মকর্তাদের কাছে প্রেরিত এক চিঠিতে লিখেছিলেন, কংগ্রেসের আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে এসেছে, তিনি তার শান্তিপূর্ণ সমাধির জন্য চেষ্টা করছেন। মানসিক এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট স্যার হেনরি কটনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অস্বীকার করে তাঁর নিজের মানসিক সংকীর্ণতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

উনিশ শো চার খৃস্টাব্দের অধিবেশনের শেষে উনত্রিশে ডিসেম্বরে কংগ্রেসের গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো কার্জনেব হাতে দেবার জন্য সভাপতি কটন একটি চিঠি পাঠান। পত্রপ্রাপ্তির চার দিন পরে কার্জনের সচিব জানান, এর আগে কোনো বড়লাট-বাহাদুর কাউকে এরকম সাক্ষাতের সুযোগ দেন নি। তাই এই রকম সাক্ষাৎকার মঞ্জুর করে তিনি তাঁর অনুগামীদের জন্য বাজে নজির সৃষ্টি করতে চান না।

কার্জনের এই ঘৃণ্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বোঝা যায়, সেদিন ভারতের ধূমায়িত অসন্তোষ সম্পর্কে তিনি অন্ধ ছিলেন: ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জনপ্রতিনিধিকে এইভাবে অপমান করায় সেদিন এদেশের প্রত্যেকটি সচেতন মানুষ নিজেকে অপমানিত বোধ করেছিলেন।

এমন কি, এই অশালীন আচরণ ইংলণ্ডের অনেকগুলো পত্রিকা-সম্পাদকের দৃষ্টি এড়ায় নি। 'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ' পত্রিকার লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা তার-যোগে জানিয়েছিলেন, বিলেতে বহুসংখ্যক ভদ্রলোক আছেন যাঁরা মনে করেন, কার্জনের পক্ষে কংগ্রেস প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ প্রত্যাখান করা তখনকার ইংলণ্ডের একশ্রেণীর শাসকের উৎকট মনোভাব প্রকাশ করেছে। 'লণ্ডন ডেলি নিউজ' ও 'মর্ণিং লীডার' কার্জনের আচরণের তীব্র নিন্দা করে। প্রথমোক্ত পত্রিকা বলে যে, কটনের অপমান সারা ভারতের মর্মে আঘাত করেছে; এটা কটনের ব্যক্তিগত অপমান নয়। এই ধরণের ব্যবহার ভারতবাসীর প্রতি আমলাতন্ত্রী লাটের ঘৃণার পরিচায়ক।

এর সঙ্গে ওই পত্রিকা একটি সতর্কবাণীও উচ্চারণ করেছিলেন, 'নানাভাবে কার্জন এ যাবৎ ইংলণ্ডের প্রতি ভারতীয় জনগণের বিরাগ সৃষ্টি করে আসছেন, কিন্তু তাঁর এই উদ্ধত ব্যবহাব তাঁর ইতিপূর্বেকার সকল বুদ্ধিহীন, নিন্দনীয় ও বেদনাদায়ক আচরণকে অতিক্রম করেছে।'

কার্জনের অহঙ্কার ছিল, 'সত্যের সর্বোচ্চ আদর্শ প্রধানত প্রতীচ্যে উদ্ভূত'। উনিশ শো পাঁচ খৃস্টাব্দের এগারোই ফেব্রুয়ারী তারিখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ দান কবতে গিয়ে এই উদ্ধত পণ্ডিতন্মন্য ব্যক্তি বলেন, 'প্রাচীতে সম্মান পাবার আগেই প্রতীচ্যের নীতিশাস্ত্রে সত্য অতি উচ্চ-স্থান অধিকার করেছিল, আর সেই সময় প্রাচীতে চাতুরী ও কূটনীতিক বঞ্চনা অতি গৌরবের স্থানে অধিষ্ঠিত ছিল।'

এই বিচিত্র তথ্যদান ছাড়াও তিনি যেখানেই ভাষণ দিতেন, সেখানেই ভারতীয়দের প্রতি ক্রমাগত বিষোদ্গার করতেন। তাঁর মতে, ভারতীয়দের প্রথম দোষ অতিরঞ্জন। তথ্যবিবর্জিত আবিষ্কার ও আরোপ নাকি ভারতে অস্বাভাবিকরূপে পুষ্ট হয়ে থাকে। 'অশ্বনীড়' বা আজগুবি গল্প ভারতে যত চলে, অন্যত্র সেরকম কদাচিৎ দেখা যায়।

এতসব কুৎসিত মন্তব্য করেও কার্জন ভারতীয়দের ছেড়ে দেন নি। তিনি ভারতীয়দের চরিত্র থেকে যে সব দুর্বলতা চিরকালের মতো নির্বাসন দিতে চেয়েছেন, সেগুলো হল চাটুবাদ, কটু নিন্দাবাদ,

তোষামোদ, পরীবাদ, কুৎসা গালিগালাজ ও মিথ্যা আরোপ। ভগিনী নিবেদিতা কার্জনের বই 'দ্য প্রব্লেম্‌স্‌ অফ দ্য ইস্ট' থেকে এক উদ্ধৃতি 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় সরবরাহ করেন। বক্তৃতার তিন দিনের মধ্যেই মুদ্রিত হয়ে এটা প্রকাশিত হয়। সেই বই পড়ে জানা যায়, কোরিয়ার রাজপ্রতিনিধির কাছে 'সত্যসন্ধ' কার্জন তাঁর বয়স সম্বন্ধে মিথ্যে কথা বলেছিলেন। তিনি ওই প্রতিনিধির কাছে আরও বলেছিলেন, তিনি নাকি অবিবাহিত। প্রাচ্যের অধিবাসী ও কোরিয়ার প্রতিনিধি নিয়ে ব্যঙ্গোক্তি ও বিদ্রূপে ভরা লেখাটি ছাপা হলে হয়ত কার্জনের মতো লজ্জাহীনেরও কিছুটা অস্বস্তি লেগেছিল, কারণ পরের সংস্করণে ওই বই থেকে এই অংশটুকু বাতিল করা হয়েছিল।

উনিশ শো পাঁচ খৃস্টাব্দের দশই মার্চ তারিখে টাউন হলে যে বিরাট প্রতিবাদ-সভা আহুত হয়েছিল সেখানে সভাপতি রাসবিহারী ঘোষ দুঃখ করে বলেছিলেন, প্রাচ্যে যে-সকল মহাপুরুষ জন্মেছিলেন, গৌতম বুদ্ধ, যীশু খৃস্ট, মহম্মদ, তাঁরা অপরের উপর কর্তৃত্ব করতে শেখান নি। শিখিয়েছিলেন, কেমন করে মরতে হয়। অর্থাৎ ওঁরা পবিত্র মৃত্যুভয়হীন জীবনযাপন করে গেছেন এবং সেই আদর্শ দেশবাসীর জন্য রেখে গেছেন। এই বক্তৃতার তিন বছরের মধ্যেই বাঙালী ছেলেরা কেমন করে স্বাধীনতার জন্য অকাতরে প্রাণ বিসর্জন করতে পারে তার প্রমাণ দিয়েছে।

কার্জনের বিবেকহীন কাজকর্মের কোনো সীমা-পরিসীমা ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর সরকারী প্রভুত্বস্থাপনের চেষ্টা, ছাপাখানা ও পত্রিকার উপর বাধা-নিষেধ আরোপ, 'দরিদ্র শ্বেতাঙ্গ'দের জন্য কর্মসংস্থান প্রভৃতি ব্যাপারে তাঁর স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্তগুলো জন-মানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। আর, এই সময়েই এসেছিল বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব।

প্রভুত্ববিলাসী কার্জন পদাধিকার বলে ছিলেন এদেশের ভাইসরয়, ইংলণ্ডেশ্বরের প্রতিভূ, সর্বময় কর্তা। তিনি নিজেকে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের মত সামরিক সকল বিভাগের অধ্যক্ষ বলে মনে করেছিলেন। ভারতের সেনাপতি হবেন তাঁর একজন পরামর্শদাতা পার্ষদ মাত্র। তিনি না বুঝে এই শক্তির পরীক্ষায় নেমে পড়েছিলেন। দ্বন্দ্ব বাধল, ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের প্রিয় ও প্রভাবশালী, ভারতের প্রধান সেনানায়ক কিচ্‌নারের সঙ্গে। ভিতরে-ভিতরে তুমুল বিতণ্ডা ও বাদানুবাদ চলছিল বেশ কিছুদিন ধরে। শেষপর্যন্ত কিচ্‌নারের কাছে কার্জনের পরাজয় ঘটল। ব্রিটিশ সরকার কার্জনের অনেক আবদার সহ্য করেছিল। কিচ্‌নারকে এবার তারা অসন্তুষ্ট করতে আর সাহসী হল না। কার্জনের নানা আচরণ ব্রিটিশ সরকার হয়তো আর তত পছন্দ করছিল না। ভারতের নানাস্থানে অশান্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল, বিশেষত সামরিক বিভাগে প্রধান সৈন্যসরবরাহকারী পাঞ্জাবীদের মধ্যে ঘনায়মান অসন্তোষ সুষ্ঠুভাবে দূর করতে সমর্থ হওয়ায় কিচ্‌নার তখন ব্রিটিশ সরকারের দারুণ সুনজরে ছিলেন। ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বে পরাজিত হয়ে ক্রোধে ক্ষোভে অপমানে কার্জন পদত্যাগ করতে বাধ্য হন ওই বছরের বিশে আগস্ট তারিখে। কার্জন নয়ই নভেম্বরে চিরতরে ভারতবর্ষ ছেড়ে গেলেও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য হিসেবে ভারতের ক্ষতি-সাধনে সচেষ্ট ছিলেন। তিনিই বলেছিলেন, পূর্ব বাংলার ছোটলাট ব্যামফিল্ড ফুলার-এর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা অন্যায় হয়েছে। বলা বাহুল্য, ফুলারও কার্জনের মতো এক অত্যাচারী প্রশাসক। উনিশ শো আট খৃস্টাব্দের জুন মাসের শেষে পার্লামেন্টে হাউস-অফ-লর্ডস-এ এক সভায় কার্জন বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ সম্বন্ধে দায়িত্ব পরের ঘাড়ে চাপাতে চেয়েছিলেন। 'লণ্ডন টাইমস্‌' পত্রিকা আসল ব্যাপারটা জানতে চাইলে, তিনি পয়লা জুলাই তার এক লিখিত উত্তর পাঠিয়ে দেন যার মূল বক্তব্য হচ্ছে যে, এই কাজ সম্বন্ধে তিনি কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করছেন না কারণ উনিশ শো চার খৃস্টাব্দে ছুটি উপলক্ষে তিনি যখন ইংলণ্ডে ছিলেন, তখন বঙ্গভঙ্গ সংশোধিত হয়েছিল এবং ডিসেম্বর মাসে ভারতে ফিরে গিয়ে কার্জন ওই কাজটিকে সমর্থন জানাতে বাধ্য হন। অবশ্য তিনি একথাও বলেন, 'পত্রিকা যেমন বলছে, চরম দায়িত্ব আমার এবং আমি তা কখনও এড়াতে চেষ্টা করিনি।'

কার্জনের শাসনকালে ইংরেজ সরকার ভারতের জনমতকে জগদ্দল পাথরের নিচে ফেলে দলিত করে। সরকারের লক্ষ্য ছিল, কোথাও কোনো আন্দোলন যেন মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে।

স্বাধীনতা-লাভের প্রচেষ্টায় জাগ্রত জাতির মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে কার্জনের কোনো সচেতনতা ছিল বলে মনে হয় না। তাঁরই শাসনকালে বাংলার দিকে-দিকে গণবিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। লর্ড রোনাল্ডসে কার্জনের জীবনী লিখেছেন। তিনি লিখেছেন, 'বাংলার তৎকাল বিচার-বিচ্যুত উৎকট ভাবধারা ও তজ্জাত প্রয়াসের ঝড় উঠেছে এবং ভাবাবেগে লোককে জাগতিক প্রাকৃত ঘটনার ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে (তারা আর অগ্র পশ্চাৎ ভাবছে না)। লর্ড কার্জন ফুৎকারে যে ভাবাবেগ উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, বিরাট তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্রের তন্ত্রীতে ঝঙ্কার ওঠার মতো, সেই উন্মাদনা আজ বাঙালীর স্নায়ু, শিরা, উপশিরা, স্পর্শ করেছে। এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে?'

অশান্তির আগুন দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। কার্জন ভারত পরিত্যাগের আগেই নানাস্থানে বিক্ষোভ বিস্ফোরণের ইঙ্গিত বহন করে আনছে। কিন্তু কার্জন তখন হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হয়ে বর্বরোচিত পন্থায় দমন-নীতি প্রয়োগ করতে লাগলেন।

নানা জায়গায় সরকারের সঙ্গে বিরোধ ও সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেল। আর, ঐ বিরোধ-সংঘর্ষে ঘৃতাহুতি দিতে থাকল, কার্জনেব শাসনকালেই প্রকাশিত তিনটি অগ্নিবর্ষী পত্রিকা--'সন্ধ্যা', 'যুগান্তর' ও বন্দেমাতরম।'

ঊনিশ শো পাঁচ খৃস্টাব্দে কংগ্রেস সভাপতি রূপে গোখেল কার্জনকে মোগল বাদশাহ আওরঙ্গ জেবের সঙ্গে তুলনা করে তাঁর বক্তব্য পরিস্ফুট করেন। 'দুজনের মধ্যেই লক্ষ্যস্থলে উপনীত হবার দৃঢ়চিত্ততা ও একাগ্র প্রচেষ্টা, আত্মভোলা কর্তব্যবোধ, বিস্ময়কর কর্মশক্তি, মানসিক নিঃসঙ্গতা, মানবজাতির উপর ঘোর অবিশ্বাস ও নির্যাতনপ্রবণতা প্রভৃতি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো বর্তমান। আর, তার ফলে বিরাট চিত্তবিক্ষোভ ও বিফলতাজনিত তিক্তচিত্ততা কার্জনকে অভিভূত করে রেখেছিল। ..লর্ড কার্জনের অন্ধ ভক্তরাও বলতে পারবে না যে, তিনি ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তির সামান্য পরিমাণেও শক্তি বৃদ্ধি করেছিলেন। এবং গোখেল-এর মন্তব্যের সূত্র ধরেই আমরা বলতে পারি, আওরঙ্গজেবের মতোই লর্ড কার্জনও বিরাট সাম্রাজ্যের ধ্বংসের বীজ বপন করেছিলেন।

আনন্দমোহন বসুও বলেছেন, 'সত্যিই কার্জন সাহেব এক স্মরণীয় উপকার করেছেন। আমরা সেই সূত্রে জাতীয় জীবনের অমূল্য ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনে সমর্থ হয়েছি।'

আঠারো শো নিরানব্বই থেকে ঊনিশ শো পাঁচ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাস পর্যন্ত এই সাড়ে পাঁচ বছর সময়ের মধ্যে একজন ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল এদেশের জনসাধারণকে এমনভাবে ক্রমাগত উত্ত্যক্ত করেছেন, শাসনের নামে নিপীড়ন চালিয়েছেন যার ফলে ওই স্বল্প সময়ের মধ্যে স্বাধীনতা-সংগ্রামের মাত্রা চতুর্গুণ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও আরও কয়েকটি ঘটনা

উনিশ শো পাঁচ খৃস্টাব্দের ষোলোই অক্টোবর তারিখে লর্ড কার্জনের কলমের খোঁচায় বাংলাদেশ দ্বিখণ্ডিত হলে পূর্ব বাংলার রাজধানী হল ঢাকা, পশ্চিম বাংলার রাজধানী কলকাতা। দুই বাংলার প্রশাসনিক কর্তা হলেন দু'জন লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্নর। সারা বাংলায়, ছোটলাট।

এই দুই ছোটলাটের মধ্যে ঢাকার ছোটলাট-এর দাপটে মানুষ অস্থির। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির অপচেষ্টায় তিনি ও তাঁর প্রশাসন তৎপর।

স্বদেশী আন্দোলন দিনে দিনে ব্যাপক ও গভীর হয়ে উঠতে লাগল। সমগ্র বাঙালী জাতি যেন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। বিদেশী দ্রব্য বয়কট, বিদেশী-শাসিত স্কুল-কলেজ প্রত্যাহার, বিদেশী চিন্তা বর্জন, ব্যাপক পিকেটিং ইত্যাদি প্রচণ্ড আবেগে শুরু হল। স্বদেশী জিনিস ক্রয়, স্বদেশী পণ্য উৎপাদন, স্বদেশী ভাবাপন্ন হবার শিক্ষাগ্রহণের সংকল্পে সমগ্র বাঙালী জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে এগিয়ে চলল।

ইংরেজ যাবতীয় দমন-পীড়ন নীতি অব্যাহত রেখেও ভয় পেল। এমন অগ্ন্যুৎপাত ইংরেজ কখনও আশঙ্কা করেনি। বাঙলার বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং ছাত্র-সমাজ সেদিন যেন উন্মাদ হয়ে উঠেছিল।

আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার হৃদয়-মথিত প্রতিজ্ঞা : 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে।/দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গ সুখ তায় রে।'

সরকার সিদ্ধান্ত নিল, ছাত্রসমাজকে শায়েস্তা করতে হবে। অতএব তারা বের করল, 'এ্যান্টি স্বদেশী সার্কুলার।' তার প্রত্যুত্তরে গড়া হল 'এ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি'। ছাত্রদের মধ্যে আন্দোলন শুরু হয়ে গেল স্কুল-কলেজ ছেড়ে দিয়ে 'জাতীয় মহাবিদ্যালয়'-এর ছায়াতলে আসার। রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক, তারক পালিত, রাসবিহারী ঘোষ, মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, গোপালচন্দ্র রায়চৌধুরী, গোপালচন্দ্র সিংহ, মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রমুখ দানবীরের বদান্যতায় এই মহাবিদ্যালয় ও জাতীয় শিক্ষা দিনে দিনে প্রসারিত হয়ে চলল। শ্রীঅরবিন্দ নিলেন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের দায়িত্ব।

বৃহত্তর বাংলায় একটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অংশ হিসেবে বয়কট, পিকেটিং এবং কর্মক্ষেত্রে শাসকের নির্যাতন উপেক্ষা করে এগিয়ে যাবার কার্যক্রম গ্রহণ করল আন্দোলনকারীরা। এই যুদ্ধে সামিল হলেন আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিত্তরঞ্জন দাশ, এ রসুল, লিয়াকৎ হোসেন, ফজলুল হক, সরলা দেবী, ভগিনী নিবেদিতা, সখারাম গণেশ দেউস্কর, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র থেকে শুরু করে বাংলার ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে আপামর জনসাধারণ। বেত মেরে, আগুনে পুড়িয়ে, জেলে পাঠিয়ে, হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা বাধিয়ে, সংবাদপত্র দাবিয়ে, পাইকারী অর্থদণ্ডের আঘাত দিয়ে এই ঝোড়ো আন্দোলনকে সরকার থামাতে পারল না। বাঙালীর একতাবোধ, স্বাজাত্যগরিমা এবং স্বদেশপ্রেম সারা ভারতবর্ষকে অনুপ্রাণিত করল। সেদিন 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি অক্ষয় কবচ হয়ে সকলকে মনে-প্রাণে অসামান্য সামর্থ্য দান করেছিল। এই যৌবন-জলতরঙ্গ লক্ষ্য করে স্যার হেনরি কটন পর্যন্ত বলেছিলেন, 'চট্টগ্রাম থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত সারা ভারতবর্ষে বাঙালীরা নিজের সামর্থ্যে বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ-আন্দোলনের স্বপক্ষে জনমত গড়ে তুলতে পেরেছেন।' অরবিন্দ বললেন, 'অত্যাচারী শাসক কোনকালে কি স্বাধীনতার প্রতি মানুষের স্বভাবজাত ভালোবাসাকে শাসনের আঘাতে দমন করতে পেরেছে? অত্যাচারে বরং এই 'ভালবাসা' শক্তিলাভ করে, শাসকের পদভারে দলিত এর রূপ সহস্রদলে বিকশিত হয়।' তাই, অরবিন্দ 'বঙ্গভঙ্গ'কে ভারতীয় জীবনে সর্বোত্তম আশীর্বাদ বলে মনে করেন। অন্য কোনো ঘটনাই এতকালের জড়তা এত সহজে দূর করে জাতির জীবনে জাতীয়তাবোধের প্রতি অমন তীব্র ও গভীর অনুরাগ জাগ্রত করতে পারত না।

তাই, এই বিশাল আন্দোলন বাঙালী-জীবনে 'সেট্‌ল্ড ফ্যাক্ট'-কে 'আনসেট্‌ল' করা পর্যন্ত দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছিল। কখনও একটুও কমেনি। দীর্ঘ আট বছরের অবিরাম সংগ্রামে মানুষের মনে কখনও ক্লান্তি আসেনি। ঊনিশ শো তিন খৃস্টাব্দের তেসরা ডিসেম্বর বাংলাকে ভাগ করার প্রস্তাব করেন লর্ড কার্জন আর ঊনিশ শো এগারো খৃস্টাব্দের বারোই ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গ রদ করে দুই বাংলাকে যুক্ত করেন সম্রাট পঞ্চম জর্জ। অন্তর্বর্তী এই আট বছর দশ দিন ধরে বাঙালীর এই দুর্দমনীয় সংগ্রাম ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা লাভের জন্য আত্মপ্রত্যয় দান করেছে। বাংলার এই কীর্তি কোনোপ্রকার প্রাদেশিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়নি। বাংলার আন্দোলনের মধ্যে সর্বভারতীয় চেতনা প্রথম থেকেই অটুট ছিল।

একথা অনস্বীকার্য যে 'বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন' বৈপ্লবিক তথা সশস্ত্র আন্দোলনের ধারাকে উত্তরোত্তর শক্তিশালী করে তুলেছিল। অরবিন্দ বরোদা থেকে বাংলায় আসার পর যে বৈপ্লবিক চেতনা সাংগঠনিক আকার ধারণ করেছিল তা স্বদেশী আন্দোলনের ধাক্কায় অপূর্ব প্রেরণা লাভ করে চলল। তার বহিঃপ্রকাশ 'যুগান্তর', 'সন্ধ্যা,' 'বন্দেমাতরম্' 'নবশক্তি,' 'কর্মযোগিন্' প্রভৃতি বিপ্লবী পত্রিকাগুলোর পাতায়-পাতায় দেখে দেশবাসী অভূতপূর্ব দেশাত্মবোধে ও প্রবল কর্মানুগত্যে চঞ্চল হল। সেই চাঞ্চল্য সরকারকে ভীতসন্ত্রস্ত করে দিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' তথা 'বন্দেমাতরম্ সংগীত' অরবিন্দের 'ভবানী মন্দির' নামক প্রবন্ধ, রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য স্বদেশী সংগীত, রাখীবন্ধনের প্রচলন ও নিজস্ব সক্রিয় অংশগ্রহণ, 'যুগান্তর' পত্রিকার

কয়েকটি রচনা সংগ্রহ করে প্রকাশিত 'মুক্তি কোন্ পথে' পুস্তিকা এবং 'বর্তমান রণনীতি' প্রভৃতি গ্রন্থ বাঙালীর চিন্তা ও কর্মজগতে সেদিন আগুনের স্পর্শ এনে দিয়েছিল। পুস্তক-পুস্তিকার পাশে-পাশে প্রচারিত হতে থাকল গোপন ইস্তাহার ও গোপন পুস্তিকা। এইসব ইস্তাহার ও পুস্তিকার ভাষায় কোনো সংকোচ, দ্বিধা বা আব্রু নেই। তার প্রকাশ শাণিত ও ক্ষুরধার। বিপ্লবের সরাসরি আবেদন সেইসব রচনায়। ভারতবাসীকে সশস্ত্র আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে ডাক দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধ করে ইংরেজকে তাড়াতে হবে এই দেশের মাটি থেকে।

বাংলা, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবের জাতীয়তাবাদী কাগজগুলো অনুক্ষণ বলতে থাকল, ভয় ত্যাগ করো।

'বন্দেমাতরম্' কাগজের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা

'বন্দেমাতরম্' কাগজের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা উঠেছে কলকাতার চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট-এর এজলাসে। ম্যাজিস্ট্রেটের নাম কিংসফোর্ড, জাঁদরেল শাসক।

'বন্দেমাতরম্' কাগজে রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধগুলোর রচয়িতার নাম ছিল না। পুলিশ সন্দেহ করল, ওগুলো আর কারও লেখা নয়, খোদ অরবিন্দেরই রচনা। বিপিনচন্দ্র পাল তখন ওই পত্রিকাটির সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং ওই কাগজে তখনও ওঁর জ্বালাময়ী রচনাগুলো প্রকাশিত হয়। অবশ্য, লেখক বা সম্পাদক হিসেবে ওঁর নাম কাগজে মুদ্রিত হত না।

চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট বিপিনচন্দ্রকে সাক্ষ্য দেবার জন্য তলব করলেন। উদ্দেশ্য ছিল, উকিলের জেরায় প্রকাশ পাবে, এই পত্রিকার লেখকরূপে এবং সম্পাদকের দায়িত্বে অরবিন্দ কতখানি জড়িত। বিপিনচন্দ্র আদালতে এলেন কিন্তু সাক্ষ্য দিলেন না। শুধু বললেন, 'এ মামলায় কোনো অংশগ্রহণে আমার সজ্ঞান আপত্তি আছে। কারণ, আমি বিশ্বাস করি যে, এ মামলা ন্যায় বিগর্হিত এবং গণ-স্বাধীনতার স্বার্থ ও জনগণের শান্তির বিরোধী। এ-মামলার শপথ গ্রহণ করাতেই তাই আমার আপত্তি। সুতরাং এ-সম্পর্কে আদালতের কোনো প্রশ্নেরই উত্তর আমি দেব না।'

বিপিনচন্দ্রের এই স্পর্ধিত উক্তিতে ব্রিটিশরাজ চমকে গেল। সারা ভারতবর্ষ বিদ্রোহী এই দেশ-নায়কের দিকে শ্রদ্ধায় ও বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। গান্ধীজি যে 'অসহযোগ' ও 'নিষ্ক্রিয়-প্রতিরোধ' রূপ নিরস্ত্র বিদ্রোহের পথ চালু করেছিলেন, তা অন্তত ষোলো-সতেরো বছর আগে বাংলায় অরবিন্দ-বিপিনচন্দ্র-ই কার্যকর করেছিলেন। ইংরেজের আদালতে দাঁড়িয়ে আদালতকে অস্বীকার করে বিপিনচন্দ্রই সর্বপ্রথম ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধে'র দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন। আদালত অবমাননার দায়ে বিপিনচন্দ্রের ছ'মাস কারাদণ্ড লাভ হল। এই রায় বেরোলো উনিশ শো সাত খৃস্টাব্দের ছাব্বিশে আগস্ট। কোর্টের বাইরে বিপুল জনসমুদ্র। তারা শ্রদ্ধেয় নেতা বিপিনচন্দ্রকে অভিনন্দন জানানোর জন্য সারা দেশ থেকে ছুটে এসেছে। জনতার কণ্ঠে শুধু 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি। সেই উচ্ছ্বাস ও আকুলতায় সমগ্র জনসমুদ্র যেন প্লাবিত। জনতার কণ্ঠ যেন দেশাত্মবোধে ঝঙ্কৃত যুদ্ধ-নিনাদে কাঁপছে।

আইনের রক্ষকেরা ওই দৃশ্য ও শব্দ আর সহ্য করতে পারল না। শ্বেতাঙ্গ সার্জেণ্টরা বেট্ন হাতে নিয়ে হিংস্র উন্মত্ততায় দস্যুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল নিরস্ত্র জনতার উপর। নিরস্ত্র মানুষদের মাথা ফেটে যাচ্ছে। কিন্তু রক্তাপ্লুত অবস্থাতেও সমগ্র জনগণ বন্দনা জানাচ্ছিল দেশ-মাতাকে, শ্রদ্ধা জানাচ্ছিল তাদের দেশ-নেতা বিপিনচন্দ্রকে।

এই মর্মান্তিক দৃশ্য সহ্য করতে পারল না একটি বালক। বালকটির মাত্র পনেরো বছর বয়স। বীরদর্পে এই বালকটি এগিয়ে গেল এক হিংস্র সার্জেন্টের সামনে। তাকে ওই নৃশংস কাজের জন্য চ্যালেঞ্জ করে বসল এই উদ্ধত বীর। কিশোর সুশীল সেনের উদ্যত ঘুষি সার্জেন্টের উদ্যত বেট্নকে স্তব্ধ করলেও

সরকারকে স্তব্ধ করতে পারেনি। কিংসফোর্ডের কোর্টেই পরের দিন বিচার হল এবং সুশীলের পনেরোটি বেত্রাঘাতের সাজা হল। সারা দেশ ও দেশবাসী নির্মম ও অভিনব এই বিচারে ক্ষিপ্ত হয়ে গেল। ছাত্রকে নিয়মানুবর্তিতা শেখাবার এই বর্বর পন্থায় ইংরেজের কাগজ 'দ্য নেশন' পর্যন্ত না লিখে পারল না—'রাজনৈতিক কারণে কোনো শিক্ষিত ব্যক্তিকে বেত্রাঘাতে দণ্ডিত করা নিশ্চয়ই অভিনব এক কলঙ্ক। জার্-এর রাশিয়াতে পর্যন্ত রাজনৈতিক অপরাধে বেত্রাঘাতে দণ্ড বিরল।'

সুশীল সেন

সুশীল চন্দ্র সেন একেবারে বালক-বয়স থেকেই বিপ্লবীদের অগ্নিস্পর্শে দুর্জয় এক কর্মী। ইংরেজ পুলিশ একের পর এক বেত্রাঘাত করে যাচ্ছে তার কিশোর-দেহে বন্দী-অবস্থায়, জেলের অভ্যন্তরে। কিন্তু শত অত্যাচারেও ওই বালকের মুখ ভাবলেশহীন। তার চোখে আতঙ্কের কোনো ছায়া পড়েনি। ধ্যানস্থ অপরূপ তাঁর রূপ। মাতৃমন্ত্রের এই কিশোর সাধকের কাছে মাতৃহন্তারক দস্যুর গর্জন নিরর্থক।

জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র সুশীল বেত্রাহত হয়ে কারাগার থেকে বেরিয়ে এলেন যেন এক সিংহ শিশু। ওর সম্মানার্থে সেদিন মহাবিদ্যালয়ে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছিল।

পরদিন কলেজ স্কোয়ারে বিরাট সভা। বীর বালককে দেশবাসী বীরোচিত সংবর্ধনা দেবে। এই উপলক্ষে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত সভার সভাপতির কাছে বীর বালককে উপহার দেবার জন্য একটি স্বর্ণপদক পাঠিয়ে দিলেন। জনতা শোভাযাত্রা করে সুশীলকে নিয়ে গেল সভাস্থলে। জনতার কণ্ঠে ধ্বনিত হল একটি গান 'যায় যাবে জীবন চলে/জগৎ মাঝে তোমার কাজে "বন্দেমাতরম্" বলে;/বেত মেরে কি মা ভোলাবি,/আমরা কি মায়ের সেই ছেলে?'

বেত মেরে মা ভোলাতে পারে নি কাউকেই--না সুশীলকে, না সংগ্রামী ভারতকে।

সুশীলের বাড়ি শ্রীহট্ট জেলার বানিয়াচঙ্ গ্রামে। সুশীল সেখানে গেলে একদিন পুলিশ এসে তাকে গ্রেপ্তার করল। কলকাতায় এনে তাকে অভিযুক্ত করা হল 'আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা'য়। নিম্ন আদালতে সাত বছরের সাজা হলেও হাইকোর্টে প্রমাণাভাবে তাঁর মুক্তিলাভ ঘটল। কুড়ি বছর বয়সে পা দিয়ে সুশীল একটি বৈপ্লবিক কাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন। কয়েকজন সতীর্থ মিলিত হয়ে তাঁরা নদীয়া জেলার প্রাগপুরে একটি অর্থলুটের পরিকল্পনা নিয়ে যান। পরপর দু'দিন তাঁরা সাফল্যের সঙ্গে একাধিক ডাকাতিও করেন। তারপর একসময় গ্রামের লোক ও পুলিশের লোকের তাড়া খেয়ে জলপথে পালাবার সময় পুলিশের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ হয়। নিজেদের গুলিতেই বিপ্লবীদের একজন আহত হন। রক্তে ভেসে যেতে থাকল তাঁর দেহ। সেই রক্তস্নাত দেহটিকে নিয়ে বিপ্লবীরা প্রাণপণে দাঁড় টেনে পালিয়ে যেতে থাকলেন। সুশীল-ই এই গুরুতর আহত যুবক।

সুশীল ক্ষীণ অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বন্ধুদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'আমার মৃত্যু এসে গেছে। মৃত্যু আমাকে স্পর্শ করা মাত্র তোমরা দেহ থেকে আমার মাথাটা বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। মাথাটা কাদামাটির মধ্যে লুকিয়ে রেখো; দেহটা জলে ভাসিয়ে দিও। নইলে মৃতের বোঝা নিয়ে সবাই ধরা পড়ে যাবে। বিপ্লবের কাজ ব্যাহত হবে।'

মুহূর্তের মধ্যে সুশীলের মৃত্যু হল। তাঁর আদেশ শিরোধার্য করে তাঁর মাথা দেহ থেকে কেটে ফেলা হল। দেহ ভাসিয়ে দেওয়া হল স্রোতের জলে। মাথা পুঁতে রাখা হল কাদামাটিতে, ঝোপঝাড়ের আড়ালে। ভারতবর্ষের একটি বর্ণোজ্জ্বল অশান্ত বিপ্লবীর জীবনদীপ এইভাবে নির্বাপিত হল। জানা গেছে যে, মাণিকতলা ও কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের মোড়ে দারোগা সুরেশ মুখার্জীকে হত্যার ব্যাপারে সুশীল সেনও জড়িত ছিলেন।

সাগ্নিক পূজারী ঃ অরবিন্দ ঘোষ

বাংলার বিপ্লবযজ্ঞের হোতা অরবিন্দ ঘোষ ভারতবর্ষে পৌঁছলেন আঠারো শো তিরানব্বই খৃস্টাব্দে, আর তাঁর আগমনের প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই কেবল বাংলায় নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে একটা অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে গেল। গণপতি ও শিবাজী উৎসবের ভিতর দিয়ে বাল গঙ্গাধর তিলক গণ-আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন। ওই একই সালে শিকাগোতে স্বামী বিবেকানন্দের যুগান্তকারী বক্তৃতা আর অ্যানি বেসান্তের ভারতের মাটিতে প্রথম পদার্পণ। আরও ঘটেছিল ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সভ্যপদের জন্য দাদাভাই নওরোজির বিজয়।

এই সময়েই ঘটল ভারতের ভাগ্যাকাশে অরবিন্দর অভ্যুত্থান। ইংলণ্ড ত্যাগ করে আসার আগেই তিনি এই দেশের রাজনৈতিক গতি-প্রকৃতির উপর নজর রাখছিলেন। সুতরাং এদেশে এসে তাঁকে শিক্ষানবিশী করতে হয় নি।

ওঁর লেখা প্রথম প্রবন্ধ 'ইন্দুপ্রকাশ'-এ প্রকাশিত হয় ওই সালের সাতই আগস্ট এবং পরের বছর ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত অনিয়মিতভাবে আরও কিছু প্রবন্ধ ওই পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। তাঁর এই প্রবন্ধগুলো 'পুরাতনের স্থলে নতুন বর্তিকা' শিরোনামে তাঁর কেম্ব্রিজের বন্ধু এবং পত্রিকা-সম্পাদক কে. জি. দেশপাণ্ডের অনুরোধে লেখা হয়। মাত্র দুটো লেখা প্রকাশিত হলে প্রবীণ রাজনীতিকরা আঁতকে উঠলেন। বিপ্লবের পাকা ভিত সেদিন স্থাপিত হল।

তখন ফিরোজ শা মেহ্‌তা এবং তাঁর অনুগামীরা কংগ্রেসের হাল ধরে রেখেছিলেন। তাঁরা সরকারের শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে উৎকট বিরুদ্ধ ভাব বা ভাষা প্রয়োগ করতে কুণ্ঠিত ছিলেন। সভায় নরম-গরম বক্তৃতা দিয়ে কর্তব্য সম্পাদন করেই তাঁরা ক্ষান্ত হতে চাইতেন। তখন কংগ্রেসের কর্ণধারদের কাছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনই ছিল পরম ও চরম লক্ষ্য।

এই পরিস্থিতিতে অরবিন্দ বললেন, 'কংগ্রেস একটা ভ্রান্ত পথ ধরেছে এবং সে-পথে ভারতের মুক্তি নেই।' অরবিন্দের তৎকালীন রচনা থেকে একটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিলে সমকালীন রাজনীতিতে অরবিন্দের অবদান সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা হবে। 'কংগ্রেস পুরানো হয়ে গেছে, তাতে পচন আরম্ভ হয়েছে। নতুন করে ঢেলে সাজা প্রয়োজন। তাজা রক্ত না জন্মালে শক্তিহীন ক্ষীণ হয়ে কংগ্রেস নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কেবল ধনী ও শিক্ষিতদের ছাড়া কংগ্রেস সমস্ত জাতিকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেনি। বিরাট জনসংখ্যার সঙ্গে এর কোনও যোগাযোগ নেই, কাজেই এতে জনমানসের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায় না। এতে আছে 'ব্যানার্জি (ডব্লু. সি.), ব্যানার্জি (সুরেন্দ্রনাথ) ও ঘোষরা (লালমোহন ও মনোমোহন) এবং মাত্র মুষ্টিমেয় লোক সমগ্র ভারতবাসীর প্রতিনিধিত্ব করছেন। তা দিয়ে আইনসভাব ভারতীয় সভ্যসংখ্যা বাড়তে পারে, সমকালে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা ভারতে ও ইংলণ্ডে পরিচালিত হতে পারে। এখানে ওখানে দু-একটা বড় পদে ভারতীয় নিযুক্ত হতে পারে বা এই জাতীয় ভেক বা মেকি সংস্কার আসতে পারে, তার বেশি আর কিছু সম্ভব নয়। এইভাবে ধীরে ধীরে পরিবর্তন আনতে আনতে ভারতের নামটাই বজায় থাকবে। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ রাষ্ট্রনায়কগণের অঙ্গুলি-হেলনে ভারতেব সকল স্বার্থ উপেক্ষিত হয়ে যাবে। শত মৌখিক প্রতিবাদ এবং দীর্ঘ 'রেজলিউশান' ছেঁড়া কাগজের টুকরায় পর্যবসিত হবে। বিরাট মূক জনগণের প্রতিনিধি এই কংগ্রেস। কিন্তু তাদের সুখ-দুঃখের কথা, অনাহার, অর্ধাহার, নিরক্ষরতা, চিররুগ্নাবস্থা, শিল্পনাশ, লুণ্ঠনের দ্বারা দারিদ্র্য-সৃষ্টি প্রভৃতি অবাধে চলে যাচ্ছে, কংগ্রেস তাকে রোধ করতে পারছে না বলে তত দুঃখ নেই, যত দুঃখ সে-বিষয়ে একটা বিধিবদ্ধ কর্মধারা পর্যন্ত নেই।

'নেতৃবৃন্দ মনে করেন এই রকম কোনও পথ অবলম্বন করতে গিয়ে জোর করে কিছু বলতে গেলে, শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষেরা ক্ষিপ্ত হবে। তাদের পরিচালিত পত্র-পত্রিকা রাজদ্রোহী বলে গর্জন করে উঠবে।

অরবিন্দ ঘোষ

সর্বশক্তি দিয়ে ইংরেজ সকল দাবী দমন করে দেবে। মডারেট নেতাদের ভয়ে যতটুকু হচ্ছে তাও বন্ধ হয়ে যাবে।'

অরবিন্দ আরও লিখেছেন, 'কিছুই তো হচ্ছে না, দেশ ক্ষয়ের দিকে চলেছে অব্যাহত গতিতে। অসহায় দর্শকরূপে নেতৃবৃন্দ সেই সর্বনাশ দেখে যাচ্ছেন। কোথাও এক-আধটা বক্তৃতা দিয়ে, প্রবন্ধ বা বই ছাপিয়ে আসল চিত্র দেখাবার ব্যর্থ চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু জোর করে প্রকৃত অবস্থা বলবার লোকও নেই। এই ধ্বনি সাধারণের কানে জোর করে আঘাত করলে, তারাই একদিন প্রতিকারের জন্য ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে এবং তাদের ন্যায্য দাবীর প্রচণ্ডতা রোধ করার শক্তি কারও থাকবে না। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এর ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।

'এই বিরাট জনশক্তিকে বিপ্লবের পথে পরিচালিত করা ভারতের জননায়কদের কর্তব্য। সে কর্তব্যে দারুণ অবহেলা তো আছেই, বরং কংগ্রেসকে ভুল পথে চালিত করা হচ্ছে। নেতামাত্রেই স্বার্থদুষ্ট, এ কথা মনে করবার কারণ নেই। কিন্তু তাঁদের দুরদৃষ্টির অভাব আজ সব বানচাল করে দিতে বসেছে। এখন সময় এসেছে যখন আমাদের কর্মপ্রচেষ্টা নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত হয়; দাবী উত্তরোত্তর বিস্তৃত ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে এবং তার শক্তি বৃদ্ধি পায়।

'বিদেশী শাসকবর্গের কাছে সুবিচার প্রার্থনা করা এবং তার ফললাভের জন্য নিশ্চেষ্ট বসে থাকা আত্মপ্রবঞ্চনার নামান্তর। নানা দুর্বলতা জাতির অন্তরে বাসা বেঁধে রয়েছে, তাকে দূর করতে শক্তিচর্চা করতে হবে। নিজে শক্তিহীন হয়ে পরের কাছে যাচ্ঞা করে কোনও জাত বড় হতে পারেনি। যার মেরুদণ্ড দুর্বল তাকে যত উৎসাহই দেওয়া যাক, সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। সমস্ত জাতির মধ্যে শক্তির তেজের প্রবাহ ছড়িয়ে দিতে হবে, মানুষ নিজেকে চিনে তাব নিজের পথ বেছে নিয়ে সুদৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাবে; তখন তার গতি দুর্ব্বার হবে, কেউ তাকে রোধ করতে পারবে না, সাহসও করবে না। অন্ততঃ দু'পক্ষের একটা কঠোর শক্তিপরীক্ষা হবে: আর দৃঢ়চিত্ত জাতি পরাধীন হলেও যথাকালে স্বপ্রতিষ্ঠিত হবেই হবে।

'ভারতবাসীর শত্রু বাইরে যতটা, তার চেয়ে দেশের ভিতর অনেক বেশী। নানা দুর্বলতা দেশের সকল অন্ধিসন্ধি ছেয়ে রয়েছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মনের শক্তি, কাম্যবস্তুর প্রকৃত চিত্রের অভাব, আত্মকলহ, পরস্পর দ্বেষ, ভেদবুদ্ধি, স্বার্থপরতা, সাম্প্রদায়িক কলহ প্রভৃতি তো আছেই, সঙ্গে আছে বিদেশীর উস্কানি। দেশেব অভ্যন্তরের সকল দুর্ব্বলতা দূর করতে না পারলে লক্ষ্যে পৌঁছুবাব কোনও সম্ভাবনা নেই। পথের মাঝেই স্রোতের গতি রুদ্ধ হয়ে যাবে। সুতবাং সকল মোহ পরিত্যাগ করে আত্মসম্বিৎ ফিরে পেতে হবে এবং তার জন্য সকল প্রকার চেষ্টা কবে চলতে হবে।

জাতীয়তাবোধের ভিত্তি হিসাবে অরবিন্দ এইসব কথা বলেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আসন্ন সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হবার নানা ইঙ্গিতও তিনি দিয়েছিলেন।

কংগ্রেসের নানা ক্রটির কথা বলেও অরবিন্দ ক্ষান্ত হননি। বাংলায় এসে বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করার আগে তিনি আসন্ন সংগ্রামের জন্য সশস্ত্র প্রস্তুতির কথা প্রকাশ্যে বলেছিলেন। হাতিয়ার নেই বলে নিরুৎসাহ হবার বা নিশ্চেষ্ট থাকার কথা তিনি ভাবেন নি।

তিনি বলতেন, সশস্ত্র বিপ্লব আনতেই হবে, কিন্তু এটা কেবলমাত্র কয়েকজন সাহসী বিপ্লবীর বিপদবরণ বা ত্যাগের মধ্য দিয়ে সম্ভব নয়; এর পিছনে প্রকাণ্ড জনসংখ্যার দেশপ্রেমজাত প্রচণ্ড বিক্ষোভের সমর্থন থাকা চাই। তা না হলে কয়েকজন কর্মী বেছে বেছে ধরে শাস্তি দিলে সমস্ত আন্দোলনটাই বানচাল হয়ে যেতে পারে। সুতরাং বিপ্লবী মনোভাব গড়ে তোলার এবং তাতে শক্তি-সংযোজনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রাখতে হবে।

অরবিন্দ সশস্ত্র হিংসাত্মক বিপ্লব সমর্থন করতেন না, এ কথা ভিত্তিহীন। তিনি সংগ্রামী গুপ্ত-সমিতির সমর্থক ছিলেন। যে সব বিপ্লব ও বিদ্রোহ পরাধীন দেশকে স্বাধীন করেছে, তিনি সে-সকলের ইতিহাস অভিনিবেশ-সহকারে পাঠ করেছিলেন। ইংরেজের বিরুদ্ধে মধ্যযুগের ফ্রান্সের সংগ্রাম এবং সেই সকল

বিদ্রোহ যার সাহায্যে আমেরিকা ও ইটালি পরাধীনতার শিকল থেকে মুক্তিলাভ করেছে সেই সকল ঘটনাকে তিনি উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করেছেন।

স্বাধীনতা-লাভের আন্দোলন কি পথ নেবে, তিনি সে-সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। 'ইন্দুপ্রকাশ'-এ লেখা এক প্রবন্ধে তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের গুণগান করেন। ইংলণ্ডের শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে প্রজা বা সামন্তশক্তির বিরোধের কথা তুলে তিনি উদাহরণস্বরূপ বলেন যে, রণিমীড থেকে কিংস্টন-অন-হলের হাঙ্গামায় পৌঁছতে ইংলণ্ডের প্রায় চার শতাব্দী লেগেছিল। কিন্তু তার প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভিন্ন পথ ধরেছিল। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, রণিমীড-এ বারো শো পনেরো খৃস্টাব্দের জুন মাসে সম্রাট জন্‌কে দিয়ে ইংরেজ সামন্তশক্তি ম্যাগনা-কার্টা সই করিয়ে নিয়েছিল। আর হল্ শহরে চারশো আটাশ বছর পরে সম্রাট চার্লস-এর সৈন্যবাহিনীকে বিধ্বস্ত করেছিল স্থানীয় গণতন্ত্রীদলের নেতারা। তারা স্লুইস গেট খুলে দিয়ে শহরের ঘেরা পরিখার সাহায্যে জল এনে আশে-পাশের সমস্ত অঞ্চল ভাসিয়ে দিলে সম্রাটের দলবল অবরোধ তুলে নিয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। অত্যাচারী সম্রাটদের বিরুদ্ধে যে বিরুদ্ধশক্তি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে জয়ী হতে পারে, এই উদাহরণ অরবিন্দ পাঠকদের কাছে উপস্থাপিত করলেন।

কিন্তু ওই প্রবন্ধেই আরও গুরুতর ঘটনার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রে রাষ্ট্রনীতির আমূল পরিবর্তন অমন সহজ সরল পথে এবং সুচারুভাবে সম্পন্ন হয় নি। বরং সেখানে তারা রক্ত ও অগ্নি-পরীক্ষায় পাপমুক্ত হয়েছিল। ইংলণ্ডের সঙ্গে তুলনায় ফ্রান্সের রক্তবিপ্লবকে তিনি অভিনন্দন জানালেন। তিনি বললেন, 'এখানে সম্ভ্রান্ত শার্ষশিষ্ট নাগরিকের সভা এই পরিবর্তন সাধন করেনি বরং সেটা করেছিল অজ্ঞ বিশাল জনতা। তারা ভয়াবহ পাঁচ বছরে সাত শতাব্দীর সঞ্চিত অত্যাচার, অনাচার ধুয়ে মুছে ফেলেছিল।'

এই প্রবন্ধটি অরবিন্দ লেখেন আঠারোশো তিরানব্বই খৃস্টাব্দে আর তার বারো বছর পরে তিনি বাংলায় বিপ্লবী দলের প্রধান পুরুষে পরিণত হন। তিনি ব্যাপক বিক্ষোভ গড়ে তোলার জন্য দেশকে প্রস্তুত হবার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। সরকারী মতে, অরবিন্দ সারা দেশকে ইংরেজ বিদ্বেষের ক্ষেত্রে একসূত্রে বাঁধতে চেয়েছিলেন, যাতে একস্থানে বিদ্রোহ দমিত হলে আর-একস্থানে প্রচণ্ডভাবে ফেটে পড়তে পারে।

বাংলার বিপ্লব-প্রচেষ্টায় তিনি নতুন ধারার প্রবর্তন করেন। আরাম-কেদারায় বসে, গায়ে একটিও আঁচড় লাগতে না দিয়ে, কেবল ফতোয়া ঝেড়ে আর বাৎসরিক বক্তৃতা দিয়ে দেশের স্বার্থরক্ষার কিছুই হবে না। তার উপর তিনি নিজ আচরণে দেখালেন, স্বার্থত্যাগ করে দেশের সেবা করতে হবে, ক্ষয় -ক্ষতি সহ্য করতে হবে। নিজ স্বার্থ অপেক্ষা দেশের কল্যাণ যে ঢের বেশি বাঞ্ছনীয়, সে-কথা তিনি প্রত্যক্ষ প্রমাণ করেছিলেন।

তাঁর সহকর্মীরা বুঝতে পেরেছিল, এর পরের স্তর নির্যাতন, যেখানে জেল, জরিমানা ভোগ করা থেকে ফাঁসীকাঠে প্রাণ দান করতে হবে। সাহসী মন চাই যা অকাতরে সকল বিপদ-আপদ উপেক্ষা করে লক্ষ্যস্থলে নিয়ে পৌঁছে দেবে। হয়তো নিজ-জীবন পূর্ণ না-হবার সম্ভাবনা খুবই কম, কিন্তু বর্তমানের আদর্শে ভবিষ্যৎ 'সন্তানদল' গড়ে উঠবে, যারা ত্যাগ শৌর্য বীর্য নিষ্ঠা সেবার দ্বারা নিজেদের যশ ও দেশমাতৃকার গৌরব বৃদ্ধি করবে।

অরবিন্দের নিজের ভাষায় 'আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চাই'। বিদেশীর আদেশ ও বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি, স্বগৃহে প্রজার সম্পূর্ণ আধিপত্য, ইহাই আমাদের রাজনীতির লক্ষ্য।'

অরবিন্দই সর্বপ্রথম প্রকাশ করে বলেন, 'পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া "স্বরাজ" শব্দটির কোনো অর্থ নেই।' সখারাম গণেশ দেউস্কর 'স্বরাজ' শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন এবং উনিশ শো ছয় খৃস্টাব্দের কংগ্রেস

অধিবেশনে দাদাভাই নওরোজি সভাপতিরূপে সেটি গ্রহণ করেন। কিন্তু তার প্রকৃত অর্থ তখন সাহস করে কেউ বলে নি। এটা অরবিন্দের জন্য তোলা ছিল। 'বন্দেমাতরম' পত্রিকা সেই বাণী প্রচার করে।

বঙ্কিমচন্দ্র মূর্তি ও মন্ত্রদান করলেন; বিবেকানন্দ তাতে করলেন প্রাণপ্রতিষ্ঠা; অরবিন্দ তাঁকে রণরঙ্গিনী মূর্তিতে আবির্ভূতা করলেন দেশের সামনে।

অরবিন্দ ভারতের রাজনীতির আকাশে উল্কার মতো এসে পাঁচ-ছ'বছরের মধ্যে আশ্রমের স্নিগ্ধ আধ্যাত্মিক পরিবেশে অন্তর্হিত হয়েছিলেন। না পেরেছিল ইংরেজ রাজশক্তি তাঁকে কারাগৃহে বন্ধ রাখতে, না পেরেছিলেন ধরে রাখতে তাঁর সহকর্মীরা, যাঁরা আত্মবিসর্জন দিয়ে দেশোদ্ধার কার্যে নিজেদের সঁপে দিয়েছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

'দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে
সেই রুদ্র দূতে, বলো, কোন্ রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে। বন্ধন শৃঙ্খল তার
চরণ বন্দনা করি'। করে নমস্কার—
কারাগার করে অভ্যর্থনা।'

রাজনীতি-ক্ষেত্রে নরম দল যখন তাঁদের আবেদন, নিবেদন, প্রবন্ধ, বিবৃতি, বক্তৃতামালার ভাষায় কিছু তেজ, কিছু উষ্মা-প্রকাশ বৃদ্ধি করেছেন, তখন অপরদিকে রাজনীতির মোড় ফিরিয়েছিলেন যাঁরা, তাঁরা দু'টো দিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করলেন। প্রথমত, তাঁরা নিলেন দারিদ্র্য, উপেক্ষা, নির্যাতন, কৃচ্ছ্রসাধন, চরম ত্যাগের পথ, আর দ্বিতীয়ত নিলেন দুর্ধর্ষ শত্রুর সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্য আগ্নেয়াস্ত্র, বারুদ, বোমা, রিভলবার, পিস্তল, রাইফেল প্রভৃতি।

বারিন্দ্রকুমার ঘোষ

অরবিন্দের আদর্শের পথ বেয়ে যাঁরা পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাসে নিজেদের নাম স্বর্ণাক্ষরে অক্ষয় করে রেখেছেন তাঁরা হলেন উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৯-১৯৫০), যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৭৯-১৯১৫), বারীন্দ্রকুমার ঘোষ (১৮৮০-১৯৫৯), ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮০-১৯৬১), অবিনাশ ভট্টাচার্য (১৮৮২-১৯৬২), সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৮৮২-১৯০৮), উল্লাসকর দত্ত (১৮৮৫-১৯৬৫), রাসবিহারী বসু (১৮৮৬-১৯৪৫), কানাইলাল দত্ত (১৮৮৮-১৯০৮), প্রফুল্ল চাকী (১৮৮৮-১৯০৮), ক্ষুদিরাম বসু (১৮৮৯-১৯০৮) প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এঁদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে বলা চলে :

'... তোমা লাগি নহে মান
নহে ধন, নহে সুখ; ....
. . . .   মহাবীর সবে
গিয়াছেন সঙ্কট যাত্রায়, যাঁর কাছে
আরাম লজ্জিত শির নত করিয়াছে
মৃত্যু ভুলিয়াছে ভয়।'

যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৩০)

ভাই বারীন্দ্রকুমার ও বন্ধু যতীন্দ্রনাথ-ই ছিলেন অরবিন্দের দুই শ্রেষ্ঠ শিষ্য। যতীন্দ্রনাথ বাংলার মাটিতে বিপ্লব-মন্ত্র কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য বরোদা থেকে প্রেরিত হয়েছিলেন, এটা আমাদের জাতীয় জীবনে পরম গৌরবের বিষয়।

যতীন্দ্রনাথের মনে দু'টি ভাব অতি প্রবল এবং সমান্তরাল রেখায় প্রবাহিত হয়েছিল। যদি তাঁকে 'আনন্দমঠে'র সন্তানদলের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তা হলে খুব ভুল হবে না। একদিকে সাংসারিক জীবনে বৈরাগ্য, সন্ন্যাসের প্রতি আসক্তি, অন্যদিকে দেশ-প্রীতি, দেশের পরাধীনতার জন্য বেদনাবোধ— তাঁর জীবনের দু'টি বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য।

তদানীন্তন ভারত সরকারের নির্দেশ ছিল বাঙালীকে কোনো সামরিক বিভাগে প্রবেশ করতে না দেওয়া। তাই, নানাস্থানে চেষ্টা করেও যতীন্দ্রনাথ বিফল হন। অথচ তাঁর বিশ্বাস, ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করে তাকে তাড়াতে না পারলে সে বিদায় হবে না। সুতরাং যুদ্ধবিদ্যা আয়ত্ত করবার জন্য যে উপায়েই হোক সৈন্যবিভাগে প্রবেশলাভ করতেই হবে। তাঁর মানসিক প্রস্তুতির পরিচয় কিছুটা মেলে যখন দেখা যায় তিনি সে-যুগেই ব্লক-লিখিত একখানা 'মডার্ন ওয়ারফেয়ার' সংগ্রহ করেছিলেন যেটাকে অবলম্বন করে বারীন্দ্রকুমার 'বর্তমান রণনীতি' বইখানা লিখেন। আলিপুর বোমার মামলায় তাঁকে ব্লক-লিখিত বইখানা কাছে রাখার জন্য জবাবদিহি করতে হয়েছিল। তিনি সেনাবিভাগে নিযুক্ত ছিলেন, সুতরাং বইখানা তাঁর কাছে রাখা ততটা দোষাবহ মনে না হওয়ায় তিনি নিষ্কৃতি পান।

প্রথমে বাঁকিপুরে ও পরে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত 'কায়স্থ পাঠশালায়' শিক্ষা সমাপনান্তে যতীন্দ্রনাথ উপযুক্ত কাজের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। কোথায় এবং কী উপায়ে তিনি সেনাবিভাগে ঢুকতে পারেন, তার অনুসন্ধান হল তাঁর সর্বপ্রধান প্রচেষ্টা। বরোদায় তৎকালীন এক প্রভাবশালী বাঙালীর সহায়তা প্রার্থনা করে যতীন্দ্রনাথ আঠারো শো নিরানব্বই খৃস্টাব্দে যাঁর দ্বারস্থ হলেন, সেই প্রভাবশালী বাঙালীই অরবিন্দ ঘোষ। সামরিক বিভাগে অরবিন্দ তাঁর বন্ধুদের সহায়তায় যতীন্দ্রনাথকে অশ্বারোহী বিভাগে ঢুকিয়ে দেন।

বরোদায় আসার পর থেকেই আধুনিক যুদ্ধবিদ্যা শেখার জন্য তিনি বিশেষ উৎসুক হয়ে ওঠেন। বুদ্ধি, শারীরিক শক্তি ও আগ্রহের পরিচয় পেয়ে, মাধব রাও যাদব নামে অশ্বারোহী বিভাগের একজন ঊর্ধ্বতন পর্যায়ের নায়েক তাঁকে বিশেষভাবে শিক্ষাদান করেন।

বরোদায় অরবিন্দের সান্নিধ্য ও ঘনিষ্ঠ আলোচনার সুযোগে তিনি ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা করে নিয়েছিলেন। অরবিন্দ তাঁকে 'মাত্রাতিরিক্ত উদ্যমী এবং যোগ্য' বলে মনে করলেন এবং মাত্র এক বছর পরেই যতীন্দ্রনাথকে বাংলায় পাঠিয়ে দিলেন। প্রধান উদ্দেশ্য হল, বাংলায় ছোট ছোট বিপ্লবী কেন্দ্র গড়ে তোলা এবং খুঁজে-খুঁজে ওই কেন্দ্রের জন্য সভ্য সংগ্রহ করা।

কলকাতায় এসে তিনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পি. মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সরলা দেবী, চিত্তরঞ্জন প্রমুখ কয়েকজন দেশপ্রেমিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পি. মিত্র প্রথম থেকেই তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে পড়েছিলেন। যতীন্দ্রনাথ-ই বাংলায় বিপ্লবী ভাবধারা বহন করে এনে কলকাতায় সর্বপ্রথম বিপ্লবীসঙ্ঘ গড়ে তুলেছিলেন, এ কথা স্মরণ করলে হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে।

ঊনিশ শো দুই খৃস্টাব্দে বারীন্দ্রকুমার কলকাতার হাল-চাল দেখতে এলেন; মফঃস্বলেও স্বল্পকাল ঘোরাঘুরি করে তিনি কলকাতায় ফিরে যান। দু'বছর পরে তিনি আবার কলকাতায় আসেন এবং অল্পকালের মধ্যেই পি. মিত্র, যতীন্দ্রনাথ ও বারীন্দ্রকুমারের মধ্যে মতান্তর হয়। যতীন্দ্রনাথ তিক্ততা এড়াবার জন্যে কলকাতা ছেড়ে চলে যান। প্রকৃতপক্ষে এর পর অনুশীলন বা যুগান্তর—কোনো দলেরই সঙ্গে তাঁর কোনো যোগাযোগ ছিল না।

সাধারণত যতীন্দ্রনাথের এই পর্যন্ত পরিচয় হয়তো বিপ্লবী হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট বলে মনে করা

যেত। মনটা তাঁর ত্যাগের দিকে ঝুঁকেছিল বেশি। সুতরাং তিনি সন্ন্যাস নিয়ে কার্যক্ষেত্র থেকে বিদায় নিলে বিশেষ কিছু বলার ছিল না।

কিন্তু বিধাতা তাঁকে ভিন্ন ধাতুতে গড়েছিলেন। কলকাতায় কর্মক্ষেত্রের বাইরে বিপ্লবের কাজের জন্য সারা ভারত, বিশেষত উত্তর ভারত পড়ে রয়েছে সেকথা তাঁর বিপ্লবী মন একবারও ভোলেনি। আরও একটা বিষয় ছিল তাঁর বিশেষ প্রিয়। বরোদায় তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, অরবিন্দের পরামর্শদাতা ঠাকুরসাহেব ইংরেজের বেতনভুক ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে ইংরেজের বিদ্বেষ প্রচার করতে মনোনিবেশ করেছেন। যতীন্দ্রনাথ মনে করলেন, তাঁর যাযাবর জীবনে তিনি এই কাজ নিপুণভাবে সম্পন্ন করতে পারবেন। তাই লোকে যখন জানল তিনি কুটিল কর্মপন্থা ত্যাগ করে বিবাগী হয়ে গেলেন, তখন প্রাথমিকভাবে অনেকে বুঝতেই পারেন নি যে তিনি সে-সময় দেশের মঙ্গলে এই নতুন বিপদসঙ্কুল পথ বেছে নিয়েছিলেন।

উনিশ শো তিন খৃস্টাব্দে তাঁর পিতার মৃত্যুর পর অরবিন্দ ও বারীন্দ্রকুমারের উপস্থিতিতে গ্রামের ভিটে চান্নায় শ্রাদ্ধাদি কাজ সম্পন্ন করে যতীন্দ্রকুমার প্রায় নিরুদ্দেশ যাত্রা করেন। তিনি বলেছেন, আর কেউ সংবাদ না রাখুক বাংলার পুলিশ তাঁর পিছন ছাড়ে নি। দূর থেকে তাঁর কার্যকলাপ লক্ষ্য করে চলেছে। তাদের সূত্র অনুযায়ী জানা যায়, যতীন্দ্রনাথ কলকাতা ছেড়ে বেরিয়ে প্রথম বছরটা দার্জিলিং ও নেপালের তরাই অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেন। অবশ্য তিনি এখানে কোনো বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন কিনা জানা যায় নি।

পরের বছর তিনি প্রথমে তিব্বতে যান এবং সেখানে মনে হল যেন জীবনের লক্ষ্য ঠিক থাকছে না। অতঃপর তিনি উত্তর-পশ্চিম ভারতের দিকে যাত্রা শুরু করলেন। পথে যেখানেই সামরিক ছাউনি পেয়েছেন, সেখানেই তিনি আলাপ জমাতে চেষ্টা করেছেন। এইভাবে তিনি গাড়োয়াল এবং হরদৈ জেলার নয়াশরণ অরণ্যে কিছুদিন কাটিয়ে দেন।

তৃতীয় বছরে তিনি আলমোড়ায় আসেন এবং সেখান থেকে পাঞ্জাবের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরতে শুরু করেন। এখানে তিনি এমন কয়েকজন যুবকের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন, যাঁরা পরবর্তীকালে উগ্রপন্থী বলে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ ক্রমশ অশান্ত হয়ে উঠেছিলেন এবং তাঁর ক্রমাগত মনে হচ্ছিল তিনি সক্রিয়ভাবে তেমন কিছু করতে পারছেন না।

ইতিমধ্যে বাংলায় বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিল। যতীন্দ্রনাথ এই আগুনে ইন্ধন দিতে পারছিলেন না। অবশ্য মনের দিক থেকেও তিনি তেমন একটা উৎসাহ পাচ্ছিলেন না কারণ কতকটা তিক্ততা নিয়েই তাঁকে বাংলা ছেড়ে যেতে হয়েছিল। যখন তিনি এইরকম একটা মানসিক সংকটের মধ্যে ছিলেন তখন উনিশ শো সাত খৃস্টাব্দে পুলিশ পেশোয়ারে যতীন্দ্রনাথের মুখোমুখি হল। এক সরকারী আদেশে মাত্র তিন দিন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অবস্থান করার পর তাঁকে ওই অঞ্চল ছেড়ে চলে আসতে হয়। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ হল, তিনি সৈন্যদের মধ্যে আনুগত্যভঙ্গের প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন।

তিনি তখন পেশোয়ার ছেড়ে ক্যাম্পবেলপুর জেলায় পাঞ্জাসাহেব যান। চলার পথ ধরে এরপরে তিনি আসেন এ্যাচোটাবাদে। সেখান থেকে চলে গেলেন ভূস্বর্গ কাশ্মীর দর্শন করতে। কাশ্মীরের আশ্চর্য নিসর্গদৃশ্য সম্ভবত তাঁর মনে আধ্যাত্মিকতার বীজ বুনে দেয়। কলকাতায় এসে তিনি বাকি জীবনে বর্ধমানের চান্নায়, কখনও কলকাতায় বা তার উপকণ্ঠে বন্ধু, ভক্ত ও শিষ্যদের আশ্রয়ে দিনযাপন করেছেন। শান্তিময় পরিবেশে তাঁর শেস জীবন অতিবাহিত হয়েছে।

অনুশীলন সমিতি

যখন বাংলাকে কেটে দু'টুকরো করা হয়েছিল, তখন দেশে বেশ কয়েকটা দল তৈরি হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী দল ছিল 'অনুশীলন সমিতি'।

স্বাধীনতা সংগ্রামের আগে থেকে শুরু করে ইংরেজের সঙ্গে বরাবরের মতো সম্পর্ক যতদিন না ছিন্ন হয়েছে, ততদিন নানা পর্যায়ে, নানা দলে অনুশীলন সমিতি সংগ্রাম চালিয়ে গেছে। মূল স্রোত থেকে অনেক শাখানদী বেরিয়েছে যেমন, শক্তিশালী 'যুগান্তর পার্টি'। কিন্তু আপন স্রোতের ধারা কখনও মাঝপথে নিঃশেষ হয়ে যায় নি।

অনুশীলন সমিতি আনুষ্ঠানিকভাবে কলকাতায় স্থাপিত হয়েছিল উনিশ শো দুই খৃস্টাব্দে। কিন্তু তার বছরখানেক আগে সতীশচন্দ্র বসু কলেজে ছাত্রাবস্থায় ব্যায়াম, পাঠ, চরিত্রগঠন প্রভৃতি লক্ষ্য করে কয়েকজন যুবককে নিয়ে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। এই কাজে তিনি জেনারেল এ্যাসেমব্লী ইনস্টিটিউশনের কয়েকজন অধ্যাপকের সহায়তাও পেয়েছিলেন।

সংগঠন যখন ক্রমশ মজবুত হতে থাকল, তখন তিনি মদন মিত্র লেনে একটি আখড়া স্থাপন করলেন। পরে পি. মিত্র এই প্রতিষ্ঠানের পিছনে এসে দাঁড়ালেন এবং অনুশীলন সমিতি পুরোদমে কাজ শুরু করল।

গোড়ায় এই সংগঠনের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে 'যুগান্তর' দলের প্রভাবশালী নেতা হিসেবে পরিচিত হয়েছেন।

ঢাকায় একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হলে অনুশীলন সমিতির খ্যাতি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে যায়। পি. মিত্র ও বিপিনচন্দ্র পাল পূর্ববাংলা সফরে গেলে ঢাকায় ওই সমিতির একটি শাখার প্রতিষ্ঠা হয়। উত্তরকালে পুলিনচন্দ্র দাস এই সমিতির কর্ণধার হিসেবে সমিতির সদস্যদের মধ্যে তুমুল উন্মাদনা সৃষ্টি করতে সমর্থ হন। ক্রমে এই সমিতি পাঁচ-ছ'শো শাখা প্রতিষ্ঠা করে।

অনুশীলন সমিতির নেপথ্য ইতিহাস জানতে গেলে আবার একটু যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গে আসতে হবে। উনি উনিশ শো এক খৃস্টাব্দে কলকাতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে একটি আখড়া প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তৎকালীন আপার সার্কুলার রোড ও সুকিয়া ষ্ট্রীটের মোড়ে। সেখানেই আখড়ায় আগত যুবকদের লাঠি ছোরা তরোয়াল প্রভৃতি খেলা এবং ড্রিল, ঘোড়ায় চড়া, কুস্তি, সাঁতার, মুষ্টিযুদ্ধ প্রভৃতি শেখানো হত। পি. মিত্র এই আখড়ার সংবাদ রাখতেন। প্রথম দিকে তাঁর কাছে কোনও যুবক এসকল বিষয়ের সন্ধানে এলে তিনি 'বরোদা থেকে যারা এসে আখড়া স্থাপন করেছে' তাদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন।

প্রতিষ্ঠার সময় এই সমিতির সভ্য তালিকাভুক্ত ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ হালদার, চিত্তরঞ্জন দাশ, রজত রায়, এইচ. ডি. বসু প্রভৃতি তৎকালীন খ্যাতনামা লোকেরা। পি. মিত্রের সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় যতীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বতন্ত্র হয়ে যান এবং স্বল্পকাল পরে বারীন্দ্র কুমার কলকাতায় এলে তাঁর সঙ্গেও যতীন্দ্রনাথের মনোমালিন্য ঘটে।

অতঃপর 'যুগান্তর দল' প্রতিষ্ঠা হল। এই দলের সদস্যরা এক সময় সকলেই অনুশীলন সমিতির সদস্য ছিলেন। মফঃস্বলের সকল বিপ্লবী দল বা গোষ্ঠীগুলো মোটামুটিভাবে অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল।

অতঃপর 'সন্ধ্যা', 'যুগান্তর' ও বন্দেমাতরম' পত্রিকা প্রকাশিত হলে দেশময় বিপ্লবের আগুন ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে লাগল। তবে দেশনেতাদের মত পার্থক্যকে কেন্দ্র করে পত্রিকাগুলোর বক্তব্যের মধ্যে কিছু কিছু মতান্তরও ছিল। অরবিন্দের সঙ্গে পি. মিত্রের মত পার্থক্য তো ছিলই। এবার শুরু হল কার্যধারা নিয়ে মতভেদ। তখন দলের যুবকদের মধ্যে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা আরম্ভ হয়েছে। যারা অরবিন্দ-ভক্ত তারা কোনো বড় বাধা পেল না। তিনি প্রকাশ্যে উৎসাহ না দিলেও পরের অর্থ লুণ্ঠনের ব্যাপারে তাঁর যে খুব বড় আপত্তি নেই, সেটা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু অনুশীলনের যুবকদল মনে করতে আরম্ভ করে যে, তাদের উপর ভীরুতার অপবাদ এসে

পড়েছে। সুতরাং তারাও অর্থসংগ্রহে এগিয়ে এল। বিশেষ করে ঢাকার অনুশীলন সমিতির পক্ষে আর চুপ করে বসে থাকা সম্ভব হচ্ছিল না। তাদের বিবিধ ব্যায়ামের প্রয়োগ ক্ষেত্র চাই। কিছু কিছু গোলযোগের খবর কলকাতায় ক্রমাগত আসতে থাকল। কলকাতার সমিতি তখন অনেকটা নিষ্প্রভ কিন্তু ঢাকার সমিতি-সম্পর্কে পুলিশের গোয়েন্দা-রিপোর্টে লেখা হয়েছিল, 'ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রচার হয়েছে দ্রুত; প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতায় বিশেষত্ব এবং কার্যক্ষেত্রে দুর্দান্ত সাহস বিশেষ লক্ষণীয়। কারণ হিসেবে মনে হয়, পূর্ববঙ্গের সাধারণ বাঙ্গালী ছেলে পশ্চিমের চেয়ে দুঃসাহসিকতায় ও দৈহিক শক্তিতে অনেক এগিয়ে আছে।'

ঢাকার অনুশীলন সমিতি কার্যক্ষেত্রে অনেকটা এগিয়ে যায়। এদিকে যুগান্তর পত্রিকাকে ঘিরে পরোক্ষে অরবিন্দ এবং প্রত্যক্ষে যে দল গড়ে উঠল, তার বড় একটা পরিচয় পাওয়া যায় কতকগুলো সাহসিকতাপূর্ণ বিপজ্জনক ও নাম করা কাজের মধ্য দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে আলিপুর বোমার মামলা এবং তার মধ্যে নরেন গোসাঁই নিপাতপর্ব যুগান্তর দলের প্রতিষ্ঠা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি করে। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল, কানাই, সত্যেন প্রমুখ ব্যক্তিরা দলকে আরও সম্ভ্রমযুক্ত করে তোলেন।

একেবারে খুন খারাপি আরম্ভ হওয়ার আগে পর্যন্ত পি. মিত্র সকল দল ও প্রতিষ্ঠানের কার্যত প্রধান ছিলেন। দল বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে যখন কেন্দ্রীয় সংস্থার সঙ্গে আর পূর্ণ যোগাযোগ-রক্ষা সম্ভব হচ্ছিল না, যখন ঢাকা ময়মনসিংহ ফরিদপুর কুমিল্লা প্রভৃতি অঞ্চলে ছোট-বড় বহু বিপ্লবকেন্দ্র গড়ে উঠেছে, এখন এই সকল প্রতিষ্ঠানের আদর্শগত মিল মিত্রমহাশয়ের নাম বজায় রাখলেও কার্যত তিনি ওই সময়ে প্রায় নির্লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন।

বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানগুলোকে দমন করার জন্য সরকার এইবার নতুন চণ্ডনীতি গ্রহণ করল। সভ্যদের পিছনে তারা গুপ্তচর লাগালো। কিন্তু দেশের চারিদিকে ব্যাপকভাবে সরকার-বিরোধী সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ পুরোদমে শুরু হয়ে গেল।

বাংলার যেসব গুপ্ত দল গড়া হয়েছিল, তাদেব সভ্যশ্রেণীভুক্ত হতে গেলে সদস্যদের নানারকম ধর্মীয় প্রক্রিয়ার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করতে হত। এই চিরাচারিত রীতি যেন 'আনন্দমঠ-'এর সন্তানদের কাল থেকে চলে আসছিল। ঠাকুরবাড়িতে রাজনারায়ণ বসু ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর যে গোপন দল (হামচূ পামু হাফ্) গঠন করেন, 'সেখানে টেবিলের দুই পাশে দুই মড়ার মাথা থাকিত, তাহার দুইটি চক্ষু কোটরে দুইটি মোমবাতি বসানো ছিল। মড়ার মাথাটি মৃত ভারতের সাঙ্কেতিক চিহ্ন। বাতি দুইটি জ্বালাইবার এই অর্থ যে, মৃত ভারতের প্রাণসঞ্চার করিতে হইবে ও তাহার জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। এ ব্যাপারে ইহাই মূল কল্পনা।' প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সূত্রে এই তথ্য পাওয়া যায়। বিপিনচন্দ্র পাল, কালীশঙ্কর সুকুল, সুন্দরীমোহন দাস, তারাকিশোর চৌধুরী প্রভৃতি শিবনাথ শাস্ত্রীর দলের সদস্যরা বুকের রক্তে প্রতিজ্ঞাপত্র ভিজিয়ে আগুনের কুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিলেন।

অনুশীলন সমিতির নানা প্রতিজ্ঞা ও প্রক্রিয়া ছিল। আদ্য, মধ্য, অন্ত্য ও বিশেষ—এই চার দফা প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হত। নানা স্তরের ভক্তদের জন্য এই সকল ব্যবস্থা ছিল। 'বিশেষ প্রতিজ্ঞা' বিধি খুব কম লোকের ভাগ্যেই ঘটেছে। প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হত কোনো দেব-দেবীর সামনে উপস্থিত হয়ে। আদিকাণ্ড হয় কলকাতায় পুলিন দাসের দীক্ষাগ্রহণের সময়। সেই দীক্ষাগ্রহণের কথা জানিয়েছেন ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী। পুলিনবাবু পি. মিত্রের নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন। দীক্ষাগ্রহণ প্রণালী এইরূপ ছিল—পূর্বদিন একবেলা হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া, সংযমী হইয়া, পরদিন প্রাতে স্নান করিয়া দীক্ষাগ্রহণ করিতে হইত। দেবীর সম্মুখে ধূপ-দীপ, নৈবেদ্য সাজাইয়া, বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিয়া যজ্ঞ করিতে হইত। পরে প্রত্যালীঢ় আসনে বসিয়া (বাম হাঁটু গাড়িয়া শিকারোদ্যত সিংহের প্রতীক) মস্তকে গীতা স্থাপন করিতে হইত। গুরু শিষ্যের মস্তকে অসি রাখিয়া দক্ষিণপার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিতেন। শিষ্য যজ্ঞাগ্নির সম্মুখে দুই হাতে প্রতিজ্ঞাপত্র ধরিয়া পাঠ করিতেন।'

অনুশীলন সমিতির প্রতিজ্ঞাপত্রের মধ্যে চারিত্রশক্তিব উপর বেশ জোর দেওয়া হত। সঙ্গে ছিল নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা পালন আর বিশেষ করে গোপনীয়তা রক্ষার প্রতিশ্রুতি। বিশ্বাসভঙ্গে হত্যাই ছিল চরম দণ্ড। এ-কথা নতুন সভ্যদের বিশেষ করে জানিয়ে দেওয়া হত। এই অপরাধের সন্দেহে পূর্ববঙ্গে অনুশীলন সমিতির অনেক সদস্যকে চিরতরে বিদায় দেওয়া হয়েছে।

যুগান্তর দল সংবিধান প্রভৃতি নিয়ে আবির্ভূত হয়নি। কার্যকারণ-পরম্পরায় এই দল অনুশীলন সমিতির থেকে একটু পৃথক হয়ে যায়। কোনো কোনো সহযোগী দলের মধ্যে শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠান ছিল না। যাদের বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়েছে, স্থানীয় নেতারা তাদের উপর ক্রমে ক্রমে দায়িত্ব পূর্ণ কাজের ভার দিয়েছেন, ফলে কর্মীরা যোগ্যস্থান পেয়ে কাজের ধারা নিয়ন্ত্রিত করেছে। এদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতার দণ্ড অনুশীলন সমিতির মতো অত ব্যাপক বা নির্মম ছিল না।

অন্যান্য সভা-সমিতি

দেশে রাজনৈতিক আলোড়নের পরিপ্রেক্ষিতে সরলা দেবী নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে ছিলেন না। সমিতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ না থাকলেও তিনি সব খবরই রাখতেন। অবশেষে নিজেই একটি 'আখড়া' স্থাপন করলেন। আখড়ার নাম হল 'লক্ষ্মী ভাণ্ডার'। ঠিকানা কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। এটার কতকটা আখড়া আর কিছুটা ভাণ্ডার বলে ধরা যেতে পারে। এটি মূলে ছিল একটি মিলনের কেন্দ্র যেখানে দেশসেবকেরা এসে মেলামেশা করতে পারে।

উনিশ শো তিন খৃস্টাব্দে লক্ষ্মীভাণ্ডার স্থাপনের পর এক বছর বাদে সরলা দেবী বালিগঞ্জে গড়ে তুললেন 'স্বাস্থ্য একাডেমী'। এখানে দস্তরমতো আক্রমণ ও প্রতিরোধ-প্রণালী, লাঠি ছোরা তলোয়ার প্রভৃতি খেলা ও যুযুৎসু বক্সিং ও ড্রিল প্রভৃতি শিক্ষণ দেওয়া হত এবং সরলা দেবী এইসব কাজের যোগ্য শিক্ষক মূর্তাজা সাহেবকে নিযুক্ত করেন। বড় লাঠি খেলায় তিনি যে সব বিখ্যাত শিষ্য তৈরি করেছিলেন, পুলিন দাস তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

সরলা দেবী কবে এবং কীভাবে ভারত স্বাধীন হবে, সেই উপায় চিন্তা করার সঙ্গে যুবকদেব মনে শক্তির বিশ্বাস ও বিকাশের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেন। তিনি 'ভারতী'র আষাঢ় সংখ্যায় (১৩১০ বঙ্গাব্দ), 'বিলাতী ঘুষি বনাম দেশী কিল' কাহিনী সম্বলিত প্রবন্ধ ছাপিয়েছিলেন। আবার কার্তিক সংখ্যায় ছাপলেন 'কিঞ্চিৎ উত্তম মধ্যম'। তার অন্তর্গত ছিল 'চাবুক পরিপাক' ও 'ঠনঠনের নির্মাক!' দুই প্রবন্ধেই বাঙালীর হাতে শ্বেতাঙ্গের লাঞ্ছনাব বেশ কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হয়। সবলা দেবীর 'মারের বদলে মার' নীতির প্রচার বাঙালীর বুকে সাহস ও বাহুতে বল এনে দিয়েছে। আগে যখন লাঞ্ছিত হলে হজম করে নেওয়া, উপেক্ষা করা বা লুকিয়ে রাখা একটা রীতিতে পরিণত হয়েছিল, এখন অপমানবোধ এসে সেই স্থান অধিকার করে বসল।

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকারের চিন্তা মাথা তুলে দাঁড়ানোর ফলে নানা ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত হল যে, অত্যাচারীর কাপুরুষতার সীমা নেই। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনে এই বলিষ্ঠ চিন্তা ও কার্যধারা একটা নতুন পথ দেখিয়ে দিয়েছে। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' পত্রিকা এই নতুন নীতির প্রবল প্রচার করছিল।

সরলা দেবী উনিশ শো চার খৃস্টাব্দে 'বীরাস্টমী ব্রত' প্রবর্তন করেন। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে নানারকম শক্তির পরীক্ষা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা হত। তিনি নিজে রঙ্গমঞ্চে অসি ধরে আবির্ভূতা হতেন এবং সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনায় দক্ষতার পরিচয় দিতেন। সেই যুগে এক মহিলার পক্ষে এই কাজ অতি সাহসিকতার বিরল নিদর্শন। বীরাষ্টমীর গানের বক্তব্য ছিল, 'মাতৃভূমি তরে' অকাতরে প্রাণ দান করলে গোলোকে স্থান হয়।

নিঃসঙ্কোচে বলা যায়, এই সকল বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠানই শুধু বাংলার বিপ্লব কেন, সকলরকম কল্যাণকর, বিশেষত রাজনৈতিক আন্দোলন-সংশ্লিষ্ট কাজের কর্মী জুটিয়েছে। স্বদেশী আন্দোলন-সংশ্লিষ্ট

বিদেশী পণ্যবর্জন, বন্দেমাতরম্ সম্প্রদায়, এ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি, শিল্প প্রদর্শনী, জাতীয় শিক্ষা প্রসার প্রচেষ্টা, ভলান্টিয়ার দল গঠন প্রভৃতি নানা ব্যাপারের ভার এদের উপর দিয়ে নেতারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেন। জনপ্রিয় হবার উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, সমাজের নানা ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের নির্দেশ মতো সেবাদান মন্ত্র পালন করা ধর্ম বলে গৃহীত হয়েছে। বিশেষত, গ্রামের মধ্যে শক্তিহীনেরা সাহায্যপ্রার্থী হয়ে এদের দিকে চেয়ে থাকত। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় দল-মত-ধর্ম-নির্বিশেষে বিপন্নকে উদ্ধার করায় এদের জুড়ি পাওয়া যেত না।

সেবা, সহানুভূতি ও নানাপ্রকার সাহায্যের দ্বারা এরা গ্রামের মধ্যে বহু লোকের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল। কেবল তাদের আদর্শে যুবচিত্ত যে বহুলাংশে প্রভাবিত হয়েছিল, তাই নয়, তাদের সঙ্গ পাবার জন্য তাদের আদেশ পালন করার সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করার একটা প্রয়াস লক্ষ্য করা যেত। ক্রমে হয়তো অজ্ঞাতসারে, গ্রাম্যনেতাদের সঙ্গে বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে বিপদ-আপদের অংশভাগী হয়েছে।

ক্রমে বিপ্লবী কেন্দ্রের সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবক দল গড়ে উঠেছিল। সরকার এঁদের কার্যকলাপের উপর শ্যেনদৃষ্টি রাখতে আরম্ভ করে। সরকারী রিপোর্টে এই সব আখড়া, সমিতি ও ক্লাব সম্বন্ধে বলেছে, 'এই সব দলের সদস্যরা লাঠিখেলা, কুস্তি প্রভৃতি চর্চায় লেগে গিয়েছিল এবং মনে হয়েছে প্রয়োজন হলে তারা মারামারি করতে পারবে, শক্তির পরীক্ষা দিতে পারবে।'

এদের ভয়ে গভর্নমেন্ট তো বিব্রত হলই, সঙ্গে সঙ্গে শ্বেতাঙ্গরা চিৎকার আরম্ভ করে দিল, যাতে সরকার এদের দমন করে। 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় পূর্ববাংলা থেকে এক পত্রপ্রেরক লিখলেন, 'এই ন্যাশন্যাল ভলান্টিয়াররা পথে-পথে 'বন্দেমাতরম' বলে চিৎকার করে বেড়ায়। পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া বাধাবার অজুহাতের বা শক্তিব অস্ত এদের নেই, বিশেষ করে অপরপক্ষ যদি শ্বেতচর্মধারী হয়। এদের উপদ্রবে মফঃস্বল শহরের রাস্তায় বেবোবার সম্ভাবনা নেই কখন কি ফ্যাসাদ বাধিয়ে বসে। অ-ভারতীয়দের পক্ষে এরা দস্তুরমতো উপদ্রবের কারণস্বরূপ হয়ে পড়েছে।'

সরকার ছুঁতো খুঁজছিল। যখন তখন আখড়ায় হানা দেওয়া, সভ্যদের থানায় ডেকে ভীতি-প্রদর্শন আর অভিভাবকদের প্রতি সাবধানবানী উচ্চারিত হতে লাগল। বেশীর ভাগ আখড়া ঝামেলা এড়াবার জন্য ভিন্নমূর্তি ধারণ করল। অনেকগুলো একেবারে বন্ধ হয়ে গেল।

বঙ্গভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে আখড়াগুলোতে যে বৈপ্লবিক তোড়জোড় চলতে থাকে তার ফলে সরকার সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছিল কি-ভাবে সমিতিগুলোর ধ্বংসসাধন করতে পারবে। শেষ পর্যন্ত উনিশ শো নয় খৃস্টাব্দের পাঁচই জানুয়ারী ঢাকার অনুশীলন সমিতি, বরিশালের স্বদেশ-বান্ধব সমিতি, ফরিদপুরের ব্রতী সমিতি, ময়মন সিংহের সুহৃদ সমিতি ও সাধনা সমাজ এবং খুলনার আকলা সমিতি প্রভৃতি সংস্থাকে সরকার বে-আইনী ঘোষণা করল এবং এই সমিতিগুলোর বিলোপসাধন ঘটল। প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবের প্রস্তুতি আরও গোপনীয়ভাবে চলতে থাকল।

ভগিনী নিবেদিতা

রম্যাঁ রলাঁ অরবিন্দকে বিবেকানন্দের যুবা-বন্ধু ও বীর-জগতের উত্তরাধিকারী বলেছেন। কার্যক্ষেত্রেও তাই দেখতে পাওয়া যায়। বিবেকানন্দের প্রভাব অরবিন্দের উপর বহুলাংশে পড়েছিল। বিবেকানন্দের রাজনীতি-ভক্ত প্রিয় শিষ্যা নিবেদিতার সঙ্গে অরবিন্দের গভীর যোগাযোগ হয়েছিল এবং মিশনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হবার পর দু'জনে একই পথে চলেছেন সম্পূর্ণ পারস্পরিক সহযোগিতা বজায় রেখে। এমন কি, অরবিন্দ কলকাতা ছেড়ে যাবার সময় 'কর্মযোগিন'-এর সম্পাদনার ভার নিবেদিতার উপর নিশ্চিন্তমনে দিয়ে যান।

আলিপুর-ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্তি পেয়ে প্রেসিডেন্সী জেল থেকে খালাস পাবার কিছুদিন পরে অরবিন্দকে আবার গ্রেপ্তার করার গুজব শুনে বন্ধুরা যখন অরবিন্দকে চন্দননগরে পালিয়ে যাবার জন্য

অনুরোধ করেছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন, 'যদি নিবেদিতা কাজ চালিয়ে যান, তাহলে আমি পালাতে পারি।'

কি কাজ? অরবিন্দ তখন 'কর্মযোগিন' পত্রিকা নিয়ে ব্যস্ত। এই পত্রিকা বিপ্লববাদের মুখপত্র, অরবিন্দের জীবনাদর্শ প্রচারের পত্র। এর 'কাজ' বা ভার তিনি দিতে পারেন একমাত্র নিবেদিতাকে। কারণ, পাণ্ডিত্যে, সাধনায়, বোধে, বীর্যে, বিপ্লব-জিজ্ঞাসায় ও দেশপ্রেমে নিবেদিতা সর্বশ্রেষ্ঠা ও অতুলনীয়া।

নিবেদিতাকে অরবিন্দের উক্তি জানানো হলে তিনি বললেন, 'তোমাদের নেতাকে বলো পালিয়ে যেতে। পলাতক নেতা অপরের মাধ্যমে অনেক কাজ করতে পারবেন।'

নিবেদিতার এই মন্তব্য শুনে অরবিন্দ বললেন, 'ঠিক আছে। ব্যবস্থা করো।' তিনি আরও বলেছিলেন, 'নিবেদিতার মাধ্যমে মা কালী আমাকে পলাতক হবার আদেশ দিয়েছেন।'

অরবিন্দ যখন বরোদায় ধীরে-সুস্থে বসে, সাধারণের অজ্ঞাতে বললেও চলে, কর্মক্ষেত্রে রাজনৈতিক আন্দোলনের ফসল ফলাবার জন্যে মাটি তৈরি করেছিলেন, তখন নিবেদিতা পুরোদমে বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নেমে পড়েছেন। তাঁর গুরু বিবেকানন্দ তাঁকে কর্মের স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, আর সেই শক্তিতে তিনি আপন পথে চলেন। বিরোধ বেধেছিল রামকৃষ্ণ মিশনের কর্ণধারগণের সঙ্গে এবং সেটা খুব অস্বাভাবিক নয়। নিবেদিতা রাজনৈতিক যে-দলের সঙ্গে ঘোরাফেরা করছিলেন, তাতে কেবল অধ্যাত্মবিষয় এবং কতকটা সেবাধর্মে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের উপর সরকারী বিষনজর পড়ার সম্ভাবনা। বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে জাপানী ওকাকুরার দান অসামান্য। নিজেদের দেশের জাতীয় অভ্যুত্থানের পরিচয় দিয়ে তিনি বাঙালী জাতিকে জেগে ওঠার জন্য ঘরোয়া আলোচনা, পরামর্শ বা প্রকাশ্য বক্তৃতায় উৎসাহ দিতে ছাড়তেন না। ওকাকুরা ভারতে এসে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হবার পর ধীরে ধীরে ভাবতে তাঁর কর্মপন্থা ঠিক করে নেন। স্বল্পকালের মধ্যেই নিবেদিতা গিয়ে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ইতিমধ্যে ওকাকুরা পি. মিত্র এবং সরলা দেবীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছিলেন।

নিবেদিতার মনে ক্রমে রাজনীতি প্রাধান্যলাভ করলেও, তিনি তাঁর ধর্মমত ও পথ থেকে বিচ্যুত হন নি। বিবেকানন্দের বিরাট ব্যক্তিত্বের ছায়ায় বসে বেদ-উপনিষদ-পুরাণের ধর্ম, জাতীয় চেতনা ও স্বাধীনতার চেষ্টার জন্য দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে প্রচার, সমাজ সংস্কার ও সেবার পরামর্শ ও ব্যবস্থা, সমগ্র জাতির মনে দেশপ্রেম ও মানবপ্রেমের সামঞ্জস্য রক্ষা করার আদর্শ-স্থাপন নিবেদিতার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

বিবেকানন্দ দেহরক্ষা করেছিলেন উনিশ শো দুই খৃস্টাব্দের চৌঠা জুলাই আর নিবেদিতা রামকৃষ্ণ মিশন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন ঠিক তার ষোলো দিন পরে। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের মতো দেশকে মূর্তিমতী 'মাতৃদেবী' বলে গ্রহণ করেন এবং নানাভাবে ভারতবাসীকে আগামী দিনের সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করা তাঁর ধর্মজীবনের অংশ বলে কাজে নেমে পড়েন। তিনি 'অজ্ঞেয়' ব্রহ্মের সন্ধানে কালক্ষেপ করার চেয়ে 'প্রত্যক্ষ দেশমাতৃকার সেবার পরামর্শ দিলেন তাঁর সহকর্মী, সমধর্মী, অনুরাগী, অনুচরদের মধ্যে।'

বিবেকানন্দের মতাদর্শ অনুযায়ী নিবেদিতা শিক্ষাদীক্ষা, চরিত্রবত্তা অনুশীলনের সঙ্গে কলকারখানা শিল্পবাণিজ্যের সাহায্যে আত্মনির্ভরশীল হবার জন্য উৎসাহ দান করলেন; ঠাকুরঘরে দেব-দেবীর পূজো ও আরাধনাকে অগ্রাধিকার দেবার চেয়ে মানুষের সেবা করা অধিক বাঞ্ছনীয় বলে প্রচার করলেন। দেশাত্মবোধের উন্মেষ যাতে যুবকদের মনে সর্বপ্রকারে সম্ভব হয়, তার জন্যে কোনও চেষ্টার ত্রুটি ছিল না তাঁর। ভারতের বাইরে বিভিন্ন দেশ স্বাধীনতা-লাভের জন্য কি করেছে, সেটা বাংলার যুবকদের জানাবার জন্যে তিনি ওই ধরনের নানা বই সংগ্রহ করে দিতেন। সেই সময়ে যুবচরিত্র গঠন করার পক্ষে এসব বইয়ের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল।

জগদীশচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, গোপালকৃষ্ণ গোখেল প্রভৃতি তদানীন্তন দেশবরেণ্য ব্যক্তিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকাতে নিবেদিতার এক বিশিষ্ট স্থান হয়েছিল তাঁর পরিবেশের মধ্যে। সেই সময় যখন অরবিন্দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হল, তখন নিবেদিতা সম্পূর্ণ নিজস্ব

ধ্যান-ধাবণা ও কমপদ্ধতিকে ৰূপ দেবাব সুযোগ পেযেছিলেন। গাইকোযাডেব আমন্ত্রণে তিনি ববোদায গেলেন এবং সেখানে অববিন্দেব সঙ্গে তিনি বাজনীতি নিযে আলোচনা কবাব সুযোগ পান। ইতিমধ্যেই

ভগিনী নির্বেদিতা

তিনি অববিন্দেব 'ইন্দু প্রকাশ'-এ মুদ্রিত প্রবন্ধাবলীব সঙ্গে পবিচিত ছিলেন। বিবেকানন্দেব প্রযাণেব পব একজন প্রগতিপন্থী সৎসাহসী উগ্রজাতীযতাভাবাপন্ন নেতাব সঙ্গে পবিচয উভযেব জীবনে কল্যাণপ্রদ হযেছিল।

বাংলায় এসে সংগ্রামী মনোভাবাপন্ন কর্মীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করার জন্য নিবেদিতা অরবিন্দকে প্রভাবিত করেছিলেন কিনা সেই বিতর্কে প্রবেশ না করেও একথা সহজেই বলা যায় যে, বরোদায় বসেই স্বাধীনতা সংগ্রামের গতি প্রকৃতি বদল করবার চিন্তা যে অরবিন্দের মনে জেগে উঠেছিল, এ কথা তিনি নিজেই বলেছেন।

নিবেদিতা কায়মনোবাক্যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। এমন কি, তাঁর সন্ন্যাসিনী জীবন সে সময় বহুল পরিমাণে দূরে সরে গিয়েছিল যোগাযোগ স্থাপন, আলোচনা সভায় অংশ গ্রহণ, সভা-সমিতিতে যোগদান, ও বক্তৃতা দেওয়া ও প্রবন্ধ রচনার সাহায্যে যুবসমাজের মধ্যে জাতীয় চেতনা উদ্বুদ্ধ করতে আপ্রাণ চেষ্টা —সবই তাঁর কর্ম তালিকায় স্থান পেয়েছিল।

অরবিন্দ বাংলায় এসে বিপ্লবের আগ্নেয়গিরিতে অগ্ন্যুৎপাত ঘটাবার আগে নিবেদিতার চেষ্টা সম্বন্ধে তিনি কয়েকটি কথা বলেছেন। তিনি বলেন, বিদেশী, বিশেষত আইরিশ মহিলা এবং বহু গণমান্য নামকরা লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় থাকায় সরকার তাঁকে একটু সমীহ করে চলত।

নিবেদিতা নিঃশঙ্ক চিত্তে বিপ্লবের বার্তা প্রচার করতেন। তাঁর সম্পর্কে বিবেকানন্দের আশীর্বাণী ঃ

'Be thou to India's future son,
Mistress, servant, friend in one.'

উঁচু মহলে, এমন কি করদ নৃপতিদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রাখতেন এবং যাঁকে দিয়ে যতটা কাজ পাওয়া যায়, ব্যক্তিগত জীবনের ঝুঁকি নিয়েও তা আদায় করে ছাড়তেন। বিপ্লবী যুবকদের সঙ্গে মেলা-মেশা করা, তাদের বিপদে-আপদে সাহায্য করা, টাকা দিয়ে, অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সহায়তা করা, বোমা তৈরি শেখার জন্য বিদেশে যুবকদের পাঠানো—তাঁর অন্তহীন কাজের মধ্যে কয়েকটি মাত্র। নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করে বিপজ্জনক কাজের ঝুঁকি ঘাড়ে নিতে তাঁর মতো খুব বেশি লোক তখন পাওয়া যায়নি। অরবিন্দ বলেছেন, 'এক কথায় বলা যায়, বিপ্লবীদের সাফল্যের মূলে তাঁর দান অপরিসীম।'

রাখীবন্ধন

উনিশ শো পাঁচ খৃস্টাব্দের বাইশে সেপ্টেম্বর কলকাতার টাউনহলে এক সভা হয়। ওই সভায় গৃহীত প্রস্তাবে ঠিক হয় যে, আমরা সর্বতোভাবে আমাদের ঐক্য ও অভিন্নতা রক্ষা করব এবং বঙ্গ ভঙ্গের পরে আমরা যে পৃথক হয়েছি, এই চিন্তা জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হতে দেব না।

বঙ্গভঙ্গের পর এই ভাবধারাকে রূপ দেবার প্রতীকস্বরূপ জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে হলুদ রঙের অন্তত তিনটি সুতো বা 'রাখী' পরস্পরের হাতে বাঁধবার নির্দেশ দিলেন নেতৃবর্গ। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ নিয়ে যে আবেগদীপ্ত চিত্তাকর্ষক ভাষণ দিলেন, চিরকালের জন্য তা অক্ষয় হয়ে আছে। যেভাবে রাখী অনুষ্ঠান পালিত হবে, সেটা 'রাখী সংক্রান্ত ব্যবস্থা' বলে প্রচারিত হয়। তাতে ছিল ঃ

'দিন। এ বৎসর ত্রিশে আশ্বিন, আগামী বৎসর হইতে আশ্বিনের সংক্রান্তি।

ক্ষণ। সূর্য্যোদয় হইতে রাত্রি এক প্রহর পর্য্যন্ত।

নিয়ম। উক্ত সময় সংযম পালন।

মন্ত্র। 'ভাই ভাই, এক ঠাঁই, ভেদ নাই, ভেদ নাই'।

উপকরণ। হরিদ্রাবর্ণের অন্তত তিন সূতা রাখী।

অনুষ্ঠান। হিন্দু-মুসলমান-খ্রীশ্চান বিচার না করিয়া প্রত্যেক বাঙালী অপর বাঙালীর ডান হাতে রাখী বাঁধিতে পারিবেন। অনুপস্থিত ব্যক্তিকে রাখী পাঠাইতে হইলে সঙ্গে মন্ত্রটি লিখিয়া দিতে হইবে। এই দিবস প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান বিধেয়।'

এই সামান্য অনুরোধ অপরিসীম শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হয়েছিল। অন্তত লক্ষ লোক সেদিন স্নানের জন্য গঙ্গাতীরে ভিড় করেছিল। স্নানের পর রাখীবন্ধনের পালা। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই 'উৎসবে' নেতৃত্ব

দিয়েছিলেন। আর, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর লেখা গান 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' হাজার হাজার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল। অংশগ্রহণ কারীদের কারও পায়ে জুতো ছিল না, কারও-কারও পরিচ্ছদে ছিল অশৌচ-চিহ্ন।

এই সঙ্গে সেদিন পালিত হয়েছিল রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী নির্দেশিত অরন্ধন। কিছু বাদ দিয়ে, ওই দিন প্রায় সকল বাঙালী পরিবারের উনুনে অগ্নিসংযোগ হয়নি।

বন্দেমাতরম্ সম্প্রদায়

'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি সেদিন পরিণত হয়েছিল বাঙালীর তথা সর্বভারতের যোগসূত্রে। এই ধ্বনি সংহতি, ঐক্য ও সৌভ্রাতৃত্বের প্রতীক হিসেবে পরিগণিত হত। অরবিন্দের কথায়,'সারা জাতটাকে ইংরেজ ভেড়ার দল বানিয়ে বেখেছিল। সেই ভীরুতা, কাপুরুষতা, মূঢ়তা ও তামসিক অবস্থা থেকে একমাত্র 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি জাগাল প্রাণে নূতন আলো, সাহস ও বীর্য্য।'

সুরেশচন্দ্র সমাজপতির উদ্যোগে উনিশ শো পাঁচ খৃস্টাব্দে এই সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। প্রথম দিকে এই সম্প্রদায় পরিচালনা করতেন সম্পাদক নন্দকিশোর মিত্র। এই সম্প্রদায়ের সভ্যদের কাজ ছিল দল বেঁধে 'বন্দেমাতরম্' ও অন্যান্য দেশাত্মবোধক গান গেয়ে পথে পথে জাতীয়তার বাণী প্রচার করা। এঁরা সভা-সমিতি, বৈঠক প্রভৃতিতে উপস্থিত থেকে জাতীয়তার মন্ত্রগ্রহণে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতেন। এঁদের কর্মসূচীর প্রভাবে স্বদেশী-ভাবের বন্যা বাঙালী সমাজকে যেন ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

এঁরা প্রচুর উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিলেন। প্রথম বাৎসরিক সভায় উপস্থিত ছিলেন বিহারী লাল মিত্র, যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। সভাপতিত্ব করেছিলেন ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর। যাঁরা ওই বছরের কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য নির্বাচিত হলেন, সেই তালিকা দেখলে মনে হয় 'সম্প্রদায়' স্বদেশী আন্দোলনে বিশেষ এক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সভাপতি হলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সহ-সভাপতি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও চিত্তরঞ্জন দাশ। কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে কার্যপরিচালক সমিতি গঠিত হয়েছিল।

এ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি

সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে জর্জরিত সমগ্র বাংলার মানুষ 'এ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সরকারের উদ্দেশ্য ছিল বিজ্ঞপ্তি মারফৎ দেশের জন-জীবনকে একেবারে পঙ্গু করে ফেলা। রংপুরে ছাত্র নির্যাতন প্রতিহত করার জন্য এই সোসাইটির উদ্ভব হয়েছিল। সমিতির সভাপতি হয়েছিলেন কৃষ্ণকুমার মিত্র। এই সমিতির সভ্যরা ঘাড়ে স্বদেশী পণ্যের বোঝা নিয়ে জনসাধারণের কাছে ফেরি করে বেড়াতেন। বলা বাহুল্য, এই সমিতিকে সরকার বিদ্বেষের চোখে দেখেছে এবং এর প্রচেষ্টা নানা উপায়ে বিকল করতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। এর সভ্যদের উপর হামলা হয়েছে যেন তাঁরা এই পথ পরিত্যাগ করেন। সরকার আন্দোলন দমন করার উদ্দেশ্যে যে 'ফতোয়া রাজ' চালু করেছিল তার কয়েকটি এখানে উল্লেখ করলে সরকারের আসল মতলব বোঝা যাবে।

বাংলা সরকারের চিফ সেক্রেটারী কার্লাইল দার্জিলিং থেকে এক গোপন সার্কুলার জারি করে তার কপি প্রত্যেক ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের কাছে পাঠিয়ে দেন। এতে বলা হয়, রাজনৈতিক আন্দোলনে যেভাবে অংশগ্রহণ করতে ছাত্রদের উৎসাহিত করা হচ্ছে সেটা ছাত্রদের স্বার্থের বিশেষ পরিপন্থী। সুতরাং যেসব স্কুল সরকারী অর্থসাহায্য পায় সেগুলো সম্পর্কে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়। ওইসব স্কুলের ছাত্রেরা পিকেটিং বা বয়কট আন্দোলনে যোগ দিলে সরকার সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলোর সরকারী সাহায্য বন্ধ করে দেবেন। ওই সার্কুলারে আরও বলা হয়েছিল, ছাত্ররা যোগ্যতা প্রমাণ করলেও সরকারী বৃত্তিতে তাদের কোনো দাবি থাকবে না এবং তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোনয়ন নাকচ করা হবে। যদি কোনো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান তথাকথিত বেয়াড়া ছাত্রদের নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে সঙ্গে-সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাবে শৃঙ্খলাভঙ্গকারী ছাত্রদের নাম। ম্যাজিস্ট্রেট তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

কার্লাইল সার্কুলারের অভিনব নির্দেশ হল, দরকার হলে প্রধান ও অন্যান্য শিক্ষকদের স্পেশাল কনস্টেবল্ এর কাজ দেওয়া হবে। ছাত্ররা শিক্ষকদের পরিচিত বলে উচ্ছৃঙ্খল ছেলেদের সনাক্ত করতে অসুবিধে হবে না।

এরপর জারি হল ব্যামফিল্ড ফুলার-এর সার্কুলার। ফুলার সাহেব সব জেলা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিলেন। স্বদেশী আন্দোলনে যেসব নেতৃবর্গ গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করছেন তাঁদের নাম সরকারী উঁচুমহলে পাঠাতে। তিনি আরও নির্দেশ দিলেন দেশীয় ভাষায় লিখিত 'ঘৃণ্য প্রচারপত্র' সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র অনুকম্পা দেখানো হবে না।'

আলেকজাণ্ডার পেডলার প্রত্যেকটি স্কুলে একটি ফর্ম বানিয়ে পাঠিয়ে দিলেন যে ফর্মের সাহায্যে স্কুল কর্তৃপক্ষ ছোটলাট বাহাদুরের কাছে অনুরোধ করে সংশ্লিষ্ট স্কুলের 'অবাঞ্ছনীয় কাজে লিপ্ত' ছাত্রদের স্কুল থেকে বিতাড়িত করতে পারেন।

ময়মনসিংহের জেলাশাসক লফ্‌টাস অটওয়ে ক্লার্ক ময়মনসিংহের সিটি কলেজিয়েট স্কুল, এডওয়ার্ড স্কুল এবং মৃত্যুঞ্জয় স্কুলের উদ্দেশে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলেছিলেন, উনিশ শো পাঁচ খৃস্টাব্দের দোসরা ডিসেম্বর যেন বড়বাজার অঞ্চলে কোনো ছাত্র না যায়। এই আদেশ অমান্য করলে যোগ্যতাসত্ত্বেও ছাত্ররা যাতে সরকারী বৃত্তি বা চাকরি লাভে বঞ্চিত হয়, সে ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে বলে ভয় দেখানো হয়। ওই দিন অবশ্য বড়বাজারে পুলিশী তান্ডবে বহু মানুষ নির্মমভাবে প্রহৃত হয়েছিল।

কলকাতায় অনুষ্ঠিত আনন্দমোহন বসুর এক সভায় রংপুর জেলা স্কুলের দু'শো ছাত্র উপস্থিত ছিল এবং 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেছিল। সরকারী নির্দেশে প্রতি ছাত্রকে পাঁচ টাকা জরিমানা করা হয়। প্রফুল্ল চাকী সহ এই ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই জরিমানার টাকা দিতে অস্বীকার করায় স্কুল কর্তৃপক্ষ তাদের বিতাড়িত করে।

সরকারের দৃষ্টিতে ওইসকল 'দাগী' ছেলেরা যাতে সরকার বা বিশ্ববিদ্যালয় মনোনীত কোনো স্কুলে ভর্তি হতে না পারে সেজন্য পূর্ববাংলা-অসমের রাজশাহী বিভাগের অস্থায়ী ডাইরেক্টর অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন বা শিক্ষা অধিকর্তা নর্মান লেসলি হলওয়ার্ড সকল স্কুল-পরিদর্শকদের উদ্দেশে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানালেন, স্কুল পরিত্যাগের বৈধ ছাড়পত্র ছাড়া কোনো ছাত্র যেন অপর কোনো স্কুলে ভর্তি হতে না পারে। এই আদেশ অমান্য করলে গুরুতর শাস্তি পেতে হবে বলে হলওয়ার্ড হুমকিও দেন।

এই ধরনের দমনমূলক ফতোয়ার বিরুদ্ধে দু'টি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল উনিশ শো পাঁচ খৃস্টাব্দের চব্বিশে অক্টোবরে। একটি প্রতিবাদ সভার সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, অন্যটিতে আবদুল রসুল। কিন্তু ইংরেজ সরকারের মনোভাবের কোনো পরিবর্তন হয়নি। কিছুদিনের মধ্যেই পূর্ববাংলা অসমের চিফ সেক্রেটারীর দপ্তর থেকে ঢাকা বিভাগের কমিশনার পার্সি কমিন্ লায়ন্ স্কুল-কলেজ পরিদর্শকদের কাছে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে জানালেন, সরকারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছেলেদের কোনো সরকারী চাকরিতে নিয়োগ করা যাবে না কারণ ওদের ইংরেজ প্রশাসনের উপর কোনো আস্থাই নেই।

এদেশের ছাত্র ও শিক্ষকদের প্রতি শ্বেতাঙ্গ শাসক ও তাদের তাঁবেদার এদেশের কর্তৃপক্ষ যে কতটা নির্মম ব্যবহার করতেন তার আরও দু'একটি নমুনা দেওয়া যেতে পারে। ফরিদপুরের ম্যাজিস্ট্রেট মাদারিপুরের মহকুমা হাকিমকে নির্দেশ দেন যে, পাট ও চা ব্যবসায়ী 'ল্যাণ্ডেল এণ্ড ক্লার্ক, কোম্পানীর দারোয়ানকে মাদারিপুর স্কুলের ছাত্ররা প্রহার করেছে। কোনো তদন্ত না করেই লায়ন সাহেব সিংহবিক্রমে গর্জে উঠে নির্দেশ দিলেন, যে ছেলেরা মারধোর করেছে তাদের মধ্যে তিনটি দলপতিকে আবিষ্কার করে সদর মহকুমা হাকিমের সামনে স্কুল গৃহে বেত মারতে হবে। প্রধান শিক্ষক ছাত্রদের কাছ থেকে দেড়শো টাকা জরিমানা আদায় করে সরকারের কাছে জমা দেবেন। স্কুলের সরকারী সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হবে যতদিন না স্কুল কর্তৃপক্ষ স্কুলে নিয়মানুবর্তিতা বা শৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেন।

এই লায়ন সার্কুলারকে ভিত্তি করেই বরিশালের জেলা শাসক বানরীপাড়া স্কুলের প্রধান শিক্ষককে

অপমান করেন এবং ওই স্কুলের তিনজন ছাত্র ও একজন শিক্ষককে স্কুল থেকে বিতাড়িত করেন। এইরকমই দমনমূলক বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন রাজশাহীর অস্থায়ী হাকিম উমাপ্রসন্ন গুহ। তিনি ওই বিজ্ঞপ্তিতে ছাত্র , শিক্ষক ও অভিভাবকদের উদ্দেশে সরকারী অনুজ্ঞা কঠোরভাবে পালন করতে নির্দেশ দেন।

শুধু বাংলা নয়, সারা ভারত জুড়ে যুব ছাত্রসমাজ সরকারেব নির্যাতন ও অবিচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ছিল। তাই, এবার আর শুধু বাংলা নয়, ইংরেজ সরকারের নজর পড়ল গোটা ভারতবর্ষেব দিকে। উনিশ শো সাত খৃস্টাব্দের ছয়ই মে এবং তেসরা জুন সিমলা থেকে হার্বার্ট হোপ বিজলি পরপব দু'টো ফতোয়া জারি করলেন। সরকার এতদিন ভাবছিল, স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে শান্তিশৃঙ্খলা ভঙ্গ করে ছাত্ররা নিজেদের সম্ভাবনাপূর্ণ বিরাট ভবিষ্যতের ক্ষতি করেছে। তারা যদি এই ধরনের কাজ থেকে বিরত না হয় তাহলে সরকার কিছু কড়া সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হবে। এগুলোর মধ্যে আছে স্কুল কলেজের অমনোনয়ন, সরকারী সাহায্য বন্ধ, ছাত্রদের বৃত্তি বন্ধ প্রভৃতি। শিক্ষকদের সম্পর্কেও হুমকি দিয়ে বলা হয়েছিল, যদি কোনো শিক্ষক তাঁর ছাত্রদের কোনো রাজনৈতিক সভায় নিয়ে যান, যেতে উৎসাহ বা সুযোগ দেন অথবা নিজ-অভিসন্ধি পূরণে ছাত্রদের নিযুক্ত করেন, তাহলে সেটা গুরুতর অপরাধ বলে গণ্য হবে এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কিংসফোর্ড হত্যার চেষ্টা

আগেই আমরা লক্ষ্য করেছি, কিংসফোর্ড দেশনায়ক বিপিনচন্দ্র পালকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং তাঁরই হুকুমে বালক সুশীল সেনকে ইংরেজের ঘাতক গুণে গুণে পনেরোবার বেত মারে। তা ছাড়া, ভারত-বিদ্বেষ, অত্যাচার-প্রবণতা ও নৃশংসতায় ওই শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষটি ছিলেন তাঁর প্রভু লর্ড কার্জনের দোসর। তাঁর হাতে 'যুগান্তর', 'বন্দেমাতরম', 'সন্ধ্যা' প্রভৃতি বিপ্লবীদেব মুখপত্রগুলোকে অশেষ নাজেহাল হতে হয়েছে। স্বদেশী-আন্দোলনের দমন কার্যে তার অন্তহীন উৎসাহের ফলে বিপ্লবী আদালতের বিচারে তাঁর প্রাণদণ্ড জারি করা হল। যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী উক্ত গুপ্ত-বিচারের রায় নাকি অরবিন্দ, চারু দত্ত ও সুবোধচন্দ্র মল্লিক সম্মিলিতভাবে দিয়েছিলেন।

একটি বইয়েব মধ্যে বোমা পুরে সেটাকে কিংসফোর্ডের কাছে পাঠিয়ে তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা ব্যর্থ হল। পরেশ মৌলিক নামক এক তরুণকে কিংসফোর্ড-হত্যা কল্পে বোমা-সন্নিবিষ্ট বিরাটদেহী ওই পুস্তকটি তাঁব বাড়িতে রেখে আসার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় কিংসফোর্ড কিছুদিন অফিসে আসেন নি এবং বইটি অলক্ষ্যে অন্যান্য বইয়ের স্তূপে পড়ে থাকে। ইতিমধ্যে কিংসফোর্ড বদলি হয়ে চলে গেলেন বিহাব প্রদেশের মজঃফবপুব শহরে।

কিন্তু বিপ্লবীর রায় যখন একবার বেরিয়ে গেছে, তখন একে কার্যকব কবতেই হবে। ক্ষুদিরাম বসু এবং প্রফুল্ল কুমার চাকি নামক দু'টি তরুণেব উপর আদেশ হল মজঃফরপুরে গিয়ে কিংসফোর্ডকে নিধন করার। উনিশ শো আট খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসে বোমা ও বিভলবাব নিয়ে তাঁরা রওনা হলেন। ওঁরা মজঃফরপুর শহরে একটা ধর্মশালায় আশ্রয় নিলেন। এক সপ্তাহ কেটে গেলেও ওঁবা কিংসফোর্ডকে হত্যা করার কোনো সুযোগ পেলেন না। নিজেব কোয়ার্টার ছেড়ে তিনি তখন ভয়ে বড় একটা বেরোতেন না।

কোর্ট-কাছারিতে যাওয়া ছাড়া তিনি অন্য কোথাও যেতেন না। ইতিমধ্যে তাঁর কাছে প্রেরিত বেনামী পত্রাদিতে তিনি জানতে পেরেছেন তাঁকে হত্যা করা হবে।

সেদিন ত্রিশে এপ্রিল। বিপ্লবী দু'জনের কাছে খবর ছিল ক্লাব-ঘরে কিংসফোর্ড দম্পতি এবং কেনেডি গৃহিণী ও তাঁর অনূঢ়া কন্যা ত্যাস খেলছেন। রাত সাড়ে আটটার সময় ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকি কিংসফোর্ডের বাড়ির সামনে লুকিয়ে অপেক্ষা করছেন।

তাস খেলা শেষ হলে পরপর দু'খানা গাড়িতে কিংসফোর্ড-দম্পতি এবং মিসেস ও মিস কেনেডি রওনা হলেন। ক্লাবঘরের খুব কাছেই ছিল কিংসফোর্ডের বাংলো কিন্তু কেনেডিদের যেতে হবে প্রায় মাইলখানেক দূরে। কেনেডিদের গাড়িটা কিংসফোর্ডের গাড়ির চেয়ে একটু এগিয়ে যাচ্ছিল। প্রথম গাড়িটা কিংসফোর্ডের বাংলোর গেটের সামনে আসতেই একটা বিশাল গাছের আড়াল থেকে হঠাৎ বাঘের মতো লাফিয়ে এসে পড়লেন ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল এবং বোমা ছুঁড়লেন গাড়িটাকে লক্ষ্য করে। বিশাল শব্দ করে বোমা বিস্ফোরণ ঘটলে গাড়িটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। বিপ্লবীরা নিশ্চিন্ত হলেন, কিংসফোর্ডের দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে।

কাজ শেষ করে ওঁরা অন্ধকারে পালিয়ে গেলেও ওঁদের পায়ের জুতো ফেলে এসেছিলেন ওখানে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি থানায় ও রেল স্টেশনে খবর পাঠানো হল, বিপ্লবীরা খালি পায়ে পালিয়েছে। কোনো যুবকের পায়ে জুতো না থাকলে তাকে তল্লাশী করো। পরবর্তীকালে, মামলা চালু হলে ওই জুতোগুলো আদালতে 'এক্‌জিবিট' হিসেবে প্রদর্শিত হয়েছিল।

ওঁরা কিছুদূর একসঙ্গে দৌড়ে এসে মানুষের সন্দেহ এড়ানোর জন্য নিজেরা ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলেন। একজন ছুটে গেলেন সমস্তিপুরের দিকে অন্যজন দৌড়লেন সোজা রেললাইন ধরে।

এদিকে বিপদ-সংকেত পেয়েই পুলিশ-সুপার দু'জন সাব-ইনস্পেক্টরকে আসামীদের গ্রেপ্তার করার উদ্দেশ্যে ট্রেনে পাঠালেন। তাদের একজন মোকামা. অন্যজন বাঁকিপুরের দিকে রওনা হল। তা ছাড়া, প্রত্যেকটি রেল-স্টেশন তখন পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ। উইনি স্টেশনেই দু'জন কনস্টেবল পাঠানো হল। তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল, সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসতে হবে।

ওদিকে দুর্ভাগ্যবশত বিপ্লবীদের ভুলের জন্য কিংসফোর্ডের গাড়িতে বোমা না পড়ে কেনেডিদের গাড়িতে বোমা পড়ায় মিসেস ও মিস কেনেডি মারা যান। নির্দোষ দুটি মহিলার মৃত্যুতে মানসিক আঘাত পেয়েছিলেন ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল। ভাগ্যক্রমে কিংসফোর্ড বেঁচে গেলেন। বিপ্লবীরা এবার আরও সতর্ক হয়ে গেলেন।

প্রফুল্ল কুমার চাকি

প্রফুল্ল দৌড়তে দৌড়তে সমস্তিপুর রেল স্টেশনে পৌঁছলেন। নতুন জামা-কাপড় ও জুতো পরে নিয়ে মোকামা ঘাটের একটা টিকিট কাটলেন।

ট্রেন এলে প্রফুল্ল একটা কামরায় উঠলেন। দুর্ভাগ্যবশত এই কামরায় ছিল দারোগা নন্দলাল ব্যানার্জি। সে ছুটির শেষে কাজে যোগ দেবার জন্য সিংভূমে যাচ্ছিল। যুবকটির পোষাক-পরিচ্ছদ, পায়ে নতুন জুতো ও চোখে মুখে একটা উত্তেজনার আভাস ধূর্ত নন্দলালের চোখ এড়াল না। পদোন্নতির লোভে ধূর্ত এই ব্যক্তিটি প্রফুল্লর সঙ্গে আলাপে ও অন্তরঙ্গতায় ঘনিষ্ঠ হতে চেষ্টা করল। ওর আপ্যায়ন ও বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টায় প্রফুল্ল যে ক্রমশ বিব্রত ও বিরক্ত হচ্ছেন, নন্দলাল তা বুঝতে পেরেই তার করে দিল পুলিশ-কর্তাদের কাছে মজঃফরপুর শহরে। বিরাট পুলিশবাহিনী মোকামাঘাট স্টেশনে তৈরি হয়ে থাকল।

প্রফুল্ল ট্রেন থেকে নামতেই বন্ধুর বেশে নন্দলাল এসে কর্তাদের নির্দেশমতো তাঁকে গ্রেপ্তার করাল। বিস্মিত প্রফুল্ল শুধু বললেন, 'আপনি বাঙালী হয়ে বাঙালীকে ধরিয়ে দিলেন?'

প্রফুল্লের দেহে অসীম শক্তি। এক ঝটকায় পুলিশের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করে তিনি দৌড় দিলেন। দুটো কনস্টেবল তাঁকে অনুসরণ করতেই তিনি গুলি ছুঁড়লেন কিন্তু গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। প্রফুল্ল কিছুতেই ধরা দিতে নারাজ। যখন তিনি প্ল্যাটফর্মের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে গেছেন তখন হঠাৎ বন্দুকটি তাঁর নিজের দিকে তাক করে পরপর দু'বার গুলি করলেন। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন তিনি। সম্মুখ-যুদ্ধে বাংলার প্রথম শহীদ নির্ভীক প্রফুল্লকুমার।

কিন্তু প্রফুল্লর মরদেহ সুসভ্য ইংরেজ সরকারের লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি পায়নি। সরকার ওঁকে জীবন্ত অবস্থায় গ্রেপ্তার না করতে পারায় দারুণ অনুশোচনায় ভুগছিল। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে প্রফুল্ল নন্দলালকে নিজের পরিচয় দিয়ে যান দীনেশচন্দ্র রায় নামে। সরকার সিদ্ধান্ত করে, 'দীনেশ'-ই যে কেনেডিদের হত্যাকারীদের মধ্যে একজন, তা প্রমাণ করতে হবে। তাই সরকারী আদেশে, প্রফুল্লর মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছন্ন করে, স্পিরিটে ডুবিয়ে কলকাতায় আনা হল শনাক্তকরণের জন্য। দু'একদিনের মধ্যেই জানা গেল, ওই মস্তক দীনেশচন্দ্র রায়ের নয়, ওটা প্রফুল্ল চাকির এবং উনিই কেনেডিদের হত্যাকারীদের মধ্যে একজন। আরও জানা গেল, প্রচুর দৈহিক শক্তির অধিকারী এই যুবক রংপুর জাতীয় বিদ্যালয়ের সুপরিচিত ছাত্র। বিপ্লবী নেতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষ তাঁর রংপুর সফরের সময় প্রফুল্লর স্বাস্থ্য, বুদ্ধি ও হৃদয়ের স্পর্শ পেয়ে তাঁকে বিপ্লবের পথে টেনে নেন। কিছুদিন পরেই প্রফুল্ল কলকাতায় আসেন এবং কিংসফোর্ড-হত্যার পরিকল্পনা সফল করতে মজঃফরপুরে যান।

ক্ষুদিরাম বসু

প্রফুল্ল চাকিকে ছেড়ে ক্ষুদিরাম রেললাইন ধরে ছুটছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন নিকটবর্তী কোনো স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেবেন। মজঃফরপুর থেকে প্রায বিশ মাইল দূরে ছোট্ট একটা স্টেশন 'উইনি'। সেখানে তিনি যখন এসে পৌঁছলেন তখন তাঁর পায়ে জুতো নেই, পরনের জামা কাপড় ময়লা, চুল রুক্ষ, চোখে মুখে দুঃসহ ক্লান্তির ছাপ। উত্তেজনায় ও পরিশ্রমে শরীর অবসন্ন, খিদেয় ও তেষ্টায় তিনি যেন আর দাঁড়াতে পারছেন না।

ক্ষুদিরাম বসু

স্টেশনেব গাযে ছিল ছোট একটা বাজার। যদি কিছু খাবাব পাওয়া যায় সেই উদ্দেশ্যে তিনি সেই বাজারে গিয়ে ঢুকলেন। এক দোকানীর কাছ থেকে কিছু চিড়ে কিনে জলের সন্ধানে যেতেই পুলিশেব হাতে ধরা পড়লেন তিনি। চলল পুলিশেব টানা-হ্যাঁচড়া ও জিজ্ঞাসাবাদ। মাত্র একবার সুযোগ পেয়েই ক্ষুদিরাম জামার নিচে থেকে রিভলভার বের করাব ব্যর্থ প্রচেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সন্ধানী পুলিশ তাঁর প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেয। তল্লাশী চালিয়ে তাঁর দেহ থেকে পুলিশ উদ্ধার কবে দুটো রিভলভার ও কিছু কার্তুজ। ওঁকে শৃঙ্খলিত অবস্থায সেই দিনই নিয়ে আসা হল মজঃফবপুবে।

যখন বন্দীবীরকে নিয়ে মজঃফরপুর স্টেশনে ট্রেন ঢুকছিল তখন হাজার-হাজার মানুষ সমবেত হয়েছিলেন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে সেদিনের সেই অগ্নিশিখাকে একটু চোখে দেখার জন্য। সকলেই দেখল, এক পরিশ্রান্ত, অবসন্ন তরুণ তাঁর নিজের দুঃখ যন্ত্রণার কথা ভুলে গিয়ে শৃঙ্খলিত অবস্থায় সদর্পে প্ল্যাটফর্মের উপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে পুলিশের গাড়িতে উঠে চিৎকার করে বলল, 'বন্দেমাতরম'। সঙ্গে -সঙ্গে সহস্র কণ্ঠে এই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়ে মজঃফরপুরের আকাশ-বাতাস যেন মথিত করে তুলল।

বিচার শুরু হল কুড়ি দিন পরে। ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে ক্ষুদিরাম অকম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'কিংসফোর্ডকে

আমি হত্যা করতে চেয়েছিলাম। কারণ, এই ব্যক্তি ব্রিটিশ ভারতের অত্যাচারী শাসকদের অন্যতম। কিংসফোর্ডের গাড়ি এবং সেই গাড়িতে তিনি আছেন মনে করেই আমি বোমা ছুঁড়েছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কিংসফোর্ডের পরিবর্তে গাড়িতে ছিলেন দুটি নিরপরাধ মহিলা। তাঁদের মৃত্যু ঘটেছে শুনে আমি দুঃখিত।'

ক্ষুদিরাম যখন লোকারণ্য আদালতে দাঁড়িয়ে অকম্পিত কণ্ঠে এই বিবৃতি দিচ্ছিলেন তখন তিনি যেন কোন্ সুদূরের মানুষ।

এর পাঁচ দিন পরে 'মজঃফরপুরে বোমার মামলা' নামে ক্ষুদিরামের মামলা সেসন কোর্টে চালান করা হল। সেখানে ক্ষুদিরামের ফাঁসীর হুকুম হলেও কোনো ভ্রূক্ষেপ ছিল না তাঁর। ইতিমধ্যে দেহের ওজন বেড়ে গেছে দু'পাউণ্ড। এই আদালতেও তাঁর বীরদৃপ্ত বক্তব্য, 'আমি এই হত্যা কাণ্ডের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিচ্ছি। আমি দুঃখিত যে, কিংসফোর্ড এখনও জীবিত, অথচ দু'জন নিরপবাধ মহিলার মৃত্যু ঘটেছে'।

হাইকোর্টের বিচারে নিম্ন আদালতের রায় বহাল থাকল।

উনিশশো আট খৃস্টাব্দের এগাবোই আগস্ট ভোর ছ'টায় মজঃফবপুর জেলে ক্ষুদিরাম ফাঁসীর মঞ্চে নিজেকে উৎসর্গ করলেন।

মামলা চলার সময় ক্ষুদিরাম তাঁব উকিলেব কাছে বলেছিলেন, 'আমি শহর মেদিনীপুরের লোক। আমার বাবা, মা, ভাই, কাকা, মামা কেউ এ-জগতে নেই। বেঁচে আছেন শুধু একটি দিদি। দিদির বড় ছেলেটি আমারই সমবয়সী।'

ক্ষুদিবাম যখন মাত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র, তখনই তিনি পড়া ছেড়ে দিয়ে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন এবং বিপ্লবী দলে ঢুকে পড়েন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকবার পুলিশেব সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। প্রয়াণেব মাত্র দু'বছর আগে এমনই এক সংঘর্ষে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয় এবং তাঁর বয়স অল্প থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহাব করে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

জানা গেছে, ফাঁসীর আগের দিন উকিলের সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎকারে ক্ষুদিরাম বলেছিলেন, 'কিছু ভাবনা নেই। পুরাকালে রাজপুত-রমণীরা নির্ভয়ে জ্বলন্ত চিতায় উঠে আত্মদান করতেন—আমিও সেই ভয়হীনতায় মৃত্যুকে গ্রহণ করব।'

তিনি যেদিন ফাঁসীর মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে গেলেন সেদিন 'দ্য এম্পায়ার' কাগজে লিখেছিল, 'আজ প্রভাতে ক্ষুদিরাম বসুকে নিধন কবা হয়েছে। এ কথা বলা হয়েছে, যে, শিরদাঁড়া সোজা করে তিনি ফাঁসীর মঞ্চে আরোহণ করেছেন। স্মিতহাস্যে হর্ষোজ্জ্বল ছিল তাঁর মুখ।'

এদিকে, কিংসফোর্ড বোমার আঘাতে আহত না হলেও সে আঘাত তাঁব মানসিক শক্তিকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল। অবসন্ন চিত্তে মৃত্যুভয়-কাতর এই রাজপুরুষটি তেসরা মে তারিখেই সপরিবারে মুসৌরীতে পালিয়ে গেলেন দীর্ঘ ছুটি নিয়ে। অতঃপব কিংসফোর্ডেব নাম বড় একটা শোনা যায় নি রাজপুরুষদের কোনো কাজে।

নন্দলাল-নিধন

প্রফুল্ল চাকিকে জীবিত অবস্থায় ধরতে না পেরে তাঁর মরদেহ থেকে মাথা কেটে নিয়ে গিয়েছিল নন্দলাল ব্যানার্জী তাঁকে শনাক্ত করার উদ্দেশ্যে। এই অসভ্য, বর্বরোচিত ও নৃশংস কাজে নন্দলাল তখন আনন্দে আত্মহারা। এবার সে ছোট দারোগা থেকে বড় দারোগা হবে, তারপর সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকারের পা চেটে আরো উপরে উঠবে। কিন্তু সে তখনও জানে না বিপ্লবীদের সংগুপ্ত নির্দেশ—'হত্যা করো বিভীষণ নন্দলালকে'।

বিপ্লবীদেব গর্বেব কথা এই যে, প্রফুল্ল চাকিব প্রয়াণেব মাত্র ৫ মাস পর্তীদেব ব্যবধানে ওঁব গ্রেপ্তাবেব জন্য দাযী দেশদ্রোহী নন্দলালকে চবম শাস্তি দিলেন বিপ্লবীবা। বিপ্লবী শ্রীশচন্দ্র পালেব হাতে মৃত্যুদণ্ড লাভ কবতে হল সর্বশক্তিমান ব্রিটিশ বাজেব পুলিশ কর্মচাবী নন্দলালকে। এই তাৎপর্যপূর্ণ বৈপ্লবিক কাজটি সংঘটিত হয়েছিল বিপিনচন্দ্র পালেব নেতৃত্বে গঠিত 'আত্মোন্নতি সমিতি'ব সঙ্গে ঢাকাব হেমচন্দ্র ঘোষেব 'মুক্তি সংঘ'-এব যোগাযোগে। শ্রীশচন্দ্র পাল ছিলেন হেমচন্দ্রেব কলকাতায় প্রতিনিধি। দেশদ্রোহী নন্দলালকে শ্রীশচন্দ্র কলকাতাব সার্পেন্টাইন লেনে গুলিব আঘাতে নিহত কবলেন। এই হত্যাকাণ্ডে শ্রীশচন্দ্রেব সঙ্গী ছিলেন 'আত্মোন্নতিব' বণেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী।

লাজপৎ বায

নন্দলালকে হত্যাব দিন যথাসময়ে সশস্ত্র বণেন গাঙ্গুলী এবং শ্রীশ পাল ওবফে নবেন গোপনে সার্পেন্টাইন লেনে এসে পুবোনো একটা শিবমন্দিবেব কাছে দাঁড়িযে চিনেবাদাম খাচ্ছিলেন। অল্পক্ষণ পবে তাঁবা নন্দলাল ব্যানার্জীকে তাব বাড়ি থেকে বেবোতে দেখে এগোতে থাকলেন। তখন সন্ধ্যে সাতটা। সেন্ট জেম্স স্কোযাব পার্কেব দক্ষিণ পশ্চিম কোণে নন্দলাল আসতেই তাকে গুলি কবে হত্যা কবলেন শ্রীশ। নন্দলালেব মৃত্যু সম্পর্কে সুনিশ্চিত হবাব জন্য ভূলুণ্ঠিত নন্দলালেব মাথায় পুনবায গুলি কবলেন বণেন্দ্রনাথ।

ইংবেজ সবকাবেব পক্ষে আততাযীদেব চিহ্নিত কবা বা গ্রেপ্তাব কবা সম্ভব হযনি।

লাল-বাল-পাল

এই নামে পবিচিত পাঞ্জাবেব লালা লাজপৎ বাই (১৮৬৫-১৯২৮), মহাবাষ্ট্রেব বালগঙ্গাধব তিলক (১৮৫৬-১৯২০) ও বাংলাব বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮ ১৯৩২) চবমপন্থী নেতা হিসেবে পবিগণিত হযেছিলেন। এঁবা প্রথম থেকেই স্বদেশী আন্দোলনেব অগ্রগণ্য নেতা ছিলেন। চাপেকাব ভাইযেবা যখন ব্যাণ্ডেব হত্যা মামলায জড়িত ছিলেন তখন তিলক ওই ঘটনাব সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং শিবাজী উৎসবেব মাধ্যমে বাজদ্রোহ প্রচাব কবছেন—এই অভিযোগে তিলককে দেড বছব কাবাদণ্ডে দণ্ডিত কবা হয। পুণাব চবমপন্থী নাটু ভাইদেবও এক পুবোনো আইন অনুযাযী পুণা ছেড়ে চলে যেতে বলা হয।

বিপিনচন্দ্র পাল

ববীন্দ্রনাথ তিলক মামলা চালানোব টাকা তোলাব জন্য 'তিলক বক্ষা সমিতি' গঠনেব আহ্বান জানান

এবং নাটু ভাইদের নির্বাসনের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেন। উনিশ শো সাত খৃস্টাব্দের দশই সেপ্টেম্বর

তিলকের বক্তৃতা

'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের জন্য আদালত অবমাননার মামলায় অন্যতম চরমপন্থী নেতা বিপিনচন্দ্র পালের ছ'মাস কারাদণ্ড হয়।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (১৮৬১-১৯০৭) ছিলেন রোমান ক্যাথলিক ও বৈদান্তিক সন্ন্যাসী। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে তাঁর দৈনিক 'সন্ধ্যা' পত্রিকা মারফৎ তিনি ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম পরিচালনা করেন। সরকার এই পত্রিকাটিকে উনিশ শো সাত খৃস্টাব্দে বন্ধ করে দেন এবং রাজদ্রোহের অপরাধে ব্রহ্মবান্ধবকে গ্রেপ্তার করেন। ইতিপূর্বে তিনি কিছুদিন শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শিক্ষকতাও করেছিলেন। মামলা চলার সময় অস্ত্রোপচারের পরে তাঁর মৃত্যু হয়।

মৃত্যুর ক'দিন আগে আদালতের সামনে অন্তিম বিবৃতিতে ব্রহ্মবান্ধব বলেন, 'এই মামলার ব্যাপারে আমি কোনোভাবেই যোগ দিতে চাই না। আমি বিশ্বাস করি যে, বিধাতৃনির্দিষ্ট স্বরাজ সাধনের ব্রত পালনে আমার যে সামান্য অংশটুকু আছে তার জন্য বিদেশী জাতির কাছে আমার জবাবদিহি করার কিছু নেই কারণ ওরা আমাদের শাসন করছে আর ওদের স্বার্থ আমাদের প্রকৃত জাতীয় উন্নয়নের পরিপন্থী হতে বাধ্য।'

কাকুজো ওকাকুরা

বিবেকানন্দের শিষ্যা মিস ম্যাকলিয়ড জাপানী চিত্রকলার অধ্যাপক ওকাকুরা (১৮৬২-১৯১৩)-কে ভারতে আনেন। এখানে তিনি সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভগিনী নিবেদিতা প্রমুখের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠ

হন ও বাংলার তরুণদের মধ্যে কিছুটা প্রগতিশীল ভাবধারা সঞ্চারিত করতে সমর্থ হন। এই কাজে তাঁর লেখা 'আইডিয়ালস্ অফ দ্য ইস্ট' গ্রন্থটি বিশেষ সহায়ক হয়।

সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭২-১৯৪০) অনুশীলন সমিতির সক্রিয় সদস্য ও কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। স্বদেশী যুগে তিনি বোম্বাইয়ের রেলধর্মঘটীদের জন্য অর্থসংগ্রহ করেন। রুশ বিপ্লবের কয়েক বছর পর থেকেই 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় ওই বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন এবং প্রয়াণের কিছুদিন আগে সোভিয়েত সভ্যতা সম্পর্কে 'বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এ-দেশে বীমা-আন্দোলনেরও তিনি পথিকৃৎ।

স্বদেশী সংগীতের প্রভাব

স্বদেশী যুগে রবীন্দ্রনাথ অসংখ্য গান লিখে বহু সভাসমিতিতে গেয়ে শোনাতেন। তাঁর 'রাখী সংগীত' বিশেষ করে স্বদেশী আন্দোলনের সূচনাপর্বকে চিহ্নিত করে।

প্রবন্ধ ও সাংবাদিকতা বাদেও কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদের (১৮৬১-১৯০৭) লেখা কবিতা ও গান স্বদেশী যুগে জনপ্রিয় হয়েছিল। 'হিতবাদী' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে কালীপ্রসন্ন তাঁর পত্রিকার লেখকের নাম প্রকাশ করতে অস্বীকার ক'রে ন'মাস জেল খাটেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (১৮৬৩-১৯১৩) স্বদেশী সংগীত ও দেশাত্মবোধক নাটক, রজনীকান্ত সেনের (১৮৬৫-১৯১০) ও অতুলপ্রসাদ সেনের (১৮৭৯-১৯৩৪) বহু গানও সেদিন উদ্বুদ্ধ করেছিল দেশবাসীকে। মুকুন্দ দাস (১৮৭৮-১৯৪৩) ছিলেন স্বদেশী পর্বের চারণ কবি। তাঁর স্বদেশী যাত্রা ও পালাগান সেদিন লক্ষ লক্ষ গ্রাম ও শহরবাসীর অন্তরে সঞ্চারিত করেছিল দেশপ্রেমের উদ্দীপনা। রবীন্দ্রনাথের ভাগ্নী সরলা দেবী চৌধুরাণী (১৮৭২-১৯৪৫) 'অতীত গৌরব কাহিনী মম বানী'র মতো দেশাত্মবোধক গান রচনা করে ও জনসভায় গেয়ে জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করেন।

এইসব সংগীত পরিবেশনের পাশাপাশি ছিল রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী ও সখারাম গণেশ দেউস্করের দেশাত্মবোধক ও চিন্তাশীল রচনা। দেউস্করের 'দেশের কথা' সরকারী নির্দেশে নিষিদ্ধ হলেও তার পাঁচটি সংস্করণের হাজার-হাজার কপি দেখতে-দেখতে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল।

মহারাষ্ট্রে স্বদেশী আন্দোলন ও শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা

আঠারো শো সাতানব্বই খৃস্টাব্দের জুন মাসে ভারতবর্ষের প্রথম বৈপ্লবিক কাজ পুণা শহরে সংঘটিত হয়। ইংরেজ প্রশাসকবৃন্দ হকচকিয়ে গিয়ে তড়িঘড়ি তারা নানারকম কড়াকড়ি শুরু করে দিল। জাতীয়তাবাদী যুব ও ছাত্রদের উপর দমন-পীড়ন শুরু হল।

কাথিয়াওয়াড়ের অধিবাসী শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা মাত্র দু'বছর আগে বিলেত থেকে দেশে ফিরলেও সরকারের এই দমন নীতি চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিদেশে আবার পাড়ি দিলেন। লণ্ডনে পৌঁছেই তিনি তাঁর কাজ শুরু করে দিলেন ওখানকার জাতীয়তাবাদী ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে। আট বছর পরে, উনিশ শো পাঁচ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে শ্যামজী প্রকাশ করলেন তাঁর পত্রিকা 'দ্য ইণ্ডিয়ান সোশিওলজিস্ট'। পরের মাসেই স্থাপিত হল 'ইণ্ডিয়ান হোম রুল লীগ বা সোসাইটি'। তারও পাঁচ মাস পরে প্রতিষ্ঠিত হল 'ইণ্ডিয়া হাউস'—ভারতীয় ছাত্রদের থাকা খাওয়ার একটা আস্তানা।

এর দু'বছর পরে শ্যামজী একটি বিপ্লবী সংস্থা গড়ে তোলার জন্য এককালীন দশ হাজার টাকা দান করলেন। ওই সংস্থা চালানো হত ভারতের রাজনৈতিক কর্মীদের তরফ থেকে, যাঁরা দেশের জন্য আত্মনিবেদিতপ্রাণ কর্মী।

কৃষ্ণবর্মার কাজ কর্মে ব্রিটিশ সরকার তটস্থ হল। এই ব্যারিস্টার অথচ বিপ্লবীকে ইংরেজ ঠিক

বুঝে ওঠার আগেই কৃষ্ণবর্মা তাঁর কাজের কেন্দ্র লণ্ডন থেকে সরিয়ে আনলেন ফ্রান্সে। প্যারিস শহরে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন বিনায়ক দামোদর সাভারকর, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, মাদাম কামা এবং আরো কিছু ভারতীয় বিপ্লবী। ভারতবর্ষের বাইরে ভারতীয়দের বিপ্লব ঘটানোর চেষ্টা শুরু করায় মহারাষ্ট্রের অবদান লক্ষণীয়।

এই মহারাষ্ট্র থেকেই উনিশ শো আট খৃস্টাব্দে 'কাল' নামক পত্রিকায় শ্রী পারাঞ্জপে নামক এক বিপ্লবী লেখকের এক প্রবন্ধে ভারতীয় বিপ্লবীদের ব্রিটিশ প্রদত্ত 'এ্যানার্কিস্ট' আখ্যা দেবার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ বের হয় এবং এই প্রতিবাদমূলক বৈপ্লবিক রচনার জন্য এই রচনাটির লেখককে কারারুদ্ধ করা হয়। বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারে পারাঞ্জপে দণ্ডিত হন।

স্বরাজ পত্রিকা

শান্তিনারায়ণ ছিলেন উত্তরপ্রদেশের মজঃফরনগর জেলার তরুণ বিপ্লবী। তিনি ভারতমাতা-সোসাইটিতে যোগ দেন এবং উনিশ শো সাত খৃস্টাব্দের নভেম্বর মাসে সম্পাদক হিসেবে এলাহাবাদ থেকে এক উর্দু সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশনা শুরু করেন। 'স্বরাজ' নামে এই পত্রিকাটি মাত্র আড়াই বছর চলেছিল এবং সরকারী নির্দেশে উনিশ শো দশ খৃস্টাব্দের নয়া প্রেস আইন অনুসারে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু এই আড়াই বছরের আয়ুষ্কালে 'স্বরাজ' পত্রিকার আট জন সম্পাদক দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এঁদের মধ্যে দু'জন আত্মগোপন করেন। চারজন সম্পাদক—হরিয়ানার হোতিলাল ভার্মা, গুরুদাসপুর জেলার বাবু রামহরি, দেরাদুনের নন্দগোপাল চোপরা, গুজরাট জেলার লাধারাম কাপুর যথাক্রমে দশ বছর, একুশ বছর, ত্রিশ বছর ও ত্রিশ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে আন্দামানে প্রেরিত হন। পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশের অপরাধে আন্দামানে দ্বীপান্তরের এটিই একমাত্র ঘটনা।

গ্রেপ্তারের ঠিক আগেই লাধারাম কাপুর তাঁর পত্রিকায় এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন—

"স্বরাজ" পত্রিকার জন্য একজন সম্পাদক চাই। প্রতিদিন বেতন—ঘি ছাড়া দু'টি চাপাটি ও এক গেলাস ঠাণ্ডা জল আর প্রতি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ পিছু দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড।'

আন্দামানে লাধারামকে অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করতে হয়। তবু সব রকম নির্যাতনের মুখোমুখি তাঁর নির্ভীক অসমসাহসিকতার জন্য আন্দামান কমরেডদের কাছ থেকে তিনি 'ফিল্ড মার্শাল' নামে সম্মানসূচক উপাধি পান।

ভিখাজি রুস্তম কামা

মাদাম কামা (১৮৬১-১৯৪৩) নামে সুপরিচিতা এই প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীর কর্মক্ষেত্র প্রথমে লণ্ডনে ও পরে প্যারিসে। সেখান থেকে তিনি ও সর্দার সিং রাওজী রানা নামে আর এক বিপ্লবী দেশে অস্ত্র চালান দেওয়া, বিপ্লবীদের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি তৎপরতায় নিযুক্ত ছিলেন।

উনিশ শো সাত খৃস্টাব্দে মাদাম কামা ও রাণাজী ফরাসী সোশ্যালিস্ট পার্টির সদস্য হিসেবে স্টুটগার্টে অনুষ্ঠিত সম্মেলন প্রতিনিধিরূপে যোগ দেন। সেখানে মাদাম কামা ভারতের স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে যে তেরঙা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে বক্তৃতা করেন সেটি আগের বছর কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে যে পতাকাটি ওড়ানো হয়েছিল, অনেকটা তারই মতো। পরবর্তীকালে অনেকটা ওই ধরনের পতাকা ইউরোপে প্রবাসী বিপ্লবীরাও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্যবহার করেন।

স্টুটগার্ট সম্মেলনে মাদাম কামা লেনিনের আলোচনা শোনেন ও তাঁর ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হন। এই আকর্ষণ রুশবিপ্লবের পরে তাঁর মনোজগতে বিপ্লব ঘটিয়ে দেয় এবং তিনি মার্ক্সবাদী ভাবনায় গভীরভাবে প্রভাবিত হন।

বিনায়ক দামোদর সাভারকর

মহারাষ্ট্রে নাসিকের বিপ্লবী গণেশ দামোদর সাভারকর ও তাঁর ছোট ভাই বিনায়ক দামোদর সাভারকর (১৮৮৩-১৯৬৬) 'মিত্র মেলা' নামে একটি বিপ্লবী সমিতি প্রতিষ্ঠিত করেন আঠারো শো নিরানব্বই খৃস্টাব্দে। প্রতিষ্ঠার আট বছর পরে, এই সংস্থার নাম হয় 'অভিনব ভারত সমিতি'। এই নতুন নামকরণের পিছনে একটি কারণ ছিল।' 'মিত্রমেলা'র এই নতুন নামকরণের মাত্র এক বছর আগে বিনায়ক বিলেতে গিয়ে শ্যামজি কৃষ্ণবর্মা প্রতিষ্ঠিত 'ইণ্ডিয়া হাউস'-এর তত্ত্বাবধান এবং তরুণ প্রবাসী বিপ্লবীদের নিয়ে 'অভিনব ভারত সমিতি' গড়ার কাজে বিশেষ উদ্যোগী হয়েছিলেন। স্যার জন কার্জন-ওয়াইলি হত্যা-কাণ্ডের পর বিনায়ক গ্রেপ্তার হন। বন্দী অবস্থায় দেশে ফেরার পথে মার্সাই বন্দরের কাছে তিনি জাহাজ থেকে সমুদ্রে লাফিয়ে পড়ে সাঁতার কেটে ফরাসী উপকূলে পৌঁছন। কিন্তু ফরাসী রক্ষীরা আবার তাঁকে তুলে দেয় ইংরেজের হাতে। এরই সূত্রে রাজনৈতিক কারণে কোনো ব্যক্তির বিদেশে আশ্রয় গ্রহণের অধিকার সংক্রান্ত মামলা দায়ের করা হয় হেগের আন্তর্জাতিক আদালতে তবে সাম্রাজ্যবাদীদের প্রভাবে সে মামলা নাকচ হয়ে যায়। ফলে বিনায়ক দামোদর সাভারকরকে দেশে ফিরিয়ে এনে এক মামলায় তাঁর বড় ভাই গণেশ দামোদর সাভারকরের মতোই যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে আন্দামানে পাঠানো হয়।

মদনলাল ঢিংড়া

মদনলাল ঢিংড়া নামে বিনায়ক দামোদর সাভারকরের অনুগামী এক ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র নয় সালের পয়লা জুলাই বিলেতের জাহাঙ্গীর হলে অনুষ্ঠিত এক পার্টিতে স্যার জন কার্জন-ওয়াইলি নামে এক বিশিষ্ট রাজপুরুষকে গুলি করে হত্যা করেন। বিচারে তাঁর মৃত্যুদণ্ড হয় এবং দেড় মাস পরে বিলেতের এক জেলে তাঁর ফাঁসী হয়। অন্তিম বিবৃতিতে ঢিংড়া লেখেন,'বিদেশী সঙ্গীনের সাহায্যে যে জাতিকে দাবিয়ে রাখা হয় তার তো নিরন্তর সংগ্রাম চালু থাকে অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে। ভারতে এখন একমাত্র যে শিক্ষার প্রয়োজন তাহ'ল চরম আত্মদানের শিক্ষা—যে শিক্ষা অন্যকে দেওয়া যায় নিজে প্রাণ দান করে, সুতরাং আমি আত্মদান করছি এবং গৌরব বোধ করছি এই শহীদত্ব বরণে।'

জ্যাকসন হত্যা

নয় সালের একুশে ডিসেম্বর নাসিকের জেলা-শাসক জ্যাকসন নিহত হলেন। নাসিক থেকে পুনায় বদলি হয়ে যাবার প্রাক্কালে ওই দিন সন্ধ্যায় তাঁকে বিদায়-সংবর্ধনা জানানো হচ্ছিল। অত্যাচারী এই ইংরেজ প্রশাসকের নাম বিপ্লবীদের খতম-তালিকায় ততক্ষণে উঠে গিয়েছিল।

সংবর্ধনা সভায় ঢুকে জ্যাকসন্ উদ্যোক্তাদের সাদর আহ্বানে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট আসনের দিকে যাচ্ছিলেন। এমন সময় এক ভয়ঙ্কর শব্দে সারা হলঘর কেঁপে উঠল। বিপ্লবী অনন্তলক্ষ্মণের প্রথম গুলিটি জ্যাকসনের গায়ে না লাগলেও দ্বিতীয় গুলিটি তাঁকে বিদ্ধ করল। জ্যাকসন ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়লেও গুলির পর গুলি এসে তাঁর দেহটিকে ঝাঁঝরা করে দিল।

ঘটনাস্থলেই ধরা পড়লেন বিপ্লবী অনন্তলক্ষ্মণ কানহেরে। জ্যাকসনকে হত্যা করার কারণ জানিয়ে লেখা একটি চিরকুট পাওয়া গেল তাঁর পকেট থেকে।

ওই হত্যাকাণ্ডের সূত্রে ধরা পড়লেন কৃষ্ণগোপাল কার্ভে, বিনায়ক দেশপাণ্ডে, শংকর, সোমান, নারায়ণ যোশী, গণেশ বৈদ্য ও পাণ্ডুরাম যোশী। সকলের বিচার শুরু হল।

প্রায় তিনমাস পরে হাইকোর্টের রায় বেরোলো। অনন্তলক্ষ্মণ কানহেরে, বিনায়ক দেশপাণ্ডে, কৃষ্ণগোপাল কার্ভের ফাঁসীর হুকুম হল। বাকি পাঁচজনের মধ্যে শংকর, রামচন্দ্র সোমান, নারায়ণ যোশী ও গণেশ বৈদ্যর হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের সাজা। দত্তাত্রেয় পাণ্ডুরাম যোশী শুধু পেলেন দু'বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।

পুলিশের মতে, জ্যাকসন্-হত্যার পিস্তলটি নাকি বিনায়ক সাভারকরই প্যারিস থেকে পাঠিয়েছিলেন

গোপন পথে। সুতরাং উক্ত হত্যাকাণ্ডের সহায়ক বলে সাভারকরকে বিলেতেই গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু বন্দী সাভারকর ভারত অভিমুখে প্রেরিত হবার কালে মার্সাই বন্দরে জাহাজ পৌঁছতেই বাথরুমের জানলা দিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং সাঁতার কেটে উপকূলে এসে পৌঁছলে তাঁকে ফরাসী পুলিশ গ্রেপ্তার ক'রে ইংরেজ পুলিশের হাতে তুলে দেয়, যা আমরা আগেই বলেছি। বিপ্লবী মাদাম কামা ফরাসী সরকারের কাছে 'সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা'র বাণী উচ্চারণ করে কত না তদ্বির করলেন সাভারকরকে মুক্ত করার আগ্রহে। কিন্তু ওঁকে ছেড়ে দেওয়া তো দূরের কথা, ইংরেজ ইতিমধ্যে কৃষ্ণবর্মার সঙ্গে ওঁকে জড়িয়ে দু'জনের ব্যারিস্টারির সনদ কেড়ে নিল। পরের বছর উনিশে এপ্রিল তারিখে ফাঁসীর মঞ্চে আরোহণ করলেন অনন্তলক্ষ্মণ, কার্ভে ও দেশপাণ্ডে।

পরপর তিনজন বীর মৃত্যু-মঞ্চে উঠে এসে দেশ-জননীর পায়ের শৃঙ্খল উন্মোচিত করার ব্রত উদ্‌যাপন করলেন। তাঁদের মৌনবাণী একান্ত মুখর হয়ে ছড়িয়ে গেল—শুধু মহারাষ্ট্রে নয়, সারা ভারতবর্ষের নির্যাতিত জনগণের কাছে।

প্রথম নাসিক ষড়যন্ত্র মামলা

জ্যাকসন্-হত্যার মূলে সুদূরপ্রসারী এক গভীর ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করল বোম্বাই-সরকারের পুলিশ। বহু লোককে গ্রেপ্তার করা হল। পুলিশ বলল, সাভারকর ভাইদের 'মিত্রমেলা' নাম পাল্‌টে 'অভিনব ভারত' হলেও আসলে ওটা বিপ্লবীদের একটা গুপ্ত সংগঠন। এদের অঙ্কুরে বিনাশ না করলে রাজ্যশাসন করা যাবে না।

এই অভিযোগের প্রধান অভিযুক্ত আসামী বিদেশ থেকে বন্দী করে আনা বিনায়ক সাভারকর কারণ তিনিই ওই সংস্থার প্রধান। হাতে জোবদার প্রমাণ না থাকলেও তাকে চিরজীবন বন্দী করে রাখা হোক। এতএব, বিচারের প্রহসন শুরু হল এবং সাভারকরের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হল। অন্যান্য আসামীদেরও নানা পর্যায়ের কারাদণ্ড দেওয়া হল।

দ্বিতীয় নাসিক ষড়যন্ত্র মামলা

ইংরেজের ক্রোধ তবু প্রশমিত হল না। তারা আবার বিনায়ক সাভারকরের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করল। এবারের অভিযোগ, জ্যাকসন্‌কে হত্যা করার জন্য ব্যবহৃত পিস্তলটি বিনায়ক সাভারকর-ই প্যারিস থেকে অনন্তলক্ষ্মণের কাছে পাঠিয়েছিলেন। মহারানী ভিক্টোরিয়ার সাম্রাজ্যে বিচারকেরা অপূর্ব তৎপরতায় সাতদিনের মধ্যে বিচার-পর্ব সমাধা করল। সাভারকরকে দ্বিতীয় দফায় আবার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ড দেওয়া হল।

ইংরেজ সরকার দেখল, শুধু ভাইকেই শাস্তি দিলে হবে না, দাদাকেও শাস্তি দেওয়া দরকার। দুরাত্মার ছলের অভাব হল না। একখানা স্বদেশাত্মক কাব্য-পুস্তক লেখার অপরাধে ইতিপূর্বেই বিনায়কের দাদা গণেশকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ড দিয়ে আন্দামান সেলুলার জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। গণেশ সাভারকরের সেই বইটির নাম ছিল 'লঘু অভিনব ভারত মেলা।'

শুধু মহারাষ্ট্রের রাজনীতিক ইতিহাসে নয়, সারা ভারতবর্ষের বিপ্লবী জীবনে এই অশান্ত ও চিরবিদ্রোহী ভ্রাতৃদ্বয়ের অবদান অতুলনীয়। বিনায়ক সাভারকর তাঁর জীবনের সায়াহ্নেও যে খাঁটি বিদ্রোহী ছিলেন তাঁর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল, নেতাজী ওই পরিণতবয়স্ক বিদ্রোহীর তারুণ্যদৃপ্ত কাজ-কর্মে মুগ্ধ ছিলেন। দেশ থেকে বিদেশে পাড়ি দেবার গোপন পরিকল্পনাটি নেতাজী তাকে বললে তিনি সানন্দে অনুমোদন করেন। এই একটি ঘটনায় বোঝা যায়, অতি প্রবীণ সাভারকর ও অতি নবীন নেতাজীর মধ্যে বিপ্লবী-চিন্তাধারার ঐক্যমতও ঘটেছিল। চল্লিশ সালেও বিনায়ক সাভারকর 'ইস্পাতের মতো তীক্ষ্ণ ঝকঝকে' বিদ্রোহী মনের অধিকারী ছিলেন বলেই তরুণ বিপ্লবী সুভাষ, আগামী কালের বিপ্লবী-মহানায়ক নেতাজী সংগোপনে পরামর্শ চাইতে গেলেন একমাত্র ওঁরই কাছে। গান্ধীজী বা নেহরুর কাছে নয়।

ভারতের বিপ্লব ইতিহাসে সাভারকর ভ্রাতৃদ্বয় চির-তরুণ, চিরবিদ্রোহী।

মাদ্রাজে বিপ্লবের আগুন

আদালত অবমাননার দায়ে বিপিনচন্দ্র পালের যখন ছ'মাস কারদণ্ড হয়েছিল তখন সমগ্র দেশে প্রতিবাদের ঝড় বয়ে গেলেও মাদ্রাজে সেই প্রতিক্রিয়া প্রলয়ঙ্কর রূপে দেখা দিয়েছিল। বিপিনচন্দ্রের প্রভাবে মাদ্রাজ তো প্রভাবিত ছিলই তা ছাড়া, বিবেকানন্দের শৌর্যময় ব্যক্তিত্বে গভীরভাবে অলোড়িত ছিল মাদ্রাজের যুবসমাজ।

মাদ্রাজের জনগণ বিপিনচন্দ্রকে অভিহিত করলেন'লায়ন অফ স্বরাজ' বলে। চিদারম্বরম্ পিল্লাই ছিলেন বিপ্লবী তারক দাসের মন্ত্রশিষ্য। সঙ্গে সহযোগী হিসেবে তিনি পেয়েছিলেন বিপ্লবী সুব্রহ্মণ্যশিবম্-কে। ওঁরা সমগ্র মাদ্রাজে অগ্নিগর্ভ ভাষণ দিতে লাগলেন পূর্ণ স্বরাজ দাবি করে।

পুলিশের রোষ গিয়ে পড়ল ওঁদের উপর। চিদাম্বরম্ ও সুব্রহ্মণ্যম্ গ্রেপ্তার হলেন। জনরোষে ফেটে পড়ল মাদ্রাজ। চারিদিকে দাঙ্গা বেধে গেল। ধর-পাকড় ও জাতীয়তাবাদী কাগজগুলোর উপর দমন-নীতির প্রয়োগ শুরু হল। পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে বিপ্লবীরা শুরু করলেন গোপন ইস্তাহার ও পত্র-পত্রিকা বিলি করতে। দিকে দিকে গড়ে উঠল গুপ্ত সমিতির অনেক কেন্দ্র। আন্দোলন অগ্নিস্রাবী হয়ে উঠল টিউটিকোরিনে। কৃষ্ণস্বামী বিদ্রোহ প্রচারের দায়ে দণ্ডিত হলেন। চিদাম্বরমের গ্রেপ্তারের জন্য বিজয়বাড়ায় 'রাজ' পত্রিকায় 'ফিরিঙ্গিরাজের ধ্বংস' কামনা করে একটি লেখা ছাপা হলে সরকারী নির্দেশে উক্ত কাগজের প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেল। ব্রিটিশ সন্ত্রাসবাদের প্রত্যুত্তরে বিপ্লবীরা 'ভারতমাতা এ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি সংগঠন গড়ে তুললেন।

দশ সালে শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার লণ্ডনস্থ 'ইণ্ডিয়া হাউস' থেকে বিপ্লব-প্রচারের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে আসেন ভি.ভি.এস. আয়ার। পণ্ডিচেরিতে তিনি তরুণদের সঙ্গোপনে রিভলভার চালাবার কায়দা শেখাতে থাকেন। এদিকে নীলকান্ত ব্রহ্মচারী ও শঙ্করকৃষ্ণ আয়ার নামক দুই ব্যক্তি দক্ষিণের নানা কেন্দ্রে বিদ্রোহের বাণী ছড়িয়ে যাচ্ছিলেন। ত্রিবাঙ্কুরে ওয়াঞ্চি আয়ার তাঁদের সঙ্গে জুটে গেলেন। ওয়াঞ্চি ছিলেন শঙ্করকৃষ্ণের আত্মীয় এবং বন-বিভাগীয় একজন সরকারী কর্মচারী। নীলকান্ত ব্রহ্মচারীর কাছে তিনি বিদ্রোহের দীক্ষা নিয়েছিলেন। ওয়াঞ্চি পণ্ডিচেরির খবর পেয়েছিলেন। তিন মাসের ছুটি নিয়ে তিনি চলে এলেন ভি.ভি.এস. আয়ারের কাছে। তাঁর সঙ্গে ওয়াঞ্চির গোপন আলোচনা হল।

অ্যাশ্-হত্যা

ওয়াঞ্চিদের গুপ্ত সমিতি সিদ্ধান্ত নিল, টিনেভেলি জেলার অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাশ্‌কে হত্যা করতে হবে। সমিতির তরফ থেকে অ্যাশ্‌কে হুঁশিয়ারি দিয়ে একটি চিঠি পাঠানো হল। তাতে লেখা হল, 'ভারতমাতা এ্যাসোসিয়েশনের সাবধান-বাণী শোনো, জনসাধারণের কোনো কাজে তুমি নাক গলাতে এসো না। আমাদের নিষেধ অমান্য করলে মুহূর্তে তোমার মাথা গুঁড়িয়ে দেব।' দূর থেকে ছুঁড়ে-মারা কোনো হুমকিতে ভয় পেতে পারেন না ইংরেজ সরকারের প্রমত্ত প্রতিভূ অ্যাশ্। তাঁর একমাত্র কর্তব্য স্বদেশী-কণ্ঠকে নির্বিচারে স্তব্ধ করে দেওয়া।

এগারো সালের সতেরোই জুন। অ্যাশ-দম্পতি টিনেভেলি থেকে রওনা হয়েছেন ট্রেনে। মানিয়াঞ্চি স্টেশনে ট্রেন বদল করে কোদাইকানালের গাড়ি ধরবেন তাঁরা। ওখান থেকে ওয়াঞ্চি আয়ার গোপনে ওঁদের অনুসরণ করতে থাকলেন। কোদাইকানালে পৌঁছে যে-মুহূর্তে প্রথম শ্রেণীর কামরায় অ্যাশ্-দম্পতি বসলেন, অমনি মৃত্যু-গর্জনে গর্জে উঠল ওয়াঞ্চি আয়ারের রিভলভার। দুর্জয় ব্রিটিশ-প্রশাসক অ্যাশের দেহ ট্রেনের কামরার মধ্যে লুটিয়ে পড়ল। ওয়াঞ্চি ঘটনাস্থল থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে নিজের রিভলভারের বুলেট নিজের কণ্ঠে চালিয়ে শহীদ হলেন। ধর পাকড় শুরু হয়ে গেল। বহু তরুণ গ্রেপ্তার হলেন। দায়ের হল 'টিনেভেলি ষড়যন্ত্র মামলা'। আসামীদের মধ্যে ভেঙ্কটেশ্বর আয়ার এবং ধর্মরাজ

আয়ারও শাসকের দণ্ড গ্রহণের জন্য অপেক্ষা না করে বন্দী অবস্থায় আত্মহত্যা করলেন। বাকি যাঁরা বন্দী রইলেন তাঁদের নানাক্রমে সাজা হল মাদ্রাজ হাইকোর্টের স্পেশাল ট্রাইবুনাল থেকে।

উত্তরপ্রদেশ, বিহার, বর্মায় বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ড

যুগান্তর অনুশীলন সমিতি এবং চন্দননগর বিপ্লবীদলের সদস্যরা ইতস্ততভাবে উত্তরভারতের কয়েকটি প্রদেশে গুপ্ত সমিতি গড়ে তুলছিলেন।। উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে শচীন সান্যালের সংগঠন ক্ষমতায় এবং রাসবিহারী বসুর অতুলনীয় নেতৃত্বে বৈপ্লবিক আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠেছিল।

বর্মার পথে বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করে ভারতে বিপ্লব সৃষ্টি করার পরিকল্পনা অনুসারে ক্ষীরোদগোপালকে উনিশ শো আট খৃস্টাব্দে বর্মায় পাঠানো হয়। তিনি প্রথমে রেঙ্গুনে গিয়ে কিছুদিন ছিলেন এবং তখন শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ওঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়কে শ্যামে পাঠানো হয় এবং তিনি সেখানে একটি বিপ্লবী-কেন্দ্র গড়ে তোলেন। উকিল কুমুদ মুখোপাধ্যায় এবং ইঞ্জিনিয়ার অমর সিং-এর উপর বিশেষ দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। ভোলানাথ বিপ্লবী নেতা ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়কে সাংকেতিক ভাষায় চিঠি লিখে পাঠাতেন এবং সেই চিঠি আসত বর্মায় অবস্থিত ক্ষীরোদগোপালের মাধ্যমে। অবশেষে সরকারী তৎপরতায় এই ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যায় এবং ক্ষীরোদগোপাল গ্রেপ্তার হন। ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জীর সূত্রে জানা যায়, 'জার্মানরা 'গদর' দলের সহযোগে যে কাজ করতে চেয়েছিল, তা অতি ভয়ানক। আমেরিকা প্রত্যাগত শিখরা শ্যামের কোনো স্থানে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বর্মাদেশ আক্রমণ করবে। সেই সময়ে সৈন্য ও মিলিটারি পুলিশও বিদ্রোহ করবে। শ্যাম-বর্মার সীমান্ত রেলে জার্মান ইঞ্জিনিয়ার ও পাঞ্জাবী শ্রমিকেরা কাজ করছিল। বর্মা থেকে ভারত আক্রমণের কথাও ছিল।'

সোহনলাল পাঠক

সোহনলাল পাঠক একজন আদর্শ বিপ্লবী। নির্বাসিত ভারতীয় বিপ্লবীদের পরিকল্পনা ছিল তাঁরা বর্মা আক্রমণ করে, ভারতবর্ষে পৌঁছে এই দেশকে শৃঙ্খলমুক্ত করবেন। এই পরিকল্পনা সোহনলালকে স্বপ্নচারী করে তুলল। তিনি দেশে বিদেশে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে আমেরিকায় পৌঁছে বিপ্লব প্রচারে ব্রতী হলেন। পরে আমেরিকা থেকে পুলিশের তাড়নায় তাকে আবার শ্যামদেশে আসতে হয়। তিনি তখন গদর পার্টির সঙ্গে কর্মসূত্রে জড়িয়ে গিয়ে ইন্দো-জার্মান পরিকল্পনা কার্যকরী করতে বর্মায় এলেন। সৈন্যবাহিনীর মধ্যে তিনি বৈপ্লবিক প্রচারকার্য চালাতে লাগলেন। তাঁর স্বদেশপ্রেম ও আত্মভোলা কর্মনিষ্ঠায় সৈন্যদলের মধ্যে তাঁর প্রতি আনুগত্যের ঝোঁক দেখা গেল। তিনি সৈন্যদের উদ্দেশে বলতেন, 'কেন ভাই ইংরেজের জন্য তুমি প্রাণ দেবে? তোমার নিজের দেশ পড়ে রয়েছে বিধর্মীর অধীনে। মাতৃভূমির জন্যে প্রাণদান বীরেরই কর্তব্য।'

এমনিভাবে সোহনলাল যখন একদিন সৈন্যদের ছাউনিতে ঢুকে বিদ্রোহ-বাণী প্রচার করছিলেন তখন সৈন্যদের মধ্যে থেকেই একজন ওঁকে গ্রেপ্তার করে বসল। ওঁর কাছে তখন দু'টি পিস্তল ও কিছু সন্দেহ-জনক কাগজপত্র পাওয়া গেল। ওঁকে মান্দালয় জেলে পাঠানো হল। ওখানকার জেলা-জজের আদালতে তাঁর বিচার শুরু হয় এবং ওঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল।

মৃত্যুদণ্ডের আদেশ শোনানোর পর বর্মার লাটসাহেব ওঁর কাছে উপস্থিত হয়ে ওঁকে ক্ষমাভিক্ষার পরামর্শ দেন এবং তাতে মৃত্যুদণ্ড লাঘব করার ইঙ্গিতও ছিল। কিন্তু দৃপ্ত সোহনলালকে নত করা যায় নি। তিনি বলেছিলেন, 'তোমার কাজ তুমি কর, আমার কাজ আমি করে যাই।'

গান্ধারের সোহনলাল সারা দুনিয়া ঘুরে শেষ পর্যন্ত যে-বর্মার অন্তর্গত মান্দালয় জেলে প্রাণ দিলেন, সেই বর্মাই ভারতের স্বাধীনতা ইতিহাসে পরবর্তীকালে এক বিশাল ভূমিকা পালন করেছিল রাসবিহারী বসু ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে।

পাঞ্জাবে বিদ্রোহ

বিদ্রোহের লীলাভূমি পাঞ্জাব। গুরু গোবিন্দের পাঞ্জাব, রণজিৎসিংহের পাঞ্জাব। পাঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপৎ রাইয়ের অগ্নিগর্ভ পাঞ্জাব।

বাওয়ালপিণ্ডি, শিয়ালকোট, লায়ালপুর, অমৃতসর, ফিরোজপুর, লাহোর প্রভৃতি স্থানে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব ও মতপ্রচার দেখা যেতে থাকে। অনেক সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। কয়েকটি গুপ্ত সমিতিও গড়া হয়েছিল। বিক্ষিপ্তভাবে লাহোরে জনসাধারণের হাতে কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ আমলাকে অপমানিতও হতে হয়েছিল। পুলিশের লোক ও সৈন্যদের বিদেশী গোলামী ছাড়তে ক্রমাগত অনুরোধ করা হতে থাকে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রেলের কর্মচারীরা ধর্মঘট করলে তাঁদের পাশে দাঁড়াবার জন্য বিপ্লবী সংগঠনগুলো জনসাধারণের কাছে ক্রমাগত আবেদন জানাতে থাকে। নেতারা প্রকাশ্য জনসভায় বলতে থাকেন, বাহুবলে বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধে ইংরেজকে ভারত ছাড়াতে বাধ্য করতে হবে।

সাত সালে ইংরেজ সরকার লালা লাজপৎ রাইকে গ্রেপ্তার করে বর্মার জেলে পাঠিয়ে দেন। সরকারের উদ্দেশ্য ছিল সর্দার অজিত সিংকেও লালাজীর সঙ্গে বর্মার জেলে পাঠানো৷ কিন্তু সর্দারজী গোপনসূত্রে এই সরকারী ষড়যন্ত্র জানতে পেরে পারস্যে পালিয়ে গেলেন। ক্রুদ্ধ সরকার সর্দারজীকে ধরতে না পেরে অপর দুই বিপ্লবী সর্দার কিষণ সিং ও লালচাঁদকে জেলে ঢোকাল। লালাজীর চিঠি থেকে পুলিশ জানতে পারে পাঞ্জাবের বিদ্রোহীদের সঙ্গে লণ্ডনে অবস্থিত শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার যোগাযোগ আছে।

বারো সালের সাতই মে লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা ছোঁড়া হল। ওই একই তারিখে লাহোরের পথে গর্ডন নামক এক ব্রিটিশ রাজপুরুষকে হত্যা করার ব্যর্থ চেষ্টা হল।

লালা হরদয়াল বিলেতে বসে প্রচণ্ডভাবে ব্রিটিশ বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন এবং আমেরিকায় গিয়ে 'গদর দল' গঠনে তৎপর হন।

বরিশাল প্রাদেশিক সম্মেলন

বঙ্গভঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে ছয় সালের চোদ্দই এপ্রিলে অনুষ্ঠিত বরিশাল প্রাদেশিক সম্মেলন ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ওই সম্মেলন পণ্ড করার জন্য সরকার মরীয়া হয়ে ওঠে। ব্যাপক পুলিশী তাণ্ডবে ও নিষেধাজ্ঞায় ওই সম্মেলন পণ্ড হয়। এ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটির বহু সভ্য এবং অন্যান্য বিপ্লবী সংস্থার সদস্যরা পুলিশের লাঠি-চালনায় আহত হন। গ্রেপ্তার এবং লাঞ্ছিত হন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ওই সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন বরিশালের বিশিষ্ট জননেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত। সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন ব্যারিস্টার আবদুল রসুল।

বরিশালের আর এক নেতা মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার পুত্র, চিত্তরঞ্জন গুরুতর আহত হয়েছিলেন। তবু সম্পূর্ণ জ্ঞান হারানোর আগে পর্যন্ত তিনি পুলিশের প্রত্যেক লাঠির আঘাতের সঙ্গে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ করতে ছাড়েন নি। বরিশালে পুলিশী তাণ্ডবের প্রতিবাদে সেদিন অসংখ্য প্রতিবাদ হয়েছিল সারা দেশ জুড়ে।

কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন

বরিশাল প্রাদেশিক সম্মেলন ভণ্ডুল হয়ে যাবার আটমাস পরে ছাব্বিশে ডিসেম্বর থেকে চারদিন ধরে দাদাভাই নওরোজির সভাপতিত্বে কংগ্রেসের বাইশতম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল কলকাতায়। ওই অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে 'স্বরাজ' বা স্বায়ত্ত্বশাসনের দাবিতে আন্দোলনে একটা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ মাত্রা যুক্ত হয় এবং অধিবেশনে বয়কট, স্বদেশী ও জাতীয় শিক্ষার সমর্থনে প্রস্তাব গৃহীত হয়। ওই অধিবেশনেই প্রথম ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে যখন দেশ জুড়ে জাতীয় আন্দোলন ক্রমশ দানা বেঁধে উঠছিল তখন শ্রমিক শ্রেণীর অনেক নতুন সংগঠনও কর্তব্যবোধে উজ্জীবিত হয়ে ওই আন্দোলনে সামিল হয়।

শ্রমিক সংগঠনের ভূমিকা

স্বদেশী আন্দোলনের আবহাওয়ায় বেশ কিছু শ্রমিক সংগঠন গড়ে ওঠে রেলওয়ে, গভর্নমেন্ট প্রেস, চটকল শ্রমিক ও ট্যাক্সি-চালকদের মধ্যে। ওই শ্রমিকদের নিজস্ব দাবি-দাওয়াকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটি ধর্মঘটও হয়। এর নেতাদের মধ্যে ছিলেন অপূর্বকুমার ঘোষ, অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার রায়চৌধুরী, প্রেমতোষ বসু, রজত রায়। এদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ব্যারিস্টার। উনিশ শো ছয় খৃস্টাব্দের সাতাশে জুলাই 'সন্ধ্যা' পত্রিকার দপ্তরে 'রেলওয়েমেনস্ ইউনিয়ন' প্রতিষ্ঠিত হয়।

নির্বাসন ও বে-আইনী ঘোষণা

আট সালের এগারোই ডিসেম্বর ন'জন দেশনেতা নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হন। এঁরা হলেন কৃষ্ণকুমার মিত্র, শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, মনোরঞ্জন গুহ, অশ্বিনীকুমার দত্ত, যতীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, ভূপেশ চন্দ্র নাগ ও পুলিনবিহারী দাস।

এই ঘটনার ছাব্বিশ দিন পরে সরকার বরিশাল স্বদেশ সমিতি, ঢাকা অনুশীলন সমিতি, সাধনা সমাজ, ফরিদপুর ব্রতী সমিতি ও ময়মনসিংহ সুহৃদ সমিতিকে বে-আইনী ঘোষণা করেন।

আলিপুর বোমা-ষড়যন্ত্র মামলা

ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকির আত্মদানের পূর্বেও এই বাংলায় বিপ্লবের ইতিহাসে দু'জন শহীদের জীবন নেপথ্যে পড়ে আছে। এঁদের একজন তরুণ বিপ্লবী পুলিশের-হাত থেকে সশস্ত্র অবস্থায় আত্মরক্ষা করেছিলেন চন্দননগরের কাছে চলন্ত ট্রেনেব নিচে আত্মদান করে। আর একজন উল্লাসকর দত্তের ফর্মুলা অনুসারে তৈরি বোমা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে বোমা বিস্ফোরণে মৃত্যুবরণ করেছিলেন দিঘিরিয়া পাহাড়ে। বোমা পরীক্ষা করার আগেই সেটি ফেটে গিয়ে অকালে প্রফুল্ল চক্রবর্তী প্রাণ দিলেন। অবশ্য প্রফুল্ল প্রাণ দিয়ে উল্লাসকরের বোমার কার্যকারিতা সম্পর্কে নিশ্চিত প্রমাণ দিলেন এবং ওই ধরনের বোমা নিয়েই কিংসফোর্ড-হত্যায় রওনা হয়েছিলেন ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকি।

বৈদ্যনাথের পাহাড়-শীর্ষে বোমা-বিস্ফোরণে প্রফুল্ল চক্রবর্তীর মৃত্যুতেই পুলিশ সচকিত হয়ে উঠেছিল। তাই, অরবিন্দের নির্দেশে বৈদ্যনাথের বোমার আড্ডা কলকাতায় সরিয়ে আনা হল। কিন্তু মানিকতলা ও মুরারিপুকুরের আড্ডায় বারীন্দ্রকুমার তেমন সতর্ক হলেন না।

এমন কি, অনতিকাল পরে কিংসফোর্ড-হত্যার ব্যর্থ প্রয়াসের খবর যখন এল তখনও অরবিন্দ সতর্ক করলেন কিন্তু তাঁর ভাই খুব একটা সচেতন হলেন না। এই অদ্ভুত নিষ্ক্রিয়তার ফলে আট সালের দোসরা মে রাত্রে পুলিশ মুরারিপুকুরের আড্ডায় হানা দিল এবং ওই কার্যালয় থেকে কয়েকজন যুবককে গ্রেপ্তার করল। বহু অস্ত্র-শস্ত্র, বোমা ও সন্দেহজনক কাগজপত্রও পেল। কলকাতার আরও তিন জায়গায় হানা দিয়ে মোট একচল্লিশ জন যুবককে গ্রেপ্তার করল এবং ওরা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রও পেয়ে গেল।

ওই তারিখেই রাত্রে অরবিন্দের বাড়ি পুলিশ ঘিরে ফেলল এবং ভোর পাঁচটায় তাঁকে গ্রেপ্তার করল। ভারতবর্ষের তৎকালীন মহান বিপ্লবী নেতা এবং ভাবীকালের বিশ্ববিখ্যাত অরবিন্দকে পুলিশ সুপার ক্রেগান হাতে হাত-কড়া পরিয়ে, কোমরে দড়ি বেঁধে বন্দী করে ফেললেন এবং সেই দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে রইল স্বদেশী একটি হিন্দুস্তানী কনস্টেবল্। তারপর শৃঙ্খলিত বন্দীকে হাঁটিয়ে নেওয়া হল সরকারের প্রয়োজনমতো দূরত্বে।

ধৃত ব্যক্তিদের দুটি দলকে ভাগ করে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির করা হল। এরপর মামলা গেল দায়রায়। দু'দফায় মামলা চলার পরে সেসন জজের রায় বেরোল। বারীন ঘোষ ও উল্লাসকর দত্তের মৃত্যুদণ্ড এবং অপরদের দ্বীপান্তর থেকে নানা ক্রমের দণ্ড হল। অরবিন্দ বেকসুর খালাস পেলেন। সেসন জজ বীচ্‌ক্রফ্‌ট্ কেমব্রিজে অরবিন্দের সহপাঠী ছিলেন। চিত্তরঞ্জন দাশ ছিলেন অরবিন্দের পক্ষে ব্যারিস্টার, নর্টন ছিলেন সরকার পক্ষের কৌঁসুলী।

চিত্তরঞ্জন দাস

প্রায় ছ'মাস পরে আপীলের রায় বেরোলে জানা গেল, বারীন ঘোষ এবং উল্লাসকর দত্তের মৃত্যু দণ্ড রদ করে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের সাজা দেওয়া হয়েছে। কারও কারও যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হলেও বাকিদের নানাক্রমের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। একজন মুক্তি পেলেন। অশোক নন্দী বিচারাধীন অবস্থাতেই কারাকক্ষে দেহত্যাগ করলেন। পাঁচজন বিপ্লবীদের শাস্তি সম্পর্কে জজেরা একমত না হওয়ায় ওই মামলা তৃতীয় জজের কাছে পাঠালে তিনি তিন জনকে মুক্তি দেন। বাকি দু'জনকে কারদণ্ড ভোগ করতে হয়।

অরবিন্দের মামলা দু'টি কারণে খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, এর প্রধান আসামী ছিলেন অরবিন্দ, যিনি তৎকালীন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতম বিপ্লবী নেতা এবং পরবর্তীকালে পৃথিবীর বরেণ্য যোগী-ঋষি। দ্বিতীয়ত, বিনা অর্থে, স্বেচ্ছায় অথচ প্রভূত ধৈর্য, অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও পাণ্ডিত্যে এই তরুণ আসামীটির পক্ষ সমর্থন করেছিলেন তৎকালের তরুণ ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ যিনি ভাবী কালের সর্বোত্তম আইনজীবীদের

অন্যতম ও ভারতীয় জননেতাদের অগ্রগণ্য। একটা মামলায় আসামী ও কৌসুলী দুই দেশবরেণ্য ব্যক্তির সংযোগ এক বিরলতম নজির। যে মহান বিপ্লবী কারাকক্ষে 'বাসুদেব দর্শন' লাভ করে এবং পণ্ডিচেরিতে ঋষি ও ভগবৎদ্রষ্টার গৌরবে বিশ্ববাসীকে আলোকদান করে বারে বারে রবীন্দ্রনাথের 'নমস্কার' পেয়েছিলেন তাঁর বিরাট স্বরূপ চিত্তরঞ্জন তাঁর বিপুল হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই তিনি আলিপুর মামলাটিকে একখানি অনন্য তপস্যার গৌরবে গ্রহণ করে জয়মাল্য লাভ করতে পেরেছিলেন। এই মামলাকে ঘিরে যে স্বদেশ-প্রেম ও কর্ম-সাধনা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল, তার দৃশ্য ও অদৃশ্য প্রভাব পরবর্তী প্রজন্মকে স্বাদেশিকতায় দীক্ষিত করেছিল।

আলিপুর ষড়যন্ত্র-মামলা চলার সময় পুলিশের তৎপরতা উত্তরোত্তর বেড়েই চলল। কারণ, এক দল বিপ্লবী ও তাঁদের নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ হলেও এই সময়েই আলিপুর জেলে নিহত হল এ্যাপ্রুভার নরেন গোসাঁই, আলিপুর দায়রা আদালতের সামনে নিহত হলেন পাবলিক প্রসিকিউটার আশু বিশ্বাস এবং হাইকোর্টে নিহত হলেন পুলিশের ডেপুটি সুপার সামসুল আলম। এঁরা সবাই আলিপুর মামলা অথবা বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে নানা মামলার রসদ জোগাচ্ছিলেন সরকারের পক্ষ হয়ে। তাই এঁদের মস্তক লক্ষ্য করে নেমে এল বিপ্লবীদের উদ্যত খড়্গ।

নরেন গোসাঁই : রাজসাক্ষী

আলিপুর মামলায় জড়িত নরেন ছিলেন শ্রীরামপুরের জমিদার গোস্বামী পরিবারের সন্তান। অরবিন্দের জবানিতে জানা যায়, 'গোসাঁই অতিশয় সুপুরুষ—লম্বা, ফর্সা, বলিষ্ঠ, পুষ্টকায়। কিন্তু তাহার চোখের ভাব কুপ্রবৃত্তি-প্রকাশক ছিল, কথায়ও বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ পাই নাই। এ বিষয়ে অন্য যুবকদের সঙ্গে তাহার বিশেষ প্রভেদ ছিল। গোসাঁইয়ের কথা নির্বোধ লঘুচেতা লোকের কথার ন্যায় হইলেও তেজ ও সাহসপূর্ণ ছিল। এইরূপ লোকই এ্যাপ্রুভার হয়।' নরেন প্রথমে ধরা পড়েন নি। শোনা যায়, পুলিশের কাছে প্রদত্ত স্বীকারোক্তিতে বারীন ওঁর নাম করেন। ফলে, নরেনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং বিপ্লবীদলের প্রতি ক্রোধবশত তিনি রাজসাক্ষী হন। বারীন সকলের নামই করেছিলেন কেবল অরবিন্দের নাম করেন নি। নরেন অরবিন্দের নাম ও বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের কথা পুলিশকে জানিয়ে দেন। নরেন গোসাঁইয়ের অপরাধ অমার্জনীয় কিন্তু বারীন ওঁর নাম না বলে দিলে অরবিন্দ হয়তো নেপথ্যে থাকতে পারতেন। কিন্তু তিনি নেপথ্যে থাকলে এদেশে বিপ্লবের ইতিহাসে কানাই-সত্যেনের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকত না, কারা-জীবনের প্রসাদে অরবিন্দের বাসুদেব দর্শন ঘটত না, দেশবন্ধুর মনে দুর্বার বেগে রাজনৈতিক জীবনের প্রেরণা আসত না. দুরন্ত বেগে বিপ্লবের রথ ছুটত না।

নরেন গোসাঁই হত্যা

আলিপুর মামলার বন্দীরা নরেন গোসাঁইকে হত্যা করার পরিকল্পনা আঁটতে লাগলেন, বিপ্লবীরা বিশ্বাসঘাতককে কখনও ক্ষমা করেন না, বিশেষত যে বিশ্বাসঘাতকতায় অরবিন্দের মতো বিপ্লবের প্রাণপুরুষ বন্দী হয়েছেন।

এদিকে বারীন বন্দী থাকা অবস্থাতেই কোর্টে যাতায়াতের পথে কয়েকজন বন্ধু, জেল ওয়ার্ডার, ও জেল কর্মচারীদের মাধ্যমে কিছু টাকার ব্যবস্থা করলেন এবং ওই টাকায় কয়েকটি পিস্তল কিনে গোপনে জেলের মধ্যে আনা হল। সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও কানাইলাল দত্তের হাতেও দুটো পিস্তল পৌঁছল।

রাজসাক্ষী নরেনকে পুলিশ জেলের মধ্যে রাখলেও তাঁর নিরাপত্তার প্রশ্নে পুলিশ সদা-তৎপর। তাঁকে রাখা হয়েছে জেলের ভিতরে আর এক জেলে—চারদিকে দেয়াল ঘেরা, সান্ত্রীবেষ্টিত এক নির্জন কক্ষে।

অসুস্থতার ভান করে রোগাটে সত্যেন জেল-হাসপাতালে ভর্তি হলেন। মাত্র চৌত্রিশ দিন পরে কানাইও কলিক্-পেনে কাতর হয়ে ভর্তি হলেন ওই একই হাসপাতালের অন্য একটি বেডে।

সত্যেন নরেনকে খবর পাঠালেন, তিনি বিপ্লবের সমস্ত গোপন ষড়যন্ত্র ফাঁস করতে চান পুলিশের কাছে। এজন্য তিনি নরেনের পরামর্শ ও সহযোগিতা কামনা করে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইলেন। নরেন সত্যেনের এই ডিগ্‌বাজী খাওয়ার সংবাদে অত্যন্ত খুশি।

জেল-সুপার এই খবর শুনে নরেনকে অনুমতি দিলেন সত্যেনের সঙ্গে দেখা করার। কানাই হাসপাতালে ভর্তি হবার আগের দিন ওঁদের মধ্যে একবার দেখা সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা হয়েও গেল।

কানাই যেদিন হাসপাতালে ভর্তি হলেন সেই তারিখটা ছিল অটসালের ত্রিশে আগস্ট। এর ঠিক দু'দিন পরে নরেন এসেছে হাসপাতালের ডিস্পেসারিতে। সত্যেন একটি কয়েদি মারফৎ ওঁকে গোপনে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। নরেনকে ইউরোপীয় ওয়ার্ডার হিগিন্স সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। ডিস্পেন্সারিতে বসে নরেন সত্যেনকে তাঁর আসার খবর পাঠালেন। কিন্তু সত্যেন একা না এসে কানাইকেও সঙ্গে নিয়ে এলেন।

কথা শুরু হবার মুহূর্তেই গর্জে উঠল পিস্তল। নরেনের হাতে গুলি লাগতেই তিনি ছুটে পালালেন হিগিন্সের আশ্রয়ে। হিগিন্স নরেনকে আগলে দাঁড়াতেই সত্যেনের পিস্তল থেকে গুলি ছুটে এল। হিগিন্সের বুড়ো আঙ্গুল উড়ে গেল। তারপর প্রাণ নিয়ে দৌড় ঝাঁপ, প্রাণ বাঁচাতে ধ্বস্তাধ্বস্তি। নরেন হঠাৎ এক দৌড়ে হাসপাতালের বাইরে চলে এসে গোরা-ডিগ্রির দিকে এগোতে লাগলেন হিগিন্স তাঁর পিছনে। কানাই ও সত্যেনও তখন ওঁদের পিছনে দৌড়তে লাগলেন। কানাইদের পিস্তল থেকে অবিরত গুলি ছুটছে, যেন শিকারের পিছনে দুটো উন্মত্ত বাঘ ছুটছে।

হঠাৎ লিন্টন নামে একটি কয়েদী পাশ থেকে সত্যেনের কাছাকাছি এসে হঠাৎ তাঁকে জাপটে ধরে মাটিতে ফেলে দিল। একটু পরে তাঁকে ছেড়ে দিয়ে কানাইকে জড়িয়ে ধরল লিন্টন। কানাই পিস্তলের নল দিয়ে তাকে প্রচণ্ড আঘাত করা সত্ত্বেও তার কবল থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে পারলেন না। কানাই তখন মরীয়া। তাঁর চোখের সামনে নরেন আহত জন্তুর মতো প্রাণভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। অথচ, কানাইয়ের পিস্তলে তখন রয়েছে মাত্র একটি গুলি। অবশেষে অমানুষিক শক্তিতে হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে কানাই নরেন গোসাঁইকে খুব নিকট নিশানার মধ্যে শেষ বুলেটে বিদ্ধ করলেন। নরেন টাল খেতে খেতে পাশের ড্রেনে পড়ে গেলেন। আর উঠলেন না। জেলের ভিতরে বন্দী-বিপ্লবীর বুলেটে বিশ্বাসঘাতককে শাস্তি পেতে দেখে ভারতবাসীর বুকে সাহস এল, ইংরেজ প্রশাসন কেঁপে উঠল। শুরু হল সত্যেন ও কানাইয়ের বিচারের পালা। নিম্ন আদালতগুলো পেরিয়ে হাইকোর্টে গেল মামলা। বিচারকের রায় বেরোলো নরেন হত্যার এক মাস কুড়ি দিনের ব্যবধানে। নিম্ন আদালতে সত্যেন ও কানাইয়ের ফাঁসীর যে হুকুম হয়েছিল, তা-ই শেষপর্যন্ত বহাল রইল।

কানাইকে আপীলের জন্য সাত দিন সময় দেওয়া হলে তিনি বললেন, 'There shall be no appeal' ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁর বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি গ্রন্থে লিখেছেন, তাঁর বন্ধু আশু দাস আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি বলেছিলেন, 'কানাই শিখিয়ে গেল হে ..! Shall আর will-এর ব্যবহার করতে কেউ আর ভুল করবে না।'

সত্যেন ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের লোক। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী জেলে ওঁকে আশীর্বাদ জানিয়ে ফিরে আসার পর অনেকে শিবনাথকে প্রশ্ন করেছিলেন, কেন তিনি কানাইকেও আশীর্বাদ করে এলেন না? উত্তরে শিবনাথ বলেছিলেন, 'সে পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহ! বহু তপস্যা করলে তবে যদি কেউ তাঁকে আশীর্বাদ করার যোগ্যতা লাভ করতে পারে।'

এ সব উক্তি থেকেই বোঝা যায় যে, সেকালে শুধু তরুণ হৃদয় নয়, সকল স্তরের বালক-বৃদ্ধ ও গুনী-জ্ঞানীর হৃদয় এই দু'জন বীর যুবক জয় করে নিয়েছিলেন। ক্রোধে কম্পমান ইংরেজ প্রশাসন সত্যেনের সঙ্গে কানাইকে ফাঁসী দিয়েও গায়ের জ্বালা মেটাতে পারে নি। ইংলিশ বার থেকে যেমন

শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা ও বিনায়ক সাভারকরেব ব্যারিস্টারির সনদ ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল. তেমনি ফাঁসীর মাত্র দু'দিন আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ কানাইয়ের বি. এ. ডিগ্রি কেড়ে নিয়েছিলেন। এই ঘটনা প্রতিহিংসাপরায়ণ ইংরেজ সরকারের খামখেয়ালিপনার চূড়ান্ত নজির।

কানাইলালের ফাঁসী

ক্ষুদিরামকে ফাঁসী দেওয়া হয়েছিল মজঃফরপুর জেলে। কিন্তু সেটা ছিল বাংলার বাইরে। বাংলার কারাগারে বিপ্লবী কানাইলাল দত্তের ফাঁসী একটি অভূতপূর্ব ঐতিহাসিক ঘটনা।

রায় বেরোনোর ঠিক কুড়ি দিন পরে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ভোর সাতটায় কানাইলাল প্রশান্ত চিত্তে ফাঁসীর মঞ্চে আরোহণ করে সানন্দে কণ্ঠে পরলেন মৃত্যু-রজ্জু।

উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ফাঁসীর সময় তাঁব নির্ভীক, প্রশান্ত ও হাস্যময় মুখশ্রী দেখে জেলেব কর্তৃপক্ষ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কিন্তু ওদের বিস্ময়েব আরও বাকি ছিল। হঠাৎ দেখা গেল, কানাই ফাঁসীর মঞ্চে দাঁড়িয়ে একজন প্রহবীকে ডাকছেন। প্রহরী ছুটে আসতেই কানাই তাকে দড়িটা ভালোভাবে লাগিযে দিতে বললেন। একজন ইউরোপীযান উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিগ্যেস করেছিল, 'তোমাদের হাতে এই বকম ছেলে আব কতগুলো আছে?'

উপেন্দ্রনাথেব তখন মানসিক অবস্থা ছিল না ওই সাহেবেব প্রশ্নের উত্তব দেবার। তিনি শুধু ভাবছিলেন 'যে উন্মত্ত জনসঙ্ঘ কালীঘাটেব শ্মশানে কানাইলালের চিতার উপব পুষ্পবর্ষণ কবিতে ছুটিযা আসিল, তাহাবাই প্রমাণ কবিয়া দিল যে, কানাইলাল মরিয়াও মবেন নাই।'

উপেন্দ্রনাথ আবও লিখেছেন, 'জীবনে অনেক সাধু-সন্ন্যাসী দেখিয়াছি, কানাইয়ের মতো অমন প্রশান্ত মুখচ্ছবি আর বড় একটা দেখি নাই। সে-মুখে চিন্তার বেখা নাই। বিপদের ছাযা নাই, চাঞ্চল্যের লেশমাত্রই নাই—প্রফুল্ল-কমলের মতো তাহা যেন আপনাব আনন্দে আপনিই ফুটিয়া রহিয়াছে। ..প্রহরীর কাছে শুনিলাম, ফাঁসীর আদেশ শুনিবার পব তাহাব ওজন ষোলো পাউণ্ড বাড়িযা গিয়াছে। ...ঘুরিয়া ফিরিয়া শুধু এই কথাই মনে হইতে লাগিল, যে, চিত্তবৃত্তি নিবোধেব এমন পথও আছে যাহা পাতঞ্জলেব বাবাও বাহিব করিযা যান নাই।'

প্রযাণের পর শহীদ কানাইয়ের মরদেহ জেল-গেটের বাইরে তাঁব আত্মীয়দের হেফাজতে দেওযা হল। শত সহস্র লোক এসে শবাধার কাঁধে তুলে নিযে শবানুগমন করতে লাগল। সেদিন কালীঘাট শ্মশানে সমবেত নর-নারীর একটু চিতাভস্ম বা একটুকরো অস্থি-সংগ্রহের সে কী আকুলতা! অশ্রুজলে সিক্ত সেই আকুলতাই পরবর্তীকালে বিপ্লবীদের স্মৃতিতর্পণে বারবার পবিস্ফুট হয়েছে।

সত্যেন্দ্রনাথের ফাঁসী

কানাই আপীল না করলেও সত্যেন ছোটলাটের দরবারে আপিল করেছিলেন। তাই তাঁর ফাঁসীর তারিখ পিছিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওই আপীলে কোন কাজ হল না, ফাঁসীর হুকুম বহাল রইল। কানাইয়ের ফাঁসীর এগারো দিন পবে সত্যেনের ফাঁসীর দিন ধার্য হল। ওঁকে মঞ্চে নিযে যাবাব জন্য এক শ্বেতাঙ্গ

সার্জেন্ট সেলের সামনে গিয়ে দেখল সত্যেন জেগে আছেন। সার্জেন্ট ওঁকে প্রস্তুত হতে বললে উনি বললেন—'আমি প্রস্তুত হয়েই আছি।' তাঁর মুখে ছিল স্মিত হাসি। তিনি দৃঢ় পায়ে মঞ্চের দিকে এগিয়ে গিয়ে বীরের মতো সানন্দে আরোহণ করলেন।

শহীদের শবাধার মাথায় তুলে নেবার জন্য অসংখ্য মানুষ জেলের বাইরে অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু এবার ইংরেজ সরকার তাদের নিয়ম পাল্টে ফেলল। তারা ইতিমধ্যেই একটা নতুন নিয়ম জাবি করে ফেলল, কোনো 'ক্রিমিন্যাল'-এর মরদেহ আর তার আত্মীয়-স্বজনদের হাতে জেলের বাইরে দেওয়া হবে না। কারণ তাতে অনর্থক হৈ-হুল্লোড় ও জনতার ভিড় হয়, আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা হয়ে ওঠে।

তাই, সত্যেনের শব জেল-গেটে এল না। ব্যর্থ নমস্কারে ফিরে যেতে হল অপেক্ষমান বিক্ষুব্ধ দেশবাসীকে। সত্যেনের মরদেহ পুড়ে ছাই হয়ে গেল জেলের চিতায়।

আশু বিশ্বাস হত্যা

আশুতোষ বিশ্বাস ছিলেন পাবলিক প্রসিকিউটার অর্থাৎ সরকারী উকিল। ইংরেজদের দরবারে তার খাতির প্রচুর। কারণ স্বদেশীদের বিরুদ্ধে মামলা সাজাতে তার জুড়ি নেই। কি করে নির্দোষকে দোষী সাব্যস্ত করতে হয়, কীভাবে সরকারী সাক্ষীকে হাজির করতে হয়, কোন্ কায়দায় মিথ্যে মামলাকে সত্যি সাজিয়ে বিপ্লবীদের নাজেহাল করা যায়—এসব চিন্তায় ও কাজে সে ছিল কুশলী খেলোয়াড়। সে যুগে সরকারের এতবড় একজন খয়ের খাঁ প্রায় ছিলই না।

অতএব, বিপ্লবীদের পরোয়ানা জারি হল, আশু বিশ্বাসকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দাও।

কিন্তু কে এই কাজের ভার নেবে? এগিয়ে এল একটি পঙ্গু ক্ষীণদেহী বেঁটে অথচ প্রাণরসে প্রোজ্জ্বল কিশোর। চারুচন্দ্র বসু।

চারুর ডান হাতখানা অশক্ত। হাতের পাতা ও আঙুলগুলো জন্মাবধি নেই। সবাই তাঁকে মনে করে অতি সাধারণ সরল শান্তশিষ্ট গোবেচারা একটি তরুণ। তিনি কাউকে কোনোদিন জানতে দেন নি, তাঁর অন্তরে দাউদাউ করে জ্বলছে তপস্যার আগুন। তিনি কাজ করতেন রসা রোডে অবস্থিত 'হিতৈষী প্রেসে'। তিনি থাকতেন অবশ্য বিপ্লবী গীষ্পতি রায়চৌধুরী (কাব্যতীর্থ)-এর বাড়িতে। কিন্তু তাতে কী হল? বিপ্লবীর বাড়িতে থাকলেই কেউ বিপ্লবী হয় নাকি?

কিন্তু কেউ জানতেন না, ওই পঙ্গু অশক্ত ছেলেটি বাঘা যতীনের শিষ্য।

নয় সালের দশই ফেব্রুয়ারী চারু তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করতে পথে বেরোলেন। তাঁর পঙ্গু ডানহাতে তিনি শক্ত করে বেঁধে নিয়েছেন রিভলভার এবং প্রয়োজনমতো তিনি বাঁ হাত দিয়ে টানবেন ট্রিগার।

যথাসময়ে আলিপুর কোর্টের সামনে শিকার দেখেই চারুর পঙ্গু হাতের রিভল্ভার বিপুল বিক্রমে গর্জে উঠল। আহত আশু বিশ্বাস মাটিত চিরকালের মতো লুটিয়ে পড়লেন।

অকম্পিত চারু তখন ইংরেজের পদলেহী ও দেশদ্রোহী আশু বিশ্বাসের মরদেহের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন হাসিমুখে। একজন পুলিশ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওঁর উপর। তারপর চলল অকথ্য অত্যাচার ও মারপিট। কিন্তু এই রুগ্ন, জীর্ণ-শীর্ণ ছেলেটির চোখে জল নেই। সেখানে শুধু বহ্নিমান অগ্নিশিখা।

দায়রা জজের কাছে চারুকে সোপর্দ করা হলে এই বালক বীর আদালতে দাঁড়িয়ে অকম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'সেসানের বিচার অবান্তর। কালই আমাকে ফাঁসী দেওয়া হোক। সবই ভবিতব্য-আশুবাবু আমার বুলেটে মরবেন এবং আমি ফাঁসীর দড়ি গলায় পরব। দেশের শত্রু বলেই তাঁকে আমি হত্যা করেছি।'

হাইকোর্টেও যখন চারুর প্রাণদণ্ড বহাল থাকল তখন তিনি লাটসাহেবের দরবারে আপীল করতে রাজি হলেন না। উনিশে মার্চ আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ফাঁসীতে আত্মাহুতি দিলেন এক প্রশান্তচিত্ত তরুণ, চারুচন্দ্র বসু।

সাম্‌সুল আলম্‌-হত্যা

আলিপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলার তদ্বিরের ভার ছিল সাম্‌সুল আলমের উপর। তিনি ছিলেন সরকারী কৌঁসুলী মিঃ নর্টনের ডান হাত। বিপ্লবীদের মামলা সাজানো, মিথ্যেকে সত্যি বলে চালানো, মিথ্যে সাক্ষী যোগাড় করে তাকে কৌশলমতো কাজে লাগানো, রাজবন্দীদের মধ্যে যারা কচি ও কাঁচা তাদের দুর্বলতা খুঁজে বের করে সেগুলো উপযুক্তভাবে কাজে লাগানো, গড়ে পিটে কাউকে 'রাজসাক্ষী' বানিয়ে নিজেদের স্বার্থে তাকে প্রয়োগ করা ইত্যাদি যাবতীয় নিকৃষ্ট কাজে পুলিশের এই ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাম্‌সুল আলম্‌ ছিলেন ওস্তাদ।

অতএব বিপ্লবীদের খতম তালিকায় তাঁর নাম উঠে গেল। আলিপুর মামলা শুরু হতেই দু'-দু'বার তিনি বিপ্লবীদের অব্যর্থ নিশানা থেকে প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন।

এরই মধ্যে আশু বিশ্বাসের প্রাণ গেল।

এবার সামসুল আলমের পালা।

দশ সালের চব্বিশে জানুয়ারী। সহকারী উকিলদের মামলার কাগজপত্র বুঝিয়ে দিয়ে সাম্‌সুল হাইকোর্টের উপরতলা থেকে সিঁড়ি বেয়ে নামছেন। সঙ্গে রয়েছে সশস্ত্র রক্ষী। বিকেল সাড়ে পাঁচটা বাজে। হঠাৎ সাম্‌সুলের নজরে পড়ল একটি যুবক। কিন্তু একটা ধারণা করার সুযোগ দিলেন না তিনি। মুহূর্তের মধ্যে তিনি মৃত্যুদূতের রূপ ধারণ করে সাম্‌সুলের সামনে ভীষণ দর্শন হয়ে উঠলেন। তাঁর পিস্তল থেকে ছুটে আসা অব্যর্থ বুলেটে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন ব্রিটিশের অনুরক্ত সেবক বলদর্পী সাম্‌সুল আলম্‌।

এই হত্যাকাণ্ডের মাত্র পাঁচদিন পরে 'কর্মযোগিন্‌' পত্রিকায় অরবিন্দ লিখলেন, 'বহু দুঃসাহসী সশস্ত্র কাণ্ডের মধ্যেও অধিকতর দুঃসাহসী এই কাজ। বিপ্লবীরা জনস্থল ও জনবহুল প্রাসাদগুলোকেই এ্যাক্‌শনের স্থানরূপে পছন্দ করেন। তাই তো দেখা যায়, নাসিকের প্রেক্ষাগার, বিলেতের সভাস্থল, কলকাতার হাইকোর্ট এঁদের পছন্দসই কর্মভূমি—জেলখানায় গোস্বামী হত্যা—এ সবই এঁদের কর্মকাণ্ডের লক্ষণীয় দিক।'

সাম্‌সুলকে হত্যা করে আততায়ী বেরিয়ে এলেন জনাকীর্ণ রাজপথে।

কিন্তু জনতার সঙ্গে মিশে যেতে পারলেন না তিনি। ধরা পড়লেন বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত। বাড়ি ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণায়। বিপ্লবীদলের এই কিশোর সভ্যটির বয়স তখনও উনিশ পেরোয়নি। বুকে দেশপ্রেমের আগুন। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের আশীর্বাদ ধন্য হয়েই তিনি সাম্‌সুল হত্যায় অগ্রণী হয়েছিলেন।

বিচার, নির্যাতন, ফাঁসীর হুকুম—বিপ্লবীদের জন্য ইংরেজ শাসকের কাছে পাওনা সবই পেলেন বীরেন। কিন্তু তিনি কোনো উকিল ব্যারিস্টারের সাহায্য নেন নি। আদালতে দাঁড়িয়ে তিনি শুধু বলেছিলেন, 'আমি ওকে হত্যা করেছি। ব্যস্‌, আমার আর কিছু বলার নেই।'

অতএব, একুশে ফেব্রুয়ারী ফাঁসীর মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে গেলেন আর এক শহীদ।

ভারতবর্ষে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক উত্তাপ

ইতিপূর্বে সাত সালে কংগ্রেস নেতৃত্বের দখল নিয়ে 'নরমপন্থী' সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রাসবিহারী ঘোষ প্রমুখের সঙ্গে 'চরমপন্থী' লাল-বাল-পাল ও অরবিন্দ গোষ্ঠীর সংঘাতে সুরাটে কংগ্রেস অধিবেশন পণ্ড হয় এবং সাময়িকভাবে কংগ্রেসে ভাঙন দেখা দেয়।

তার পরের বছরেই 'কেশরী' পত্রিকায় ক্ষুদিরামের আত্মদানের সপ্রশংস উল্লেখসহ বাল গঙ্গাধর তিলকের রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে তাঁকে ছ'মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে সুদূর মান্দালয় জেলে পাঠানো হয়, যে কথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। আদালতে তিলক নিজেই আত্মপক্ষের সমর্থনে বক্তৃতা করেন।

তিলকের ওই ছ'বছর কারাদণ্ডের প্রতিবাদে বোম্বাইয়ের হিন্দু-মুসলমান শ্রমিক তখন যে দু'দিন-ব্যাপী ধর্মঘট করেন, ভারতবর্ষে তা অভূতপূর্ব। হাটবাজার, দোকানপাট সব বন্ধ, সম্পূর্ণ হরতাল-আন্দোলনে যোগ দিলেন ছোট ব্যাসায়ীরা। এমন কি, বাড়ির ঝি-চাকররাও। আর এই সবই সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে, তিলকের মুক্তির দাবিতে। এই গণ-আন্দোলনকে দমন করতে বোম্বাইয়ের রাজপথে পুলিশের সঙ্গে নামানো হল মিলিটারি। পুলিশ ও মিলিটারির গুলিতে প্রাণ দিলেন দু'শোরও বেশি শ্রমিক ও সাধারণ মানুষ।

বোম্বাইয়ের ওই ধর্মঘটের খবর পেয়ে লেনিন সেদিন তাঁর সুইৎজারল্যাণ্ডে নির্বাসন থেকে লিখেছিলেন, 'ভারতবর্ষে শ্রমিক শ্রেণীও এরই মধ্যে সচেতন, রাজনৈতিক গণসংগ্রামের স্তরে উঠেছে। আর তাই যদি হয় তবে ভারতে রুশী ঢং-এর ব্রিটিশ রাজত্বের দিন খতম হয়ে এল।'

আন্‌জুমান-এ-মুহিব্বান-এ-ওয়াতন (বা ভারতমাতা সোসাইটি)

মোরাদাবাদের বিখ্যাত বিপ্লবী সূফী অম্বাপ্রসাদ সাত সালে পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশের বিপ্লবীদের নিয়ে এই সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমিতির উল্লেখযোগ্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন সর্দার অজিত সিং ও তাঁর দুই ভাই, সর্দার কিষণ সিং (ভগৎ সিং এর বাবা) স্বরণ সিং, লালা পিণ্ডিদাস, লালা আনন্দকিশোর মেহ্‌তা, লালা কেদারনাথ সাইগল, লালা লালচাঁদ 'ফলক', লালা হরদয়াল, বাবু ঈশ্বরীপ্রসাদ, হাপুরের মৌলভি জিয়াউল হক, পণ্ডিত রামচন্দ্র পেশোয়ারি প্রমুখ। দু'বছর পরে অম্বাপ্রসাদ সর্দার অজিত সিং-এর সঙ্গে ইরাণে পালিয়ে যান।

রামকৃষ্ণ পিল্লাই

রামকৃষ্ণ পিল্লাই প্রথম ভারতীয় ভাষা মালয়ালমে কার্ল মার্ক্সের জীবন ও কাজকর্ম বিষয়ে একটি পুস্তিকা লেখেন বারো সালের আগস্ট মাসে। অবশ্য এর মাত্র চার মাস আগে 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় লালা হরদয়াল কার্ল মার্ক্সের উপর ইংরেজিতে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তার ছায়াপাত ঘটেছিল রামকৃষ্ণ পিল্লাইয়ের প্রবন্ধে। তিনি ছিলেন ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী। তাঁর 'দেশাভিমানী' পত্রিকা ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যসরকারের নির্দেশে বন্ধ হয়ে যায়। তাঁর ছাপাখানাটিকেও বাজেয়াপ্ত করে তাঁকে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য থেকে বিতাড়িত করা হয়।

বিপ্লবী ননীগোপাল

বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা জ্যোতিষ ঘোষের শিষ্য ছিলেন চুঁচুড়ার বিপ্লবী ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়। ননীগোপাল যখন মাত্র ষোলো বছরের কিশোর তখন তিনি ডালহৌসী স্কোয়ারে পুলিশের বড় কর্তা ডেনহ্যাম সাহেবের গাড়িতে বোমা ফেলার চেষ্টা করেন। এ জন্য ওঁর বারো বছরের জেল হয় এবং ওঁকে আন্দামানে পাঠানো হয়।

সেখানে কারা আইনের কোনো শর্তই তিনি মানতে চান নি। সেজন্য কর্তৃপক্ষ তাঁর উপর অকথ্য অত্যাচার করেন। অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি প্রায় একশো পঞ্চাশ দিন অনশন করেন, অবশ্য মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে।

কারা-মুক্তির পর তিনি আন্দামান থেকে জামশেদপুরে এসে ক্রেন-ড্রাইভারদের সংগঠিত করে টাটা কোম্পানীতে প্রথম ধর্মঘট করেন। সরকারী নির্দেশে ননীগোপাল ওখান থেকে বহিষ্কৃত হলেন এবং কলকাতায় এসে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষকসভার আন্দোলনে এবং কমিউনিস্ট সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ ভূমিকা লক্ষণীয়।

ভারতীয় বিপ্লবের আগুন ঃ লণ্ডনের মাটিতে

নয় সালের পয়লা জুলাই। লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল ইনস্টিটিউটের জাহাঙ্গীর হলে ন্যাশন্যাল এ্যাসোসিয়েশনের বাৎসরিক সভায় অন্যান্য বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সঙ্গে উপস্থিত হয়েছিলেন কার্জন উইলি-ও।

গানের পালা সবেমাত্র শেষ হয়েছে। হঠাৎ এক তরুণের পিস্তল থেকে এক ঝাঁক গুলি ছুটে এল উইলিকে লক্ষ্য করে। গুলি খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন উইলি। তাঁকে বাঁচাতে এসে প্রাণ দিলেন লালকাকা নামে এক পার্শী ভদ্রলোক। আততায়ী মদনলাল ধিংড়া ধরা পড়লেন।

ঘটনার চার দিন পরে ধিংড়ার এই কাজের নিন্দাসূচক প্রস্তাব আনার জন্য লণ্ডনে আহুত এক সভায় দেশী-বিদেশী, শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ বহু গণমান্য ব্যক্তি যখন নিন্দাসূচক প্রস্তাবটির সমর্থনে ভাষণ দিয়ে প্রস্তাবটি সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করতে যাচ্ছিলেন তখন ওই সভায় এক তরুণ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি। ইনিই বিনায়ক দামোদর সভারকর।

উনি এই কথাটি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই পামার নামে এক এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছুটে এসে ওঁর মাথায় এমন আঘাত করল যে, সাভারকরের মাথা ফেটে গেল।

তাই দেখে তরুণ বিপ্লবী থিরুমল আচারিয়া প্রচণ্ড ঘুষি মেরে পামারকে ফেলে দিলেন মাটিতে। আর এক বিপ্লবী ভি. ভি. এস. আয়ার পকেট থেকে পিস্তল বের করে পামারকে গুলি করে হত্যা করতে উদ্যত হলে প্রশান্তচিত্তে বন্ধুদের সংযত করলেন ওঁদের বিপ্লবী নেতা সাভারকর।

সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সাভারকরকে নৃশংসভাবে আক্রমণ করার প্রতিবাদে তিনি সভাগৃহ ত্যাগ করে চলে গেলেন। সাভারকরের কোনো দোষ ছিল না বলে লণ্ডন-পুলিশ ওঁকে গ্রেপ্তার করল না। সেই রাত্রেই 'টাইম্‌স্‌' পত্রিকায় আহত সাভারকর একটি চিঠি পাঠালেন। পরদিন কাগজটি প্রকাশিত হলে জানা গেল সাভারকর লিখেছেন, 'ধিংড়ার মামলা এখনও কোর্টে বিচারাধীন। সভায় বসে কারোই কোর্টের ক্ষমতা বে-দখল করে ধিংড়ার বিরুদ্ধে রায় দেবার অধিকার নেই। আর যদি কোন রায় আদৌ দিতে হয়, তবে ধিংড়ার কথাও তো প্রথমে শুনে নিতে হবে। 'ওই পত্রিকায় প্রকাশিত আর একটি চিঠি লিখেছিলেন দেশপ্রেমী সরোজিনী নাইডুর ভাই, আজন্ম বিপ্লবী. বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সেই চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, 'ইংরেজ যদি এখনও মনে করে যে, মানব-কল্যাণের জন্য ভারতবর্ষে তাকে থাকতে হচ্ছে, তবে এ সুখ-কল্পনা তার অচিরেই চুরমার হয়ে যাবে। আগামী দিনে হত্যালীলা দীর্ঘতম হতে বাধ্য। সেই রক্তপাতের জন্য দায়ী হবে তারাই, যারা ভারতের স্বাধীনতা অস্বীকার করে আত্মস্বার্থে তাকে পদানত রেখেছে।

ধিংড়ার কাজকে সমর্থন করতে এগিয়ে এলেন শ্যামজী কৃষ্ণবর্মাও। তিনি লিখলেন, 'আমার এই নিধনকার্যের সঙ্গে কিছুমাত্র সম্পর্ক নেই। তবু সরল চিত্তে স্বীকার করব যে, এই কাজ আমার সমর্থনযোগ্য। আমি এই নিধন-লীলাব যিনি কর্তা, তাঁকে ভারতীয়-স্বাধীনতার বেদীতলে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ 'শহীদ' রূপে বরণ করি। আমি জানি. আমার এই উক্তি অনেকের মনে আঘাত দেবে। কিন্তু এও জানি যে, ইংরেজদের মধ্যেও এমন সুস্থ-সবল চিত্তের মানুষ আছেন, যাঁরা আমার সঙ্গে একমত। তাঁরাও বলবেন—রাজনৈতিক কারণে-এর নিধন, সাধারণ হত্যার সামিল নয়।'

মদনলাল ধিংড়ার ফাঁসী

উইলি-হত্যাকাণ্ডের দশদিন পরে মদনলালকে আনা হল ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে। আদালতে ধিংড়া বললেন যে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে লালকাকাকে হত্যা করেন নি। আত্মরক্ষার জন্য ওকে গুলি করেছিলেন। মামলা জজের কোর্টে এলে ধিংড়া কোনো উকিল দিলেন না। তিনি জজের উদ্দেশে বললেন, 'তুমি

ইচ্ছাসুখে বিচার করো। আমার আপত্তি নেই। তোমরা শ্বেতাঙ্গদল এখন ক্ষমতায় বসে আছো, তোমরা আমাকে নিয়ে যা খুশি তাই করতে পারো। কিন্তু মনে রেখো, দিন আমাদেরও আসবে।'

ব্রিক্সটন্ কারাগারে বন্দী ধিংড়াকে দেখতে গিয়েছিলেন ভি. ভি. এস. আয়ার ও বিনায়ক সাভারকর। তাঁদের চোখে সেদিন ধিংড়াকে মনে হয়েছিল যেন এক আত্মা-নিবেদিত বীর্যবান তরুণ তাপস।

ধিংড়া বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'জার্মানদের যেমন ব্রিটেন দখল করবার অধিকার নেই, ব্রিটেনেরও তেমনি ভারতবর্ষ দখল করবার এক্তিয়ার নেই। অতএব যে-ইংরেজ আমার পবিত্র জন্মভূমি ভারতবর্ষকে অপবিত্র করতে চায়, তাকে হত্যা করা আমাদের কাছে ন্যায়ের নির্দেশ। ইংরেজের কপটতা, অশোভন মিথ্যাচার ও বিদ্রূপবর্ষী আচরণ দেখে আমি স্তম্ভিত।

'আমি বিশ্বাস করি, বিদেশী বেয়নেটের গুঁতোয় যে জাতিকে দাবিয়ে রাখা হয়েছে—সে নিয়ত বিবদমান পরিপার্শ্বে অবস্থিত। যুদ্ধ-ডঙ্কা সেখানে অববিরত বেজে যাচ্ছে। কিন্তু অস্ত্রহীন জাতির পক্ষে সম্মুখ-যুদ্ধের কথা অবান্তর, আমি তাই অতর্কিতে আক্রমণ করেছি। বন্দুকের লাইসেন্স আমাকে দেওয়া হয় নি, আমি তাই গোপনে শত্রুর বুকে পিস্তল তাক্ করেছি।'

'আমি হিন্দু হয়ে মনে করি, আমার দেশজননীর অসম্মান, বিধাতারই অসম্মান। দেশের কাজ, ভগবান রামচন্দ্রেরই কাজ। দেশের সেবা, প্রভু শ্রীকৃষ্ণেরই সেবা। আমি বিদ্যাহীন, বিত্তহীন, বুদ্ধিহীন, জননীর পূজাবেদীতলে অর্ঘ্য দেবার মতো আমার বুকের রক্তটুকুই শুধু আছে। সেই রক্ত আমি নিবেদন করলাম।'

'ভারতবর্ষে একটি মাত্র শিক্ষারই প্রয়োজন, সে হচ্ছে মৃত্যুবরণের শিক্ষা। সেই শিক্ষাদানের একটিমাত্র পথ রয়েছে—সে হচ্ছে আত্মবলিদানের পথ।........তাই আমি মৃত্যুকে বরণ করছি। আমার আত্মনিবেদন জয়যুক্ত হোক।

'বিধাতার কাছে আমার কামনা, আমি যেন বারে বারে আমারই গর্ভধারিণীর বুকে জন্মগ্রহণ করে বারে বারে দেশোদ্ধারের সাধনায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করি, যতকাল না আমার ভারতভূমি সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে বিশ্বসভায় গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিতা হন।'

ওই বছরের সতেরোই আগস্টে লণ্ডনের পেন্টনভেলি জেলে ফাঁসী হল সুদূর পাঞ্জাবের তরুণ বিপ্লবী মদনলাল ধিংড়ার। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বলে গেলেন, তাঁর যা কিছু সম্বল ও অর্থ লণ্ডনে আছে তা যেন জাতীয় ভাণ্ডারে জমা করে দেওয়া হয়।

ধিংড়ার বাবা ছিলেন বিত্তশালী ব্যারিস্টার। বড় ভাই দেশে থাকেন। ইংরেজের অনুগ্রহপুষ্ট পরিবার। ছেলে মদনলালকে ইংলণ্ডে পাঠিয়েছিলেন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে এবং পাশ করে দেশে ফিরে এসে পরিবারটিকে আরও সমৃদ্ধিশালী করে গড়ে তোলার আশায়। সেই ছেলে কিনা পরিবারের মুখে চুণ-কালি দিয়ে—। ছিঃ। ওকে ত্যাজ্য করে পরিবারের নিরাপত্তা ও মান-সম্মান বাঁচাও।

তাই মৃত্যুর পরে জাতীয় ভাণ্ডারে দেওয়ার জন্য ধিংড়ার সম্পত্তির মধ্যে পাওয়া গেল সামান্য কিছু টাকা ও দু'একটি জীর্ণ কাপড়-জামা।

ওঁর মৃতদেহ জেলের বাইরে আনতে দেওয়া হয়নি। ধিংড়ার শেষ ইচ্ছানুসারে ওঁর শ্রাদ্ধাদি হল লণ্ডনেই। সতীর্থ জ্ঞানচাঁদ বর্মা মাথা মুড়িয়ে সকল অনুষ্ঠান পালন করে বিপ্লবীর শেষকৃত্য সম্পন্ন করলেন। কলকাতায় বসে অরবিন্দ তাঁর 'কর্মযোগিন্' পত্রিকায়, লিখলেন, 'এখানে তাঁর দেশ তাঁরই পিছনে রয়েছে তাঁর কৃতকর্মের সকল দায়িত্ববহন করার সংকল্পে।'

বিশ্বখ্যাত রাজনৈতিক নেতা লয়েড জর্জ ব্রিটেনের পরবর্তীকালের প্রধানমন্ত্রী স্যার উইনস্টন্ চার্চিলের কাছে বলেছিলেন, 'ধিংড়ার কোর্টে প্রদত্ত উক্তি দেশপ্রেমের শ্রেষ্ঠতম মাধুর্যে উজ্জ্বল। তাঁর তুলনা চলে শুধু প্লুটার্ক-বর্ণিত মৃত্যুঞ্জয়ী বীর্যবানদের সঙ্গে।'

লর্ড হার্ডিঞ্জ হত্যা

কলকাতা থেকে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হল বারো সালে। সম্রাট পঞ্চম জর্জের অভিষেক উপলক্ষে ভারতীয় প্রজাগণের প্রতিনিধি ও দেশীয় রাজন্যবর্গ নিয়ে প্রভুর প্রতীক বড়লাটের দরবার বসল তেইশ ডিসেম্বরে।

সারা রাজধানী জুড়ে বিপুল সমারোহ। অন্তহীন জাঁকজমক। চোখ-ধাঁধানো আড়ম্বর। পথ ঘাট লোকে লোকারণ্য। দরবার-গৃহ দৃপ্ত ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের উপকরণে দর্শনীয়।

দিল্লীর সেন্ট্রাল স্টেশনে বড়লাটের স্পেশাল ট্রেন এসে থেমেছে।

বিশাল এক হাতীর পিঠে বিরাট এক রূপোর তৈরি হাওদায় বসে আছেন সস্ত্রীক লর্ড হার্ডিঞ্জ। বড়লাট-দম্পতির মাথায় ছাতা ধরে বসে আছে কোনো এক করদ-রাজ্য থেকে আগত এক জঙ্গী জোয়ান, জমাদার মহাবীর সিং।

জনাকীর্ণ পথে এগিয়ে চলেছে সেই হাতি। কাতারে-কাতারে লোক পথের দু'ধারে দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে সেই জাঁকজমকপূর্ণ শোভাযাত্রা দেখছেন।

হাতিটি পাঞ্জাব ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের সামনে আসতেই এক বিশাল বিস্ফোরণের শব্দে সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। কান-ফাটানো এই শব্দে সবাই বিহ্বল হয়ে পড়েছে। বড়লাটের হাওদার পিছন দিকটা চুরমার হয়ে গেছে। বোমার একটা টুকরো লর্ড হার্ডিঞ্জের পিঠের মাংস ছিঁড়ে কাঁধের উপরে একটা গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছে। সেই ক্ষত থেকে রক্তক্ষরণেব বিরাম নেই। ক্রমে লর্ড হার্ডিঞ্জের চেতনা লুপ্ত হয়ে গেল।

বিপর্যস্ত হলেও অসামান্য মনোবলে লেডি হার্ডিঞ্জ তাঁর সামনের হাতির পিঠে বসা কর্ণেল ম্যাক্সওয়েলকে ডেকে তাঁর এবং অন্যান্যদের সাহায্যে স্বামীকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে গেলেন চিকিৎসার ব্যবস্থা কবতে। ওদিকে জমাদার মহাবীর সিংয়ের ছিন্নভিন্ন দেহ পড়ে থাকল বাজপথে।

যে সব ভারতীয়বা ইংরেজ সরকারকে তোষামোদ ও খোসামোদ করে আখের গোছাত, তাবা একটা মোটা অঙ্কের পুরস্কার ঘোষণা করল আততায়ীকে ধরার জন্য। কিন্তু ক্ষিপ্ত ইংরেজ সরকাব তখন ওসব চাটুকারিতা প্রশ্রয় না দিয়ে নিজেরাই আততায়ীদের সন্ধান দেবার বিনিময়ে একলক্ষ টাকা প্রাপ্তির লোভ দেখাল। কিন্তু পুলিশ কাউকে ধরতে পারল না। গোয়েন্দাদের মাথা হেঁট হয়ে রইল।

প্রায় পাঁচ মাস কেটে যাবার পর আবার বিস্ফোরণ। এবার লাহোরে। লরেন্সবাগে একটি তাজা বোমা রাখা হয়েছিল সিলেটের প্রাক্তন জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট, কুখ্যাত গর্ডনকে হত্যা করার জন্য। কিন্তু গর্ডন সেদিন ওপথে আসেন নি। একটি নিরীহ চাপরাশি ওই পথে যাচ্ছিল সাইকেল চালিয়ে। মৃত্যু হল তার। ওখানে বোমাটি রেখেছিলেন রাসবিহারী বসুর বিশ্বস্ত কর্মী, তরুণ বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস। আই. সি. এস. গর্ডন যখন সিলেট জেলার দায়িত্বে ছিলেন, তখন ওখানকার অরুণাচল আশ্রমের উপর পুলিশের নজর পড়ল। একদিন ওখানে বিশাল এক পুলিশবাহিনী ধাওয়া করে এবং গর্ডনের আদেশে নিরীহ আশ্রমবাসীদের উপর নির্বিচারে গুলি চালানো হয়। পরে ওই সাহেবের আদেশে আশ্রমটিকে বে-আইনী ঘোষণাও করা হয়েছিল। গর্ডনের এই অমানবিক নৃশংসতায় ক্ষোভে ফেটে পড়ে সমগ্র বাংলা।

বিপ্লবীরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, গর্ডনকে তাঁর বাংলোতেই হত্যা করা হবে। এজন্য অনুশীলন সমিতির কয়েকজন সভ্যসহ যোগেন চক্রবর্তীকে পাঠানো হয়। কিন্তু গর্ডনকে হত্যা করার জন্য নির্ধারিত বোমাটি যোগেনের হাতে ফেটে যায় এবং তিনি মারা যান। সরকার গর্ডনের প্রাণ বাঁচাতে তাঁকে সুদূর লাহোরে বদলি করে দেয়। লর্ড হার্ডিঞ্জ এবং গর্ডনের ঘটনায় সরকার প্রচণ্ড তৎপর হলেও কাউকে ধরে মুখ বাঁচাতে পারল না।

বড়লাটের আততায়ীদের নিন্দায় দেরাদুনে একটি সভা আহুত হলে সেখানে সরকারের বন-বিভাগের এক তরুণ কর্মচারী জ্বালাময়ী ভাষায় আততায়ীদের নিন্দা করলেন, বড়লাটকে দীর্ঘজীবী হয়ে ভারতের কল্যাণ ব্রতে নিযুক্ত থাকতে অনুরোধ জানালেন এবং অবিশ্বাস্যরূপে তাঁর প্রাণরক্ষায় হৃদয়ের আনন্দ প্রকাশ করলেন।

রাসবিহারী বসু

এই বক্তাই রাসবিহারী বসু যিনি তখন উল্কার বেগে সারা উত্তর ভারত ও পাঞ্জাব চষে বেড়াচ্ছিলেন

এবং একটার পর একটা গুপ্ত সমিতি গড়ছিলেন। পুলিশ চিন্তাই করতে পারেনি যে তাঁরই নির্দেশে ও ব্যবস্থাপনায় লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা ছোঁড়া হয়েছে। পুলিশ আরও জানত না, বাংলা ও উত্তরভারতের বিপ্লবী সংস্থাগুলোর মধ্যে যোগাযোগের সার্থক নেতৃত্ব এই সরকারী কর্মচারীটির উপর ন্যস্ত; তারা কল্পনাও করতে পারেনি, এই রাজভক্ত কর্মচারীটিই হবেন ভাবীকালের মহান বিপ্লবী রাসবিহারী বসু। পৃথিবীব্যাপী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্বপ্রধান জমিদারী ছিল ভারতবর্ষ। সেই ভারতবর্ষের প্রধানতম ব্রিটিশ-প্রতিভূকে ওই ভয়ঙ্কর আক্রমণ করার অর্থ হল, ব্রিটিশের শক্তি, দম্ভ ও প্রজাপালনের অধিকারকে অস্বীকার করার অপ্রতিহত অভিযান। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ-অভিযান মারাত্মক। ব্রিটিশের পক্ষে স্থায়ীভাবে অশুভ।

দিল্লী ও উত্তর-ভারতের নানা জায়গায় লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপের প্রশংসা এবং ব্রিটিশ বিতাড়নের যুদ্ধে যুব-শক্তিকে ঝাঁপিয়ে পড়ার সরাসরি আহ্বান জানিয়ে দেওয়ালে-দেওয়ালে পোস্টার লাগানো হতে থাকল।

উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের কর্মনেতৃত্বে রাসবিহারী বসালেন বিপ্লবী অবোধবিহারীকে। তা ছাড়া উত্তর ভারতের বিপ্লবী সংস্থাগুলোকে কর্মতৎপর করে তুলতে রাসবিহারীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন পাণ্ডিত্যে, বীর্যে ও আদর্শপালনে অনন্যসাধারণ অবোধবিহারী, বীর বালমুকুন্দ, কর্মপাগল বসন্ত বিশ্বাস, পিংলে, শচীন সান্যাল ও আমীর চাঁদ।

কিন্তু তের সালের নভেম্বর মাসে কলকাতার রাজাবাজারে একটি বিপ্লবী আস্তানায় তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ কিছু বোমার মালমশলা ও একটি নামের তালিকা পায়। ওখানে গ্রেপ্তার হন অনুশীলন সমিতির নেতৃস্থানীয় দুর্জয় বিপ্লবী অমৃত হাজরা এবং আরও দু'জন ব্যক্তি—দীননাথ ও সুলতান চাঁদ। দীননাথ বিচারকালে রাজসাক্ষী হয়ে রাসবিহারী বসু ও বসন্ত বিশ্বাসের নাম বলে দেয় এবং সুলতান চাঁদ জেরার ভয়ে তার পিতা আমীরচাঁদের নাম কবুল করে।

চার মাসের মধ্যে পুলিশ গ্রেপ্তার করল আমীরচাঁদ, বসন্ত বিশ্বাস, অবোধবিহারী ও বালমুকুন্দকে। গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে জাল বিস্তার করেও পুলিশ কিছুতেই ধরতে পারল না রাসবিহারীকে। যিনি বহু ভাষাবিদ্, ছদ্মবেশ ধারণে অসীম দক্ষ, সদা সতর্ক। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'র নায়ক সব্যসাচীপ্রতিম এই মানুষটি যাদুকরের মতো সমগ্র ভারতবর্ষে সবার চোখে ধূলো দিয়ে গোপনে ঘুরে ঘুরে প্রচণ্ড কর্মপ্রবাহ সৃষ্টি করতে থাকলেন।

আমীরচাঁদ, অবোধবিহারী, বালমুকুন্দ ও বসন্ত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বোমা তৈরি, অস্ত্র-আইন ভঙ্গ ও রাজদ্রোহের নানা ধারায় অভিযোগ আনা হল। অবোধবিহারী ও বসন্ত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আরও বাড়তি অভিযোগ আনা হল লরেন্সবাগে চাপরাশি হত্যার।

ছোট-বড় সব আদালতে মামলার শুনানী হয়ে যাবার পর পাঞ্জাব চিফ্-কোর্টের রায়ে ওঁদের ফাঁসীর হুকুম হয়ে গেল এবং আম্বালা কারাগৃহে ওঁরা ফাঁসীতে মৃত্যুবরণ করলেন পনেরো সালের এগারোই মে।

প্রসঙ্গত জানাই, বালমুকুন্দের স্ত্রী রামরাখী দেবী স্বামীর ফাঁসীতে মৃত্যু হওয়ার পর অন্নজল ত্যাগ করেছিলেন এবং অল্প কিছুদিন পরেই তিনি লোকান্তরিত হন।

রডা অস্ত্রলুণ্ঠন

আত্মোন্নতি সমিতির সভ্য শ্রীশ মিত্র ওরফে হাবু থাকতেন মধ্য কলকাতায়, কাজ করতেন 'আর. বি. রডা কোম্পানীর অফিসে সামান্য টালি ক্লার্কের পদে। বউবাজারে ছাতাওয়ালা গলির এক গোপন আড্ডায় যুগান্তর, আত্মোন্নতি সমিতি ও মুক্তিসংঘের নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধিদের কাছে হাবু এসে গোপনে খবর দিলেন অস্ত্র-ব্যবসায়ী রডা-কোম্পানীর জন্য প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র কাস্টমস্-হাউসে দু'একদিনের মধ্যেই

এসে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে তিব্বতের দালাই লামার জন্য থাকবে 'মাউজার পিস্তল' পঞ্চাশটি, অতিরিক্ত স্প্রিং পঞ্চাশটি এবং পিস্তলের প্রয়োজনীয় 'ফেস'—যেগুলোর সাহায্যে ওইসব পিস্তল রাইফেলের মতো ব্যবহার করা চলে। এ ছাড়া থাকবে পঞ্চাশ হাজার রাউণ্ড কার্তুজ।

হাবু মিত্রের এই খবর শুনলেন শ্রীশচন্দ্র পাল। তিনি তখন মুক্তি সংঘের নেতা হেমচন্দ্র ঘোষের কলকাতার প্রতিনিধি। তিনি এই সংবাদ শুনেই অস্ত্রলুঠ করার পরিকল্পনা করলেন। তিনি বিপ্লবী বন্ধুদের বললেন অস্ত্র-শস্ত্র রডার ঘরে তোলার আগে পথ থেকেই মাল লুঠ করতে হবে।

দিনে-দুপুরে ডালহৌসী স্কোয়ারের মতো জনাকীর্ণ স্থানে এই দুঃসাহসী এবং প্রায় অসম্ভব কাজ করতে রাজি হলেন না কেউ-কেউ। এই পরিকল্পনাকে অবাস্তব বলে দলের সভা ছেড়ে চলে গেলেন তাঁরা। কিন্তু শ্রীশ পাল এতে দমলেন না।

আত্মোন্নতি সমিতি ও মুক্তি সংঘের সদস্যরা শ্রীশচন্দ্র পালের উপর আস্থা রাখলেন। বাংলা তথা ভারতবর্ষের বিপ্লব ইতিহাসে এত বড় দুঃসাহসিক এ্যাকশনের সফল কল্পনা ইতিপূর্বে কোনো দলই করেনি। শুধু অস্ত্র লুঠ করলেই কাজ শেষ হবে না। সেই অস্ত্রগুলোর প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ ও বন্টন করাও কম গুরুত্বপূর্ণ কাজ নয়।

শ্রীশচন্দ্র তখনই পলাতক অবস্থায় ছিলেন। তখন তাঁর নাম নরেন দত্ত। তাঁর পালিয়ে থাকার কারণ তিনি নাকি প্রায় দু'বছর আগে জগদ্দলের আলেকজাণ্ডার জুট মিল্স্-এর বিলিতি ইঞ্জিনিয়ার রবার্ট ও'ব্রায়েনকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন।

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র ঘোষ, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, হরিশ শিকদার প্রভৃতি অগ্রগণ্য, বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের সমর্থনে এবং হাবু মিত্র, হরিদাস দত্ত, খগেন দাস প্রমুখ কর্মীদের সক্রিয় সহায়তায় এবং বিপ্লবী নেতা অনুকূল মুখার্জির অনুপ্রেরণায় শ্রীশচন্দ্র রডা-অস্ত্রলুণ্ঠনের পরিকল্পনা ছকে ফেললেন।

চোদ্দ সালের পঁচিশে আগস্ট শ্রীশ ও অনুকূল যেভাবে পরিকল্পনা করেছিলেন সেই অনুযায়ী একটি গরুর গাড়ি সংগ্রহ করা হল এবং পরদিন ওই গাড়িতে মাল তুলে দিলেন হাবুমিত্র। রডা কোম্পানীতে ওই কাজের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। অতএব সন্দেহের কোনো অবকাশ ছিল না। গাড়োয়ানের ভূমিকায় ছিলেন কলেজের ছাত্র প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকা। মাড়োয়ারী হোস্টেলের এই ছাত্রটিকে খাঁটি গাড়োয়ানের বেশে রূপান্তরিত করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন হরিদাস দত্ত। কলকাতার রাজপথে যথাসময়ে গরুর গাড়িটা রওনা হল। গাড়োয়ানটির মাথায় কদম ছাঁট চুল, গায়ে কালো ফতুয়া, গলায় কালো ফিতের সঙ্গে আঁট করে লাগানো পিতলের ধকধকি, পরনে ময়লা আটহাত কোরা ধুতি।

পূর্ব পরিকল্পনামতো গাড়ির সমানে হেঁটে চলেছেন গোপন-অস্ত্রে সজ্জিত শ্রীশচন্দ্র। একটু দূরত্ব বজায় রেখে গাড়িখানাকে অনুসরণ করছিলেন সশস্ত্র খগেন দাস। এমন কি, গাড়োয়ান প্রভুদয়ালও নিরস্ত্র ছিলেন না।

এঁদের পরিকল্পনা অনুযায়ী গরুর গাড়িটির আগেও আরো ছ'খানা গাড়িতে মাল তোলা হয়েছিল এবং সেগুলো ওঁদের নির্দিষ্ট গাড়িটির আগে-আগে যাচ্ছিল। ভ্যান্সিটার্ট রো-র সামনে এসে প্রথম ছ'খানা গাড়ি রডা কোম্পানীর উদ্দেশ্যে গলির মধ্যে ঢুকে যেতেই হাবুর নির্দেশে এবং শ্রীশ পাল ও খগেন দাসের প্রহরায় সপ্তম গাড়িটি মিশন রো হয়ে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া স্ট্রীট, বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট পেরিয়ে চাঁদনি চক্-এর পাশ দিয়ে মলঙ্গা লেনে অনুকূলবাবুর আস্তানায় পৌঁছে গেল।

অনুকূল মুখোপাধ্যায় একান্ত ক্ষিপ্রতায় কালিদাস বসু ও ভুজঙ্গ ধর প্রমুখের সাহায্যে মালপত্র গোপন স্থানে পৌঁছে দিলেন।

সংবাদটি অনতিবিলম্বে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। কলকাতার বুকে এই দুঃসাহসী কাজে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁদের খুঁজে বের করতেই হবে। চারিদিকে ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়ে গেল। প্রথমে ধরা পড়লেন হরিদাস দত্ত, এরপর হাবু মিত্রের আশ্রয়দাতা ডাক্তার সুরেন বর্ধন। তারপরে একে-একে ধরা

পড়লেন হেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীশ পাল, হরিদাস দত্ত ও খগেন দাস। কিন্তু হাবু মিত্রকে পুলিশ ধরতে পারল না। তাঁর শেষ পরিণতি ইতিহাসে অজ্ঞাত রয়ে গেছে। তিনি ফ্রন্টিয়ার পার হয়ে ভারতের বাইরে চলে যেতেও পারেন অথবা পার হতে গিয়ে কোনো দুর্ঘটনায় বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মারাও যেতে পারেন। ফ্রন্টিয়ার-প্রহরীর গুলির আঘাতেই হোক, বুনো পশুর আক্রমণেই হোক, কিংবা অন্য কোনো কারণেই হোক হাবু মিত্র সম্বন্ধে বলা চলে তাঁর প্রাণ পলাতক অবস্থায় দেশব্রতেই বন্ধুহীন, আত্মীয়হীন, নিঃসঙ্গ অবস্থায় নিঃশেষিত হয়েছে।

অস্ত্র লুঠের পরবর্তী পর্যায়

একুশ হাজার দু'শো রাউণ্ড বুলেট ছাড়া বাকি বুলেট ও পঞ্চাশটি মাউজার পিস্তলই বিপ্লবীদের হাতে চলে গেছে। এই অস্ত্রগুলো অনেক বিপ্লবী সংগঠনের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করা হল। ঢাকার অনুশীলন সমিতির সদস্যরা অস্ত্র হাতে পেয়েই পুলিশ-কর্তা বসন্ত চ্যাটার্জীকে হত্যা করলেন।

অস্ত্র-শস্ত্র যে গুদাম ঘরে রাখা ছিল তার নিরাপত্তার খোঁজে গিয়েই হরিদাস দত্ত ধরা পড়লেন। ও'ব্রায়েন-হত্যা মামলায় হরিদাসের নাম পুলিশের খাতায় ইতিমধ্যেই উঠেছিল। তাই, বড়বাজারে বাঁশতলার গুদামঘরের কাছ থেকে দৌড়ে পালিয়ে যাবার সময় হরিদাসকে ধরে থানায় আনার পর চার্লস টেগার্ট ওঁকে বলেছিলেন, 'রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার'। টেগার্ট হন্যে হয়ে হাবু মিত্রের বন্ধু-বান্ধবকে ধরতে গিয়ে গ্রেপ্তার করলেন অনুকূল মুখোপাধ্যায়, কালিদাস বসু, গিরীন ব্যানার্জী, নরেন ব্যানার্জী, ভুজঙ্গ ধর, বৈদ্যনাথ বিশ্বাস, সতীশ দে, উপেন সেন, প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকা ও আশুতোষ রায়কে। শুরু হল রডা আর্মস কন্‌স্পিরেসি কেস। বিচারের শেষে হরিদাস দত্ত, কালিদাস বসু, ভুজঙ্গ ধর ও নরেন ব্যানার্জী ছাড়া অন্য সবাই মুক্তি পেলেন। হরিদাসবাবুরা দু'বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করলেন। হরিদাসের আরও দু'বছর বাড়তি সাজা হল এবং কয়েদকাল শেষ হলে 'তিন আইন'-এ 'স্টেট প্রিজনার' করে তাঁকে পাঠানো হল হাজারিবাগ সেন্ট্রাল জেলে। শ্রীশ পাল এবং খগেন দাসও পরে ধরা পড়েন। শ্রীশকে নানা জেলে আটক রেখে পরে হাজারিবাগ জেলে আনা হয়েছিল আর খগেন দাস 'ভারতরক্ষা আইনে' গ্রেপ্তার হয়ে কুমিল্লার নানা গ্রামে অন্তরীণ থেকেছেন।

সরকার পরবর্তীকালে বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পারে যে, অপহৃত পঞ্চাশটি মাউজার পিস্তলের মধ্যে চুয়াল্লিশটি পিস্তলই প্রাপ্তির সঙ্গে-সঙ্গে বাংলার ন'টি বিপ্লবী-সংস্থার উদ্দেশে বিলি হয়ে যায়। এই পিস্তলগুলো চুয়ান্নটি অ্যাকশনে অর্থাৎ ডাকাতি ও হত্যা সফল করার প্রয়াসে চোদ্দ সালের আগস্ট মাসের পর থেকে ব্যবহৃত হয়।

'গদর' পত্রিকা ও 'গদর' পার্টি

'গদর' শব্দটির অর্থ হল বিদ্রোহ। এই 'গদর' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওরেগন রাজ্যে এস্টোরিয়া শহরে বহু প্রবাসী ভারতীয়। প্রকাশের প্রথম তারিখটি ছিল তেরো সালের একুশে এপ্রিল। সদস্যদের অধিকাংশই ছিলেন পাঞ্জাবী।

এই পত্রিকাটিকে কেন্দ্র করে যে পার্টি গড়ে ওঠে, প্রথমদিকে তার নাম ছিল 'হিন্দি এ্যাসোসিয়েশন অফ দি প্যাসিফিক কোস্ট অফ আমেরিকা।' কিছুদিন পরে পত্রিকাটির নাম অনুসরণ করে এই সংস্থাটির নামকরণ করা হয়েছিল 'হিন্দুস্তান গদর পার্টি'। দলের সভাপতি নির্বাচিত হন সোহন সিং ভাখনা এবং সাধারণ সম্পাদক হন লালা হরদয়াল। এই হরদয়াল ছিলেন পাঞ্জাবের প্রখ্যাত বিপ্লবী। ইনি সরকারী-বৃত্তি ও লণ্ডনের পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে আমেরিকায় চলে গিয়েছিলেন পরে তিনি লণ্ডনে শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার বিপ্লব-প্রচারের সঙ্গী হয়েছিলেন এবং বার্লিন-প্যারিসে ভারতীয় বিপ্লবীদের আস্তানায় আনাগোনা শুরু করেছিলেন।

'গদর' পত্রিকাটি পাঞ্জাবী ও উর্দুভাষায় প্রকাশিত হত। মাঝে মাঝে হিন্দী, গুজরাটি, মারাঠী ও বাংলা ভাষাতেও এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে, এমন কি, ইংরেজিতেও। যেখানে এই কাগজটি ছাপা হত, আমেরিকায় সেই ছাপাখানার নাম ছিল যুগান্তর আশ্রম। কাগজের মূল বক্তব্য ছিল, সমস্ত প্রবাসী ভারতীয়রা বিদেশের মাটি ছেড়ে ভারতে অবিলম্বে ফিরে গিয়ে স্বাধীনতা-আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ুক। হরদয়ালের পর ওই পত্রিকাটির সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন রূপে-গুণে-পাণ্ডিত্যে রামচন্দ্র নামে এক তরুণ পেশোয়ার-বাসী। তিনি আমেরিকায় থেকে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত হিন্দু-শিখের বিদ্বেষের বলি হন।

দেশপ্রেমিক কবিতার সংকলন 'গদর-দি-গুঞ্জ' ও গদর দলের এক উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা।

কোমাগাটামারু

চোদ্দ সালের চৌঠা এপ্রিল। মালয় ও সিঙ্গাপুরের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী গুরজিৎ সিং কোমাগাটামারু নামে একটি জাপানী জাহাজ ভাড়া করে তিন শো বাহাত্তরজন শ্রমজীবী শিখকে নিয়ে হংকং থেকে কানাডার উদ্দেশে যাত্রা করলেন। জাহাজটি ইয়াকোহামা এবং অন্যান্য বন্দরে থামার সময় ভারতীয় বিপ্লবীরা যাত্রীদের মধ্যে 'গদর' পত্রিকা ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন।

মে মাসের শেষে কানাডার ভ্যাঙ্কুবারে জাহাজটি পৌঁছলে কানাডার কর্তৃপক্ষ জাহাজ থেকে কোনো যাত্রীকে নিচে নামতে দিলেন না। ব্রিটিশ সরকার যে তার ভারতীয় প্রজাদের উপর এই লাঞ্ছনার কোনো প্রতিবিধান করবে না, তা ওই জাহাজের যাত্রীরা ধারণাই করতে পারেন নি। ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও ক্লান্তিতে তাঁদের তখন বিধ্বস্ত অবস্থা। তাই এবার 'গদর' পত্রিকা ও বিদ্রোহাত্মক নানাবিধ প্যামফ্লেট-এর প্রত্যেকটি ঠাণ্ডা হরফ তাঁদের কাছে আগুনছোঁয়া বারুদের এক-একটি স্তূপের মতো ফেটে পড়বার উপক্রম হল।

হংকং বন্দরে জাহাজ ফিরে এলেও যাত্রীদের ওখানে নামতে দেওয়া হল না। এমনকি, গুরজিৎ সিংয়ের অনুরোধে ব্রিটিশ দূত কান দিলেন না। একটু খাবারও জাহাজে আনার অনুমতি পাওয়া গেল না। যখন যাত্রীরা প্রায় বিদ্রোহে ফেটে পড়তে চাইছেন তখন ভারত সরকারের নির্দেশে কিছু খাদ্যদ্রব্য দিয়ে জাহাজটিকে কলকাতা বন্দরের দিকে রওনা করা হল। যাত্রীরা দেশের অবস্থা বুঝে নিজেদের অসহায়তার পরিপ্রেক্ষিতে হংকং বা সিঙ্গাপুরে নেমে যেতে চাইছিলেন কিন্তু ভারতে আসার বাধ্যতামূলক নির্দেশে তখন তাঁদের মন ব্রিটিশ-বিদ্বেষী হয়ে উঠল।

ঊনত্রিশে সেপ্টেম্বর জাহাজটি বজবজের ঘাটে এসে পৌঁছতেই সরকার যাত্রীদের বিশেষ একটি ট্রেনে চাপিয়ে পাঞ্জাবে পাঠিয়ে দিতে প্রস্তুতি নিলেও গুরুজিৎ সিং ও তাঁর অনুগামীরা পায়ে হেঁটে কলকাতার উদ্দেশে রওনা হলেন। এই অবাধ্যতাকে সরকার কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারে না। অতএব কলকাতার পুলিশ কমিশনার স্যার ফ্রেডারিক এবং চব্বিশ পরগণার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডোনাল্ড-এর নেতৃত্বে বিশাল এক পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে তুমুল সংঘর্ষ বেধে গেল ওই শিখবাহিনীর।

এই সংঘর্ষে স্যার ফ্রেডারিক আহত হলেন, শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষ হাম্ফ্রির আঘাত গুরুতর, লোমেক্সকে বাঁচানো গেল না, কিছু পুলিশ ও সৈন্য জখম হল। যাত্রীদের মধ্যে নিহত হলেন আঠারো জন এবং অনেকেই অল্প-বিস্তর আহত হলেন। ষাটজন যাত্রীকে জোর করে ট্রেনে তুলে দেওয়া সম্ভব হয়। বাকি দু'শো বারোজন পালিয়ে যান। এঁদের মধ্যে গুরুজিৎ সিং ও তাঁর আঠারো জন অনুগামী ছাড়া বাকি সবাই পরবর্তীকালে ধরা পড়েন। একত্রিশ জনকে অন্তরীণ করা হয়।

কোমাগাটামারুর যাত্রীদের নিধন-যজ্ঞের আগুন ছড়িয়ে গেল দেশে-বিদেশে ভারতীয়দের মধ্যে। ক্ষেপে গেল পাঞ্জাব। জ্বলে উঠল বিপ্লবী বাংলা তথা ভারত।

ওই বছরের ঊনত্রিশে অক্টোবরে 'তোসামারু' নামে একটি জাপানী জাহাজ আমেরিকা, ম্যানিলা, চীন, সাংহাই ও হংকং থেকে বহু ভারতীয়কে বহন করে নিয়ে এল কলকাতায়। যাত্রীদের মধ্যে অধিকাংশই

ছিলেন শিখ। প্রায় একই সময় কলকাতার বন্দরে আসে 'এস্. এস্. সালামির' নামে আর একটি জাহাজ। এটিতেও বহু শিখ যাত্রী ছিলেন। আর ছিলেন বিশিষ্ট বিপ্লবী পিঙ্লে ও সত্যেন সেন। পিঙলে রাসবিহারী বসুর সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য উত্তরভারতে রওনা হন। সত্যেন সেন কলকাতায় থেকে যান। 'টোসামারুর' একশো সাতজন ভারতীয় যাত্রীর মধ্যে ইংরেজ সরকারের নির্দেশে একশো জনকেই অন্তরীণ করা হয়েছিল। তবু বিদেশে অবস্থিত বিপ্লবীরা নানাভাবে প্রভাবান্বিত করে বহু ভারতীয়কে নানা জাহাজে তুলে স্বদেশে পাঠাতে বিরত হলেন না।

স্বদেশে-প্রত্যাগত মরীয়া শিখদের ভয়ে পাঞ্জাবে ব্যাপক ধর-পাকড় শুরু হল। শুধুমাত্র সন্দেহবশে অল্প দিনের মধ্যে প্রায় দু'হাজার শিখ গ্রেপ্তার হলেন।

ইংরেজের এই ভীত-সন্ত্রস্ত মরীয়াভাবের সুযোগ নিতে বিপ্লবীরা এইবার আরও অসমসাহসিক কর্মোদোগ গ্রহণ করলেন। নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এলেন রাসবিহারী বসু ও যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী।

প্রথম লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার শহীদ

ইত্যবসরে আরও কয়েকটি ঘটনা ঘটল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে গদর পার্টি তার সদস্যদের নির্দেশ দেয় দেশে ফিরে গিয়ে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিতে। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে অনেকেই ভাবতে ফিরতে সচেষ্ট হন। এঁরা অধিকাংশই ছিলেন পাঞ্জাবী। কিন্তু এই ব্যাপারে ইংরেজ সরকারের কড়া নজর ছিল। তাই, জাহাজ থেকে নেমে ভারতের মাটিতে পা দিতেই গ্রেপ্তার হন 'গদর' পার্টির সভাপতি সোহন সিং ভাখনা, ভাই জওলা সিং, কেশব সিং, হরনাম সিং। কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও পুলিশ ধরতে পারল না কর্তার সিং সরাভা, কানসিরাম, বিষ্ণু গণেশ পিংলে, পৃথ্বী সিং, রহমত আলি, নিধন সিং চুঘা, হরনাম সিং তুণ্ডলটিকে। তাঁরা পালিয়ে গিয়ে গোপনে সংগ্রাম চালাতে থাকেন।

এঁরা অনতিকালের মধ্যে রাসবিহারী বসু পরিকল্পিত সিপাহী বিদ্রোহের ধাঁচে যে দেশব্যাপী সংঘর্ষের ছক তৈরী করা হয়েছিল তাতে সামিল হন। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ওই পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ায় অনেকে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর হাতে মারা যান। বাকি যাঁরা ছিলেন তাঁদের গ্রেপ্তার করে প্রথমে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা এবং সংশ্লিষ্ট আরও ক'টি মামলার আসামী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বিচারে একষট্টি জন আসামীর মধ্যে চব্বিশ জনের ফাঁসীর এবং সাতাশ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়। তীব্র প্রতিবাদের মুখে ও স্বয়ং বড়লাটের হস্তক্ষেপে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত সতেরো জনের দণ্ডাদেশ হ্রাস করে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়। অতএব ফাঁসীতে প্রাণ দিতে হল সাতজনকে। এঁরা হলেন, বিষ্ণু গণেশ পিংলে, কর্তার সিং সরাভা, জগৎ সিং বা মুর সিং, হরনাম সিং, বকশিশ সিং, গিলওয়ালি এবং মুরাইন সিং গিলওয়ানি। এঁদের মধ্যে বিষ্ণু, গণেশ, পিংলে মীরাট সামরিক ব্যারাকে ডিনামাইট সমেত ধরা পড়েন।

এই সাতজন ছাড়া আরও উনচল্লিশ জন গদর বিদ্রোহী শহীদত্ব বরণ করেন সংশ্লিষ্ট অন্য সব মামলায় এবং আন্দামান জেলে নৃশংস অত্যাচারের ফলে নিহত হন ভান সিং।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় গদর-পার্টির তৎপরতা

গদর পার্টির যে সব বিপ্লবীদের ইংরেজ সরকার গ্রেপ্তার করতে পারেনি, তাঁরা অনেকেই ভারতের বাইরে পালিয়ে গিয়ে বিপ্লবের কাজে জড়িয়ে থাকেন। বার্মা, মালয় ও সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশ-বিরোধী তৎপরতার কাজে সোহনলাল পাঠক নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন এবং সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে তাঁর হাত ছিল। মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে মান্দালয় জেলে তাঁর ফাঁসী হয়। ওই একই সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে বিশেষ করে সায়ামে ব্রিটিশ বিরোধী চক্রান্তের জন্য বুধ সিং-এর ফাঁসী হয়।

বিপ্লবী রামরক্ষা বার্মা, মালয় ও সিঙ্গাপুরে সেনাবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ সংগঠন করার ব্যাপারে সোহনলাল পাঠকের সংযোগী ছিলেন। পনেরো সালে মান্দালয়ে সাপ্লিমেন্টারি মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে দণ্ডিত হয়ে আন্দামানে প্রেরিত হন। সেখানে তাঁকে চূড়ান্ত অপমান করে তাঁর উপবীত কেড়ে নেবার চেষ্টা করলে তিনি বাধা দেন এবং মারামারিতে প্রচণ্ড আহত হন। তারপর প্রায় তিনমাস অনশনের পর আন্দামানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

পুনরায় বিপ্লবের প্রস্তুতি

শুধু অস্ত্র সংগ্রহ করলেই চলবে না, আন্দোলন পরিচালনা করতে গেলে টাকারও দরকার। তাই বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পরামর্শে মোটর-যোগে দু'টো বড় ডাকাতির পরিকল্পনা হল। প্রথমটি গার্ডেনরীচে, পরেরটি বেলেঘাটায়। এতে পাওয়া গেল মোট প্রায় আটত্রিশ হাজার টাকা।

এবার জার্মানী থেকে প্রার্থিত অস্ত্রবোঝাই জাহাজ কলকাতায় এলেই হয়।

আসছে অস্ত্র, আসছে অর্থ কয়েকদিনের মধ্যেই। এসে গেছে বিদেশ থেকে বহু প্রবাসী ভারতবাসী আসন্ন অভ্যুত্থানে যোগ দেবার জন্যে। ভারতের বুকে বিপ্লবী যুবসমাজ তো প্রথম থেকেই প্রস্তুত। অভ্যুত্থানের দিন ঠিক হয়েছে পনেরো সালের একুশে ফেব্রুয়ারী। খাকি প্যান্ট, খাকি হাফ শার্ট তৈরি হয়েছে প্রচুর। প্ল্যান হয়েছে হাতে অস্ত্র এলেই শার্ট-শর্ট-পরিহিত বিপ্লবী স্বেচ্ছাসৈনিকরা একই সঙ্গে থানাগুলোকে দখল করে নেবেন। তারপর দেশীয় সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হলে সারা দেশে ঘটবে সশস্ত্র অভ্যুত্থান।

নেতাদের কাছে খবর ছিল 'ম্যাভারিক' জাহাজে মাল আসছে এবং জাহাজটি রায়মঙ্গলে ভিড়বে। জার্মান কন্‌সাল জেনারেলের সঙ্গে ব্যবস্থা করেছেন নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ওরফে মার্টিন, পরবর্তীকালে যিনি সুপ্রসিদ্ধ মানবেন্দ্রনাথ রায় নামে পরিচিত। উনি তখন বাটাভিয়ায় বসে ওখানকার জার্মান কন্‌সাল হের থিয়োডোর হেলফেরিখ্-এর সঙ্গে কথা বলে ঠিক করেছেন, ওই জাহাজে বিপ্লবীদের জন্য আসবে ত্রিশ হাজার রাইফেল, প্রত্যেক রাইফেলের জন্য বরাদ্দ চার শো রাউণ্ড করে বুলেট এবং দু'লক্ষ টাকা। খবরটির নিশ্চয়তার জন্য যতীন্দ্রনাথ হরিকুমার চক্রবর্তীকে একটি ঠিকানা যোগাড়ের ভার দেন। শুধু সংবাদ নয়, ওই ঠিকানায় অর্থবাবদ ড্রাফ্‌টও আসবে। হ্যারি এ্যাণ্ড সন্স নামে হরিকুমার একটা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান খুলে বসলেন এবং ওর মাধ্যমে নরেন্দ্রনাথ সাংকেতিক ভাষায় খবরাখবর পাঠিয়ে যেতে থাকলেন এবং জার্মান-সরকার থেকে প্রাপ্ত অর্থও বারে বারে ড্রাফ্‌ট করে পাঠাতে থাকলেন।

কিন্তু এই অবৈধ আর্থিক লেনদেনের খবর পুলিশের কাছে গোপন থাকে না। সন্দেহবশত তারা বাটাভিয়া থেকে পাঠানো তেতাল্লিশ হাজার টাকার মধ্যে দশ হাজার টাকার হদিশ পেয়ে যায়। নরেন্দ্রনাথ জুন মাসের মাঝামাঝি কলকাতায় ফিরে এলে যতীন্দ্রনাথ সবকিছু জেনে যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সঙ্গে একমত হয়ে স্থির করলেন, পূর্ববাংলায় হাতিয়া, পশ্চিম বাংলায় কলকাতা ও ওড়িশার বালেশ্বরে জার্মান-অস্ত্রশস্ত্রগুলো বিপ্লবীদলের মধ্যে বিতরণ করা হবে। আরও স্থির হয়েছিল, প্রধান-প্রধান পুলগুলো উড়িয়ে দিয়ে বাংলা-অভিমুখী তিনটি রেল-লাইনই অকেজো করে দেওয়া হবে।

যতীন্দ্রনাথ স্বয়ং ভার নিলেন বালেশ্বর থেকে মাদ্রাজের সঙ্গে যুক্ত লাইনটিকে অকেজো করার, ভোলানাথ চ্যাটার্জীকে পাঠানো হল চক্রধরপুরে বেঙ্গল-নাগপুর লাইন সামলাবার দায়িত্ব দিয়ে এবং সতীশ চক্রবর্তী গেলেন অজয়ের উপর ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলের পুল উড়িয়ে দেবার আদেশ নিয়ে। পূর্ববাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণের পর জেলাগুলো দখল করার প্রস্তুতির জন্য হাতিয়ায় চলে গেলেন নরেন ঘোষ চৌধুরী, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ভার নিলেন ফোর্ট উইলিয়াম চড়াও হয়ে কলকাতা দখল করার। যাদুগোপাল ভার নিলেন রায়মঙ্গলে জার্মান-অস্ত্র জাহাজ থেকে খালাস করে যথানির্দিষ্ট ঘাঁটিগুলোতে সে-সব সরবরাহ করার। কিন্তু এতবড় একটা পরিকল্পনা ভেস্তে দিল কৃপাল সিং নামে একটি সৈনিক। সে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে সব কিছু ফাঁস করে দিল।

এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য অবশ্য কৃপাল সিংকে পঁচিশ বছর পরেও বিপ্লবীদের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছিল কিন্তু সেদিন সব কিছু ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। আসন্ন দুর্যোগের খবর পেয়ে পাঞ্জাবে সৈন্যদের ব্যাপক স্থানান্তরিত করা শুরু হল, ধর-পাকড় শুরু হল। প্রমাদ গুনলেন রাসবিহারী। তিনি লাহোর ছেড়ে বিনায়ক কাপ্‌লেকে সঙ্গে নিয়ে কাশী হয়ে কলকাতায় চলে এলেন। আগেই তিনি বাংলায় পাঠিয়ে

বাঘা যতীন

দিয়েছিলেন শচীন সান্যাল ও কৈলাসপতিকে। নানা ছদ্মবেশে তিনি গোটা দেশ জুড়ে ঘুরে বেড়ালেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ ও বিশাল পুলিশ বাহিনী ধরতে পারল না এই বহু-ভাষাবিদ্, বিপ্লবী-যাদুকর রাসবিহারীকে। অবশেষে তিনি 'শানুকিমারু' নামক জাপানী জাহাজে উঠে ওই পনেরো সালের বারোই মে তারিখে ঠাকুর পরিবারের পি.এন. ঠাকুর ছদ্মপরিচয় নিয়ে জাপানে পালিয়ে গেলেন।

স্বাধীন ভারত সরকার

রাসবিহারী ঘোষ ও যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ভারতে যেমন সশস্ত্র অভ্যুত্থান পরিকল্পনা করেছিলেন তেমনি রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ, সূফী অম্বাপ্রসাদ, অজিৎ সিং প্রমুখ বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ কাবুলে একটি অস্থায়ী 'স্বাধীন ভারত সরকার' স্থাপন করেছিলেন। তাঁদের পরিকল্পনা ছিল ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবের সংবাদ পেলেই ওঁরাই উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পথে ব্রিটিশকে আক্রমণ করবেন।

কিন্তু ভারতের প্রস্তাবিত বিপ্লবের ব্যর্থতার সংবাদ পেয়ে ওখানকার আমীর প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করার সিদ্ধান্ত নিলেন। গোপনে সংবাদ পেয়েই রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ ও অজিৎ সিং পালিয়ে গেলেন কিন্তু সুফী অম্বাপ্রসাদ ধরা পড়লেন এবং কাবুলের কারাগারেই তাঁর মৃত্যু হল। এরপর কয়েকজন সৈন্যের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে কর্তার সিং ও হরনাম সিং গ্রেপ্তার হন এবং সৈন্য শিবিরে প্রবেশ করে বিপ্লবের বীজ ছড়ানোর সময় এক বাক্স মারাত্মক বোমাসহ মারাঠী বীর বিষ্ণু গণেশ পিঙ্গলে বন্দী হলেন। স্বাধীন ভারত সরকার প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন তখনকার মতো ব্যর্থ হয়ে গেল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কালের দুই বীরাঙ্গনা

খ্যাতনামা বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মেজ পিসীমা যুগান্তর বিপ্লবী দলে 'মেজ পিসীমা' নামেই পরিচিতা ছিলেন। অমরেন্দ্র নাথ, যাদুগোপাল, অতুল ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবীদের গোপন আস্তানার তিনিই ছিলেন কর্ত্রী। ননীবালা দেবী নাম্নী ওই মহিলা ওইখানে থেকেই অনেক দুঃসাহসিক কাজে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছিলেন।

যখন তিনি ওই আস্তানায় ছিলেন তখন ব্রাহ্মণের ঘরের নিষ্ঠাবতী বিধবা হয়ে মাউজার পিস্তলের হদিশ জানার জন্য এক বন্দীর স্ত্রী বলে আত্মপরিচয় দিয়ে জেলে সেই বন্দীর সঙ্গে দেখা করেন এবং খবর জেনে আসেন। ফলে মাউজার পিস্তলগুলো বিপ্লবীদের হাতে আসে। কিছুদিন বাদে পুলিশ এই ব্যাপার জানতে পেরে তাঁকে গ্রেপ্তার করে কিন্তু বহু নির্যাতন চালিয়েও পুলিশ তাঁব মুখ থেকে কোনো গোপন কথা জানতে পারেনি। ননীবালা দেবী ভারতবর্ষের প্রথম ও একমাত্র আঠারো শো আঠারো সালের তিন নম্বর রেগুলেশনে বিনা বিচারে আটক বন্দিনী।

দু'কড়িবালা দেবী অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ এবং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর শিষ্য বিপ্লবী নিবারণ ঘটকের মাসীমা। নিবারণ ঘটকের বাড়ি ছিল রানীগঞ্জের কাছে সিয়াকোশালে। দু'কড়িবালা দেবী রডা কোম্পানীর মাউজার পিস্তল ও কার্তুজের ট্রাঙ্ক বাড়িতে রাখার অপরাধে আড়াই বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। বিপ্লবী কাজকমের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিতা নারীদের মধ্যে তিনিই প্রথম ওই গৌরবের অধিকারিণী।

বালেশ্বর যুদ্ধ

কুমুদনাথ মুখার্জি ওকালতি করতেন ব্যাঙ্ককে। তিনি জানতে পারলেন অস্ত্রবোঝাই 'ম্যাভারিক' জাহাজটি ধরা পড়ে গেছে।

তৎক্ষণাৎ তিনি সংবাদটি পৌঁছে দিলেন যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়কে। নরেন ভট্টাচার্য নিজে চলে গেলেন বাটাভিয়ায় কন্‌সালের সঙ্গে যথাকর্তব্য স্থির করতে। যতীন্দ্রনাথ আরও কিছু বিশদ সন্ধান নেবার জন্য ভূপতি মজুমদারকে পাঠালেন।

কিন্তু সিঙ্গাপুরে জাহাজ পৌঁছলে জাহাজেই ওঁকে গ্রেপ্তার করা হয় কারণ ষড়যন্ত্র সম্পর্কে গোপন সংবাদ ব্রিটিশ সরকার আগেই জেনেছিল।

পুলিশ যখন খবর পেল, 'হ্যারি এ্যাণ্ড সন্স' মোটেই ব্যবসা সংক্রান্ত অফিস নয়, ওটা বিপ্লবীদের পোষ্ট বক্স, বিদেশের বিপ্লবীদের সঙ্গে দেশের বিপ্লবীদের যোগাযোগ রক্ষার কেন্দ্রমাত্র, তখন তারা

হরিকুমার চক্রবর্তী ও তাঁর ভাইকে গ্রেপ্তার করল। 'হ্যারি এ্যাণ্ড সন্স'র শাখা অফিস বালেশ্বরের 'ইউনিভারস্যাল এম্পোরিয়মে' হানা দিল। ওখান থেকে বিশ মাইল দূরে 'কপ্তিপদা' গ্রামে তল্লাশি চালাতে গিয়ে 'ম্যাভারিক' সম্পর্কে সংবাদ পেল এবং ওই আস্তানাটি পুলিশ ঘিরে ফেলল। এদিকে বিপ্লবীরাও আগেই পুলিশী হানার আঁচ পেয়েছিলেন। যতীন্দ্রনাথ ও তাঁর সতীর্থগণ ওখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

বিপ্লবের অধিকতর সাফল্যের জন্য যতীন্দ্রনাথ আত্মগোপন করে থাকতে পারতেন। কিন্তু তিনি যখন দেখলেন, বিপ্লব আপাতত ব্যর্থ হয়েছে, বিরাট ষড়যন্ত্র সকলের অজ্ঞাতে সংগঠিত হয়ে সহসা ব্যর্থ হয়ে গেল, জাতির সামনে তুলে ধরার মতো আদর্শ ও প্রত্যয় কিছু না রেখে গেলে এই ব্যর্থতা দেশকে বহুদূর পিছিয়ে দেবে এবং বিপ্লবীদের মনে অবসন্নতা আসবে, তখন তিনি ভাবলেন কিছু লোকের নীচতা ও দুর্বল রুচির ফলে এই বিশ্বাসঘাতকতা বিপ্লবকে যখন ব্যর্থ করে দিতে চলেছে তখন জাতির এই কলঙ্ক অতিক্রম করে এক বলিষ্ঠ কীর্তিস্থাপন করা চাই, জাতির সকল নিরাশা দূর করা চাই।

যতীন্দ্রনাথ সহযোদ্ধা চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, নীরেন দাশগুপ্ত, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ও জ্যোতিষ পালকে নিয়ে বুড়িবালামের তীরে গোবিন্দপুর গ্রামে এসেছিলেন। চিত্তপ্রিয় ইতিপূর্বে কলকাতায় পুলিশ ইনস্পেক্টর সুরেশচন্দ্র মুখার্জিকে হত্যা করে এসেছেন। ভাদ্র মাসের ভরা নদী পার হয়ে বনের দিকে পথ চলতেই গ্রামের লোকেরা সন্দেহ করল। কারণ, ইতিমধ্যেই আশে-পাশের সব শহরে ও গ্রামে পুলিশ ঢোল-সহযোগে জানিয়ে দিয়েছে, কয়েকজন জার্মান ও দেশী ডাকাত গৃহস্থদের ঘরে ডাকাতি বা রাহাজানি করার মতলবে গোপনে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

অতএব, গ্রামের লোকেরা ভাবল, এঁরাই বোধ হয় সেই ডাকাতদল। ওঁরা বিপ্লবীদের নানা প্রশ্ন করে বিরক্ত করে তুলল। ক্রমশ ভিড় বেড়ে যাচ্ছিল। পুলিশও ঘটনাস্থলে এসে গেল। প্রমাদ গণে বিপ্লবীরা খুব জোরে হাঁটতে থাকলেন। পুলিশের প্ররোচনায় জনসাধারণ ওঁদের পিছনে ধাওযা করতেই ওঁরা বাধ্য হয়ে গুলি ছুঁড়লেন। জনতা আপাতত পালিয়ে গেল।

চাষখন্দের কাছে বিপ্লবীরা নদী সাঁতরে পার হয়ে একটা বড় উইয়ের ঢিবির পাশে এসে বসলেন। ক্ষুধা-তৃষ্ণায়, উত্তেজনায় এবং পথ চলার শ্রান্তিতে কাতর। কিন্তু বিপ্লবীদের জীবনে বিশ্রামের কোনো অবকাশ নেই। ইতিমধ্যে টেগার্ট প্রমুখ পুলিশ কর্তাদেব নেতৃত্বে জনতাসহ বিশাল এক পুলিশ বাহিনী ওঁদের দু'দিক থেকে ঘিরে ফেলেছিল।

তারপর শুরু হল সংঘর্ষ। পনেরো সালের নয়ই সেপ্টেম্বর। পাঁচজন বিপ্লবী বীর ঘন্টার পর ঘন্টা অসম যুদ্ধ করে গেলেন অমিতবীর্যে। বুড়িবালামের তীরে সংঘটিত ওই যুদ্ধে চিত্তপ্রিয় প্রাণ দিলেন। মারাত্মক জখম হলেন যতীন্দ্রনাথ।

নিরুপায় হয়ে বিপ্লবীরা শ্বেত পতাকা দেখালে ওঁদের যুদ্ধবন্দী করা হল। পরদিন ভোর পাঁচটায় যতীন্দ্রনাথ দেহরক্ষা করলেন বালেশ্বর হাসপাতালে।

অতঃপর শুরু হল বিচারের পালা। ব্রিটিশ সরকার মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ও নীরেন দাশগুপ্তের ফাঁসীর হুকুম দিল এবং জ্যোতিষ পালকে আন্দামান জেলে নির্বাসন দিল চোদ্দ বছরের জন্য।

বালেশ্বর জেলে বাইশে নভেম্বরে মনোরঞ্জন ও নীরেন ফাঁসীর দড়িতে আত্মবিসর্জন দিলেন এবং জ্যোতিষ কিছুদিন আন্দামানবাসের পর অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে ওখান থেকে বহরমপুর জেলে স্থানান্তরিত করা হয় এবং দুঃখে কষ্টে, বিনা-চিকিৎসায়, নির্জন সেলে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন চব্বিশ সালের চৌঠা ডিসেম্বরে।

বার্লিন কমিটি (১৯১৫-১৯১৮) ও 'অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার'

ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে কৃষ্ণবর্মা, মাদাম কামা প্রমুখের সংস্পর্শে এসে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধার সঙ্গে সঙ্গেই প্রধানত তাঁরই উদ্যোগে জার্মানীতে সমবেত

ভাবতীয বিপ্লবীদেব বিপ্লবী সংগঠন, 'ইণ্ডিযান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স কমিটি (সংক্ষেপে বার্লিন কমিটি)' গডে ওঠে। তিনিই হন ওই সংস্থাব প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। মহেন্দ্রপ্রতাপ, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ডঃ চম্পকবমণ পিল্লাই, ডঃ অবিনাশ ভট্টাচার্য, মওলানা ববকতুল্লাহ, দাদাচানজি ফেবসাম্প, প্রমথনাথ দত্ত, জিতেন্দ্রনাথ লাহিডী বীবেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রমুখ বিশিষ্ট বিপ্লবী 'বার্লিন কমিটি'তে যোগ দেন। ওই সমযে সাবা পৃথিবী ব্যাপী যে ব্রিটিশ বিবোধী তৎপবতা দেখা দিযেছিল তাব অন্যতম প্রধান সংগঠক ছিলেন বীবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায।

বার্লিন কমিটি একদিকে গদব পার্টি'ব সঙ্গে সংযোগ স্থাপন কবে, অন্যদিবে মধ্যপ্রাচ্য কনস্টান্টিনোপল বাগদাদ, ইবান এবং আফগানিস্তানে সদস্যদেব পাঠিযে বিপ্লব সংগঠনেব চেষ্টা কবে।

বীবেন্দ্রনাথ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবাব এক বছব আগে স্টকহলমে যান এবং যুদ্ধ শেষ হবাব দু'তিন বছবেব মধ্যে বিপ্লবোত্তব বাশিযাব বাজধানী মস্কোয দু বছবেব জন্য যান। এবপব জার্মানীতে ফিবে তিনি জার্মান কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন এবং আবও পবে, উনিশ শো সাতাশ খৃস্টাব্দে 'লীগ এগেন্স্ট ইম্পিবিলিযাজম' নামক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানটিব অন্যতম সাধাবণ সম্পাদকরূপে নির্বাচিত হন। পাঁচ বছব পবে জার্মানীতে নাৎসী প্রভাব বেডে ওঠায তিনি আবাব সোভিযেত দেশে গেলে সেখানে তাঁব মৃত্যু হয এগাবো বছব পবে।

মানবেন্দ্রনাথ রায় (১৮৮৭-১৯৫৩)

যুগান্তব দলেব বিশিষ্ট সদস্য ইনি জার্মান অস্ত্র ও অর্থেব সন্ধানে গোপনে বিদেশে পাডি দেন পনেবো সালে মাত্র আটাশ বছব বযসে। জাপান হযে আমেবিকা পৌঁছে তিনি প্রকৃত নাম নবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য পবিবর্তন কবে মানবেন্দ্রনাথ বায নামে পবিচিত হন। পববর্তীকালে এই নামটিই বিশ্ববাসীব কাছে তাকে পবিচিত কবে।

মানবেন্দ্রনাথ বায

আমেবিকা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবাব মাত্র এক বছব আগে মিত্রশক্তিব পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিলে তিনিও গদব দলেব অন্যান্য বিপ্লবীদেব সঙ্গে গ্রেপ্তাব হন কিন্তু জামিন পেযে তিনি তাব আমেবিকান স্ত্রী, এভেলিন ট্রেন্টেব সঙ্গে মেক্সিকোয পালিযে যান।

ওখানে মানবেন্দ্রনাথ বিখ্যাত রুশ বিপ্লবী বোবোডিনেব সংস্পর্শে এসে কমিউনিস্ট হন। তিনি সেখানে প্রথমে সোশ্যালিস্ট পার্টি ও পবে কমিউনিষ্ট পার্টিব অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

উনিশ শো কুডি খৃস্টাব্দেব এপ্রিল মাসে মানবেন্দ্রনাথ মস্কোয যান এবং লেনিনেব পবামর্শে 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকেব (কমিণ্টার্ন) দ্বিতীয কংগ্রেসে পবাধীন দেশে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদেব কর্মকৌশল বিষযে লেনিনেব বক্তব্যেব পবিপূবক একটি বক্তব্য পেশ কবেন। তাঁদেব দু'জনেব প্রস্তাবই কংগ্রেসে গৃহীত হয। পবে তিনি কমিণ্টার্নেব কার্যনির্বাহক সমিতিব সদস্য নির্বাচিত হন।

পরবর্তীকালে মানবেন্দ্রনাথ ভারতে ফিরে আসেন। এদেশের প্রখ্যাত জাতীয়তাবাদী নেতাদের আপোষমুখী মনোভঙ্গির তিনি তীব্র সমালোচক ছিলেন। স্কুল কলেজে পড়াশোনা না করলেও মননশীলতায় এই বহুভাষাবিদ অনন্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন।

রুশ বিপ্লব ও ভারতীয় মনীষীবৃন্দের অভিমত

রুশ বিপ্লব সারা দুনিয়ার সঙ্গে ভারতের জনজীবনেও বিপুল প্রভাবসৃষ্টি করেছিল। বস্তুতপক্ষে শোষিত ও নির্যাতিত মানুষ এই বিপ্লবের মধ্যে নতুন আশার আলো দেখতে পেয়েছিলেন। লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ায় সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পর ভারতীয় মনীষীবৃন্দ এই বিপ্লবকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

সতেরো সালে জারের পতন হলে 'নব্য রাশিয়া' পত্রিকায় সুব্রহ্মণ্য ভারতী যা লিখেছিলেন তার বাংলা অনুবাদ নিচে উদ্ধৃত হল :

'মহা বীর্যবতী দেবী পরাশক্তি
প্রসন্ন দৃষ্টি ফেরালেন রাশিযার দিকে
আর চেয়ে দেখো বিপ্লব এনেছে নবযুগ।
স্বেচ্ছাচারীর পতন ঘটেছে চিৎকারে চিৎকারে
দেবতাদের রোদে-রাঙা কাঁধ স্ফীত আজ আনন্দে ও গর্বে
আর নারকীরা চোখের জল ফেলতে ফেলতে অন্ধ ও নিষ্প্রাণ।
দুনিয়ার মানুষ,
চেয়ে দেখো, এই অভিনব আশ্চর্য।...
....হঠাৎ সব কিছু বদলে গেল
বিধান রচিত আজ মানুষের কল্যাণে, তাদেরি ইচ্ছায়।
সমস্ত দুনিয়াকে জাগানোর জন্য তাদের ঘোষণা
—তাদের রাজ সর্বমানবের রাজ।
—দাসত্ববন্ধন আর নেই, দাসও নেই।
—বিধ্বস্ত প্রাচীরের মতো চুরমার আজ কলিযুগ
আর ঊষালগ্ন স্বর্ণযুগের।'

পরের বছর জুলাই মাসে 'এ্যাট দ্য ক্রসরোড্‌স' শিরোনামে বিপ্লবী রাশিয়াকে বিজয়-অভিনন্দন জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'রাশিয়ার বর্তমান বিপ্লবের ইতিহাস আমরা খুব কমই জানি। যে সামান্য খবর পেয়েছি তা'তে জোর করে বলতে পারি নে যে তার বিপর্যয়ের মধ্য দিয়েই সে নৈতিক শূন্যতার ভিতের উপরে প্রতিষ্ঠিত সম্পদের বিরুদ্ধে মানুষের অদম্য আত্মাকেই প্রতিফলিত করেছে কিনা। এটুকুই শুধু বলতে পারি রায় দেবার সময় এখনও আসেনি, বিশেষ করে যখন চালু রাজনীতিই আজ বিপাকে পড়েছে। এতে সন্দেহ নেই যে আধুনিক রাশিয়া যদি জাতি-পূজার মামুলী ঐতিহ্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার চেষ্টা করত তাহলে আজ তার অবস্থা হয়তো কিছুটা স্বচ্ছন্দ হতে পারত কিন্তু তার সংগ্রামের এই প্রচণ্ডতা, তার সংকটের জটিলতা থেকে স্বতঃই প্রমাণিত হয় না যে সে বিপথে গেছে। এটা অসম্ভব নয় যে জাতি হিসেবে সে ব্যর্থ হবে, তবু তার ধ্রুব আদর্শের পতাকা মুঠোয় নিয়ে যদি সে ব্যর্থও হয় তা হলেও তার সেই ব্যর্থতাও শুকতারার মতো বিলীন হয়ে যাবে এক নবযুগের সূর্যোদয়ের আগমনীতে।'

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের এই অভিমত তাঁর রাশিয়া ভ্রমণ করে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করার বহু পূর্বেই আমরা পেয়েছি।

রুশবিপ্লবের প্রায় দশ বছর পরে 'ঈশ্বরের উদ্দেশে লেনিন' কবিতায় শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে রাশিয়ায় সমাজ-জীবনে যে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন মহম্মদ ইকবাল :

যে সব জাতি
ঈশ্বরের কাছ থেকে রীতিমত বখশিস পায় না,
বিদ্যুৎ আর বাষ্পের শক্তিই
তাদের উন্নতির মাথায় পৌঁছে দেয়।
যন্ত্র যদি মাথায় চড়ে বসে,
তাহলেই বুঝতে হবে
মানুষের হৃদয় আর মন, খতম।
যান্ত্রিক হাতিয়ার তখন হয়ে ওঠে
বেরাদরির দুশমন।
লক্ষ্মণ দেখে,
অবশেষে,
এখন ঠাওর হচ্ছে
যুক্তির সঙ্গে পাঞ্জার লড়াইয়ে
নিয়তি ক্রমাগত হারছে।
তাঁদের রাজত্বের কাঠামো টলমলিয়ে উঠছে
—প্রবীন জ্ঞানবৃদ্ধেরা এখন
এই দুশ্চিন্তাই করছেন।
গোধূলির মুখের রক্তিমা?
ওটা আসল নয়,
ঝুটো।
হয়, ওটা চোখ-ভোলানো প্রসাধনের
প্রলেপ,
না হয়
খোয়ারি ভাঙার আগে,
নেশার চোখের খোয়াব।
অর্থাৎ
গেলাস আর বোতলের কেরামতি।
হে ঈশ্বর !
মানি,
তুমি সর্বশক্তিমান
তোমার বিচারই নির্ভুল।
কিন্তু!
তোমারই দুনিয়ায়,
খেটে যারা খায়,
তাদের জীবন যে সবচেয়ে বিপন্ন,
সবচেয়ে দুঃখের!
ঈশ্বর
ধনতন্ত্রের এই জাহাজটা,
কবে ডুববে গো?

তামাম দুনিয়া যে
সেদিনের পথ চেয়ে আছে।
ঈশ্বর!
ধনতন্ত্রের এই জাহাজটা
ডুববে কবে?
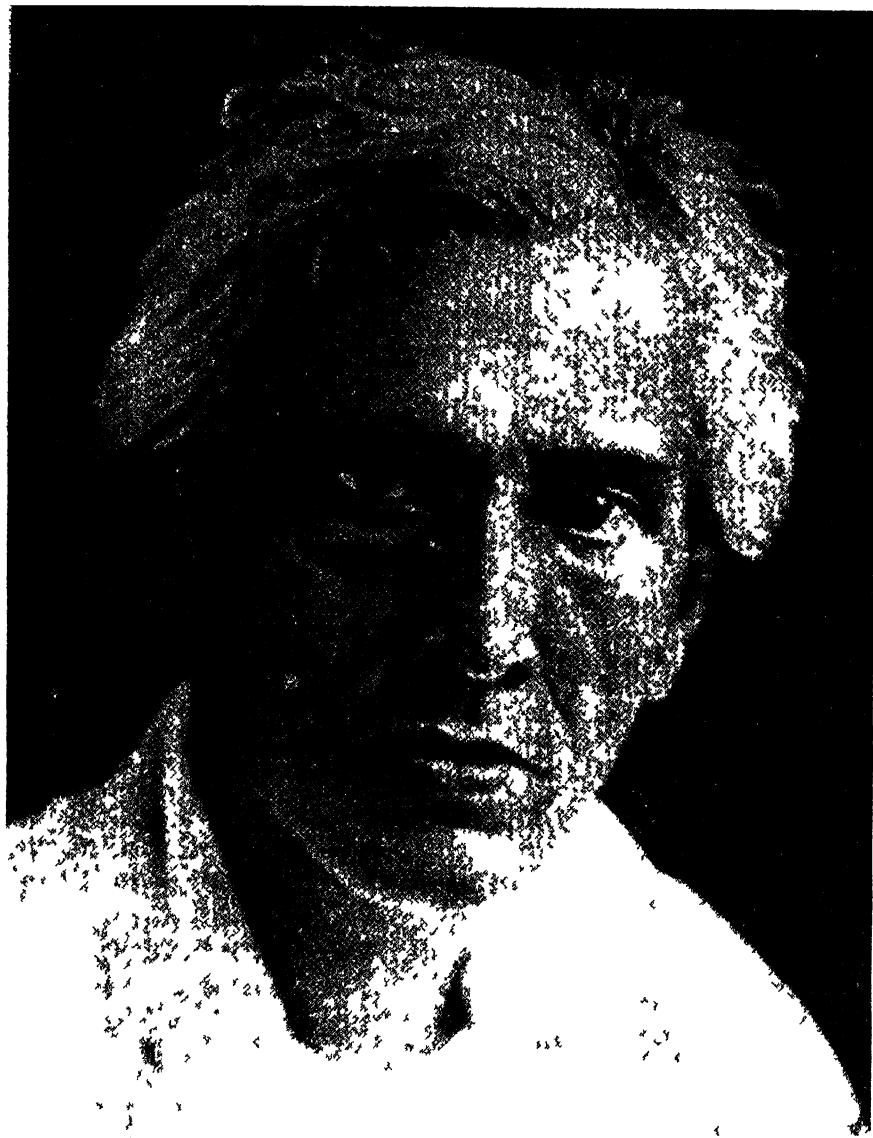
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চব্বিশ সালে লেখা 'সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি' নিবন্ধে শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন, 'একটা নালিশ এই করা যেতে পারে যে, পূর্বের মতো রাজারাজড়া, জমিদারের দুঃখদৈন্যদ্বন্দ্বহীন জীবনেতিহাস নিয়ে আধুনিক সাহিত্য দেবীর মন আর ভরে না। তারা নীচের স্তরে নেমে গেছে। এটা আপশোষের কথা নয়। বরঞ্চ এই অভিশপ্ত, অশেষ দুঃখের দেশে, নিজের অভিমান বিসর্জন দিয়ে রুশ সাহিত্যের মতো যে দিন সে আরো সমাজের নীচের স্তরে নেমে গিয়ে তাদের সুখ, দুঃখ, বেদনার মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে, সে দিন এই সাহিত্য-সাধনা কেবল স্বদেশে নয়, বিশ্বসাহিত্যেও আপনার স্থান করে নিতে পারবে।'

'লেনিনের সমাধিক্ষেত্র' থেকে উদ্ধৃত নিচের কবিতাটি পড়লে জানা যাবে নারায়ণ মেনন ভাল্লাবোল জার-সাম্রাজ্যের পতনে কতটা উল্লসিত হয়েছিলেন—

'ভাবীকালের গভীরে নিবদ্ধ তাঁর দুই চোখ
আজ মুদিত
যেন পৃথিবীর কল্যাণ চিন্তায়।
তিনি গভীর চিন্তিত।
দেখ! দেহের দুপাশে অচঞ্চল
তাঁর দুটি হাত
সেই হাত যা দিয়ে নির্ভীকভাবে তিনি
দেশকে তুলেছিলেন
জারের স্বৈরাচারী শাসনে জর্জর
যন্ত্রণার নরককুণ্ড থেকে
তোমার পঁচিশ কোটি সন্তানের মধ্যে
আর যন্ত্রণা নেই, আলস্য নেই, নেই অশিক্ষা
নরনারী সবাই জীবন্ত স্থির লক্ষ্যের
একাগ্রতায়।
রাশিয়া! তোমার সাফল্য আজ
সত্যই চূড়ান্ত বিজয়।'

প্রেমচন্দ্র

'মহাজনী সভ্যতা' নিবন্ধে মুন্সী প্রেমচন্দ লিখেছেন ঃ

'ধন্য সেই সভ্যতা, যা এই পুঁজিপতি এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি খতম করছে। অচিরেই সমস্ত দুনিয়া তার পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। সেই সভ্যতা অমুক দেশের সংগঠন অথবা ধর্মের সঙ্গে খাপ খায় না কিংবা তার পরিবেশের অনুকূল নয় এ তর্ক নিশ্চয় অসঙ্গত।

'খৃস্টধর্মের বীজ জেরুজালেমে অঙ্কুরিত হয়েছিল কিন্তু আজ সমস্ত বিশ্বে ছড়িয়ে আছে তার সৌরভ। বৌদ্ধধর্ম উত্তরভারতে জন্ম নেয়। কিন্তু অর্ধেক পৃথিবী তাকে গুরুদক্ষিণা দিয়েছে। মানব সমাজ সমগ্র বিশ্বে একই। ছোটখাটো কথায় তফাৎ থাকতে পারে কিন্তু মূল বিষয় বিচারে আন্তর্জাতিক ভেদ নেই, পুঁজিবাদী সভ্যতা আর তার ভাড়া করা গুণ্ডার দল সম্পূর্ণ শক্তি দিয়ে বিরোধিতা করবে, তার বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করবে, কিন্তু সত্যের গতি রুখবে কে? তার জয় অবশ্যম্ভাবী।'

পঁচিশ সালে 'কুলিমজুর' কবিতায় রুশ বিপ্লবের পর রাশিয়ায় নতুন রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় উদ্দীপিত উজ্জীবিত কাজী নজরুল ইসলাম অভিনন্দন জানিয়েছেন—

'...আসিতেছে শুভদিন
দিনে দিনে বহু বাড়িতেছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ।
হাতুড়ী শাবল গাঁইতি চালিয়ে ভাঙ্গিল যারা পাহাড়,

পাহাড় কাটা পথের দু'পাশে পড়িয়া যাদের হাড়,
তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি,
তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি,
তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদেরি গান—
তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব অভ্যুত্থান।'

নজরুল

রাওলাট আইনের প্রেক্ষাপট

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক বাতাবরণ ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল। সমান্তরালভাবে ইংরেজ সরকারও তার দমন-নীতি প্রয়োগে অধিকতর নৃশংস হয়ে উঠল।

হোমরুল আন্দোলনের নরমপন্থী নেতা এ্যানি বেশান্ট, ওয়াডিয়া এবং এরাণ্ডেলকে গ্রেপ্তার করে অন্তরীণ করা হল। দীর্ঘদিন ধরে বন্দী শালায় আটকে রাখা হল 'আল হিলাল' পত্রিকার সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, 'কমরেড' পত্রিকার সম্পাদক মহম্মদ আলি ও তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শওকত আলি এবং

বিখ্যাত উর্দু কবি ও বক্তা হজরৎ মোহানিকে। এ ছাড়া বাংলার প্রায় তিনহাজার মানুষকে বিভিন্ন কারাগারে রাজবন্দী করে রাখা হয়েছিল।

বন্দী অবস্থায় পুলিশী নির্যাতনে কারাগারের মধ্যে শহীদ হন ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, বরহাত প্রতাপ সিং, নগেন্দ্রনাথ দত্ত ওরফে গিরিজাবাবু।

একদিকে দেশের অভ্যন্তরে তখন অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি। অন্যদিকে, এই পরিস্থিতির সঙ্গে বেশ কয়েক বছর ধরে যুক্ত হয়েছিল বিদেশে ভারতীয় বিপ্লবীদের তৎপরতা । এই দু'টি বিষয়ে তদন্তের এবং ওই ধরনের তৎপরতা দমনের ব্যবস্থার জন্য বিচারপতি রাওলাটের নেতৃত্বে যে কমিশন গঠিত হয় তার রিপোর্ট প্রকাশিত হয় আঠারো সালের অক্টোবব মাসে। ওই রিপোর্টে বিপ্লবী আন্দোলন দমনের জন্য বেশ কিছু জবরদস্ত ব্যবস্থার সুপারিশ ছিল। যুদ্ধকালীন 'ডিফেন্স অফ্ রেল্‌ম্ এ্যাক্ট'; 'ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট' প্রভৃতির জায়গায় আরো সংহত নির্ভুলভাবে রাওলাটের সুপারিশগুলো প্রয়োগ করার জন্য যুদ্ধের পর এরই ভিত্তিতে ভারতীয় জনমত স্বভাবতই বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসনসংস্কারের ঘোষণাজনিত হতাশা ও রাওলাটের দমন-নীতি বিক্ষুব্ধ ভারতবাসীকে ঠেলে দিল সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পথে।

এর আগে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে দেশে ফিরে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী চম্পারণ, খেড়া ও আহমেদাবাদে কৃষক ও শ্রমিক সমস্যা নিয়ে কিছুটা সত্যাগ্রহ আন্দোলন করেছিলেন। কিন্তু উনিশ সালের এপ্রিল মাসে তাঁর প্রথম আবির্ভাব ঘটল সর্বভারতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে। ছয়ই এপ্রিল তাঁর ডাকে দিল্লী ও বোম্বাইয়ের রাজপথে যে মিছিল বেরোল তার উপরে পুলিশ নির্মমভাবে গুলি চালাল। প্রাণ দিলেন বেশ কিছু হিন্দু ও মুসলমান। এর প্রতিবাদে অভূতপূর্ব হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য দেখা গেল।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড

এই নৃশংস দমন-পীড়নেব প্রতিবাদে পাঞ্জাবে দেখা দিল গণবিক্ষোভ আর তাকে দমনের জন্য উনিশ সালের তেরই এপ্রিল ঘটল জালিয়ানওয়ালাবাগের রক্তাক্ত বিভীষিকা। অমৃতসরে প্রাচীর ঘেরা জালিয়ানওয়ালাবাগ উদ্যানে যে মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল সেখানে প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণের জন্য ছিল একটি মাত্র সরুপথ। গভর্নর মাইকেল ও. ডায়ার কর্তৃক পাঞ্জাবে গণ-বিক্ষোভ দমনের জন্য সামরিক আইন জারি করার অল্পকালের মধ্যে তাঁরই নির্দেশে জেনারেল ডায়ার সেই পথটি আগলে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে সমবেত নিরস্ত্র জনতার উপরে সেনাবাহিনীকে অবিরাম গুলি চালানোর নির্দেশ দেন। ফলে, অল্প সময়ের মধ্যে হতাহতের সংখ্যা দাঁড়ায় আড়াই হাজারেরও বেশি।

জালিয়ানওয়ালাবাগে প্রবেশের গলি ছিল অত্যন্ত সরু, তাই সাঁজোয়া গাড়ি ভিতরে ঢোকানো যায়নি বলে আফশোষ করেছিলেন জেনারেল ডায়ার। তবু, পাঞ্জাবকে সামরিক আইনের আওতায় রেখে সারা ভারতবর্ষ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে যথেচ্ছ লাঞ্ছনা ও অত্যাচার চলে মাসাধিক কাল। প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হয়ে ইংরেজ সরকার নিপীড়নের এমন কতকগুলো নৃশংস নমুনা তখন পাঞ্জাবে রেখেছিল যা মানবসভ্যতার ইতিহাসে নজিরবিহীন। জনৈকা ইংরেজ মহিলা ওখানে নিগৃহীতা হয়েছেন এই অজুহাতে ওখানে একটি গলির মধ্যে প্রত্যেক নরনারীকে বেয়নেটের মুখে মাটিতে শুয়ে হামাগুড়ি দিয়ে যেতে বাধ্য করা হয়। সন্দেহভাজন নিরপরাধ ব্যক্তিদের প্রকাশ্য রাস্তায় দাঁড় করিয়ে বেত মারতে মারতে উলঙ্গ কবে ফেলা হয় এবং তারপরেও তার নগ্নদেহে বেত মারা চলতে থাকে। কৈসুর নামে একটি শহরের রাজপথে ফাঁসীর মঞ্চ তৈরি করা হয় একটি আচ্ছাদনহীন জায়গায় এবং সন্দেহভাজনে ব্যক্তিদের ধরে এনে ঘন্টার পর ঘন্টা ওই মঞ্চের সামনে দাঁড় করিয়ে মানসিক চাপ সৃষ্টি করা হত।

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের খবরে প্রচণ্ড ব্যথিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ বড়লাট চেমসফোর্ডকে একটি চিঠি লিখে 'নাইটহুড' ত্যাগ করেন এবং লেনিন তাঁর উদ্বেগ প্রকাশ করেন 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে'র তৃতীয় কংগ্রেসে পঠিত প্রবন্ধে।

সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা

বিশ সালের ত্রিশে অক্টোবর বোম্বাইয়ে লালা লাজপৎ রাইয়ের নেতৃত্বে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সারা দেশ থেকে সম্মেলনে যোগ দেন আটশো ছ'জন প্রতিনিধি 'যাঁরা প্রতিনিধিত্ব করছিলেন ষাটটি সাংগঠনিক ভাবে যুক্ত ও চল্লিশটি সহানুভূতিশীল ইউনিযনের অন্তর্ভুক্ত অন্তত পাঁচ লক্ষ শ্রমিকের।' অধিবেশন চলে চার দিন ধরে।

সভাপতির ভাষণে লালা লাজপৎ রাই বলেন, 'সামরিকতাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ ধনতন্ত্রেরই যমজ সন্তান। এরা তিনের মধ্যে এক বা একের মধ্যে তিন। এদের ফল, এদের দান, এদের ছায়া অবধি বিষাক্ত। সম্প্রতি এদের এক প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয়েছে—সে প্রতিষেধক হল সংগঠিত মজুর। .....ইউরোপে প্রত্যেক মজুরই রাজনীতির একটি ঘাঁটি। ইউরোপের মজুর এক হাতিয়ার খুঁজে পেয়েছে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মধ্যে।' আর এদের সবার উপরে স্থান রাশিয়ার মজুরদের যাদের লক্ষ্য সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা।'

শ্রমিকশ্রেণীর পথের দিশারী হয়ে লালা লাজপৎ রাই আরও ঘোষণা করলেন, 'ইউরোপে সত্য দু'রকমের— ক) ধনতান্ত্রিক বা সরকারী সত্য যার প্রতিনিধিত্ব করেন উইনস্টন চার্চিলের মতো লোক বা 'লণ্ডন টাইমস'-এর মতো পত্রিকা এবং খ) সমাজতান্ত্রিক বা শ্রমিকদের সত্য যার প্রতিনিধি 'জাস্টিস' 'ডেলি হেরাল্ড' ও 'সোভিয়েত রাশিয়া'র মতো পত্রিকা। ইউবোপ ও আমেরিকায় আমার অভিজ্ঞতা আমায় এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সাহায্য করেছে, যে সমাজতান্ত্রিক এমন কি বলশেভিক সত্য ধনতান্ত্রিক বা সাম্রাজ্যবাদী সত্যের চাইতে সব সময়েই অনেক ভালো, অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য এবং অনেক বেশি মানবিক।'

গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন

পাঞ্জাবের হত্যাকাণ্ড ও রাওলাট দমননীতিব প্রতিবাদে এবং খিলাফৎ ও স্বরাজের দাবি পূরণের প্রস্তাব বিশ সালের সেপ্টেম্বরে কলকাতায় বিশেষ অধিবেশনে এবং ওই বছরেই নাগপুরের সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত হয়। আর তারই উদ্দেশ্যে গান্ধীজীর নেতৃত্বে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন।

ওই সময়ে ভাবতবর্ষের জেলাগুলো রাজবন্দী মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘদিন কারা-যন্ত্রণা ভোগ করে আসার পর বিপ্লবীরা নতুন সমস্যা ও নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। তখন স্বাধীনতা যুদ্ধের টেকনিক, পটভূমি ও রূপ বদলে গিয়ে অভাবিত জীবন-স্রোতে বহমান সংগ্রাম সূচিত হয়েছে সারা ভারতবর্ষে। দীন- .রিদ্র, মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত, নর-নারী ওই যুদ্ধে সামিল হয়েছিলেন। দু'দিন আগেও পর্দার আড়ালে বসে যে-সমাজের মহিলারা স ন-সমিতিতে যোগদান করতেন, তাঁরাই পর্দা ছিঁড়ে ফেলে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালেন, পথের মিছিলে বেরিয়ে পড়লেন। এদিকে গান্ধীজীর আবেদনে বাংলার অবিসংবাদী নেতা চিত্তরঞ্জন অভূতপূর্ব সাড়া দিলেন। এক কথায় বিপুল ঐশ্বর্য ধূলায় ছড়িয়ে দিয়ে তিনি পথে নেমে এলেন দেশমাতৃকার মুক্তি কামনায়। তিনি তাঁর ধন-মান-সম্পদ, এমনি কি ব্যারিস্টারি পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে মহাভিক্ষুকের অমিতবীর্যে দেশজননীর শৃঙ্খলমোচনের সাধনায় অসাধ্য সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। মুহূর্তে সমগ্র দেশ তাঁকে বন্ধুর আসনে গ্রহন করল। 'দেশবন্ধু' চিত্তরঞ্জন সকলের প্রাণের মানুষ হয়ে গেলেন।

শুরু হয়ে গেল ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার অসহযোগ। বিদেশী পণ্য বয়কট থেকে শিক্ষা-বর্জন পর্যন্ত। দলে দলে শিক্ষক ও ছাত্র ইংরেজদের গোলামখানা থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল।

দেশবন্ধু জানতেন যে, এই ব্যাপক গণবিক্ষোভে বিপ্লবীদেরও সামিল করতে না পারলে তাঁর সকল আয়োজন ব্যর্থ হয়ে যাবে, গান্ধীজীর সর্বভারতীয় আন্দোলনও বাংলার সঠিক অবদান ছাড়া কিছুটা অকিঞ্চিৎকর হয়ে উঠবে। তাই বিপ্লবীদের উদ্দেশে দেশবন্ধু বললেন, 'তোমাদেব অস্ত্র এবার তূণে ঢুকিয়ে

গান্ধিজী

আমাদের চলার পথে নেমে পড়ো। এত তোমরা সর্বজনবিদিত হবে, বিশালতর পটভূমিতে তোমাদেরই প্রভাব বিকীর্ণ হবে, তারপরে এ পথে গন্তব্যে পৌঁছতে না পারলে তোমাদের পথেই তোমরা আরও শক্তিমান হয়ে সারা দেশকে সঙ্গী করে এগিয়ে যেও। আখেরে লাভ হবে তোমাদেরই। কারণ, তোমরা আপোষহীন বিপ্লবী।'

গান্ধীজী ও দেশবন্ধুর বক্তব্যের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বললেন, 'ভারতবাসীর কটিদেশে তরবারি থাকলে তা কোষমুক্ত করতে বলতাম। কিন্তু তা নেই। তাই তাদের বলছি অহিংস-অসহযোগের পন্থা গ্রহণ করতে।'

শুধু তাই নয়, গান্ধীজী আরও এক ধাপ এগিয়ে বললেন, 'অহিংসাকে বিশ্বাস বা কর্মপদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। আমি এই শয়তান গভর্নমেন্টকে ধ্বংস করার জন্য বদ্ধপরিকর।' দেশবন্ধু ও গান্ধীজীর অনুরোধ ও আশ্বাসে সবাই এগিয়ে চললেন নতুনতর একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার ধৈর্য নিয়ে।

ভারতের জনগণ আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী এক ধরনের নিষ্ক্রিয় আন্দোলনে সামিল হয়ে সরকারকে একটা নতুন ধরনের সংঘাত ও সংঘর্ষে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন।

অসমের চা-বাগিচা, অসম-বেঙ্গল রেলওয়ে ও জাহাজী শ্রমিক ধর্মঘট

অসমের চা-বাগানের কুলিরা চা-বাগান মালিকদের নির্মম শোষণ ও অত্যাচার সয়ে আসছিলেন। গান্ধীজীর অসহযোগের ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁরা একুশ সালের বিশে মে তারিখে দলে-দলে চা-বাগান থেকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে তাঁদের নিজেদের স্থানে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত করলেন। রেল ও জাহাজ কর্তৃপক্ষ পদে পদে নানাভাবে তাঁদের যাত্রাপথে বাধা দেবার চেষ্টা করল। তা সত্ত্বেও তাঁরা যখন চাঁদপুরে পৌঁছলেন তখন রাতের অন্ধকারে হঠাৎ গোর্খা বাহিনী তাঁদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং গুরুতর আহত করে।

এর প্রতিবাদে সেদিন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও বিদ্যুৎগতিতে ধর্মঘট শুরু হল অসম-বেঙ্গল রেলওয়ে শ্রমিক এবং চাঁদপুর, গোয়ালন্দের জাহাজী শ্রমিকদের। ধর্মঘট ভাঙার জন্য ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর চলল প্রচণ্ড উৎপীড়ন এবং কংগ্রেসী স্বেচ্ছাসেবকদের যথেচ্ছ গ্রেপ্তার ও নির্যাতন। কংগ্রেসী নেতা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের নেতৃত্বে শ্রমিকেরা দিনের পর দিন রাজনৈতিক ধর্মঘট চালান, এমন কি যতীন্দ্রমোহনের গ্রেপ্তারের পরেও।

অসহযোগ আন্দোলনের কয়েকটি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব

একুশ সালেই আহমেদাবাদ কংগ্রেস অধিবেশনে প্রথম পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল। প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন মওলানা হজরৎ মোহানি এবং সমর্থন করেছিলেন স্বামী কুমারানন্দ।

এদিকে মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমায় যখন ওই সালে বঙ্গীয় স্বায়ত্তশাসন অনুযায়ী ইউনিয়ন বোর্ড গঠনের চেষ্টা শুরু হয় তখন গ্রামের মানুষ ওই বোর্ড তাঁদের কোনো উপকারে আসবে না, শুধু তার ফলে আবার তাঁদের কাঁধে নতুন ট্যাক্সের বোঝা চাপাবে—এই বিবেচনায় তাঁদের অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। শ্রী বীরেন শাসমল তাঁদের অসন্তোষকে সংগঠিত রূপ দেন এক বিশাল বয়কট আন্দোলনের ডাক দিয়ে। ফলে সরকারী আদেশে ট্যাক্স-দানে বাধা সৃষ্টি করার জন্য বহু কৃষকের অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয় এবং তাঁরা গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ হন। কংগ্রেস নেতৃত্বের সমর্থন পেলেও শ্রী বীরেন শাসমলের নেতৃত্বে পরিচালিত এই আন্দোলন এত ব্যাপক রূপ ধারণ করে যে ওই বছরের ডিসেম্বর মাসে কাঁথিতে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনের নির্দেশ শেষ পর্যন্ত প্রত্যাহৃত হয়।

অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলন বিশাল গণ-অভ্যুত্থান-এর রূপ ধারণ করে কেরলের মালাবার অঞ্চলে। ওই অঞ্চলের অধিকাংশ তালুকের অধিবাসী মোপলা মুসলমান। অনেকেই প্রায় নিঃস্ব কৃষক

আর জেন্‌মি বা জমিদারেরা প্রায় সবাই হিন্দু। এ অবস্থায় সুযোগ নিয়ে ইংরেজ শাসকেরা এর আগে অবধি মোপলা কৃষকদের অসন্তোষ যখনই আন্দোলনের রূপ নেবার উপক্রম করেছে তখনই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে তাকে পরাস্ত করেছে। এবারে কিন্তু গান্ধীজী ও মওলানা শওকত আলি কেরল সফর করে অসহযোগ ও খিলাফতের দাবিতে যুক্ত আন্দোলনের আহ্বান জানালে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেল। সারা এলাকায় ছড়িয়ে পড়ল খিলাফৎ কমিটির আন্দোলন। আগস্ট মাসে পুলিশ এরনাদ ও ভাল্লুভামদ নামে দুটো তালুকে একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করে কারণ ওখানে ছিল মোপলাদের শক্ত ঘাঁটি। বিশে আগস্ট তারিখে স্থানীয় খিলাফৎ কমিটির, সম্পাদককে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ গেলে সমবেত মোপলারা বর্শা, তলোয়ার প্রভৃতি নিয়ে বাধা দেন। তখন এরনাদে পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী খিলাফৎ কমিটির সম্পাদককে গ্রেপ্তারের জন্য জোর করে তিরুরঙ্গাডি মসজিদে ঢোকে। ফলে ওই এলাকায় মোপলারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। ওঁরা একের পর এক থানা দখল করেন, সরকারী তহবিল লুঠ করেন এবং আদালত ও রেজিষ্ট্রি অফিসে ঢুকে সরকারী নথিপত্র পুড়িয়ে ফেলেন।

আলি মুসালিয়ার প্রমুখ দুর্ধর্ষ বিদ্রোহী নেতার নেতৃত্বে মোপলারা সেদিন যে বিশাল গণ-অভ্যুত্থান ঘটান তাতে কেরল কংগ্রেসের ঐতিহাসিকদের মতে আটাশে আগস্ট নাগাদ মালাপ্পুরাস, তিরুরঙ্গাডি সাজেরি ও পেরিন্‌থলমান্নায় বিপর্যস্ত হয় ব্রিটিশ প্রশাসন। রোল্যাণ্ড মিলার নামে মোপলা-বিদ্রোহ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিকও লিখেছেন যে প্রধান শহরগুলো ব্রিটিশ বাহিনীর হাতে থাকলেও পুরো তিন মাস গ্রামাঞ্চলের সম্পূর্ণ আধিপত্য ছিল বিদ্রোহীদের হাতে। এক বিশাল এলাকার দশ লক্ষেরও বেশি মানুষ জড়িত ছিলেন এই গণ-অভ্যুত্থানে।

বিদ্রোহ দমনের জন্য সামরিক আইন জারি করে ইংরেজ সরকার এবং তারপর ওরা অবর্ণনীয় অত্যাচার চালায় মোপলাদের উপর। আমরা এখানে অত্যাচারের একটি নৃশংস নমুনা তুলে ধরছি। উনিশে নভেম্বর রেলের ছোট একটি কামরায় একশো বাইশ জন মোপলা-বন্দীকে যখন তিরুর থেকে নব্বই মাইল দূরে কোয়েম্বাটুরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন কামরার দরজা খুলে দেখা যায় যে, চৌষট্টি জন বন্দী শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেছেন। মোপলা-বিদ্রোহ দমনের সময় অন্তত দশ হাজার মোপলা নিহত হন এবং তিন হাজার মোপলাকে দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড দিয়ে পাঠানো হয় আন্দামানে। সম্ভবত সাঁওতাল-বিদ্রোহ ও সিপাহী-বিদ্রোহ ছাড়া কোনো সংগ্রামে এত বেশি যোদ্ধাকে আত্মদান করতে হয় নি।

মোপলা বিদ্রোহে হিন্দুরাও অনেকে ছিলেন, তবে সমস্ত অভ্যুত্থানের এলাকায় হিন্দুদের, এমন কি যুক্ত আন্দোলনের নেতাদেরও প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। বিদ্রোহ দমন করার সময় প্রথম ছেচল্লিশ জন দণ্ডিতদের মধ্যে একজন নাম্বুদিরি, একজন মেনন, একজন নায়ার এবং নারায়ণ মেনন, মাধবন নবি, কে. কানাপুম প্রভৃতি ছিলেন মঈদু মওলভি, মহম্মদ রহমান ও হাসান কয়ার পাশাপাশি।

পেশোয়ার ষড়যন্ত্র মামলা

খিলাফৎ আন্দোলনের সূত্রে, অসহযোগ আন্দোলনের এক বছর আগে, প্রায় একলক্ষ ভারতীয় মুসলমান 'হিজরৎ' করে আফগানিস্তানে চলে যান। 'হিজরৎ' শব্দটির অর্থ হল, ইসলাম শাস্ত্র অনুসারে শত্রু-কবলিত রাজ্য পুনরুদ্ধারকল্পে শক্তি সঞ্চয়ের জন্য দেশ ছেড়ে স্বেচ্ছায় অন্যত্র আত্মনির্বাসনে যাওয়া। সেখানে মহেন্দ্রপ্রতাপ প্রতিষ্ঠিত 'অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকারে'র সংশ্লিষ্ট বিপ্লবীদের সংস্পর্শে এসে তাঁদের কেউ কেউ বিপ্লবী দলে নাম লেখান এবং আমদুরিয়া পেরিয়ে সোভিয়েত দেশে যান ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের রসদ সংগ্রহ করতে।

সোভিয়েত দেশে তাঁরা প্রথমে তাসখন্দে মিলিটারি একাডেমি ও পরে মস্কোর 'প্রাচ্যদেশের শ্রমজীবী বিশ্ববিদ্যালয়ে' শিক্ষালাভ করে কেউ কেউ হিন্দুকুশ পেরিয়ে, কেউ বা পারস্যের ভিতর দিয়ে দেশে ফেরার চেষ্টা করেন।

তাঁরা প্রায় সবাই ভারতসীমান্তে গ্রেপ্তার হয়ে যান এবং তাঁদের সকলকে পেশোয়ারে পরপর চারটি বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত করা হয়। মেয়াদ ছিল এক বছর থেকে দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড।

ওই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত মুহাজিরীন বিপ্লবীদের মধ্যে ছিলেন আবদুল মজীদ, শওকৎ উসমানি, মিঞা আকবর শাহ্, রফিক আহমদ ও ফজল ইলাহী কুরবান। আবদুল মজীদ পরে মীরাট মামলার আসামী হয়েছিলেন এবং শওকৎ উসমানি প্রথমে কানপুর ও পরে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত হন। বিপ্লবীরা তাসখন্দ ও বাকু থেকে যথাক্রমে 'জমীনদার' ও 'আজাদ হিন্দুস্তান আখবার' 'পত্রিকা দুটি প্রকাশ করেছিলেন।

সামাজিক পট-পরিবর্তনে কিছু পত্রিকার আবির্ভাব

শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে সম্পাদিত 'দ্য সোশ্যালিস্ট'। বোম্বাই। ইংরেজি সাপ্তাহিক। ১৯২২।

গুলাম হুসেন-সম্পাদিত 'ইনকিলাব' লাহোর। উর্দুপত্রিকা। ১৯২২।

সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার-সম্পাদিত 'লেবার কিষাণ গেজেট'। মাদ্রাজ। ইংরেজি পাক্ষিক। ১৯২৩।

মুজফ্ফর আহমেদ ও নজরুল ইসলাম-সম্পাদিত 'লাঙল'। কলকাতা। বাংলা সাপ্তাহিক। ১৯২৫।

সন্তোখ সিং-সম্পাদিত 'কীর্তি'। অমৃতসর। পাঞ্জাবী ও পরে উর্দু মাসিক পত্রিকা। ১৯২৬। সন্তোখ সিংয়েব মৃত্যুর পর এই পত্রিকাটি পরবর্তী বছর থেকে মোহন সিং যোশের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

চৌরিচৌরার কৃষক অভ্যুত্থান

যখন দেশ জুড়ে অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলন চলছিল তখন উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার চৌরিচৌরা গ্রামে কৃষক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নেতা, সৈন্যবাহিনীর কলকাতা শাখার প্রাক্তন সিপাহী, ভগবান আহিরকে উনিশ শো বাইশ খৃস্টাব্দের পাঁচই ফেব্রুয়ারি তারিখে পুলিশের দারোগা বিনা অপরাধে সর্বজনসমক্ষে লাঞ্ছিত করে। এর ফলে জনতা প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং পুলিশের সঙ্গে সংঘাত বেধে যায়। পুলিশের গুলিতে কিছু কৃষক হতাহত হন এবং বাইশ জন পুলিশও সংঘর্ষে প্রাণ হারায়। স্বেচ্ছাসেবকেরা অহিংসার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে— এই যুক্তিতে গান্ধীজী ভারতব্যাপী আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। যদিও গান্ধীজীর এই একক সিদ্ধান্তে বিরক্তি প্রকাশ করেন চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহরু, লাজপৎ রাই, সুভাষচন্দ্র বসু, জওহরলাল নেহরু প্রমুখ সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দ, কিন্তু গান্ধীজী তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকেন।

বাইশ জন পুলিশ - হত্যায় অভিযুক্ত দু'শো পঁচিশ জন আসামীর মধ্যে প্রথমে একশো বাহাত্তর জনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ হয়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য উনিশ জনের ফাঁসী হয় এবং বাকিদের যাবজ্জীবন ও বিভিন্ন মেয়াদের শাস্তি দিয়ে দ্বীপান্তরে পাঠানো হয়। এই নৃশংস দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে বিদেশ থেকে মানবেন্দ্রনাথ রায়-এর 'ভ্যানগার্ড' পত্রিকা এবং 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক-এর (কমিন্টার্ন) কার্যনির্বাহক সমিতি ছাড়া এদেশের কোনো ব্যক্তি বা পত্রিকা প্রতিবাদ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। তা ছাড়া, চৌরিচৌরায় এই বাইশ জন নিহত পুলিশের স্মারক ফলক থাকলেও আজ অবধি ওই কৃষক শহীদদের জন্য কোনো স্মৃতিস্তম্ভ বা ফলক নেই।

রম্পা অভ্যুত্থান

অন্ধ্রে রম্পা মহকুমায় আল্লুরি সীতারাম রাজুর নেতৃত্বে উনিশ শো বাইশ খৃস্টাব্দের জুন মাসে যে অভ্যুত্থান শুরু হয়েছিল তার প্রধান শক্তি ছিলেন স্থানীয় আদিবাসীরা। এই সর্বজন শ্রদ্ধেয় সাধু চরিত্রের মানুষটি এর আগে ওই দরিদ্র আদিবাসীদের উপর সরকারী জুলুম ও শোষণ বন্ধ করার অনেক চেষ্টা করেছিলেন দরখাস্ত ও আবেদন মারফৎ। সেই চেষ্টা ব্যর্থ হলে তিনি গোপনে প্রায় তিনশো কৃষক ও

আদিবাসী তরুণ নিয়ে একটি বাহিনী গড়ে তড়িৎ আক্রমণে একের পর এক পুলিশ থানা এবং অস্ত্রশস্ত্র দখল করেন। তাঁর মাথার জন্য সরকার পনেরো হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করলেও গ্রামের গরীব মানুষেরা তাঁর বাহিনীকে নানাভাবে সাহায্য করতে থাকেন।

তিন মাস পরে বিদ্রোহীরা গুজরিঘাটে একটি সৈন্যবাহিনীকে পর্যুদস্ত করেন এবং স্কট ও হাইটার নামে দুই ইংরেজ সেনাধ্যক্ষ নিহত হন। ওঁদের আক্রমণে যানবাহন, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থাও বিপর্যস্ত হয়। গুডমের পুলিশ-ব্যারাকটি সম্পূর্ণ ধ্বংস করেন ওঁরা।

এরপর মেশিনগান, লিউটম বন্দুক নিয়ে সুসজ্জিত বিশাল বাহিনী নিয়ে ইংরেজ সরকার ওঁদের সঙ্গে সংঘর্ষে নামে। আরও কিছুদিন যুদ্ধ চালাবার পর সীতারাম ইংরেজের হাতে ধরা পড়েন এবং তাঁকে আত্মপক্ষ সমর্থনের বিন্দুমাত্র সুযোগ না দিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে গুলি করে হত্যা করা হয়। তাঁর সহযোদ্ধা গণ্ডাম, কোরা, ইয়েডদের পাড়ল প্রমুখকেও ওইভাবে নির্বিচারে হত্যা করা হয়। অনেককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়ে পাঠানো হয় আন্দামান জেলে। এঁদের মধ্যে বনাঙ্গি পাণ্ডু পাড়ল মুক্তির পরেও আমৃত্যু আন্দামানে ছিলেন।

শাঁখারীটোলা পোস্ট-অফিস লুঠ

কেউ বুঝতে পারেন নি কলকাতার বুকে ঘটতে চলেছে একটি বিস্ফোরক ঘটনা। তখন অপেক্ষাকৃত প্রবীণ বিপ্লবীরা কারারুদ্ধ। তরুণদের একাংশের সঙ্গে প্রবীণ নেতাদের মতানৈক্য ঘটছিল। তরুণদের ধারণা প্রবীণেরা বিপ্লবের পথ থেকে, যে কোনো কারণেই হোক, সরে যাচ্ছেন। সেই ধারণা থেকেই তাঁরা নিজেরাই বিপ্লবের মশাল নিজেদের হাতে তুলে নিতে এগিয়ে এলেন।

বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর অনুগামী তরুণ-বিপ্লবী সন্তোষ মিত্র 'শাঁখারীটোলা পোস্ট-অফিস লুঠ' করার ব্যবস্থা করলেন প্রবীণ নেতৃত্বকে না জানিয়ে। দুর্ভাগ্যবশত টাকা কিছুই পাওয়া গেল না, কিন্তু পোস্টমাস্টার নিহত হলেন। বরেণ ঘোষ নামক এক তরুণের এ-ব্যাপারে বিশ বছরের সাজা হল। এখানে উল্লেখযোগ্য, পোস্ট মাস্টারের শোকসন্তপ্তা বিধবা পত্নীই সরকারের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, বরেণের যেন ফাঁসী না হয়। তাঁর স্বামীর অভাব কারও মৃত্যু দিয়ে কোনোদিন পূরণ করা যাবে না।

'স্বরাজ্য দলে'র উদ্ভব

অসহযোগ আন্দোলন হঠাৎ প্রত্যাহৃত হওয়ার পর কংগ্রেসের নেতৃত্বের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহরু, বিঠলভাই প্যাটেল প্রমুখ বিশিষ্ট নেতা বলেন, অসহযোগের পথ ছেড়ে বিধানসভায় যোগ দেওয়া উচিত। তাহলেই সম্ভব হবে মণ্টেগু-চেমসফোর্ডের নয়া শাসনতান্ত্রিক সংস্কার ভিতর থেকে ধ্বংস করা। উনিশ শো বাইশ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি দেশবন্ধুর ওই প্রস্তাব পরাস্ত হলেও তিন মাস পরে তিনি, মতিলাল নেহরু প্রমুখ 'স্বরাজ্য দল' গড়ে ওই বছরের নভেম্বর মাসে নির্বাচনে যোগদানের সিদ্ধান্ত করলেন। শেষ পর্যন্ত পরিবর্তনকামী ও পরিবর্তনবিরোধী গোঁড়া দল একটা আপোষ করেন। সিদ্ধান্ত হয়, স্বরাজ্য দল নির্বাচনে লড়বেন এবং অন্যেরা নিখিল ভারত খাদি বোর্ড প্রভৃতি মারফৎ গঠন-মূলক কাজ করবেন।

পরের বছর জুন মাসে এ. আই. সি. সি. অধিবেশনে কংগ্রেস সদস্যমাত্রেরই নির্দিষ্ট পরিমাণ সুতো কাটতে হবে, কংগ্রেস কমিটির পদাধিকারী বিধানসভায় যোগ দিলে তাঁকে কংগ্রেসের ওই পদ ছাড়তে হবে, গান্ধীজীর ওই দুই প্রস্তাব পরাস্ত হয় এবং জাতীয় বিপ্লবী দলের গোপীনাথ সাহার কাজ-সংক্রান্ত গান্ধীজীর নিন্দাসূচক প্রস্তাব মাত্র ৭৮-৭০ ভোটে জয়লাভ করে। গোপীনাথ সাহা পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টকে মারতে গিয়ে নিরীহ এক ইংরেজ ভদ্রলোককে গুলি করেন এবং সেজন্য তাঁর ফাঁসী হয়। গান্ধীজী ওই জয়কে তাঁর নৈতিক পরাজয় বলেই মনে করেন।

যাই হোক, এই সব ঘটনার ফলে স্বরাজ্য দলের সদস্যরা বিধানসভায় কংগ্রেস সংগঠনের অঙ্গ হিসাবে কাজ করবেন—গান্ধীজী এই সিদ্ধান্ত মেনে নিলেন। এরপর স্বরাজ্য দল নির্বাচনে বাংলা, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানে উল্লেখযোগ্য জয়লাভ করেন।

মতিলাল নেহেরু

টেগার্ট-হত্যার ব্যর্থ প্রয়াস

চব্বিশ সালের বারোই জানুয়ারী সকালবেলায় চৌরঙ্গীর বুকে গর্জে উঠল যুগান্তর দলের তরুণ বিপ্লবী গোপীনাথ সাহার আগ্নেয়াস্ত্র। স্যার চার্লস টেগার্ট ভেবে ভুল করে তিনি গুলি করেছিলেন একজন ইউরোপীয়কে। তাঁর নাম মিঃ ডে। টেগার্ট তখন ছিলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার। অতি বুদ্ধিমান ও দক্ষ ব্রিটিশ রাজপুরুষ। ইংরেজের অত বড় মিত্র এবং বিপ্লববাদের অত বড় সুদক্ষ শত্রু ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামে তেমন একটা দেখা যায় নি। এ হেন টেগার্টকে হত্যা করার সংকল্পে গোপীনাথ সার্থক হতে পারলেন না। টেগার্টের গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগল না। প্রাণ দিতে হল নিরীহ নির্বিবাদী ডে-সাহেবকে।

লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় অবশ্য গোপীনাথের মনে যেন কোনো দুঃখ নেই। তিনি নির্বিকার। শুধু ফাঁসীর দড়ি গলায় পরার আগে বলেছিলেন, 'ডে'র মৃত্যুতে আমি দুঃখিত। আমার আপশোষ, টেগার্ট বেঁচে গেলেন। আমার আশা যে আমার আরব্ধ কাজ সুসম্পন্ন করার লোক পিছিয়ে নেই।'

চব্বিশ সালের পয়লা মার্চ প্রেসিডেন্সি জেলে গোপীনাথকে ফাঁসী দেওয়া হল। সেদিন সকালে সুভাষচন্দ্র গিয়েছিলেন ওই জেলের গেটে। বহুক্ষণ বাইরে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ফাঁসীর পর জেল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে চেয়ে আনলেন গোপীনাথের গায়ের চাদরখানা। মাথায় জড়িয়ে নিলেন সে-

সুভাষচন্দ্র তখন ছিলেন কলকাতা কর্পোরেশনের চিফ একজিকিউটিভ অফিসার অর্থাৎ প্রধান কর্মসচিব। জেল-গেট থেকে তিনি একা অফিস-ঘরে এসেছেন। দরজা ভেজানো। ওঁর মনের অবস্থা চিন্তা করে অফিসের কর্মীরা কাজ থাকা সত্ত্বেও ওঁর ঘরে ঢুকতে সাহস পাচ্ছিলেন না। অনেকক্ষণ পরে একজন ওঁর খুব অনুগত কর্মচারী দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে সুভাষচন্দ্রকে দেখে স্তব্ধ হয়ে গেলেন এবং তিনি বেরিয়ে এলেন সসম্ভ্রমে, একটুও শব্দ না করে। সুভাষচন্দ্র তখন জানতেই পারলেন না।

তিনি তখন দেওয়ালে টাঙানো প্রকাণ্ড একটি ভারতবর্ষের মানচিত্রের সামনে প্রায় ধ্যানস্থ মূর্তিতে দাঁড়িয়ে গুন্‌গুন্‌ করে গাইছিলেন, 'তোমার পতাকা যারে দাও। তারে বহিবারে দাও শকতি।' তখন তাঁর বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত, নীরবে চোখের জল ঝরছে।

রাজনৈতিক বিচারে গোপীনাথের ফাঁসী অনেক তাৎপর্যপূর্ণ।

তখন বাংলার কংগ্রেস মোটামুটিভাবে বিপ্লবীদের হাতে। দেশবন্ধু আছেন এঁদের শীর্ষে। তাই সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনে পথ ও মতের অমিল থাকা সত্ত্বেও গোপীনাথের আত্মবলিদান ও বীরত্বের প্রশংসা করে তাঁরা একটি প্রস্তাব গ্রহণ করতে গিয়ে ব্যর্থ হন নি।

কংগ্রেস-শাসিত কলকাতা কর্পোরেশনেও অনুরূপ প্রস্তাব গৃহীত হয়। এতে বিপ্লবীদের বীরত্বের প্রতি প্রকাশ্যে অভিনন্দন জানানো হল পরোক্ষে এই ধরনের বীরত্ব প্রদর্শনে তাঁদের অনুপ্রাণিত করা হল।

এতে দেশবাসী খুশি হলেও ইংরেজ শাসক প্রচণ্ড চটে যায়। আর তার চেয়েও বেশি চটে যান গান্ধীজী। তিনি দেখলেন ভারতীয় রাজনীতি আর তাঁর অহিংসা মন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে না। সেখানে জনসাধারণ ও দেশবরেণ্য নেতাদের কাছে বাহবা পাচ্ছে সন্ত্রাসবাদ।

তিনি এমনই ক্ষেপে গেলেন যে তাঁকে তুষ্ট করার জন্য অবশেষে কর্পোরেশন তাঁদের প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়।

গান্ধীজী গোপীনাথ-প্রস্তাব নিয়ে বেঁকে বসলেও তাঁকে মাত্র দু'বছর পরে ভগৎ সিংদের আত্মত্যাগের মর্যাদা দিতে হয়েছিল জনমতের চাপে। কিন্তু গোপীনাথ তো ছিলেন ভগৎ সিংদের অগ্রদূত। সিরাজগঞ্জে গোপীনাথ সম্পর্কিত প্রস্তাব লাহোরে গান্ধীজীর কণ্ঠোচ্চারিত ভগৎ সিংদের শৌর্য-স্বীকৃতির সূচনা। গোপীনাথের ফাঁসী তাই রাজনৈতিক বিচারে তাৎপর্যপূর্ণ।

গোপীনাথকে কেন্দ্র করেই ভারতীয় রাজনীতির দ্বন্দ্বসংকুল ইতিহাস, গান্ধীজী-নেতাজীর বিরোধের সূত্রপাত হল।

ভারতীয় রাজনীতিতে সুভাষচন্দ্র বসুর আবির্ভাব

সচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান হয়েও সুভাষচন্দ্র আকৈশোর বিদ্রোহী। তের সালে মাত্র পনেরো বছর বয়সে তিনিই কটক থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। পরের বছরেই তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন এবং গরমের ছুটিতে বাড়িতে কাউকে কিছু না বলে এক ধর্মবিশ্বাসী তরুণ বন্ধুকে নিয়ে গয়া কাশী বৃন্দাবন মথুরা হরিদ্বার হৃষীকেশ ইত্যাদি তীর্থ ভ্রমণ করে কোনো গুরুর সন্ধান না পেয়ে আবার কলকাতায় ফেরেন।

পরের বছরে তিনি আই. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দর্শন শাস্ত্রে অনার্স নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজেই বি. এ. ক্লাসে ভর্তি হন। ইতিমধ্যে ওই বয়সেই তাঁর বহু সন্ত্রাসবাদী নেতার সঙ্গে পরিচয় হয়। ইংরেজ অধ্যাপক ঈ. এফ. ওটেন ভারতীয়দের উদ্দেশে কটূক্তি করায় সুভাষ প্রতিবাদ করেন এবং তাঁরই নেতৃত্বে ছাত্র উত্তেজনা, ছাত্র ধর্মঘট ও নানা আন্দোলনের ফলে বিদেশী শাসকদের পরামর্শে কলেজ কর্তৃপক্ষ সুভাষচন্দ্রকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করলেন।

তিনি তখন কিছুদিনের জন্য কটকে বাবা-মা, জানকীনাথ ও প্রভাবতীর কাছে ফিরে গেলেন। অনতিকালের মধ্যে কলকাতায় ফিরে এসে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সহায়তায় স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হন।

পড়াশোনা ছাড়াও তিনি একইসঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ইণ্ডিয়ান ডিফেন্স ফোর্সে অর্থাৎ টেরিটোরিয়াল আর্মিতে যোগদান করলেন। খাকি পোষাক, কাঁধে রাইফেল নিয়ে পরবর্তী জীবনের আই. এন. এ.-র সর্বাধিনায়কের সৈনিক জীবনের হাতে-খড়ি হল। একদিকে প্রেসিডেন্সি কলেজে দর্শনে অনার্স নিয়ে পড়াশোনা, অন্যদিকে ফোর্ট উইলিয়মে সামরিক প্রশিক্ষণ চলল।

উনিশ শো উনিশ খৃস্টাব্দে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান পেয়ে দর্শনে অনার্স নিয়ে তিনি বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। পুঁথিগত বিদ্যা, সামরিক প্রশিক্ষণ এবং রাজনৈতিক সচেতনতার সমন্বয়ে তরুণ সুভাষ আরও উচ্চশিক্ষায় উদ্দীপ্ত হলেন। তিনি এক্সপেরিমেন্টাল সাইকোলজি নিয়ে এম. এ. ক্লাসে ভর্তি

হলেন। কিন্তু জানকীনাথ সুভাষকে উনিশ শো কুড়ি খৃস্টাব্দে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বসাতে চাইলেন কারণ জানকীনাথের মনে হয়েছিল, নতুন শাসনতন্ত্রের অধীনে একজন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন আই. সি. এস.-এর জীবন অসহনীয় হবে না এবং পরবর্তী দশ বছরের মধ্যে ভারত স্বায়ত্তশাসনাধিকার লাভ করবে। এই ব্যাপারে জানকীনাথ সুভাষের অগ্রজ শরৎচন্দ্রের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন।

সুভাষকে বিলেতে পাঠানোর প্রস্তুতি যখন শেষ, তখন পাঞ্জাবে জালিয়ানওয়ালাবাগে নিষ্ঠুরতম হত্যাকাণ্ড ঘটে। সারা দেশ জুড়ে তুমুল উত্তেজনা। এই পরিস্থিতির মধ্যে উনিশ সালের পনেরোই সেপ্টেম্বরে উদ্বিগ্নমনে সুভাষচন্দ্র লণ্ডনে যাত্রা করলেন। কেমব্রিজে তাঁর ছাত্রজীবন শুরু হল।

তিনি ইংল্যাণ্ডে পৌঁছেছিলেন অক্টোবর মাসে আর অনার্স পরীক্ষার জন্য কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু করলেন নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে। ওখানে ভর্তি হবার বিষয়ে অধ্যক্ষ রেডভাওয়ের মূল্যবান সাহায্যের স্বীকৃতি দিয়ে সুভাষ লিখেছেন, 'রেডভাওয়ের সাহায্য ভিন্ন জানিনা আমি ইংল্যাণ্ডে কি করিতাম।'

সুভাষ আধুনিক ইউরোপীয় ইতিহাস অধ্যয়ন করার সুযোগ পেয়েছিলেন কেমব্রিজে। সেই সঙ্গে পাঠ করেছিলেন বিসমার্কের আত্মজীবনী. মেটারনিকের স্মৃতিচারণ, কাভুরের চিঠিপত্র ইত্যাদি। তিনি স্বীকার করেছিলেন 'আমার কেমব্রিজে পড়া এই সব মৌলিক দলিল আমার রাজনৈতিক বোধ গড়ে ওঠার পথে এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির বাস্তব স্রোত সম্পর্কে ধারণা বৃদ্ধির পক্ষে অন্য আর সব কিছুর তুলনায় বেশি সাহায্য করেছিল।'

বিশ সালের জুলাই মাসের শুরুতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা আরম্ভ হল। পড়াশোনার জন্য তিনি মাত্র আটমাস সময় পেয়েছিলেন, তাই প্রত্যাশার তুলনায় সুভাষ সামান্য প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষায় বসেছিলেন। তা ছাড়া, তিনি সংস্কৃত-পত্রে একশো পঞ্চাশ নম্বর নষ্ট করেছিলেন। কিন্তু দু'মাস বাদে পরীক্ষার ফল বেরোলে জানা গেল, সুভাষ সফলতার ক্রম-অনুসারে চতুর্থ স্থান অধিকার করেছেন। ফল প্রকাশিত হলে তিনি অগ্রজ শরৎ বসুকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, 'আমি বলতে পারি না যে আই. সি. এস. -এর পদমর্যাদায় প্রবেশের সম্ভাবনায় আমি খুব আনন্দিত হয়েছি। আমাকে যদি একাজে যোগদান করতেই হয়, তবে যে অনীহার সঙ্গে আমি আই. সি. এস. পরীক্ষার জন্য পড়াশোনা করেছি ঠিক সেইভাবে এই কাজটিও করব। এক চমৎকার নিয়মিত মাইনে এবং অবসর জীবনে একটা ভাল পেনসন নিশ্চয়ই আমি পাব। যদি গোলামের মত আজ্ঞাধীন হবার জন্য যথেষ্ট নত করতে পারি নিজেকে তবে হয়ত আমি একজন কমিশনারও হব। এক বশংবদ মানসিকতার সঙ্গে সহজাত কর্মক্ষমতা নিয়ে একজন এমন কি একটি প্রাদেশিক সরকারের চীফ সেক্রেটারি পর্যন্ত হবার উচ্চাশা করতে পারেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই চাকুরিই কি হবে আমার জীবনের চরম লক্ষ্য? সিভিল সার্ভিস একজন মানুষের জীবনে সর্বপ্রকার পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে আসতে পারে। কিন্তু এই প্রাপ্তি কি তাঁর সত্তার বিনিময়ে সংগ্রহ করা নয়? একজন আই. সি. এস. কে যে ধরনের চাকুরীর শর্তাবলীর অধীনতা স্বীকার করতে হয়, আমি মনে করি, তার সঙ্গে জীবনের উচ্চ আদর্শের সামঞ্জস্য বিধান করা একটা ভণ্ডামি মাত্র।

'উক্ত চাকুরীর সমর্থনে অনেক কিছুই বলা যেতে পারে। এই চাকুরীমাত্র একটি বারেই আমাদের প্রত্যেকের প্রধানতম সমস্যার সমাধান করে দেয়—জীবিকার সমস্যা। কাউকে ঝুঁকি নিয়ে কিংবা সাফল্য-অসাফল্য সম্পর্কে কোন অনিশ্চয়তা নিয়ে মুখোমুখি হতে হয় না জীবনের। কিন্তু আমার মতো প্রকৃতির মানুষ, যে বেঁচে আছে এমন কিছু ভাব নিয়ে, যাকে নিশ্চিতভাবে অদ্ভুত বলা যেতে পারে, তার পক্ষে সামান্য প্রতিবন্ধকতাহীন পথ অনুসরণের পক্ষে শ্রেষ্ঠ পথ হতে পারে না......তাছাড়া, সিভিল সার্ভিসে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে কোনো মানুষের পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থায় এবং সর্বাত্মক ভাবে দেশসেবা করা সম্ভব নয়। সংক্ষেপে, জাতীয় এবং আত্মিক উচ্চাশা সিভিল সার্ভিসের শর্তাবলীর প্রতি আনুগত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।'

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

পরের বছর ছাব্বিশে জানুয়ারী তিনি আবার ভাইকে লেখেন, 'নীতিগতভাবে আমি এমন এক ব্যবস্থার অংশীদার হবার কথা ভাবতে পারি না যার প্রয়োজনের দিন ফুরিয়ে গেছে এবং সমর্থন করছে

এমন সব ব্যবস্থার যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে রক্ষণশীলতা, স্বার্থপর ক্ষমতা, হৃদয়হীনতা এবং লালফিতার ফাঁস।'

বিদেশী শাসনের অধীনে এক দাসোচিত সিভিলিয়ানের জীবনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছিলেন না তিনি এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে, সিভিল সার্ভিসের পীড়াদায়ক প্রভাবের কাছে কিছুতেই নতি স্বীকার করবেন না। তিনি অনুভব করতেন, 'আমাদের একটা জাতিগঠন করতে হবে এবং হ্যাম্পডেন ও ক্রমওয়েলের আপোষহীন আদর্শবাদের দ্বারাই তা করা সম্ভব।'

এই সময় তিনি তাঁর ভাই এবং বন্ধুদের কাছে বিদেশ থেকে যে সব চিঠিপত্র লিখেছিলেন তার থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, স্বামী বিবেকানন্দের জীবনাদর্শ এবং অরবিন্দ ঘোষের বৈপ্লবিক কর্মোদ্যোগ তখন সুভাষের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

আই. সি. এস. পাশ করার পরের বছর জুন মাসের শেষে সুভাষ ভারতের উদ্দেশে ইংল্যাণ্ড ত্যাগ করেন। মাত্র কুড়ি মাস তিনি ওদেশে ছিলেন।

ষোলোই জুলাই সুভাষ বোম্বাইতে অবতরণ করেন এবং সেই দিন বিকেলেই তিনি সাক্ষাৎ করলেন গান্ধীজীর সঙ্গে। ইতিমধ্যে গান্ধীজী বিশ সালের ডিসেম্বর মাসে নাগপুর কংগ্রেস থেকে তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বানের মাধ্যমে ভারতবর্ষে অবিসংবাদী নেতা হয়ে উঠেছিলেন।

কলকাতায় এসে সুভাষ সাক্ষাৎ করলেন দেশবন্ধুর সঙ্গে। পরবর্তীকালে সুভাষ লিখেছেন, 'আমি অনুভব করতে শুরু করেছিলাম যে, একজন মানুষ আছেন এখানে যিনি আপনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানেন, যিনি নিজের সব কিছু ত্যাগ করতে পারেন এবং অপরের দেবার মতো যা কিছু আছে তা দাবি করতে পারেন তাদের কাছ থেকে তারুণ্য যার কাছে অক্ষমতা নয় বরং একটি গুণ। আমাদের কথাবার্তা যখন শেষ হয়ে এল ততক্ষণে আমার মন তৈরি হয়ে গেছে। একজন নেতাকে খুঁজে পেয়েছি বলে অনুভব করলাম এবং মনস্থ করলাম যে অনুসরণ করব তাঁকেই।'

সুভাষ নিজেকে দেশবন্ধুর হাতে ছেড়ে দিলেন আর দেশবন্ধু তাঁকে 'বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজ' -এর অধ্যক্ষ নিযুক্ত করলেন, ন্যাশন্যাল ভলান্টিয়ার কোর-এর নেতাও হলেন সুভাষ। এই কাজটি তাঁর অত্যন্ত পছন্দসই ছিল। এই সঙ্গে তিনি বাড়তি দায়িত্ব নিলেন বাংলা-কংগ্রেসের প্রধান প্রচার অধিকর্তার। অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মতে, 'প্রতিটি পদে তিনি তাঁর যোগ্যতা প্রদর্শন করেছিলেন।'

ওই একুশ সালের ডিসেম্বর মাসের দশ তারিখে চিত্তরঞ্জন ও সুভাষ তাঁদের অনুগামীসহ গ্রেপ্তার হলেন। দীর্ঘ বিচার-যন্ত্রণার শেষে চিত্তরঞ্জন, সুভাষ ও বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে ছ'মাস হাজতবাসের শাস্তি দেওয়া হল। 'মাত্র ছ'মাস?' বিদেশী শাসকের হাতে পাওয়া প্রথম শাস্তি-সম্পর্কে এই ছিল সুভাষের বিস্মিত প্রতিক্রিয়া।

উত্তরপ্রদেশে চৌরিচৌরার বিপর্যয় ও গান্ধীজীর আন্দোলন প্রত্যাহারের ডাকে দেশবাসীর প্রতিক্রিয়ার কথা ইতিপূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি। এ-সম্পর্কে সুভাষের কঠোর মন্তব্য হল, 'জনগণের উৎসাহ যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে, তখন পশ্চাদাপসরণের নির্দেশ উচ্চারণ একটি জাতীয় বিপর্যয়ের তুলনায় কিছুই কম নয়।'

কঠোর পরিশ্রম, যোগ্যতা এবং দেশবন্ধুর অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে খুব অল্প সময়ের মধ্যে সুভাষ বিখ্যাত হয়ে উঠলেন। তিনি 'বাংলার কথা' পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হলেন এবং একজন যুবনেতা হিসেবে সারা ভারত যুবলীগ গড়ে তুললেন। তেইশ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি নিজে ওই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হলেন। শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তাঁর কৃতিত্ব কম ছিল না। তিনি টাটা আয়রণ এ্যাণ্ড স্টিল কোম্পানীর সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং একবার সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভায় সভাপতিত্বও করেছিলেন।

তিনি নিজে যখন যুবলীগের সভাপতি হয়েছিলেন, ওই একই সময়ে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসেরও সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। ইতিপূর্বে, মাত্র এক বছর আগে মস্কোয় অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশন্যালের চতুর্থ কংগ্রেসে একজন স্বাধীনতা-সংগ্রামী এবং সংগঠক হিসেবে সুভাষকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু ওই আমন্ত্রণপত্র পুলিশ আটক করে এবং বাজেয়াপ্ত করে নেয়।

চব্বিশ সালের প্রথম দিকে স্বরাজ্য দলের সদস্যরা কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিরাট সাফল্য অর্জন করে। যদিও পৃথক নির্বাচক-মণ্ডলীর ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তবু এক বিরাট সংখ্যক মুসলমান প্রার্থী স্বরাজ্য দলের সদস্যদের টিকিটে নির্বাচিত হন। ওই নির্বাচনে দেশবন্ধু ও শহীদ সুরাবর্দী যথাক্রমে মেয়র ও ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হন। সুভাষ নির্বাচিত হন চিফ একজিকিউটিভ অফিসারের পদে। পুলিশ দপ্তরের গোপন নথি থেকে জানা যায়, ওই পদে নির্বাচিত হয়ে সুভাষ বহু সন্ত্রাসবাদীকে কর্পোরেশনে চাকরি দিয়েছিলেন।

কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলা (১৯২৪)

ওই মামলায় মুজফ্ফর আহমেদ, শ্রীপদ অমৃত ডাঙ্গে, শওকৎ উসমানি ও নলিনী গুপ্ত—এঁদের প্রত্যেকেরই চার বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। অসুস্থতার জন্য মজফ্ফর আহমেদ ও নলিনী গুপ্ত এক বছর জেল খাটার পর মুক্তি পান।

কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলা (১৯২৫)

উত্তর প্রদেশের কাকোরী রেলস্টেশনের কাছে বিপ্লবীরা ট্রেন থামিয়ে মেল ভ্যান লুঠ করেন নয়ই আগস্ট তারিখে। ওই ঘটনায় এক ব্যক্তি নিহত হন। বিপ্লবীরা হিন্দুস্তান রিপাবলিকান আর্মির সদস্য। ওই মামলায় চারজন বিপ্লবীর ফাঁসী হয়। এঁরা হলেন; রামপ্রসাদ বিসমিল, আস্ফাকুল্লাহ, ঠাকুর রওশন সিং ও রাজেন্দ্র লাহিড়ী। শচীন সান্যাল, যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিপ্লবীদের দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড হয। রামপ্রসাদ 'সব ফারোসি কি তমন্না অব্ হমারে দিল মে হ্যায়, দেখ্না হ্যায় জোর কিত্না বাজু এ কাতিন সে হ্যায়' গানটি গাইতে গাইতে ফাঁসীকাঠে প্রাণ দেন উনিশে ডিসেম্বর তারিখে। এই গানটি বিসমিল আজিমাবাদীর রচনা। রামপ্রসাদ বিসমিলের মা ছেলের ফাঁসীর সংবাদ পেয়ে তাঁর সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন গোরক্ষপুর জেলে। বীর রামপ্রসাদের চোখে জল দেখে তাঁর মা তাঁকে জিগ্যেস করলেন, 'তুমি কি ভয় পেয়েছ? মৃত্যুকে সর্বোত্তম আনন্দে এবং সর্বাধিক সাহসে বরণ করার মুহূর্তে তুমি কি ভয় পেয়েছ?'

পুত্র তখন বললেন, 'তোমার দুঃখে আমার চোখ ভিজে গিয়েছে, মা। আমার নিজের দুঃখে নয়। আমি পরমানন্দে শহীদ হতে যাচ্ছি।'

কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় গোবিন্দ কর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর লাভ করেন। এই মামলার অন্যতম পলাতক বিপ্লবী-আসামী ছিলেন চন্দ্রশেখর আজাদ। ছ'বছর পরে, একত্রিশ সালের সাতাশে ফেব্রুয়ারী এলাহাবাদের এ্যালফ্রেড পার্কে চন্দ্রশেখর আজাদ পুলিশ কর্তৃক আক্রান্ত হলেন। সশস্ত্র সংগ্রামে তিনি মহান বীরের মতো মৃত্যুবরণ করে শহীদ হলেন।

কানপুরে কমিউনিস্ট সম্মেলন

পঁচিশ সালের ডিসেম্বর মাসে কানপুরে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন হজরৎ মোহানি। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মুজফ্ফর আহ্মেদ, সচ্চিদানন্দ বিষ্ণু ঘাটে, কে. এল. যোগলেকর, বাবা সন্তোষ সিং ও মহম্মদ হাসান প্রমুখ অর্থাৎ বোম্বাই, কলকাতা, মাদ্রাজ, লাহোর—দেশের চারটি কমিউনিস্ট চক্র থেকেই প্রতিনিধিরা যোগ দিয়েছিলেন ওই সম্মেলনে। সম্মেলনে একটি সংক্ষিপ্ত কর্মসূচী ও গঠনতন্ত্র গৃহীত হয় এবং নির্বাচিত হয় পার্টির একটি কার্যনির্বাহক সমিতি।

সুভাষচন্দ্রের বারংবার কারাদণ্ড

সরকার এবং আইনশৃঙ্খলার অভিভাবকদের চোখে সুভাষ ছিলেন একজন ভয়ঙ্কর যুবক। দেশবন্ধু যখন সিমলায়, তখন চব্বিশ সালের পঁচিশে অক্টোবরে সুভাষকে আঠারো সালের রেগুলেশন তিন

ধারায় গ্রেপ্তার করা হল। ওঁর গ্রেপ্তার প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করল দেশে। মেয়র দেশবন্ধু এক ভাষণে বললেন, 'আমি যা বলতে চাই, তা হল সুভাষ আমার চেয়ে বেশি বিপ্লবী নয়। তবে কেন তাঁরা আমাকে গ্রেপ্তার করলেন না? আমি জানতে চাই, কেন? স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা যদি অপরাধ হয় তবে আমি একজন অপরাধী। কেবলমাত্র কর্পোরেশনের চিফ একজিকিউটিভ অফিসার নয়, মেয়রও সমভাবে দোষী।.....কোনো অভিযোগ আনা হয়নি তাঁর বিরুদ্ধে। কোনো জবাবদিহি চাওয়া হয়নি তাঁর কাছ থেকে। কোনো কারণ দেখানো হয় নি...এটা কি আইন? এটা কি বিচার?'

সুভাষকে গ্রেপ্তার করার নিন্দা করে গান্ধীজী 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় একটি সম্পাদকীয় লিখলেন। বে-আইনী গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে একত্রিশে অক্টোবর তারিখে এক বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হল কলকাতায়। আলিপুর নিউ সেন্ট্রাল জেলে প্রায় দু'মাস বন্দী করে রাখা হল সুভাষকে।

জেলে থাকা অবস্থায় প্রায়ই পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে তাঁর ঝামেলা লেগে থাকত। তাই শাস্তি হিসেবে তাঁকে প্রথমে বহরমপুর জেলে এবং সেখান থেকে পঁচিশ সালের শুরুতে তাঁকে উত্তর বর্মার মান্দালয় জেলে স্থানান্তরিত করা হল। ওই জেলে থাকার সময় তিনি বর্মী ভাষা শেখেন।

অক্টোবর মাসে বন্দীরা বাঙালী হিন্দুর শ্রেষ্ঠ জাতীয় উৎসব দুর্গাপুজো করার অনুমতি চাইলে সরকার আপত্তি করল। এর প্রতিবাদ হিসেবে পরের বছর ফেব্রুয়ারী মাসে কয়েদীরা অনশন ধর্মঘট শুরু করলে সরকার নতি স্বীকার করল।

ইতিমধ্যে পঁচিশ সালের ষোলোই জুন দেশবন্ধু প্রয়াত হলেন। ওই ঘটনাকে সুভাষ বলেছেন, 'ভারতবর্ষের পক্ষে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এক জাতীয় বিপর্যয়।'

প্রতিকূল আবহাওয়ার এবং অনশন ধর্মঘটের ফলে সুভাষের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়তে শুরু করল। ওই বছরের (দেশবন্ধুর প্রয়াণ-বছর) শীতকালে তিনি ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হলেন। ফলে ক্রমাগত জ্বর হতে লাগল এবং সুভাষের ওজন হ্রাস পেতে লাগল। লেফ্‌টেনান্ট কর্ণেল কেলহান আর সুভাষের ভাই ডাক্তার সুনীল বসুকে নিয়ে গঠিত একটি মেডিক্যাল বোর্ডকে দিয়ে পরীক্ষা করানোর জন্য তাঁকে রেঙ্গুন জেলে বন্দী করা হল। তাঁকে জেলে আর বন্দী করে না রাখার পক্ষে অভিমত দিলেন ডাঃ বসু।

রেঙ্গুন জেলে সরকারী আদেশের অপেক্ষায় থাকাকালে ইংরেজ অধীক্ষকের সঙ্গে বিবাদ ঘটনার পরিণতিতে তিনি ইনসেইন জেলে বদলী হলেন। বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে এক প্রস্তাব মারফত প্রশাসন জানাল যে সুভাষ যদি নিজ-ব্যয়ে সুইজারল্যাণ্ডে যেতে চান, তবে তারা তাঁর মুক্তির ব্যবস্থা করবে এবং রেঙ্গুন থেকে ইউরোপগামী জাহাজে তুলে দেবে। সুভাষ তাঁর আত্মমর্যাদার পক্ষে অসম্মানজনক এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন।

পাঞ্জাবে বাব্বর অকালি আন্দোলন

ইতিমধ্যে পাঞ্জাবে ধর্মকে কেন্দ্র করে জোরদার সরকার বিরোধী আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং গুরুতর সংঘর্ষ ঘটে। যাঁরা গুরুদ্বারগুলোতে মোহান্ত ছিলেন, সেইসব মোহান্তদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন অত্যাচারী, অসচ্চরিত্র ও শোষণকারী। ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারে আগ্রহী পাঞ্জাবীরা তাঁদের বিরুদ্ধে বিশের দশকে প্রথম ছ'বছর সম্পূর্ণ অহিংস উপায়ে আন্দোলন চালাচ্ছিলেন। এই সময়ে অনেক নিরস্ত্র আন্দোলনকারীদের উপর গুলি চালিয়ে নানকানা সাহেবের মোহান্ত কয়েক শো মানুষকে হত্যা করেন। গুরু-কা-বাগ গুরুদ্বারে সত্যাগ্রহ দমনের জন্য মোহান্ত পুলিশের সাহায্য চাইলে পুলিশ এসে সাড়ে পাঁচ হাজার সত্যাগ্রহীকে গ্রেপ্তার করে ও বহু সত্যাগ্রহীর উপর নৃশংস অত্যাচার চালায়। এইবার অত্যাচারিত পাঞ্জাবীরা ফিরে দাঁড়ান এবং তাঁরা অনেক অত্যাচারী পুলিশ অফিসার ও গুপ্তচরকে হত্যা করেন। এঁরা পরিচিত হন বাব্বর (সিংহ) অকালি নামে। পুলিশের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘাতে এবং গ্রেপ্তার হয়ে ফাঁসীকাঠে এঁদের অনেকেই মৃত্যুবরণ করেন।

আলিপুর জেলে আর একটি হত্যা

পঁচিশ সালের শেষের দিকে দক্ষিণেশ্বরে একটি বোমার কেন্দ্র পুলিশ আবিষ্কার করে এবং এই সূত্রে একদল তরুণকে বন্দী করে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে রাখে।

এই তরুণেরা যুগান্তর ও অনুশীলন সমিতির সদস্য। এঁদেরই অন্যতম হলেন অনন্তহরি মিত্র ও প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী।

আই বি.র স্পেশাল এস.পি. রায়বাহাদুর ভূপেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী ছিলেন অত্যন্ত ধুরন্ধর ব্যক্তি। ইংরেজ প্রশাসনের কাছে তাঁর কদর ছিল খুব। তিনি মাঝে মাঝে ওই জেলে এসে যাঁরা সুকুমার-মতি অল্প বয়স্ক তরুণ, তাঁদের মনোবল ভাঙতে নানারকম কৌশল প্রয়োগ করতেন। কিন্তু অবরুদ্ধ বিপ্লবীদের মধ্যে যাঁরা দুরন্ত দুর্বার, তাঁরা ওই পুলিশ-অফিসারের কুশলী খেলা দেখে মনে-মনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে থাকেন। নিরস্ত্র হলেও প্রতিশোধ নিতে হাত নিশপিশ্ করতে থাকে।

তাঁরা কয়েকজন মিলে গোপনে সংকল্প করলেন, ইংরেজের এই খয়ের খাঁকে তাঁরা পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবেন। যে-কোনো উপায়েই হোক।

জেলে জেনারেল 'লক-আপ' হয়ে গেছে একদিন। তখন বিকেলবেলা। ভূপেন চ্যাটার্জী চলেছেন বন্ব-ইয়ার্ডের দিকে তাঁর নিত্য কর্ম পালন করার তাগিদে। হঠাৎ কোত্থেকে কি হল। প্রচণ্ড ডাণ্ডার ঘায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন প্রভুর-প্রসাদে-বীরপুঙ্গব পুলিশ সুপার। সঙ্গে সঙ্গে সাঙ্গ হল তাঁর ভবলীলা। কি করে যেন বন্দীরা সংগ্রহ করেছিলেন একটি শাবল। হয়তো দুপুর বেলায় কোনো সাধারণ কয়েদী ওইসব শাবল-খোন্তা নিয়ে জেল-ইয়ার্ডে মেরামতী-কাজ করছিল। ওটা তাদের কাছ থেকে বাগিয়ে নেওয়া সম্ভব নয় সিপাহী-মেটদের সাহায্য ছাড়া।

যাই হোক, এই অভাবনীয় ঘটনায় জেলখানায় হই-চই শুরু হয়ে গেল। পাগলা-ঘন্টি বেজে উঠতেই চারদিক থেকে অসংখ্য পুলিশ ছুটে এল। এলোমেলোভাবে দশজনের বিরুদ্ধে বিচার শুরু হল।

কিন্তু এই বিপ্লবী বন্দীদের বিরুদ্ধে সাক্ষী-সাবুদের অভাব ঘটল। প্রত্যক্ষদর্শী ছিল মাত্র একজন। মতি। খুনের দায়ে বিশ বছরের সাজা ভোগ করছে সে। সে তো সাক্ষী দিলই না, এমন কি ইউরোপীয় ওয়ার্ডার যাঁরা একটু দূরে ডিউটিতে ছিলেন এবং চাক্ষুষ ব্যাপারটা ঘটতে না দেখলেও ঘটে যাবার সাথে-সাথেই ঘটনাস্থলে এসেছিলেন তাঁদের দিয়েও পুলিশ মিথ্যে কথা বলাতে পারেনি। এঁদের মধ্যে দুজনে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সার্জেন্টের নাম বিপ্লবীরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতেন। ব্রুমফিল্ড ও লাভ্‌রি। শত প্রলোভন ও মানসিক চাপ সৃষ্টি করেও ইংরেজ প্রশাসন ওঁদের টলাতে পারেনি। সুভাষ জেলে থাকার সময় বহুবার এই সার্জেন্ট দু'জনকে বলেছেন স্বদেশী-বন্দীদের সাহায্য করতে গিয়ে তাঁদের চাকরি গেলেও ভয় পাবার কিছু নেই, তিনি অবিলম্বে ওঁদের কলকাতা কর্পোরেশনে ঢুকিয়ে দেবেন।

কিন্তু সাক্ষী না পাওয়া গেলেও ইংরেজ প্রশাসন বিচলিত হয় নি। পুলিশের সাজানো কথা বলে গেল কয়েকজন সাজানো কয়েদী। ফলে, ওদের মেয়াদকাল বাড়িয়ে দিল ব্রিটিশ ভারতের ন্যায়নিষ্ঠ সরকার।

ফাঁসীর আদেশ পেলেন অনন্তহরি মিত্র ও প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী। রাখাল দে, ধ্রুবেশ চ্যাটার্জী ও অনন্ত চক্রবর্তীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হল। বাকি পাঁচজন বেকসুর খালাস পেলেন।

ছাব্বিশ সালের আটাশে সেপ্টেম্বর ভোরবেলায় আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে অনন্তহরি ও প্রমোদরঞ্জনের ফাঁসী হয়ে গেল।

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংঘ ও ভারতবর্ষ

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংঘের প্রতিষ্ঠা হয় উনিশ শো সাতাশ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের দশ থেকে পনেরো তারিখে। ব্রাসেল্‌সে অনুষ্ঠিত ওই সম্মেলনে ভারতবর্ষ থেকে যোগ দিয়েছিলেন জবাহরলাল

নেহরু, মওলানা বরকতুল্লাহ্, সাপুরজী সাকলাৎওয়ালা, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এই সংঘের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মাদাম সান্ ইয়াৎ সেন্, অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, আপ্টন সিনক্লেয়ার, আঁরি বারবুস ও ম্যাক্সিম গোর্কি। সংঘের দুই সাধারণ সম্পাদক ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও উইলি সুনজেন বুর্ক। সভাপতি-মণ্ডলী গঠিত হয়েছিল জবাহরলাল. লান্সবেরি, এডোফিম্মেল, জেনারেল লু চিং-লিন ও কুওমিনটাং-এর নিয়াওকে নিয়ে।

খড়্গপুর ও লিলুয়ায় শ্রমিকদের ধর্মঘট

ব্রাসেল্সে যখন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংঘ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল, সেই একই সময়ে বারোই ফেব্রুয়ারী তারিখে খড়্গপুরে আড়াই হাজার রেল শ্রমিক ধর্মঘট করেন। রেল কোম্পানীর প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে মার্চ মাসে ধর্মঘটের অবসান হয়।

কিন্তু প্রতিশ্রুতি না রেখে মাত্র ছ'মাস পরে কর্তৃপক্ষ সতেরো শো রেল শ্রমিককে ছাঁটাই করার নোটিশ জারী করেন। পরদিন থেকে সর্বাত্মক ধর্মঘটে সামিল হন আড়াই হাজাব রেল শ্রমিক। রেল ধর্মঘট ছ'মাস পেরিয়ে গেলে, ওঁদের সমর্থনে ধর্মঘটে নেমে পড়লেন লিলুয়ার রেল শ্রমিকেরা। ওই আন্দোলনে তখন নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন কিরণ মিত্র (জটাধারী বাবা), শিবনাথ ব্যানার্জী, গোপেন চক্রবর্তী ও ধরণী গোস্বামী।

লিলুয়ার লোকোশেডটি ছিল কয়েক মাইল দূরে বামুনগাছিতে। কয়েক হাজার ধর্মঘটী শ্রমিক বামুনগাছির দিকে মিছিল নিয়ে গেলে পুলিশ গুলি চালায়। এর ফলে পাঁচজন শ্রমিক নিহত হন। অতঃপর ধর্মঘটে নামলেন 'জেসপ', 'বার্ণ' ও অন্যান্য কারখানার শ্রমিকেরা। পরের বছর জুলাই মাসে অবশেষে লিলুয়ার ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হল। ছ'মাসের উপর ওই ধর্মঘট চালিয়ে যাবার সময় শ্রমিকেরা যেমন ছিলেন ঐক্যবদ্ধ তেমনই ছিলেন আপোষহীন।

এটা অবশ্য ঠিক, খড়্গপুর ও লিলুয়া ধর্মঘটের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের আশু দাবি পূরণ হয়নি। কিন্তু ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে শ্রমিক-শ্রেণী সেদিন যে সচেতনতা ও সংগ্রামী সৌহার্দ্য দেখিয়েছিলেন তা আগামী দিনের বিপুলতর সাফল্যের প্রতিশ্রুতি বহন করে এনেছিল। এমন কি, ওই বছরের তেরোই সেপ্টেম্বরে রেল-শ্রমিকদের সমর্থনে যে ভারতব্যাপী স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট হয় তা-ও এই পর্বের সংগ্রামী মেজাজের ইঙ্গিতবহ।

হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান আর্মি

বিশের দশকের শেষ দিকে বাংলার বাইবে তরুণ বিপ্লবীরা ব্রিটিশ সিংহকে আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এঁদের সহায়তা করছিলেন শচীন সান্যাল ও যোগেশ চট্টোপাধ্যায়। ত্রৈলোক্য মহারাজ ভগৎ সিংকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, লাহোর-কংগ্রেসে তিনি যেন এক বিরাট স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গড়ে সুদূর বিপ্লবের পথ তৈরি করেন! কিন্তু ভগৎ সিং তার পরিবর্তে গড়লেন এক গোপন বাহিনী এবং তার নাম দিলেন 'হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান পার্টি!' উদ্দেশ্য, বিপ্লবেব ধ্বনি তখনই উচ্চাবণ করা। ওই যজ্ঞের হোতারূপে যে সব তরুণেরা সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের নিষ্ঠা-নিয়মানুবর্তিতা-শৌর্য-বীর্য অতুলনীয়। ত্রৈলোক্য মহারাজের কাছে ভগৎ সিং বলেছিলেন, 'আমাদের এমন সব যুবক আছে, তাদের কেটে টুকরো-টুকরো করলেও টু-শব্দ কববে না।' এই উক্ত যে কতটা সত্য, তা প্রমাণিত হয়েছে ওই পার্টির ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডে।

এই পার্টি সমগ্র পাঞ্জাব-যুক্তপ্রদেশ-বিহারে ওই অল্প সময়ে সংগঠন ব্যবস্থাও করেছিল কার্যকর। ঝড়ের বেগে উত্তর-ভারতকে আলোড়িত করে যেতে পারলেন তরুণ-বিপ্লবীদল। ইংরেজের সুবিশাল প্রশাসন-যন্ত্র অবশ্য অল্পকালের মধ্যে তাঁদের স্তব্ধ করে দিয়েছিল কিন্তু সেই স্বল্পকালের মধ্যেই বিপ্লবীরা

দুর্দান্ত ব্রিটিশ-সিংহের কোমর ভেঙে দিয়ে গেলেন। এই আঘাত যে আগামী মহাবিপ্লবের পথ সুগম করে দিয়েছিল, ঐতিহাসিকেরা সে কথা অস্বীকার করেন নি।

সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে পুনরায় টানাপোড়েন

উত্তরপ্রদেশের আলমোড়া জেলে স্থানান্তরিত করার অভিপ্রায়ে সাতাশ সালের মে মাসে সুভাষকে ইনসেইন জেল থেকে সরিয়ে রেঙ্গুন পরিত্যাগরত এক জাহাজে তুলে দেওয়া হল। ডায়মণ্ডহারবারে পৌঁছে তিনি পুলিশের গুপ্তচর বিভাগের প্রধান লোম্যানকে দেখতে পেয়ে গোপনে তাঁকে কলকাতার বাইরে পাচার করার সন্দেহে জাহাজ থেকে নামতে অস্বীকার করলেন। তখন তাঁকে একটি মেডিক্যাল বোর্ডের সামনে উপস্থিত হতে বলা হল। বোর্ডে ছিলেন স্যার নীলরতন সরকার , ডাঃ বি. সি. রায়, লেফটেন্যান্ট কর্নেল স্যাণ্ডস এবং রাজ্যপালের ব্যক্তিগত চিকিৎসক মেজর হিংস্টন। তাঁরা সুভাষের মুক্তির সুপারিশ করে রাজ্যপালের কাছে নোট পাঠিয়ে দিলেন এবং এগারোই মে তারিখে গভর্নর সুভাষের মুক্তির আদেশে সই করলেন যদিও পুলিশ দপ্তরের চক্রান্তের ফলে সুভাষ মুক্তি পেলেন আরও পাঁচ দিন পরে।

কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন

শুধু ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসেই নয়, বিপ্লবী ভারতের ইতিহাসেও আটাশ সালে অনুষ্ঠিত কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ওই অধিবেশনে সবাই এসে হাত মিলিয়েছিলেন অধিবেশনের জি. ও. সি. ইন. সি. সুভাষের সঙ্গে। সেদিন অনুশীলন, যুগান্তর, পূর্ণ দাসের দল, হেমচন্দ্র ঘোষের মুক্তিসংঘ, মাস্টারদা সূর্য সেনের দল, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন শাখা, কেউ বাদ গেল না। বিপ্লবী যুগের কর্মীরাই বাংলায় কংগ্রেসকে শক্তিশালী করে গড়ার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করেন। সূর্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী প্রমুখেরা তো ছিলেনই, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন ময়মনসিংহ থেকে সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ ও জ্ঞান মজুমদার, ঢাকা থেকে মদনমোহন ভৌমিক, কলকাতার বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, অরুণ গুহ, ভূপেন দত্ত, বরিশাল থেকে সতীন সেন, মনোরঞ্জন গুপ্ত এবং রাজসাহী থেকে প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী ও তাঁদের হাজার-হাজার অনুগামী। এ ছাড়া সুভাষ তাঁর পাশে পেয়েছিলেন ভলান্টিয়ার্স মুভমেন্টের সেনাপতি মেজর সত্য গুপ্তকে। কংগ্রেসের এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীই হল উনত্রিশ সাল থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজের পূর্বকাল পর্যন্ত বিপ্লবকাণ্ডের মূলাধার। সুভাষের পার্ক-সার্কাস ময়দানের কর্নেল লতিকা বসু-পরিচালিত নারী-বাহিনীই আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্নেল লক্ষ্মী সায়গল-পরিচালিত ঝাঁসীর রাণী ব্রিগেডের অঙ্কুর। ওঁর কলকাতা-কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীরূপ বীজের রূপান্তর ঘটেছিল মাত্র পনেরো বছর পরে দুর্জয় আজাদ হিন্দ ফৌজের মহা-মহীরুহে। কংগ্রেসের বরেণ্য নেতৃবৃন্দকে নিয়ে হাওড়া স্টেশন থেকে পার্ক-সার্কাস ময়দান পর্যন্ত কলকাতা শহরে অভূতপূর্ব বিশাল বর্ণাঢ্য মিছিল পরিচালনা এবং অধিবেশন চলাকালীন এক বিশাল স্বেচ্ছাবাহিনীর সুশৃঙ্খল কার্যকলাপে দেশের আপামর জনসাধারণ আনন্দিত হলেও খুশি হতে পারেননি গান্ধীজী। বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স ও সর্বাধিনায়কের বেশে সুভাষের তেজোদ্দীপ্ত চেহারাটিকে প্রসন্নদৃষ্টিতে দেখতে পারলেন না তিনি। তাই প্রকাশ্য ভাষণে তিনি খোলাখুলিভাবেই রসিকতা করে বললেন, 'এ হল পার্ক সার্কাসের সার্কাস।'

আসলে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধীজী ও সুভাষের অবস্থান একেবারে দুই মেরুতে। সহিংস বিপ্লবে গান্ধীজী কখনই আস্থা রাখতে পারেন নি, অথচ সুভাষ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারকে এদেশ থেকে তাড়াতে গেলে সশস্ত্র সংঘর্ষ অনিবার্য।

সুভাষকে খোলাখুলিভাবে একদিন প্রশ্ন করেছিলেন গান্ধীজী, বিপ্লবীদের সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করা তোমার পক্ষে কি কোনরকমেই সম্ভব নয়?

না। সুভাষের সংক্ষিপ্ত উত্তর।

কারণ?

কারণ, বিপ্লব মানে শুধু ধ্বংস নয়, সৃষ্টিও বটে। একহাতে তার রণতূর্য, অন্য হাতে সৃজন মুখর বাঁশরী। তাই একই সঙ্গে তার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে ওঠে ধ্বংস ও সৃষ্টির আহ্বান। এককথায় বিপ্লবের অর্থ—অন্যায় রাষ্ট্রব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। আপনি কি তা চান না? সেদিক থেকে বিচার করতে গেলে আপনিই কি ভারতের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নন?

জবাব শুনে নির্বাক হয়ে গিয়েছিলেন গান্ধীজী। আশ্চর্য, যেমন গুরু তেমনই তাঁর শিষ্য। দেশবন্ধুও ঠিক এমনি কথাই বলতেন। বিপ্লবীদের প্রসঙ্গ উঠলেই খোলাখুলি ভাবেই তিনি বলতেন, ওদের নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের কথা ভাবলে আমার সকল অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে যায়। সুভাষের মুখেও একই কথার প্রতিধ্বনি যেন শোনা গেল আজ।

স্যাণ্ডার্স হত্যা

ভারতবর্ষের দিকে দিকে আগুন জ্বলে উঠেছে। তাই বিক্ষুব্ধ ভারতবর্ষকে শান্ত কবার নীতি ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা গ্রহণ করে আটাশ সালে এদেশে পাঠাল সাইমন কমিশন। তাঁরা সরেজমিনে সবকিছু জেনেশুনে একটি রিপোর্ট দাখিল করার দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন। হয়তো ভারতবাসীর কিছু দাবি-দাওয়া পূরণ হতেও পারে।

কংগ্রেস কিন্তু সরকারের এই লোক-দেখানো প্রজা-প্রীতিতে ভুলল না। তারা সম্পূর্ণ বর্জন করল এই কমিশনকে। কমিশনের চেয়ারম্যানকে দেশের লোক কালো-পতাকা দেখিয়ে বলতে থাকল, 'গো ব্যাক, সাইমন'।

অবশেষে ত্রিশে অক্টোবরে লাহোরে এল সাইমন কমিশন। কালো পতাকা হাতে নিয়ে বিশাল জনতা শহরের রাজপথে মিছিল বের করল। কণ্ঠে তাদের 'গো ব্যাক সাইমন' ধ্বনি। তাদের পুরোভাগে ছিলেন লালা লাজপৎ রাই এবং অন্যান্য নেতৃবর্গ।

শান্তিপূর্ণ মিছিলে পুলিশ নৃশংসভাবে লাঠি চালালে লাজপৎ রাইয়ের বুকে আঘাত লাগল। শুধু তাই নয়, ওঁর চোখে-মুখে অবিশ্রান্তধারায় নেমে এল পুলিশের ঘুষি।

গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হল। সতেরো দিন পরে লোকান্তরিত হলেন তিনি। দুঃখে-শোকে মুহ্যমান গোটা ভারতবর্ষ, ক্ষোভে-ক্রোধে প্রজ্বলিত তরুণ চিত্ত। পাঞ্জাবের বিপ্লবী দল দেশনায়কের মৃত্যুর প্রত্যুত্তর দেবার কাল গুণতে থাকলেন প্রশান্ত চিত্তে।

সাতাশ সালের ডিসেম্বরে কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশন পূর্ণ স্বাধীনতাকে আমাদের জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্য ঘোষণা করে। পরের বছরে সোভিয়েত সফর ও ব্রাসেল্সের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সম্মেলন থেকে ফিরে জবাহরলাল স্বয়ং আনলেন পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব। সমর্থন করলেন যোগলেকর। তা পাশও হয়ে গেল অনায়াসেই। গান্ধীজী ওই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন না, তিনি বিরক্তি প্রকাশ করলেন এই বলে যে, প্রস্তাবটি নাকি 'মূঢ়তাপ্রসূত ও চিন্তাভাবনা না করেই সেটিকে পাশ করা হয়েছে।'

তবে ওই মাদ্রাজ অধিবেশনেই পাশ করা হয়েছিল সাইমন কমিশন বয়কটের জোরালো প্রস্তাব। তাই সাইমন কমিশন বোম্বাই বন্দরে পৌঁছনো মাত্র সারা দেশে হরতাল হয়ে গেল। এরপর মাদ্রাজ, কলকাতা, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, পাটনা যেখানে কমিশন যায় সেখানেই হরতাল হতে থাকল। বিশাল মিছিল থেকে 'সাইমন কমিশন, গো ব্যাক' ধ্বনি উঠলেই পুলিশ নির্মমভাবে লাঠি চালাত। তার দাপট থেকে রেহাই পেতেন না নেতারাও। লক্ষ্ণৌয়ে মিছিল পরিচালনা করার লময় লাঠির আঘাতে আহত হয়েছিলেন জবাহরলাল ও গোবিন্দবল্লভ পন্থ। এমনিভাবে গুরুতর আহত হলেন লালা লাজপৎ রাই পাঞ্জাবে। ওই প্রবীণ নেতার উপর পুলিশের কাপুরুষোচিত আক্রমণকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করে সেদিন পত্র এল রম্যাঁ রলাঁর কাছ থেকে।

ভগৎ সিং ও তাঁর সতীর্থদেব বিপ্লবী সংগঠন হিন্দুস্থান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান পার্টির গোপন অধিবেশনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, লালা লাজপৎ রাইয়ের মৃত্যুর জন্য দায়ী পুলিশ-কর্তা স্কটকে উড়িয়ে দিতে হবে। এটা না করলে পাঞ্জাবের লোকের মনোবল ফিরে আসবে না।

প্রায় এক মাস কেটে গেল। অবশেষে এল সেই লগ্ন। সতেরোই ডিসেম্বর। অপরাহ্ণ চারটে সাঁইত্রিশ মিনিট। পুলিশ-কর্তার দপ্তরের কাছে অপেক্ষা করছেন ভগৎ সিং, রাজগুরু, চন্দ্রশেখর আজাদ প্রমুখ বিপ্লবীবৃন্দ।

একজন ইউরোপীয় অফিসার দপ্তর থেকে বেরিয়ে মোটর সাইকেলে উঠতে যাওয়ার সময় স্কট ভেবে রাজগুরু গুলি করলেন যে পুলিশ অফিসারটিকে তাঁর নাম স্যাণ্ডার্স। একজন ইউরোপীয় সার্জেন্ট গুলির শব্দ শুনেই দপ্তর থেকে সবেগে বেরিয়ে এসে তাড়া করল রাজগুরুকে। স্যাণ্ডার্সের দেহরক্ষী চন্দন সিংও ছুটল রাজগুরুর পিছনে।

তখন ভগৎ সিং শায়িত স্যাণ্ডার্সের রক্তাপ্লুত দেহে পরপর কয়েকটি গুলি ছুঁড়ে ঝাঁঝরা করে দিলেন। ওদিকে চন্দ্রশেখর আজাদের ছোঁড়া গুলিতে নিহত হল চন্দন সিং।

বিপ্লবীরা কাজ শেষ করেই পালিয়ে গেলেন। কেউ তাঁদের পাত্তা পেল না।

একুশে ডিসেম্বর লাহোর ও শালিমার গেটে বিপ্লবীরা ইস্তাহার লটকে দিলেন। তাতে ইংরেজ বিতাড়নের যুদ্ধে তরুণ রক্ত ঢেলে অর্ঘ্যদানের আহ্বান ছিল। শহরের দেয়ালে আরও ইস্তাহার লাগিয়ে ঘোষণা করলেন বিপ্লবীরা। তাতে ওঁদের দলের সামরিক অধিকর্তার তরফ থেকে অর্থ-পুরস্কার ঘোষণা করা হল বিপ্লবী কর্মকর্তাদের ধরবার চ্যালেঞ্জ জানিয়ে।

বারদৌলি সত্যাগ্রহ (১৯২৮)

ওই বছরের মাঝামাঝি গুজরাটের বারদৌলি তহশিলের কৃষকেরা কুড়ি থেকে পঁচিশ বছর অন্তর-অন্তর শতকরা পঁচিশভাগ ভূমি রাজস্ব বৃদ্ধির যে ব্যবস্থা ছিল তার বিরুদ্ধে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ আন্দোলন করেন। এই সম্পন্ন ও মাঝারি শ্রেণীর কৃষকেরা খাজনা-বৃদ্ধির বিরোধী ছিলেন না। তাঁদের বক্তব্য ছিল বৃদ্ধির হার কিছুতেই অত বেশি হওয়া উচিত নয় কারণ তাঁরা ওই পঁচিশ বছরে ফসল বৃদ্ধি করেছেন তাঁদের শ্রমে ও টাকায়। কাজেই নিরপেক্ষ তদন্তের পর খাজনা বৃদ্ধির হার স্থির করতে হবে—সরকার খুশিমতো খাজনা বৃদ্ধি করলে চলবে না। সরকার তাঁদের আবেদন অগ্রাহ্য করলে তাঁরা খাজনা বন্ধ করবেন।

এই দাবির ফলে সরকার কৃষকদের গরু-বাছুর ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে শুরু করল এবং পুলিশী নির্যাতন শুরু করল। আন্দোলন ব্যাপকরূপ ধারণ করলে সরকার শেষ পর্যন্ত আগষ্ট মাসে খাজনা বৃদ্ধির হার সওয়া ছয় শতাংশে নামিয়ে আনে। কৃষকদের বাজেয়াপ্ত-করা সম্পত্তি ফেরৎ দেওয়া হয় এবং যে-সব রাজকর্মচারী সরকারী জুলুমের প্রতিবাদে পদত্যাগ করেন, তাঁরাও কাজ ফিবে পান।

বোম্বাইয়ের সূতাকল শ্রমিকদের ঐতিহাসিক সাধারণ ধর্মঘট (১৯২৮)

ওই বছরের মার্চ মাসে বোম্বাই সূতাকলের মিল-মালিকরা সিদ্ধান্ত করেন যে প্রত্যেক তাঁতিকে দুটোর বদলে তিনটে তাঁত চালাতে হবে আর শ্রমিককে কাপড় বোনার সময় দু'পাশের যন্ত্রকেই সামাল দিতে হবে। এই ব্যবস্থা চালু হলে শ্রমিকদের উপর কাজের চাপও যেমন বাড়বে তেমনি আবার বহু তাঁতি ছাঁটাই হয়ে যাবে।

সূতাকল শ্রমিকেরা তখন তিনটি সংগঠনে বিভক্ত ছিলেন। প্রথমটি হল, এন. এম. যোশী প্রমুখ নরম-পন্থীদের 'বোম্বাই সূতাকল শ্রমিক ইউনিয়ন'। দ্বিতীয়টি হল, এ. এ. আলওয়ে পরিচালিত কিছুটা জঙ্গী 'গিরনি কামগড় মহামণ্ডল'। এই আলওয়ে পরের বছর মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার আসামী হয়েছিলেন। আর তৃতীয়টি হল, কমিউনিস্ট দ্বারা সদ্য প্রতিষ্ঠিত' গিরনি কামগড় ইউনিয়ন'।

নয়ই এপ্রিল তারিখে শেষের দুটি ইউনিয়ন এক যুক্ত মোর্চা স্থাপন করে শ্রমিকদেব উদ্দেশে এক যৌথ ইস্তাহারে লিখল, 'আপনাদের মজুরী ও চাকরির উপরে সূতাকল মালিকদের নৃশংস আক্রমণ রুখবার একমাত্র পথ হচ্ছে ঐক্যবদ্ধ সাধারণ ধর্মঘট।'

সতেরোই এপ্রিলে বোম্বাইয়ের শতকরা সত্তরটি সূতাকলেই শুরু হল ধর্মঘট। তেইশ তারিখে শ্রমিক-মিছিলের উপর গুলি-চালানোর শহীদ হলেন সূতাকলের জঙ্গী শ্রমিক পরশুরাম যাদব।

সরকারের বর্বরোচিত দমন-পীড়নেও ধর্মঘট ভাঙল না বরং প্রাথমিক দ্বিধা কাটিয়ে বোম্বাই সূতাকল শ্রমিক ইউনিয়নও ছাব্বিশে এপ্রিলে বাধ্য হল সাধারণ ধর্মঘটে যোগ দিতে। কমিউনিস্ট ইউনিয়নের উদ্যোগে কেন্দ্রীয়ভাবে নির্বাচিত হল সমস্ত জঙ্গী শ্রমিক ও সংগঠকদের নিয়ে এক 'স্ট্রাইক কমিটি'—ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এই প্রথম।

বোম্বাইয়ের সূতাকল শ্রমিকদের সর্বাত্মক সাধারণ ধর্মঘটে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসেছিলেন ডাঙ্গে, ঘাটে, নিম্বকর, যোগলেকর ও মীরাজকরের মতো কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ। এই আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সংগঠক ছিলেন ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য বেঞ্জামিন ব্রাডলে।

পরের বছর এরাঁ সকলেই ছিলেন মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার আসামী।

ছ'মাস পরে লড়াই যখন সাময়িকভাবে থামল তখন গিরণি কামগড় ইউনিয়নের সভ্য সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ এবং তহবিলে জমা ছিল লক্ষাধিক টাকা। ষোলো হাজার টাকা পাঠায় সোভিয়েত ইউনিয়নের সূতাকল শ্রমিক ইউনিয়ন আর শ্রমিকদের ডাকা ধর্মঘটকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন সরোজিনী নাইডু ও বিঠলভাই প্যাটেল।

নিখিল ভারত শ্রমিক ও কৃষক পার্টি সম্মেলন (১৯২৮)

ত্রিশে ডিসেম্বরে জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে প্রায় পঞ্চাশ হাজার শ্রমিকের এক দু'মাইল দীর্ঘ বিশাল, সুশৃঙ্খল মিছিল কলকাতার পার্ক সার্কাস ময়দানে কংগ্রেসের অধিবেশনে উপস্থিত হয়। বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স এ্যাসোসিয়েশন, ক্যালকাটা ট্রামওয়ে মেন্‌স্ ইউনিয়ন, ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে লেবার ইউনিযন, ক্যালকাটা পোর্ট-ট্রাস্ট ইউনিয়ন এবং আরো অনেকগুলো ইউনিয়নের উদ্যোগে ওই মিছিল বঙ্কিম মুখার্জী, মুজাফ্‌ফর আহ্‌মেদ, ধরণী গোস্বামী, রাধারমণ মিত্র, গোপেন চক্রবর্তী, শিবনাথ ব্যানার্জী, কিরণচন্দ্র মিত্র, আর. এস. নিম্বকর প্রমুখের নেতৃত্বে কংগ্রেস প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করে।

প্রবেশের সময় প্রথমে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকরা শ্রমিকদের বাধা দিতে চেষ্টা করলে কিছুটা সংঘাত হয়। পরে জবাহরলালের হস্তক্ষেপে ও সভাপতি মতিলাল নেহরুর নির্দেশে তাঁদের প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়। সেখানে জবাহরলালের সভাপতিত্বে যে সভা হয় তাতে কয়েকজন শ্রমিক নেতা ভাষণ দেন। ওই সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। 'শ্রমিক ও কৃষকদের এই জনসভা ঘোষণা করছে যে আমরা দেশের শ্রমিক ও কৃষকগণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত এবং ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের সবরকম শোষণ বন্ধ না হওয়া অবধি নিরস্ত হব না। জাতীয় কংগ্রেসকেও আমরা আহ্বান জানাই ওই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই যেন তাঁরা সমস্ত জাতীয় শক্তিগুলিকে সংগঠিত করেন।'

কিন্তু পরের দিন জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে গান্ধীজীর নেতৃত্বে 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস' প্রাপ্তি সম্পর্কে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

কংগ্রেসের অধিবেশনের মাত্র কয়েকদিন আগে কলকাতার এ্যালবার্ট হলে একুশে ডিসেম্বর থেকে পরবর্তী তিনদিনব্যাপী 'নিখিল ভারত শ্রমিক ও কৃষক পার্টি' সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এর আগেই বাংলা, বোম্বাই, উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবে একের পর এক 'শ্রমিক ও কৃষক পার্টি' গড়ে উঠেছিল। এবার ওই সংস্থাগুলো এবং অন্যান্য বহু ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিকে নিয়ে একটি সর্বভারতীয় পার্টি গড়ার জন্য কলকাতায় এই সম্মেলন আহূত হল সোহন সিং যোশের সভাপতিত্বে। ওই সম্মেলনে ভাষণ দেন

বেঞ্জামিন ব্রাডলে এবং নিউ সাউথ ওয়েলসের ট্রেড ইউনিয়ন পরিষদ এবং প্যান-প্যাসিফিক ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য জে. রায়ান। সম্মেলনে শুভেচ্ছা বাণী পাঠায় 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কার্যনির্বাহক সমিতি।

শ্রমিক ও কৃষকদের কয়েকটি দাবি-সম্বলিত প্রস্তাব ওই সম্মেলনে গৃহীত হয়। সেগুলোর মধ্যে ছিল ট্রেড ডিসপিউট্স্ আইন খারিজ, দৈনিক কাজের সময়-সীমা আটঘণ্টা, সরকারী কর্মচারী সমেত সমস্ত শ্রমিক ও কর্মচারীর ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার অধিকার, এ. আই. টি. ইউ. সি. র অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অধিকার, বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ, বছরে দু'হাজার টাকার বেশি কৃষি-আয়ের উপর উত্তরোত্তর বেশি হারে ট্যাক্স প্রদান প্রভৃতি। এ ছাড়াও ওই সম্মেলনে পার্টির লক্ষ্য স্পষ্ট করে স্থির করা হয়েছিল পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের বিষয়ে। শ্রমিক ও কৃষকের কোনো নিজস্ব প্ল্যাটফর্ম থেকে এই প্রথম স্বাধীনতার দাবি উত্থাপিত হল।

দিল্লীর কেন্দ্রীয় বিধান পরিষদে বোমা নিক্ষেপ

কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে গান্ধীজীর যে প্রস্তাব গৃহীত হল, তার মূল বয়ানে বলা হয়েছিল, পরবর্তী এক বছরের মধ্যে ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ন স্টেটাস দিতে ব্রিটিশ সরকারকে রাজি হতে হবে। সুভাষ এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সংশোধনী এনেছিলেন। তাঁর দাবি ছিল, ডোমিনিয়ন স্টেটাস নয়, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করতে হবে। এই দুই প্রস্তাব ভোটাভুটিতে ফেলা হলে সুভাষের পক্ষে ভোট পড়ে ন'শো তিয়াত্তর, গান্ধীজীর পক্ষে এক হাজার তিনশো পঞ্চাশ।

পূর্ণ স্বরাজের দাবি থেকে কংগ্রেস আপাতত সরে এলেও দেশের পরিস্থিতি তখন অগ্নিগর্ভ। ইতিমধ্যেই জবাহরলাল ও শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারকে নিয়ে সুভাষ 'ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ' গঠনে উদ্যোগী হয়েছেন। তিনি কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে দলের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত

উনত্রিশ সালে ভারতবর্ষ রাজনৈতিক অস্থিরতায় কম্পমান। এমন সময়, আটই এপ্রিল তারিখে দিল্লীর কেন্দ্রীয় বিধান পরিষদে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটল।

বিধান পরিষদের অধিবেশন শুরু হল। দর্শকদের আসনে সাইমন বসে আছেন। সরকারের জন নিরাপত্তা বিল ও শিল্পবিরোধ বিষয়ক বিল আলোচনা হবে। স্পীকারের আসন অলঙ্কৃত করেছেন বিঠলভাই প্যাটেল।

বিলগুলো ভোটাধিক্যে পরাস্ত হলে বড়লাট তাঁর বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে সেগুলোকে বৈধ বলে যে-মুহূর্তে ঘোষণা করলেন, তৎক্ষণাৎ পরিষদের গ্যালারিতে ঢুকলেন ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত। দর্শকদের গ্যালারি থেকে তাঁরা ছড়িয়ে দিলেন রেড-প্যামফ্লেট। তারপর বিপুল শব্দে গর্জে উঠল তিনটি জীবন্ত বোমা। কিন্তু এই বোমায় কেউ ঘায়েল হল না, এমন কি দর্শকের আসনে উপবিষ্ট সাইমন-ও না।

ওঁদের ছড়ানো ইস্তাহারে লেখা ছিল, 'বধিরকে শোনানোর জন্য প্রচণ্ড কণ্ঠস্বরের প্রয়োজন। সরকার-পক্ষও শুনে রাখুন, তাঁদের 'পাবলিক সেফটি বিল' বা 'ট্রেড ডিসপিউট বিল' কিংবা তাঁদের কৃত লালা

লাজপৎ রাইয়ের হত্যার প্রচণ্ড প্রতিবাদ আমরা করে যাচ্ছি ভারতের অসহায় জনসাধারণের পক্ষ থেকে। আমরা আরো জোরের সঙ্গে বলছি যে, অজস্র ব্যক্তি-বিশেষকে হত্য করা সহজ, অথচ আদর্শের হত্যা-সাধন অসম্ভব। বিশাল সাম্রাজ্য ধুলোয় গড়িয়ে পড়ে, কিন্তু আদর্শের মৃত্যু ঘটে না। মানুষের জীবনকে আমরা পবিত্র মনে করি। কিন্তু যে মহান বিপ্লব দেশের সেই মুক্তি এনে দেবে, যে-মুক্তির আবির্ভাবে মানুষকে মানুষ আর শোষণ করতে পারবে না—সে বিপ্লবের বেদীমূলে বহু ব্যক্তিকে উৎসর্গ করতেই হবে। তা অনিবার্য।.......বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।'

তরুণ বিদ্রোহীদের রেড-প্যামফ্লেটের অগ্নিস্রাবী ভাষায় ভারতবর্ষের মানুষ শৌর্যময় এক যুগে আবির্ভূত হল। পরাধীনতার অবসাদ, দৈন্য ও দুর্বলতা যেন নিমেষে ঘুচে গেল। দেশবন্ধুর ভাই, ব্রিটিশ সরকারের প্রাক্তন ল' মেম্বার এস. আর. দাশ তাঁর ছেলেকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, 'ইংলণ্ডকে ঘুম থেকে তুলতে হলে ওই বোমার প্রয়োজন।'

প্রবীণ নেতারা এবার নতুন করে হয়তো বুঝলেন যে, স্যাণ্ডার্স হত্যা, এ্যাসেমব্লিতে বোমা বিস্ফোরণ বা 'ডে'-নিধন কিংবা ভূপেন চ্যাটার্জি অপসারণ—এসব কিছুই সন্ত্রাসবাদমূলক কাজ নয়। এ-সব জাতির উদাত্ত কণ্ঠধ্বনি, আত্ম-প্রতিষ্ঠাকল্পে সবল হাতের কৃপাণ-ঝঞ্ঝনা। হাজার সত্যাগ্রহ, সভা-সমিতি, মিছিল বা মিঠে-কড়া আবেদন-নিবেদনে যা হত, তার বহুগণ কাজ হল ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তের নিক্ষিপ্ত বোমার গগনভেদী শব্দে।

বোমা নিক্ষেপ করেই ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত হাতের আগ্নেয়াস্ত্র ফেলে দিলেন। প্রশান্তচিত্তে দাঁড়িয়ে রইলেন তাঁরা, চোখে কৌতুকের ছটা, ঠোঁটে মৃদু হাসি। তাঁদের কাজ হয়ে গেছে। তাঁরা অযথা কাউকে হত্যা করতে আসেন নি, তাঁরা 'সন্ত্রাস' সৃষ্টির ব্রত নেননি। তাঁরা সন্ত্রাসবাদী নন। তাঁরা বিপ্লবী—তাঁদের কাজ দেশকে বিপ্লবের পথে এগিয়ে নেওয়া, ভারতবর্ষের বক্তব্য বিশ্ববাসীকে কার্যকরীভাবে শোনানো।

নিরস্ত্র দুই বীরকে সদম্ভে গ্রেপ্তার করল সশস্ত্র পুলিশ। ওঁরা কারারুদ্ধ হলেন। দু'মাসের মধ্যে বিচারের প্রহসনও সাঙ্গ হল। উভয়েরই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ড লাভ হল। এই রায় বেরোবার মাত্র ছ'দিন আগে দিল্লীর সেসন্‌স্ জজের আদালতে দুই বিপ্লবী যে ঐতিহাসিক বিবৃতি দেন তার শেষাংশে এঁরা বলেছিলেন—

'বিপ্লবের আদর্শ পূর্ণ করার জন্য সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব সমাজের অগ্রগতির পথ সুগম করে। বিপ্লব মানুষের জন্মগত অধিকার। এটা কেউ কেড়ে নিতে পারে না।......শ্রমিক শ্রেণীই বর্তমান সমাজের প্রধান পরিপোষক। তাদের আদর্শ মানবিক গুণাবলী সমৃদ্ধ নতুন সমাজ গড়ে তোলা। এই আদর্শ মেনে চলি বলে আমাদের যে শাস্তিই দেওয়া হোক না কেন আমরা তা সানন্দচিত্তে গ্রহণ করব। আমাদের জীবন-যৌবন দিয়ে সাজানো নৈবেদ্য বিপ্লবের এই মহান বেদীমূলে অর্পণ করছি। আমরা জানি ত্যাগ যত বিপুলই হোক না কেন, ওই আদর্শের তুলনায় তা তুচ্ছ। আমাদের কোন আক্ষেপ নেই। আমরা সানন্দ হৃদয়ে বিপ্লবের আগমন প্রতীক্ষা করছি।'

চটকল শ্রমিকের প্রথম সাধারণ ধর্মঘট (১৯২৯)

বিগত বছরে চেঙ্গাইলের লাডলো জুট মিলে ও তার একটু পরে বাউড়িয়ার ফোর্ট গ্লস্টার চটকলে ছ'মাস ব্যাপী ধর্মঘট হয়েছিল। লাডলো জুট মিলের ধর্মঘটে বঙ্কিম মুখার্জী, রাধারমণ মিত্র, গোপেন চক্রবর্তী ও ফিলিপ স্প্র্যাট জড়িত ছিলেন এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যে সামান্য কিছুটা দাবিপূরণের পর ধর্মঘটীরা কাজে ফিরে যান। দ্বিতীয়টিতে পুলিশের সঙ্গে ধর্মঘটী শ্রমিকদের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। পুলিশের গুলিতে আটাশ জন শ্রমিক আহত হন। তবু দীর্ঘ ছ'মাস ধরে ধর্মঘট চালিয়ে অবশেষে তুলে নেওয়া হয়। নিছক দাবি আদায়ের মাপকাঠিতে ধর্মঘটে পরাস্ত হলেও বাউড়িয়া চটকল-ধর্মঘটে শ্রমিকেরা ছ'মাস প্রচণ্ড সংগ্রাম চালিয়ে অদম্য মনোবলের পরিচয় দেন।

এই দুই ধর্মঘটের পর উনত্রিশ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে শ্রমের ঘন্টা ও কাজের চাপ বাড়ানো এবং দুই শিফটের জায়গায় এক শিফ্‌ট চালু করে ষাট হাজার শ্রমিক ছাঁটাইয়ের মালিকী চক্রান্তের বিরুদ্ধে এখানে চটকল শ্রমিকদের প্রথম সাধারণ ধর্মঘট হয়।

এই ধর্মঘট পরিচালনা করে 'বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন' যার সভানেত্রী ছিলেন ড. প্রভাবতী দাশগুপ্ত। ধর্মঘট শুরু হয়েছিল আলমবাজার ও বরাহনগর থেকে এবং এক সপ্তাহের মধ্যে তাতে যোগ দেন বরাহনগর থেকে ব্যারাকপুর পর্যন্ত প্রায় এক লক্ষ চটকল শ্রমিক। এই বছরের তেরোই আগস্ট তারিখে ধর্মঘটী শ্রমিকের সংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাঁড়াল এক লক্ষ বিরানব্বই হাজারে। এই বিপুল-সংখ্যক শ্রমিকের ধর্মঘট দিনের পর দিন সংগঠিত করার ক্ষেত্রে প্রথমাবধি যথাসাধ্য সহায়তা করেছিলেন ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।

এই আন্দোলনের মাধ্যমে শ্রমিকেরা বেশ কিছু দাবি আদায় করেন। যেমন, কাজের ঘন্টা বাড়ানো বা শ্রমিক ছাঁটাইয়ের চেষ্টা আপাতত বন্ধ রাখতে মালিকরা রাজি হন। তা ছাড়া, এই ঐতিহাসিক ধর্মঘটে সংগঠন গড়ে তোলা সম্পর্কে শ্রমিকেরা প্রথম সচেতন হল।

যতীন দাসের আত্মাহুতি

কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে যখন 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স' বাহিনী গড়ে উঠেছিল তখন তার 'জেনারেল অফিসার কমাণ্ডিং' হিসেবে সুভাষ একটি স্বেচ্ছাসৈনিক-বাহিনী সংগঠিত করেছিলেন। এই বাহিনীতে সবচেয়ে বেশি যুবক নেওয়া হয়েছিল দক্ষিণ কলকাতা থেকে। মেজর সত্যগুপ্ত ছিলেন এই দলের নায়ক এবং তাঁর প্রধান সহায়ক ছিলেন মেজর যতীন দাস। বাংলার বাইরের গোপন কার্যকলাপে যতীন দাস প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকার জন্য তিনি বাংলার স্বেচ্ছাসেবীদের কাজে নিজেকে খুব একটা জড়াতে পারতেন না। ভগৎ সিংদের নেতা ছিলেন শচীন সান্যাল আবার তিনি বিদ্রোহী যতীন দাসেরও নেতা। তিনি একদিকে শচীন স্যান্যালের নির্দেশ পালন করতেন, অন্যদিকে কলকাতার স্বেচ্ছাসেবকদেব। সঙ্গেও যোগাযোগ রেখে চলতেন।

উনত্রিশ সালের চোদ্দই জুনে যতীন দাসকে তাঁর কলকাতার বাড়ি থেকে লাহোবের পুলিশের নির্দেশে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। শৃঙ্খলিত অবস্থায় দু'দিন পরে লাহোর জেলে নিয়ে যাওয়া হল। শুরু হল ভগৎ সিং, রাজগুরু, শুকদেব-সহ যতীন দাসের মামলা। এই মামলাই পরিশেষে রূপান্তরিত হয়েছিল 'থার্ড লাহোর কনস্পিরেসি কেস'-এ। অবশ্য যতীন দাস তখন লোকান্তরিত হয়েছেন।

রাজনৈতিক বন্দীদের উপযুক্ত মর্যাদাদানের দাবিতে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামীরা যে ঐতিহাসিক ধর্মঘট করেন তাতে এই মামলার আসামী যতীন্দ্রনাথ দাস তেষট্টি দিন অনশনের পর মৃত্যুবরণ করেন। নাকে নল ঢুকিয়ে জবরদস্তি খাওয়ানোর সময় নলটি ফুসফুসে ঢুকে যায়। এজন্য তাঁর নিউমোনিয়া হয় অথচ অনশনব্রতী হিসেবে তিনি শেষ অবধি ওষুধ খেতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেন। যতীন দাশের ওই আত্মদানে সারা দেশে বিপুল সাড়া জাগে।

মৃত্যুঞ্জয়ী বীর যতীন দাসের মরদেহ কলকাতায় আনা হল। ওঁর শোকযাত্রায় সেদিন হাওড়া থেকে কেওড়াতলা পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ লোক সজল চোখে যোগদান করেছিল। আর যাঁরা রক্তের বিনিময়ে রক্ত-উৎসব রচনায় উন্মুখ, তাঁদের চোখে কিন্তু জল ছিল না। তাঁদের বুকের কথা হাজার-হাজার ইস্তাহারে প্রকাশ্যে সেদিন ছড়ানো হয় জনতার মধ্যে। ইস্তাহারের শীর্ষে লেখা ছিল, 'রক্তে আমার লেগেছে আজ সর্বনাশের নেশা।' এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ' গানটি।

সুভাষ ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রমুখ নেতৃবৃন্দ পরিচালিত, ইউনিফর্ম-পরিহিত, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স বাহিনী সেদিন লক্ষাধিক লোকের মৌন শোক-মিছিল করে অপূর্ব নিষ্ঠায় যতীন দাসের শবাধারটি কাঁধে করে নিয়ে এসেছিলেন হাওড়া থেকে কেওড়াতলা শ্মশান পর্যন্ত সারাটা পথ। যতীন দাসের আত্মদানে

আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে ম্যাক্সুইনি পত্নী মেরী ম্যাক্সুইনি একটি শোকবার্তা পাঠিয়েছিলেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন, 'টেরেন্স ম্যাক্সুইনির পরিজন শোকে ও গর্বে যতীন দাসের মহাপ্রয়াণে দেশপ্রেমী ভারতবাসীদের সঙ্গে যুক্ত হলেন। স্বাধীনতার অভ্যুদয় সুনিশ্চিত।

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত

শ্মশানে যতীন দাসের চিতাশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে যতীন দাসের বৃদ্ধ পিতা বঙ্কিমচন্দ্র দাস অতুলনীয় গাম্ভীর্যে মন্ত্রোচ্চারণ করে বললেন, 'ওঁ নারায়ণ, যে দেশদ্রোহীরা মাতৃভূমিকে বিদেশীর হাতে সমর্পণ করেছিল, তাদের সকলের পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আমার আদরের খেঁদুকে (যতীনের ঘরোয়া নাম) অশ্রু-অর্ঘ্যসহ তোমার চরণে সমর্পণ করলাম।'

ভাইসরয়ের স্পেশাল ট্রেন ওড়াবার চেষ্টা

ওই বছরে তেইশে ডিসেম্বরের হাড়কাঁপানো শীতে ভোর পাঁচটা পনেরো মিনিটের সময় দিল্লী থেকে চার মাইল দূরে কুরুপাণ্ডবদের দুর্গের কাছে একটি মোটর-সাইকেল এসে থামল। চারিদিক গভীর কুয়াশায় ঢাকা। পাশের মানুষকে দেখা যায় না।

সাইকেল থেকে নামলেন দু'টি আরোহী। একজনকে মনে হয় কোনো মিলিটারি অফিসার, অপর ব্যক্তিটি সম্ভবত তাঁর আর্দালি। জঙ্গী-অফিসারটির পরনে জঙ্গী টুপি, কোর্তা, ব্রিচেস এবং পায়ে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা চামড়ার জুতো। জঙ্গী-ঘোড়সওয়ার বাহিনীর মেজরের বেশ। আর্দালির গায়ে সামরিক বাহিনীর ওভারকোট।

কিন্তু এঁরা আদপে কেউ সাধারণ সৈনিক নন। সামরিক বাহিনীর অফিসারের পোষাকে ছিলেন যশপাল এবং আর্দালির ছদ্মবেশে ভাগরাম। এঁরা হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান দলের সদস্য ভগত সিং-দের সতীর্থ।

ভারতবর্ষের বড়লাট লর্ড আরউইন কোলহাপুর থেকে একটি বিশেষ ট্রেনে করে সেদিন ভোরে দিল্লীতে আসছিলেন। যশপাল এবং ভাগরামের উপর ভার পড়েছিল বড়লাটের গাড়ি উড়িয়ে দেবার। গাড়িটি ওখানে পৌঁছানোর সঠিক সময় ছিল ভোর ছ'টায়।

তার কয়েক মিনিট আগেই মোটর সাইকেলটি ভাগরামের হেপাজতে রেখে কুরুপাণ্ডব দুর্গের কাছাকাছি একটি কুয়োর পাশে গেলেন যশপাল। ওই কুয়ো থেকে রেল লাইনের দূরত্ব মাত্র দু'শো গজ। রেললাইনের তলায় একদিন আগেই বোমাটি ভাগরামের দায়িত্বে স্থাপিত হয়েছিল। সেই বোমার সঙ্গে সেদিনই একটি তার সংযুক্ত করে তার অপর দিকটা ওই কুয়োর কাছে টেনে এনে গোপনে রাখা হয়।

যশপাল ওখানে পৌঁছে ওই তার প্রান্তের সঙ্গে একটি ব্যাটারি যুক্ত করে ভাইসরয়ের গাড়ি আসার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। যথাসময়ে ট্রেনটি এলেই তিনি সুইচ টিপে দেবেন।

নিয়ম হল, বড়লাটের গাড়ির আগে পাইলট ইঞ্জিন চলে যাবে লাইনটি বিপদমুক্ত কিনা জানার জন্য। তা ছাড়া, বড়লাটের যাত্রাপথে সারা লাইন জুড়েই কিছু কিছু দূরে পুলিশ মোতায়েন করার রীতিও ছিল।

নির্দিষ্ট সময়েই পাইলট ইঞ্জিনের শব্দ শুনলেন যশপাল। কিন্তু ঘন কুয়াশার জন্য চোখে কিছুই দেখতে পেলেন না। ওই পাইলট ইঞ্জিনটি চলে যাবার ঠিক পনেরো মিনিট পরে বড়লাটের ট্রেনটি আসার কথা। যশপাল তাই ঘড়ি ধরে ঠিক পনেরো মিনিট বাদে সুইচটি টিপলেন। ব্যাটারির চার্জ হলে বিশাল শব্দ করে বোমা ফেটে গেল। নিবিড় কুয়াশার জন্য যশপাল দেখতেই পান নি, বোমা ফাটার এক মিনিট আগেই বড়লাটের গাড়িটি বেরিয়ে গেছে।

ব্যর্থতার জ্বালা বুকে নিয়ে দুই সহযোদ্ধা দিল্লী ফিরে যেতে মনস্থ করলেন। কিন্তু মোটর সাইকেল স্টার্ট নিচ্ছে না। ঠাণ্ডায় ইঞ্জিনটা জমে গেছে, তখন ওটাকে ঠেলে নিয়ে এগোতে লাগলেন ওঁরা। কিছুদূর এগিয়ে যেতেই তারা শুনলেন অনেকগুলো বুটের আওয়াজ।

বিপ্লবীরা বুঝলেন, পুলিশ ওদের তাড়া করেছে। পালাবার কোনো উপায় নেই। ওরা দু'জন তাই পকেটের পিস্তলে হাত রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

যশপাল একটু এগিয়ে রাস্তার উপর গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর উদ্দেশ্য, আক্রান্ত হলে বেশ কিছু পুলিশকে ঘায়েল করে তিনি শহীদের মত মৃত্যুবরণ করবেন।

অফিসার-সহ পুলিশেরা সামনে এসে ওঁর সঙ্গে সংঘর্ষে না গিয়ে ওঁকে সেলাম করতে করতে মার্চ করে চলে গেল। ওঁকে বাঁচিয়ে দিল ওঁর মেজরের পোষাক। তবে ওঁর টুপির উপরে পিতলের ব্যাজে লেখা ছিল এইচ. এস. আর. এ. অর্থাৎ হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান আর্মি। কুয়াশার জন্য ওরা কেউ দেখতে পায়নি।

তারপর মোটর সাইকেলটি নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যশপাল ও ভাগরাম দিল্লী এলেন। আগে ঠিক ছিল বোমা-বিস্ফোরণের পর মোটর-সাইকেল চালিয়ে যশপাল চলে যাবেন দিল্লী থেকে আঠারো মাইল দূরে, গাজিয়াবাদ স্টেশনে। সেখানে ভগবতী চরণ অপেক্ষা করছেন তাঁর জন্যে। উভয়ে একত্রিত হলেই সটান পালিয়ে যাবেন কলকাতায়।

ভগবতী চরণ প্রথম শ্রেণীর প্রতিক্ষালয়ে অপেক্ষা করছিলেন যশপালের জন্য। সেখানে দু'জনে মিলিত হয়ে রওনা হলেন কলকাতার উদ্দেশে।

ভগবতীচরণ ও দুর্গা দেবী

রায় বাহাদুর শিবচরণ দাসের পুত্র ভগবতীচরণ। লাহোরের অধিবাসী এই পরিবার। বিত্তশালী ও সরকারী খেতাবপ্রাপ্ত পিতার পুত্র হলেও ভগবতীচরণের রক্তে প্রবাহিত ছিল ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব, দুঃখী ও নির্যাতিত ভারতবাসীর জন্যে মমত্ববোধ।

ভগবতীচরণ অল্প বয়সেই বিয়ে করেন। স্ত্রীর নাম দুর্গা দেবী। স্বামী-স্ত্রী দীক্ষিত হয়েছেন বিপ্লবের মন্ত্রে। হিন্দুস্তান সোশ্যালিষ্ট রিপাবলিকান আর্মির যাবতীয় সরকার বিরোধী সংঘাত অর্থাৎ লাহোরে স্যাণ্ডার্স-হত্যা, দিল্লীতে বড়লাটের স্পেশাল ট্রেন উড়িয়ে দেবার চেষ্টা প্রভৃতি প্রত্যেক কাজেই ভগবতী -চরণের সুদক্ষ সহযোগিতা অনস্বীকার্য। কিন্তু পুলিশ তাঁকে কোনোদিন খুঁজে পায়নি। লাহোর-ষড়যন্ত্র মামলায় ভগবতীচরণের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ছিল, পলাতক আসামীরূপে মোটা টাকার পুরস্কারও পুলিশ তাঁর নামে ঘোষণা করেছিল। কিন্তু কেউ তাঁকে ধরে দিতে পারেনি।

বড়লাটের স্পেশাল ট্রেন উড়িয়ে দেবার ব্যর্থ প্রয়াসের পর ভগবতীচরণ চুপ করে থাকতে পারলেন না। এদিকে সতীর্থরা একে একে কারারুদ্ধ হয়ে গেছেন। তিনি দু'একজন সহযোদ্ধাকে নিয়ে চলে গেলেন রাবী নদীর তীব ধরে দূর অরণ্যে। সেখানে বোমা ফাটালে বনের পশু চমকে উঠলেও কোনো মানুষের কানে তার শব্দ যাবার সুযোগ নেই।

বিপ্লবীরা শুরু করেছেন বোমার পরীক্ষা-নিরীক্ষা। সহসা দিগন্ত কাঁপিয়ে দারুণ গর্জনে ফেটে গেল একটি বোমা। মুহূর্তে ভগবতীচরণের দু'খানি হাত উড়ে গেল। তিনি অরণ্যতলে লুটিয়ে পড়লেন রক্তাক্ত দেহে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তিনি ঢলে পড়লেন মৃত্যুর কোলে। সামনে বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন সহযোদ্ধারা। বনতলে শায়িত রইলেন সেই ক্ষত-বিক্ষত সৈনিক, উর্দ্ধে মহামৌন আকাশ, চারদিকে নিঃসীম নীরবতা। বিপ্লব-সতীর্থা সহধর্মিনী দুর্গাদেবী ছিলেন না পাশে।

এই দুর্ঘটনা ঘটেছিল ত্রিশ সালের জানুয়ারী মাসে। কিন্তু সংবাদটি পুলিশের নজরে আসে পরের বছর নয়ই ফেব্রুয়ারী তারিখে লাহোর-ষড়যন্ত্র মামলার একজন রাজসাক্ষীর মাধ্যমে।

ভগবতীচরণের মৃত্যুর পর মাসখানেকের মধ্যে লাহোরে বিপ্লবী দলের একটি গোপন সভা ডাকা হয়। যাঁরা তখনও ধরা পড়েন নি, তাঁদের মধ্যে অনেকেই সেদিন সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল ভগৎ সিং ও অন্যান্য বন্দীদের লাহোর জেল থেকে উদ্ধার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং উক্ত সিদ্ধান্তকে কার্যকর করার নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করা। ওই সিদ্ধান্ত দুটো গ্রহণ করার পর স্থির করা হল, এ জন্য রেলওয়ে কোম্পানীর ও গভর্নমেন্টের টাকা লুঠ করতে হবে। তা ছাড়া, যিনি যেখান থেকে যা কিছু সংগ্রহ করতে পারেন, তাঁকে তা সত্বর পার্টি তহবিলে জমা দিতে হবে।

অর্থভাণ্ডারে প্রথম দান এল ভগবতীচরণের বিপ্লবিনী পত্নী দুর্গাদেবীর কাছ থেকে। নিজের গয়নাপত্র ও মূল্যবান সামগ্রী বিক্রী করে তিন হাজার টাকা তিনি তুলে দিলেন এই ভাণ্ডারে। সবকিছু দান করে ফতুর হয়ে নিরাভরণা তাপসীর রূপ ধারণ করলেন দুর্গা দেবী।

লাহোর-ষড়যন্ত্র মামলা (তৃতীয়)

ত্রিশ সালের দশই জুলাই 'লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা' (তৃতীয়) একটি স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের কোর্টে শুরু হল। এগারো জন আসামীর বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য উচ্ছেদ ঘটানোর অভিযোগ থেকে শুরু করে স্যাণ্ডার্স-হত্যা ইত্যাদি নানা রাজদ্রোহমূলক অভিযোগ আনা হল। বিচার শেষ হল সাতই অক্টোবর। ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেবের ফাঁসীর হুকুম হল এবং অপর আটজনকে দেওয়া হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ড। কিন্তু দেশ মনে নিল না শাস্তির এই ব্যবস্থা। গোটা দেশ জুড়ে দিকে-দিকে দেখা দিল প্রবল অসন্তোষ।

যদিও গান্ধীজী চব্বিশ সালে গোপীনাথ সাহার আত্মত্যাগ ও বীরত্বের প্রশংসামূলক প্রস্তাব সিরাজ-গঞ্জের প্রাদেশিক কংগ্রেস-সভা গ্রহণ করায় ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এবং কলকাতা কর্পোরেশনকে অনুরূপ গৃহীত প্রস্তাবটি বাতিল করতে বাধ্য করেছিলেন কিন্তু ভগৎ সিং-দের বেলায় ভারতীয় জনমতের চাপে ওঁকে ভগৎ সিং-দের আত্মত্যাগ ও বীরত্বের মর্যাদা দিতে হল এবং গান্ধী-আরউইন চুক্তির সফল রূপায়ণের প্রশ্নে ওঁদের ফাঁসীর দণ্ড মকুব করতে উনি সরকারকে অনুরোধ করলেন। কিন্তু গান্ধীজীর প্রয়াস ব্যর্থ হল।

পরের বছর চব্বিশে মার্চ ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেবের ফাঁসী হয়ে গেল সন্ধ্যা পৌনে সাতটায় লাহোর সেন্ট্রাল জেলে।

এদিকে সুভাষ সারা দেশে যেখানেই তখন বক্তৃতা করতে যাচ্ছেন সেখানেই তাঁর বক্তব্য, 'পদানত এই ভারতবর্ষ হাজার ভগৎ সিং চাইছে।'

পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব

কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে ভারতকে ডোমিনিয়ন মর্যাদা দানের জন্য সরকারকে এক বছরের মেয়াদ দেওয়া হয়েছিল। ওই মেয়াদ উনত্রিশ সালের একত্রিশে ডিসেম্বর রাত বারোটায় কেটে যাবার পর মুহূর্তেই লাহোর কংগ্রেস অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পূর্ণ স্বাধীনতাব প্রতীক হিসেবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

ওই বছরে সারা দেশে ছাব্বিশে জানুয়ারী 'স্বাধীনতা দিবস' হিসেবে পালিত হল। প্রত্যেকটি জনসভায় ওইদিন জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে স্বাধীনতার যে সংকল্প বাণীটি পাঠ করা হয়, তার প্রথম অনুচ্ছেদটি হল ঃ

'যে কোনো দেশবাসীর মতো ভারতবাসীরও অবিচ্ছেদ্য অধিকার রয়েছে স্বাধীনতা আর যাতে আত্মবিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ মেলে তার জন্য নিজ শ্রমের ফলভোগের ও জীবন ধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় উপকরণাদি পাওয়ার—এই আমাদের বিশ্বাস। আমাদের বিশ্বাস কোনো সরকার যদি ওইসব অধিকার থেকে কোনো জাতিকে বঞ্চিত করে ও তার উপরে অত্যাচার চালায় তবে সে জাতির অধিকার আছে ওই সরকার পরিবর্তনের, উচ্ছেদ সাধনের। ভারতে ব্রিটিশ সরকার দেশের মানুষকে শুধু তাদের স্বাধীনতা থেকেই বঞ্চিত করেনি, সে তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেছে জনসাধারণের শোষণের উপরে এবং ভারতের সর্বনাশ করেছে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং আত্মিক দিকে থেকেও। আমাদের তাই বিশ্বাস, ভারতকে ব্রিটিশের সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন এবং পূর্ণ স্বরাজ বা পরিপূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করতেই হবে।'

এই প্রস্তাব গ্রহণের পরেই আইন অমান্য আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গান্ধীজী ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলনে একটা নতুন মাত্রা যোগ করলেন।

ডাণ্ডি অভিযান ও লবণ আইন অমান্য

ত্রিশ সালের বারোই মার্চ গান্ধীজী উনআশিজন সত্যাগ্রহীকে নিয়ে ডাণ্ডি অভিযান শুরু করেন এবং দু'শো মাইল হেঁটে পাঁচই এপ্রিল ডাণ্ডি পৌঁছন। ছয়ই এপ্রিল সমুদ্রতট থেকে লবণ তুলে লবণ আইন ভঙ্গ করেন। চৌঠা মে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। মে মাসে ধরসানা লবণ গোলা দখল 'অভিযানে' নেতৃত্ব দেন সরোজিনী নাইডু। অভিযানের ঠিক আগে তিনি তাঁর অহিংস অনুগামীদের নির্দেশ দিলেন, 'ভারতের মর্যাদা আজ তোমাদের হাতে। কোনো প্ররোচনাতেই তোমরা হিংসার আশ্রয় নেবে না। হাত তুলবে না আঘাত এড়াবার জন্য।'

তারপর যা ঘটল, এক প্রত্যক্ষদর্শী মার্কিন সাংবাদিকের বর্ণনা থেকে আমরা উদ্ধৃত করছি—'তাঁর

কথার প্রতিধ্বনি করে রব উঠল "ইনকিলাব জিন্দাবাদ" — তাঁর পরিচালনায় অহিংস বাহিনী এগোতে শুরু করল লবণ রাখার পাত্রগুলির দিকে। বিনা বাধায় মানুষকে অবিশ্রাম মারতে মারতে রক্তপিণ্ডে পরিণত করার দৃশ্যে আমি এত পীড়িত বোধ করছিলাম যে আমায় চোখ ফিরিয়ে নিতে হচ্ছিল মাঝে মাঝে। পাশ্চাত্য মনের পক্ষে এই অপ্রতিরোধের তত্ত্ব ধরতে পারা কঠিন। অনির্দিষ্ট এবং অসহায় ক্রোধ ও ঘৃণার অনুভূতিতে আমি তখন আচ্ছন্ন। সে ঘৃণা ও ক্রোধ যতটা লাঠি চালানো পুলিশের প্রতি, প্রায় ততটাই বিনা প্রতিরোধে যাঁরা অনন মারের সামনে মাথা পেতে দিচ্ছিলেন তাঁদের প্রতিও, যদিও ভারতবর্ষে আমি এসেছিলাম গান্ধীজীর আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়েই।' এই বছরের এগারোই নভেম্বর মোপলা বিদ্রোহ দমনের কাজে কুখ্যাত রাও বাহাদুর আমু সাহেবের নির্দেশে সত্যাগ্রহীদের উপরে যে নির্মমভাবে লাঠি চালানো হয় তাতে শেষ পর্যন্ত যে সত্যাগ্রহী রক্তাক্ত দেহে মাটিতে শায়িত হলেও জাতীয় পতাকা ছাড়েন নি—তিনি হলেন কেরলের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা পি.কৃষ্ণ পিল্লাই।

কলকাতার গাড়োয়ান ধর্মঘট

ওই বছরের পয়লা এপ্রিল তারিখে বঙ্কিম মুখার্জী, আবদুল মোমিন, স্বামী বিশ্বানন্দ প্রমুখের নেতৃত্বে কলকাতায় মোষের গাড়ির গাড়োয়ানরা তাঁদের গাড়ি থেকে মোষ খুলে, পর পর গাড়িগুলো সাজিয়ে শেয়ালদা থেকে হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত গোটা হ্যারিসন রোড অবরোধ করে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। পুলিশের গুলিতে সেদিন পাঁচজন গাড়োয়ান সমেত মোট সাতজন নিহত হন। এঁদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকে আবদুল হালিম সেদিন হিন্দী ও বাংলায় যে ইস্তাহার প্রকাশ করেন তার জন্য তাঁকে এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। তাঁদের মৃতদেহ নিয়ে কলকাতার রাস্তায় সেদিন যে বিশাল মিছিল বেরিয়েছিল তাতে হিন্দু-মুসলমানের যে সাম্প্রদায়িক ঐক্য দেখা যায়, বস্তুতপক্ষে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টিকারী সরকারী অপপ্রয়াসের প্রেক্ষিতে তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মাত্র চার বছর আগে অনুষ্ঠিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিকায় এই ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা ছিল। দুপুরবেলা মোষের গাড়ি চালানো নিষিদ্ধ করে পুলিশ যে নির্দেশ দিয়েছিল তার প্রয়োগ শেষ পর্যন্ত বন্ধ রাখতে পুলিশ বাধ্য হল। ভারতের গোয়েন্দা প্রবর স্যার হোরেস উইলিয়ামস্ লেখেন ঃ

'নতুন আইনে বিক্ষুব্ধ কলকাতার মোষের গাড়ির গাড়োয়ানরা কমিউনিস্টদের প্ররোচনায় গুরুতর হাঙ্গামা ঘটায়। পরে কমিউনিস্ট পত্রিকাগুলিতে, একে 'ভারতবর্ষে পুলিশের সঙ্গে প্রথম ব্যারিকেড সংগ্রাম বলে অভিনন্দিত করে।'

চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ ও অস্ত্রাগার লুণ্ঠন এবং কয়েকটি সশস্ত্র সংঘর্ষ

উনিশশো আটাশ খৃস্টাব্দে অনুষ্ঠিত কলকাতা কংগ্রেসের প্রাক্কালে একদিন দুপুরবেলা মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্কের একটি গোপন কক্ষে গণেশ ঘোষ, ত্রিপুরা সেন ও অনন্ত সিংহের সঙ্গে সুভাষ অন্যের সম্পূর্ণ অসাক্ষাতে মিলিত হয়ে ভলান্টিয়ার্স সংগঠন সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ওই গোপন অথচ খোলাখুলি আলোচনায় চট্টগ্রামের যুব-বিদ্রোহীরা বললেন, তাঁরা সামরিক পোশাকে সজ্জিত হয়ে কংগ্রেসের নিরস্ত্র ও শান্তিপূর্ণ স্বেচ্ছাসেবী হয়েই কংগ্রেসের শোভাবর্ধন করবেন না। কংগ্রেসের অহিংস-নীতি ওঁরা কখনো অন্তর দিয়ে সমর্থন করেন না। ওঁরা নিছক কৌশল হিসেবে অহিংস-নীতি সাময়িকভাবে মেনে চলেন এবং এই অহিংস নীতির আড়ালে সশস্ত্র যুব-বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হতে চান। সুভাষ ওঁদের দৃঢ় মনোভাবের পরিচয় পেয়ে ওঁদের যুব বিদ্রোহের পরিকল্পনাকে তাঁর নৈতিক সমর্থন জানান।

এরপর এল চট্টগ্রামে যুব-বিদ্রোহের মহা-মুহূর্ত। ত্রিশ সালের আঠারোই এপ্রিল রাত দশটা। দিনটি আইরিশ বিপ্লবের স্মৃতিবিজড়িত।

মাষ্টারদা

চট্টগ্রামের একদল তরুণ বিদ্রোহী বহুদিন ধরে নিখুঁত পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির পর অতর্কিত আক্রমণে শহরের দুটি অস্ত্রাগার দখল করেন এবং চট্টগ্রামের সঙ্গে বহির্জগতের যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন করেন। আর, 'ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি'র চট্টগ্রাম শাখার সভাপতি সূর্য সেন ওরফে মাস্টারদার নির্দেশে চট্টগ্রামের যুবক ও ছাত্রদের প্রতি যে আবেদন ইস্তাহার আকারে ছড়িয়ে দেওয়া হয় তাতে 'স্বাধীন চট্টগ্রাম' ঘোষণা করে তাঁদের সৈন্য হিসেবে ভারতীয় গণতন্ত্র বাহিনীতে যোগ দিতে আহ্বান জানানো হয়। আর একটি ইস্তাহারে চট্টগ্রামের জনসাধারণকে অনুরোধ করা হয় আপন সন্তানদের আত্মাহুতির প্রেরণা জাগিয়ে নিজ যোগ্যতা প্রমাণের। তারপর মাস্টারদাকে সর্বাধিনায়ক করে সংগ্রাম চালানোর এক সংকল্পবাণীও পাঠ করা হয়।

এই সংগ্রাম পরবর্তী চার বছর ধরে চলতে থাকে প্রচণ্ড সরকারী দমন পীড়ন সত্ত্বেও।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের চার দিন পরে বিদ্রোহীদের আশ্রয়স্থল জালালাবাদ পাহাড়টিকে ইংরেজের সেনাবাহিনী ঘিরে ফেলে তুমুল যুদ্ধ চালায়। ওই যুদ্ধে নিহত হন মোট বারো জন ঃ প্রভাস বল, শশাঙ্ক দত্ত, নির্মল লালা, জীতেন দাশগুপ্ত, মধু দত্ত, পুলিন ঘোষ, হরিগোপাল বল, মতি কানুনগো, নরেশ রায়, ত্রিপুরা সেন, বিধু ভট্টাচার্য এবং গুরুতর আহত অর্ধেন্দু দস্তিদার পরের দিন হাসপাতালে মারা যান।

অর্ধেন্দু দস্তিদারের আত্মদানের পরের দিন আত্মসমর্পণের পরিবর্তে অমরেন্দ্র নন্দী আত্মহননের পথই বেছে নেন।

ছয়ই মে তারিখে কালারপোল যুদ্ধে প্রাণবিসর্জন হল চার শহীদের—স্বদেশ রায়, রজত সেন, মনোরঞ্জন সেন, দেবপ্রসাদ গুপ্ত।

আটাশে জুন অনন্ত সিংহ একটি চিঠি লিখে গোয়েন্দা বিভাগের হেড কোয়ার্টার্স ইলিসিয়াম রো-তে গিয়ে লোম্যানের কাছে ধরা দিলেন।

একুশে সেপ্টেম্বরে চন্দননগরে পুলিশের গুলিতে জীবন ঘোষাল নিহত হলেন।

এর আগে পয়লা সেপ্টেম্বরে কোনো এক অজ্ঞাত সূত্র থেকে খবর পেয়ে পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট দীর্ঘক্ষণ গোলাগুলি বিনিময়ের পর গ্রেপ্তার করলেন লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ, আনন্দ গুপ্ত ও অন্যান্য বিপ্লবীদের।

নয়ই অক্টোবরে ধরা পড়লেন জালালাবাদ যুদ্ধে আহত অম্বিকা চক্রবর্তী।

পয়লা ডিসেম্বরে রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও কালীপদ চক্রবর্তী চাঁদপুরে ট্রেনের মধ্যে পুলিশ বিভাগের সর্বময় কর্তা, অত্যাচারী মিঃ ক্রেগকে হত্যা করতে গিয়ে ভুল করে রেল ইনস্পেক্টর তারিণী মুখার্জীকে হত্যা করেন। বিচারে রামকৃষ্ণের প্রাণদণ্ড হল আর বয়স কম বলে কালীপদকে দেওয়া হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

ইতিমধ্যে এই বছরেই উনত্রিশে আগস্ট ঘটেছিল আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতাল প্রাঙ্গণে বিনয় বসুর রিভলবারের গুলিতে নিহত হলেন বাংলার ইনস্পেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ মিঃ এফ. জে. লোম্যান এবং ঢাকার সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ পুলিশ মিঃ ই. হডসন। ঢাকায় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা বাধাতে হডসনের জুড়ি ছিল না। বিনয় মেডিক্যাল কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। উনি বিক্রমপুরের রাউথভোগ গ্রামের রেবতী মোহন বসুর ছেলে।

উনিশ শো একত্রিশ খৃস্টাব্দের সাতই এপ্রিল তারিখে মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অত্যাচারী মিঃ জেমস পেডিকে গুলি করেন মেদিনীপুরের দুই দুর্ধর্ষ তরুণ বিমল দাশগুপ্ত আর যতীজীবন ঘোষ। পরদিন পেডির মৃত্যু হয়। হত্যাকারী ধরা পড়েনি।

চৌঠা আগস্টে পুলিশ ইনস্পেক্টর তারিণী মুখার্জীকে হত্যাব অপরাধে ফাঁসীকাঠে প্রাণ দেন রামকৃষ্ণ বিশ্বাস। এর আগে জুন মাসে ডিনামাইট দিয়ে জেলের পাঁচিল ভেঙে বন্দীদের মুক্ত করার চেষ্টা শেষ মুহূর্তে ব্যর্থ হয়।

ত্রিশে আগস্ট চট্টগ্রাম নিজাম পল্টন মাঠে কুখ্যাত গোয়েন্দা ইনস্পেক্টর আমাতুল্লা বালক হরিপদ ভট্টাচার্যের গুলিতে নিহত হন। সাক্ষ্যের অভাবে হরিপদর ফাঁসীর বদলে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়।

ইতিমধ্যে বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত হয়েছিলেন মেদিনীপুরের আর একজন ম্যাজিস্ট্রেট রবার্ট ডগলাস। ওঁকে হত্যা করেছিলেন প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য ত্রিশে এপ্রিলে। তেত্রিশ সালের বারোই জানুয়ারী প্রদ্যোতের ফাঁসী হয়েছিল মেদিনীপুর জেলে।

ডগলাস হত্যার চার মাস পরে আর একজন ম্যাজিস্ট্রেট বি.ই.জে. বার্জ দোসরা সেপ্টেম্বরে বিপ্লবী মৃগেন দত্ত ও অনাথ পাঁজার গুলিতে নিহত হন। বার্জের দেহরক্ষীর গুলিতে এঁরা ঘটনাস্থলেই নিহত হন। এঁদের সহযোগী হিসেবে ধরা পড়েন নির্মলজীবন ঘোষ, ব্রজকিশোর চক্রবর্তী এবং রামকৃষ্ণ রায়। মেদিনীপুর জেলে নির্মলজীবনেব ফাঁসী হয় তেইশে সেপ্টেম্বরে ও বাকি দু'জনের ফাঁসী হয় তার দুদিন পরে।

ওই বছরের বাইশে জুলাই তারিখে বোম্বাইয়ের অস্থায়ী গভর্নর, অর্নেস্ট হটসনকে পুণা ফার্গুসন কলেজের গ্রন্থাগার হলে গুলি করেন বি.এ. ক্লাসের ছাত্র বাসুদেব বলবন্ত গোগ্টে। জামার নিচে হটসনের স্টিল জ্যাকেট পরা ছিল। তাই তিনি বেঁচে গেলেন। গোগ্টের শাস্তি হয়েছিল বারো বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।

দীনেশ গুপ্ত ও রামকৃষ্ণ বিশ্বাসকে প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন মিঃ আর.আর গার্লিক, স্পেশাল ট্রাইবুনালের সভাপতি। সাতাশে জুলাই আদালতের মধ্যে তাঁকে গুলিতে হত্যা করলেন কানাইলাল ভট্টাচার্য। তিনিও সঙ্গে সঙ্গে সার্জেন্টের গুলিতে নিহত হলেন।

কুমিল্লার ফয়জুন্নেসা গভর্নমেন্ট স্কুলের ছাত্রী, শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী চোদ্দই ডিসেম্বরে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ সি. জি. বি স্টিভেনস্কে গুলি করে হত্যা করেন । পরবর্তী বছরের সাতাশে জানুয়ারী নাবালিকা বলে আদালতের বিচারে ওঁদের মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

ওই একত্রিশ সালের ষোলোই সেপ্টেম্বরে হিজলীর বন্দী নিবাসে দুশো জন রাজবন্দীর উপর বিনা প্ররোচনায় নির্বিচারে পুলিশ গুলি চালায়। এর প্রতিবাদে তিনদিন পরে ময়দানে মনুমেন্টের পাদদেশে এক মহতী প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। মঞ্চে উপস্থিত থেকে ভাষণ দেন রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র ও যতীন্দ্রমোহন। এই নৃশংস বর্বরোচিত হামলায় ব্যথিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ 'প্রশ্ন' কবিতাটি লেখেন।

হিজলী বন্দীনিবাসে বিনা বিচারে আটক রাজবন্দীদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের কিছুদিন থেকে কিছুটা গোলমাল চলছিল, কিন্তু তাব ফলে গুলিচালনার ঘটনা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। রাত ন'টা নাগাদ সেদিন পঞ্চাশজন সশস্ত্র পুলিশ এবং জনা পঁচিশ লাঠি ও বেটনধারী সিপাই অতর্কিতে রাজবন্দী ব্যারাকে ঢুকে বিনা নোটিশে ঘরের মধ্যে লাঠি ও গুলি চালাতে শুরু করে। গুলিতে নিহত হন কলকাতার সন্তোষকুমাব মিত্র এবং ববিশালের তারকেশ্বর সেন। লাঠি ও গুলিতে আহত হন আরও বহু রাজবন্দী। বন্দীশিবির থেকে বন্দীনিবাসের কমাণ্ডান্টের বাড়ি দু'মিনিটেব পথ। তিনি ঘটনাস্থলে পৌঁছন প্রায় এক ঘন্টা পরে।

সরকারী তদন্ত কমিটিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয় সমস্ত ব্যাপারটিকে ধামাচাপা দেওয়ার। তবু তাঁদেরও লিখতে হয়েছিল ঃ

'কমিটি এ-ও যোগ করতে চান যে সিপাহীদের মধ্যে কেউ কেউ যে বন্দীনিবাসে ঢুকে, কোনো কোনো রাজবন্দীকে লাঠি ও বেয়নেট দিয়ে আঘাত করেছিলেন এবং সেখানে কয়েকবার গুলি চালাবার পর ওই স্থান ছেড়ে গিয়েছিলেন, ও-কাজের কোনো যুক্তি ছিল না।'

অসুস্থ দেহে মনুমেন্টের পাদদেশে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ যে ধিক্কার বাণী উচ্চারণ করেছিলেন তার মধ্য থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করা হল ঃ 'যখন দেখা যায় জনমতকে অবজ্ঞার সঙ্গে উপেক্ষা করে এত অনায়াসে বিভীষিকার বিস্তার সম্ভবপর হয়, তখন ধরে নিতেই হবে যে, ভারতে ব্রিটিশশাসনের চরিত্র বিকৃত হয়েছে এবং এখন থেকে আমাদের ভাগ্যে দুর্দম দৌরাত্ম্য উত্তরোত্তর বেড়ে চলবার আশঙ্কা

ঘটল।.... আমি স্বদেশবাসীর হয়ে রাজপুরুষদের এই বলে সতর্ক করতে চাই যে, বিদেশী রাজ যত পরাক্রমশালী হোক না কেন আত্মসম্মান হারানো তার পক্ষে সকলের চেয়ে দুর্বলতার কারণ।.... প্রজাকে পীড়ন স্বীকার করে নিতে বাধ্য করানো রাজার পক্ষে কঠিন না হতে পারে, কিন্তু বিধিমত অধিকার নিয়ে প্রজার মন যখন স্বয়ং রাজাকে বিচার করে তখন তাকে নিরস্ত করতে পারে কোন শক্তি?'

রক্তাক্ত ইতিহাসের কয়েকটি স্মরণীয় দিন

বত্রিশ সালের ছয়ই ফেব্রুয়ারী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে চ্যান্সেলার গভর্নর স্যার স্ট্যানলী জ্যাকসনকে গুলিতে আহত করলেন ডায়োসেশন কলেজের ছাত্রী এবং সুভাষের শিক্ষাগুরু বেণীমাধব দাশের কন্যা বীণা দাস। ওঁর ন' বছর কারদণ্ড হয়।

তেরই জুন। শুরু হয় ঐতিহাসিক ধলঘাট সংঘর্ষ। একদিকে বিরাট এক গুর্খা বাহিনী নিয়ে ক্যাপ্টেন ক্যামেরন। অন্যদিকে সূর্য সেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, নির্মল সেন, অপূর্ব সেন। নির্মল ও অপূর্ব আত্মাহুতি দিলেও সূর্য সেন ও প্রীতিলতা আত্মগোপন করতে সক্ষম হন। ক্যামেরণ নিহত হন।

চব্বিশে সেপ্টেম্বর। সামরিক পোশাকে সুসজ্জিতা প্রীতিলতার নেতৃত্বে পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রান্ত হল। এর ফলে একজন বৃদ্ধা ইউরোপীয়ান মহিলা নিহত এবং ইনস্পেক্টর ম্যাকডোনাল্ড, সার্জেন্ট উইলিস এবং অপর ছ'জন ইউরোপীয়ান আহত হন। চট্টগ্রাম শহরের জগদ্বন্ধু ওয়াদ্দেদারের কন্যা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক প্রীতিলতা আত্মঘাতিনী হন। মৃত্যুর আগের দিন তিনি তাঁর মাকে মর্মস্পর্শী ভাষায় একটি চিঠি লিখে যান।

দোসরা মার্চ। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার রায় প্রকাশ। বারো জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। এঁরা হলেন গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল, আনন্দ গুপ্ত, ফণী নন্দী, সুবোধ চৌধুরী, সহায় রাম দাস, ফকির সেন, লালমোহন সেন, সুখেন্দু দস্তিদার, সুবোধ রায় ও রণধীর দাশগুপ্ত। অনিল বন্ধু দাসকে তিন বছর সশ্রম কাবাদণ্ড ও নন্দলাল সিংহকে দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। বাকি ষোলো জন আসামী মুক্তি পান। অথচ বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স অনুসারে তাঁদের সকলকে আবার গ্রেপ্তার করা হয় এবং বিশেষভাবে ভাড়া করা একখানা জাহাজে অন্যান্য দণ্ডিত চোদ্দজন আসামীর সঙ্গে তুলে এক অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়।

সাতাশে অক্টোবর। চব্বিশে সেপ্টেম্বর রাত্রে চট্টগ্রামের কাছে পাহাড়তলীতে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ইনষ্টিটিউটে বিপ্লবী হামলার জন্য চট্টগ্রামের সমস্ত হিন্দু অধিবাসীর উপর আশি হাজার টাকা জরিমানা ধার্য করা হয়। এর আগে ঊনত্রিশে জুলাই তারিখে তরুণ বিপ্লবী শৈলেশ রায় কুমিল্লার জাঁদরেল পুলিশ-কর্তা এলিসনকে প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি করে হত্যা করেন।

পরের বছর সতেরোই ফেব্রুয়ারী তারিখে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নায়ক সূর্য সেন নেত্র সেন নামক জনৈক বিশ্বাসঘাতকের ষড়যন্ত্রে পটিয়া থেকে পাঁচমাইল দূরে গৈরালা নামক গ্রামে ধরা পড়েন। তখন তাঁর মাথার দাম ছিল দশ হাজার টাকা। অবশ্য নেত্র সেনের পক্ষে পুরস্কারের টাকাটা পাওয়া সম্ভব হয় নি। কারণ কিরণ সেন নামক এক তরুণের এক ভোজালির কোপে তার মুণ্ডটা ধড় থেকে আলাদা হয়ে ভাতের থালায় গড়াগড়ি খায়।

ঊনিশে মে। গহিরা গ্রামে ফৌজী বাহিনীর সঙ্গে সংঘাতে দুই বিপ্লবীর মৃত্যু হয় এবং বিপ্লবী তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা দত্ত বন্দী হন।

পরের বছরের সাতই জানুয়ারী। নিত্যগোপাল দেব, হিমাংশু চক্রবর্তী, কৃষ্ণ চৌধুরী ও হরেন্দ্র ভট্টাচার্য প্রকাশ্য দিবালোকে শহরের পল্টনের মাঠে ইংরেজ অফিসারদের বোমা ও পিস্তল নিয়ে আক্রমণ করেন। ওই আক্রমণে পুলিশ সুপার মিঃ ক্লিয়ারী নিহত হন। রক্ষীদের গুলিতে ঘটনাস্থলেই হিমাংশু চক্রবর্তী মারা যান এবং কৃষ্ণ চৌধুরী ও হরেন্দ্র ভট্টাচার্য ধরা পড়ে ফাঁসীকাঠে প্রাণ দেন।

মাত্র পাঁচদিন পরে ব্রিটিশ শাসকেরা মাস্টারদা সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারকে ফাঁসী দেয়। সূর্য সেন এক মহান বিপ্লবী ও সংগঠক। তাঁর কর্মকাণ্ড বহুধা বিস্তৃত। অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, জালালাবাদ-যুদ্ধ, প্রীতিলতার মতো শৌর্যময়ী নারী-অধিনায়িকার নেতৃত্বে পাহাড়তলী-ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ, অজস্র খণ্ড সংঘর্ষ, দলে দলে তরুণ ও কিশোরের আত্মদান—এইসব ঘটনা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সংগ্রামকে এক নতুন বৈপ্লবিক মাত্রা দিয়েছে। এতবড় কাজ যাঁরা সম্পন্ন করেছেন তাঁরা কঠোর নিয়মে বাঁধা তেজোদীপ্ত এবং প্রাণচঞ্চল একটি কর্ম সংস্থার আদর্শনিষ্ঠ আত্মনিবেদিতপ্রাণ বিপ্লবী কর্মী। সেই সংস্থা সঙ্গোপনে গড়ে তুলেছিলেন যে রূপকার, তাঁরই নাম সূর্য সেন।

পঁচিশে আগস্ট তারিখে কলকাতার রাজপথে পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টের উপর ব্যর্থ আক্রমণ হয়। নিজেরই বোমার আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় বিপ্লবী অনুজা সেনের দেহ। দশজন বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করে বিচারের জন্য পাঠানো হলে তাঁদের দশ থেকে কুড়ি বছর পর্যন্ত দ্বীপান্তরের আদেশ দেওয়া হয়।

এর আগে আটই মে তারিখে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল দার্জিলিংয়ে। লেবংয়ের ঘোড়দৌড়ের মাঠে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ঘেরাটোপে বসে গভর্নর অ্যাণ্ডারসন ঘোড়দৌড় উপভোগ করছিলেন। হঠাৎ ওই নিরাপত্তা বলয় ভেদ করে ঢুকে পড়ল ভবানী আর রবি নামের দুই কিশোর। তাদের হাতে গর্জে উঠল পিস্তল। গুরুতর আহত হলেন অ্যাণ্ডারসন। ভবানী আর রবি ধরা পড়ল এবং তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল। মনোরঞ্জন ব্যানার্জীকে দেওয়া হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। উজ্জ্বলা মজুমদার, মধু ব্যানার্জী ও সুকুমার ঘোষের চোদ্দ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং সুশীল চক্রবর্তীকে বারো বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হল।

সরকার-বিরোধী সমসাময়িক আরও কয়েকটি আন্দোলন

এক. পেশোয়ারে আন্দোলন

সীমান্ত গান্ধীর আহ্বানে তাঁর 'খুদা-ই-খিদমৎগার' বাহিনী যখন উনিশশো ত্রিশ খৃস্টাব্দের তেইশে এপ্রিল পেশোয়ারের বিলিতি কাপড়ের দোকানে পিকেট করতে যাচ্ছিল তখন সশস্ত্র বাহিনী তার পথরোধ করে ও তার উপরে গুলি চালায়।

ওই নিরস্ত্র বাহিনীর উপরে বিনা প্ররোচনায় গুলি চালনার ফলে অনেকে হতাহত হন। ওই ঘটনায় উপস্থিত পাঠানেরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং অত্যাচারের প্রতিরোধকল্পে সাঁজোয়া গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেন।

তখন পেশোয়ারের গণ-অভ্যুত্থান দমনের জন্য ডাক পড়ে গাড়োয়ালি সৈন্যবাহিনীর। তাঁদের বলা হয়েছিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে হিন্দুদের ব্যবসা বন্ধ করার জন্যই নাকি হিন্দুদের বিলিতি কাপড়ের দোকানে মুসলমানেরা পিকেট করছে। কিন্তু ইংরেজের তরফে ওইসব প্ররোচনা সত্ত্বেও হিন্দু গাড়োয়ালি সৈন্যবাহিনী তাঁদের অবিসংবাদী নেতা ঠাকুরচন্দ্র সিং গাড়োয়ালির নির্দেশে সেদিন নিরস্ত্র দেশবাসীর উপর গুলি চালাতে অস্বীকার করেন। ফলে সামরিক আদালতের বিচারে ঠাকুরচন্দ্র সিং-এর প্রথমে মৃত্যুদণ্ড ও পরে দণ্ড হ্রাস করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। অন্যান্য গাড়োয়ালি সিপাহিরও বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড হয়।

এর পর পেশোয়ারে কার্যত কয়েকদিনের মতো ব্রিটিশ শাসন ভেঙে পড়ে। তারপর বিপুল ইংরেজ সেনাবাহিনী এসে প্রচণ্ড হত্যাকাণ্ড ও অত্যাচার চালিয়ে অবশেষে কর্তৃপক্ষকে খবর পাঠায়।

দুই. শোলাপুরে শ্রমিক অভ্যুত্থান

ওই বছরের পাঁচই মে এবং তার পরদিন গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে শোলাপুরে যে সর্বাত্মক শ্রমিক ধর্মঘট ও হরতাল হয় তার দরুণ সেখানকার ইংরেজ পরিবারগুলো শহর ছেড়ে চলে যায় এবং

কয়েকদিনের মতো সেখানে ব্রিটিশ শাসন অচল হয়ে পড়ে। তখন সামান্য গান্ধী টুপি পরলেই সেই লোকটির উপর নৃশংস পুলিশী অত্যাচার চালানো হত। আর, এর পাশাপাশি ছিল সামরিক আদালতের নির্মম বিচার পদ্ধতি। 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকার সাংবাদিকের কাছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ওই নৃশংসতার তীব্র নিন্দা করেন।

পরের বছরে বারোই জানুয়ারী শোলাপুরে সামরিক আদালতের নির্দেশে মাল্লাপ্পা ধনশেট্টি, কুরবান হুসেন, জগন্নাথ শিণ্ডে এবং শ্রীকৃষ্ণ সর্দারের ফাঁসী হয়।

তিন. কৃষক বিক্ষোভ ঃ ইয়ং কমরেডস্ লীগ

ওয়াকার্স এ্যাণ্ড পেজান্ট্স্ পার্টির সঙ্গে যুক্ত ধরনী গোস্বামী প্রমুখ কিছু কমিউনিস্ট নেতা আটাশ সাল থেকেই পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের যে সব যুব কর্মী কমিউনিজমের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছিলেন অথচ বিপ্লবী জাতীয়তাবাদের পথও পুরোপুরি বিসর্জন দিতে পারেন নি, তাঁদের নিয়ে 'ইয়ং কমরেডস্ লীগ' নামে একটি সংস্থা গড়ে তোলেন। ধরণী গোস্বামী মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় ধরা পড়লেও সংগঠন ভাঙেনি বরং রাজশাহী ও ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমায় 'ইয়ং কমরেডস্ লীগ' নগেন সরকার ওয়ালি নওয়াজ, সুধাংশু অধিকারী, মনীন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখের নেতৃত্বে জমিদার, বড় তালুকদার ও মহাজনদের জুলুমের বিরুদ্ধে ত্রিশ সালের মে-জুন মাসে এক তীব্র কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলে।

আন্দোলনের সূত্রপাত হয় কিশোরগঞ্জের দশ মাইল দূরে এক গ্রামে এক অত্যাচারী মুসলমান মহাজনের বাড়ির উপর হিন্দু-মুসলমান কৃষকের মিলিত অভিযান দিয়ে। তারা ওই অত্যাচাবী মহাজনের কাছারি বাড়ি তছনছ করে জ্বালিয়ে দেয় সব বন্ধকী দলিল। কিশোরগঞ্জ মহকুমার জাঙ্গালিয়া হোসেনপুর, মাঠখেলো, গোবিন্দপুর প্রভৃতি গ্রামে দেখতে দেখতে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। এর মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য জাঙ্গালিয়া গ্রামের প্রবল অত্যাচারী মহাজন কৃষ্ণ রায়ের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনা। কৃষ্ণ রায়ের বাড়ির সামনে হিন্দু মুসলমান কৃষকেরা দাবি করে সমস্ত ঋণপত্র ও বন্ধকী দলিল তাদের হাতে তুলে দিতে হবে। জবাবে কৃষ্ণ রায় ও তার কর্মচারীরা জনতার উপরে নির্বিচারে গুলি চালায়। এর ফলে আটজন কৃষক নিহত ও বহু কৃষক আহত হন। এর পর জনতা ক্ষেপে গিয়ে দরজা ভেঙে বাড়িতে ঢুকে জিনিসপত্র তছনছ করে, সমস্ত ঋণপত্র জ্বালিয়ে দেয় এবং কষ্ণ রায়কে হত্যা করে।

ইংরেজ সরকার ও জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলো জোর প্রচার চালায় যে ওই হাঙ্গামা সাম্প্রদায়িক এবং কঠোরহস্তে এটা দমন করা দরকার। কমিউনিস্টরা ও জাতীয়তাবাদী মুসলিমদের দ্বারা পরিচালিত 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি' দৃঢ়ভাবে ওই গণজাগরণকে সমর্থন করে। ফলে, প্রজা সমিতির বেশ কয়েকটি জেলা সংগঠনকে সরকার বে-আইনী ঘোষণা করে।

অবিরাম সাম্প্রদায়িক প্রচারের ফলে মোপলা বিদ্রোহের শেষ পর্যায়ের মতো কিশোরগঞ্জের কৃষক আন্দোলন কিছুটা বিপথগামী হলেও ওই আন্দোলন যে মূলত মহাজন বিরোধী কৃষক-খাতক বিস্ফোরণ, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

চার. বার্মায় থারওয়াডডি বিদ্রোহ (১৯৩০-১৯৩১)

সাঁইত্রিশ সালের আগে পর্যন্ত বার্মা ভারতেরই অঙ্গ ছিল। তাই, ভারতের জাতীয় সংগ্রামের বহু নেতা যেমন তিলক, লাজপৎ রাই, অজিত সিং, সুভাষচন্দ্র, যতীন্দ্রমোহন প্রমুখকে অনেক সময় সুদূর বার্মায় নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল। তেইশ সালে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে যুগান্তর ও অনুশীলন দলের বহু নেতাকে ও ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, অরুণ গুহ , জ্যোতিষ ঘোষ, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীকেও মান্দালয়, বেসিন প্রভৃতি জেলে পাঠানো হয়েছিল। ইংরেজ বার্মা অধিকার করে অনেক পরে। বার্মার মুক্তি সংগ্রামের তাই কতকগুলো বৈশিষ্ট্য ছিল, যেমন সেখানকার রাজনীতিতে ফুঙ্গি বা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বিশেষ স্থান।

এঁদের মধ্যে ভিক্ষু উত্তম কংগ্রেস আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা ছিলেন। আবার তাঁর কিছুটা যোগাযোগ ছিল অনুশীলন সমিতির সঙ্গে। আর এক মুক্তি সংগ্রামী ভিক্ষু ফুঙ্গি ওয়াজিয়া একুশ সালের নয়ই এপ্রিল ভিক্ষুর বেশ পরিধান ও অন্যান্য অধিকারের জন্য অনশন ধর্মঘট শুরু করেন এবং একশো তেষট্টি দিন অনশনের পর মৃত্যুবরণ করেন।

কিন্তু বার্মায় যে আন্দোলন সব থেকে সংগ্রামী ও ব্যাপক রূপ গ্রহণ করে সেটি হল ত্রিশ-একত্রিশ সালের থারওয়াডডি বিদ্রোহ। সায়া সেন নামে এক দেশীয় চিকিৎসকের পরিচালনায় ওই বিদ্রোহ ব্যাপকভাবে কৃষকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে—বিশেষ করে থারওয়াডডি, ইনসেত ও পেয়াগন এলাকায়। সায়া সেন এর কৃষক বাহিনী অতিদ্রুত দুর্গম বিস্তীর্ণ এলাকায় ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন করে শত্রুবাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলত। মান্দালয় পাহাড় থেকে সুদূর শান রাজ্যগুলো পর্যন্ত সর্বত্রই ছিল তাঁর অবাধ গতি।

দু'বছর অবিশ্রান্ত সংগ্রামের পর সায়া সেন অবশেষে ইংরেজের হাতে ধরা পড়েন এবং তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

বার্মা সরকারের স্বরাষ্ট্রসচিবের মতে বার্মায় থারওয়াড্ডি কৃষক বিদ্রোহে সেদিন মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল মোট দু'শো চুয়াত্তর জনের এবং দ্বীপান্তরে নির্বাসিত করা হয়েছিল মোট পাঁচশো পঁয়ত্রিশ জনকে। জনসাধারণের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্য বহু বিদ্রোহীর কাটা মাথার প্রকাশ্য প্রদর্শনী সাজিয়েছিল 'সুসভ্য' ইংরেজ সরকার।

পাঁচ. শহরের রাজপথে কলকাতার মেয়র প্রহৃত ও কারারুদ্ধ

ত্রিশ সালে সুভাষ কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হন। পরের বছরে আঠারোই জানুয়ারী সুভাষ বহরমপুর থেকে মালদায় গেলেন। সরকার মালদায় তাঁর প্রবেশ নিষেধ করল একটি আইন জারী করে। তিনি সেই আইন অমান্য করে গ্রেপ্তার বরণ করলেন এবং মালদা জেলে হাজতবাস করলেন সাতদিন।

সবেমাত্র জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন তিনি। এদিকে বিপ্লবীদের একটার পর একটা আক্রমণে ইংরেজ সরকার এবং নরমপন্থী কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ উদ্বেগ বোধ করেছিলেন। তেজবাহাদুর সাপ্রু ও এস.আর. জয়াকরের মত নেতৃবৃন্দ প্রাণপণে চেষ্টা করছিলেন যাতে কংগ্রেস নেতৃত্ব ও ইংরেজ সরকারের মধ্যে আলাপ পরিচয়ের মধ্য দিয়ে পথ পরিষ্কার হয় কংগ্রেসের পক্ষে বিলেতে রাউণ্ড টেবিল বৈঠকে যোগদানের। এরই জন্য বড়লাট কারারুদ্ধ কংগ্রেস নেতারা যাতে পঁচিশে জানুয়ারী তারিখে পরস্পরের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে পারেন তার ব্যবস্থাও করেছিলেন।

কিন্তু তার ঠিক পরের দিন যখন কলকাতার মেয়র সুভাষ 'স্বাধীনতা দিবস' উদ্‌যাপনের জন্য কর্পোরেশন বিল্ডিং থেকে মিছিল নিয়ে ময়দানের দিকে যাত্রা শুরু করলেন তখন কলকাতা পুলিশের ঘোড়সওয়ার বাহিনী অতর্কিতে তাঁদের উপর আক্রমণ করে ও বেটন চালাতে শুরু করে। পুলিশের আক্রমণে রাজপথে কলকাতার প্রথম নাগরিক সুভাষের কব্জি ভাঙে এবং কর্পোরেশনের শিক্ষাবিভাগের প্রধান ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মাথা ফাটে। তাঁদের গ্রেপ্তার করে সঙ্গে-সঙ্গে জেলে পাঠানো হয় এবং সেখানেও উপযুক্ত চিকিৎসার বদলে তাঁদের প্রতি দুর্ব্যবহার করা হয়।

পরের দিন সুভাষের ব্যাণ্ডেজ-করা হাত ঝোলানো অবস্থায় এবং রক্তমাখা জামাকাপড়ে তাঁকে আদালতে হাজির করা হল এবং বিচারে তাঁর ছ'মাসের সশ্রম কারাদণ্ড হল। যাই হোক, আটই মার্চ সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শনের ফলে সুভাষ মুক্তি পেলেন।

ইতিমধ্যেই ইংরেজ সরকার দেশব্যাপী তুমুল উত্তেজনাকে অগ্রাহ্য করে সর্দার ভগৎ সিং এবং তাঁর অন্য দুই বিপ্লবী সহযোদ্ধাকে ফাঁসী দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। মার্চ মাসের তেইশ তারিখে ওঁদের

ফাঁসী হয়ে গেলে গান্ধী-আরউইন চুক্তির সমর্থকরা স্পষ্টতই অস্বস্তিতে পড়লেন। তাঁদের ধারণা হল, ছাব্বিশে মার্চ অনুষ্ঠিত করাচী কংগ্রেসে ভাঙন দেখা দেবে কিন্তু তা ঘটল না। কারণ, সুভাষ এবং চুক্তিবিরোধী অন্যান্য নেতৃবৃন্দ অনুভব করলেন যে দলে ভাঙন ধরিয়ে বাস্তবে কিছু অর্জন করা যাবে না। পক্ষান্তরে, ইংরেজ সরকারের হাত শক্ত করা হবে।

গান্ধীজীর বিদেশ সফর এবং তার প্রতিক্রিয়া

একত্রিশ সালের বারোই সেপ্টেম্বরে গান্ধীজী লণ্ডনে পৌঁছলেন এবং ত্রিশে নভেম্বরে গোলটেবিল বৈঠকের পূর্ণ অধিবেশনে ভাষণ দিলেন। প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি স্বল্পকালের জন্য প্যারিসে অবস্থান করলেন কিন্তু কোনো রাজনীতিবিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন না। এর ফলে ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নটি আন্তর্জাতিক গুরুত্বের বিষয়ে পরিণত হল না। তিনি জেনিভায় গেলেন কিন্তু লীগ অফ নেশন্‌স্ সংস্থার কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাতের কোনো আন্তরিক প্রচেষ্টা দেখালেন না। তিনি অবশ্য মহান ভারতবন্ধু রম্যাঁ রল্যাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। সুইজারল্যাণ্ড থেকে তিনি গেলেন ইটালীতে এবং সেখানে দেখা করলেন মুসোলিনীর সঙ্গে। মুসোলিনী তাঁকে অভিনন্দন জানালেন তাঁর প্রচেষ্টার সাফল্যের জন্য। ফ্যাসীবাদী কর্তৃপক্ষের প্রতি তাঁব আচরণ এবং ফ্যাসীবাদী অনুগামীদের সমাবেশে তাঁর উপস্থিতি ফ্যাসীবাদী বিরোধী গোষ্ঠীগুলোর তীব্র নিন্দার কারণ হল।

ইংরেজ সরকারের নয়া নির্দেশ ও দমন-পীড়ন

উনিশ শো বত্রিশ খ্রীস্টাব্দের চৌঠা জানুয়ারী ভারত সরকার সারা ভারতে সব স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে এই মর্মে নির্দেশ পাঠালেন যে এখনই যেন সমস্ত কংগ্রেসী প্রতিষ্ঠানের উপর আঘাত হানা হয়। আগের বছরে সরকার কর্তৃক প্রস্তুত অর্ডিন্যান্সটি এবার কার্যকর করা হল। কংগ্রেসী নেতাদের কোনোরকম আইন-অমান্য আন্দোলন গড়ে তোলার আগেই ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার করা হল। কংগ্রেস সংগঠনকে বে-আইনী ঘোষণা করা হল। অফিসগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া হল। বাজেয়াপ্ত করা হল তার অর্থভাণ্ডার। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হল। নিষিদ্ধ করা হল জাতীয় সাহিত্য।

ইতিমধ্যেই দোসরা জানুয়ারী তারিখে বোম্বাইয়েব শহরতলী স্টেশন কল্যাণে ট্রেন থেকে নামা মাত্রই সুভাষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাঁকে জব্বলপুরের সেন্ট্রাল জেলে বন্দী করে রাখা হল। ওঁর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায় ওঁকে মাদ্রাজে স্থানান্তরিত করা হলেও স্বল্পকাল পরে ওঁকে উত্তর প্রদেশের বলরামপুর হাসপাতালে পুলিশী প্রহরায় শাবীরিক পবীক্ষা-নিবীক্ষা চালানো হল। বন্দী জীবনের চোদ্দ মাস অতিক্রান্ত হবার পর তাঁর শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক অবস্থায় পৌঁছলে লক্ষ্ণৌয়ের লেফ্‌টেন্যান্ট কর্নেল বাকলে, আই. এম. এস. চিকিৎসার জন্য সুভাষকে ইউরোপে পাঠানোর নির্দেশ দিলেন। বহু চিন্তা-ভাবনার পর তীব্র অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁকে ইউরোপ যাবার অনুমতি দিল সরকাব। বোম্বাইতে উপকূল ত্যাগ করার মুহূর্তে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হল এবং পরের বছর অর্থাৎ তেত্রিশ সালের মার্চ মাসে তিনি ভিয়েনাতে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

আরও কয়েকজন শহীদ

চন্দ্রশেখর আজাদ, মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে গ্রেপ্তার হন এবং পনেরো ঘা বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত হন। দু'বছর পরে বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে কাকোরী মেলভ্যান ডাকাতিতে অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু ধরা না পড়ায় তিনি গোপনে বিপ্লবী সংগঠন গড়ার কাজ চালিয়ে যান এবং ছ'বছর পরে ভগৎ সিং প্রমুখ বিপ্লবীদের সঙ্গে একযোগে হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট বিপাবলিকান পার্টি

গড়ে তোলেন। সরকার তাঁর মাথার দাম ত্রিশ হাজার টাকা ধার্য করেছিল। ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেব কর্তৃক স্যাণ্ডার্স হত্যার সময়ে তিনিও সাহায্যের জন্য ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। মাত্র তিন বছর পরে এলাহাবাদের এ্যালফ্রেড পার্কে চারদিক থেকে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে তিনি একা বহুক্ষণ লড়াই চালিয়ে বেশ কিছু পুলিশ ও অফিসারকে আহত করার পর রাইফেলের গুলিতে নিহত হন মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে। এখন তাঁর নামে এ্যালফ্রেড পার্কটির নামকরণ করা হয়েছে।

হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য ফণী ঘোষ ধরা পড়ে নিজেকে শাস্তির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য রাজসাক্ষী হলেন এবং তাঁর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে লাহোর-ষড়যন্ত্র মামলা, মোতিহারি ষড়যন্ত্র মামলা, সৌননিয়া ডাকাতি মামলা এবং পাটনা ষড়যন্ত্র মামলায় পার্টির চূড়ান্ত ক্ষতি হয়। এর জন্য সরকার তাকে যথেষ্ট টাকা কড়ি দিয়েছিল এবং প্রহরীরও ব্যবস্থা করেছিল তাঁকে রক্ষা করার জন্য। বত্রিশ সালের নয়ই নভেম্বরে তাঁকে ধারালো কুকরীর আঘাতে হত্যা করেন বৈকুণ্ঠ শুকুল এবং আট মাস পালিয়ে থাকার পর তিনি পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। ধরা পড়ার পরের বছরে চোদ্দই মে তারিখে শুকুলের ফাঁসী হয় গয়া জেলে। গান্ধীবাদী নেতা লিখেছেন, ফাঁসীর আগের দিন সারা রাত তিনি শুকুলের অনুরোধে একটার পর একটা গান শুনিয়েছিলেন—ক্ষুদিরামের পছন্দসই গান 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি', রামপ্রসাদ বিসমিলের 'সরফরোশী কী তমন্না অব হমারে দিলসে হ্যায়', রবীন্দ্রনাথের লেখা স্বদেশী গান এবং যখন ফাঁসীর মঞ্চে নিয়ে যাবার জন্য সান্ত্রী এল তখন 'আখরী গানা বন্দেমাতরম'। সহযোদ্ধা বিপ্লবীদের দিকে তাকিয়ে শুকুলের শেষ কথা হল,'দাদা, তবে চলি। আবার আমি আসব, দেশ তো এখনও আজাদ হয় নি। বন্দেমাতরম্।'

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ছোট্ট গ্রাম 'ঘাল্লা ঢের-এর এক পরিবারের সকলেই ছিলেন বাদশা খানের 'খুদা-ই-খিদ্‌মৎগার' বাহিনীর ঘনিষ্ঠ দরদী। তার উপরে হিন্দু পাখতুন পরিবারের মধ্যম পুত্র হরকিষণ ছিলেন ভগৎ সিং ও ভগবতীচরণ-প্রতিষ্ঠিত 'নওজোয়ান ভারত সভা'রও সমর্থক। ওই সভার নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করে হরকিষণ স্থির করেন লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন সভায় গভর্নর স্যার জিওফ্রে মন্টমরেন্সিকে গুলি করে হত্যা করবেন। পিতা গুরুদাস মল পুত্রের এই সিদ্ধান্তের কথা শুনে নিজের হাতে পুত্রকে অব্যর্থ নিশানা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেন কারণ তিনি ছিলেন দক্ষ শিকারী। ত্রিশ সালের তেইশে ডিসেম্বরে সমাবর্তন-অনুষ্ঠানে এসে হরকিষণ দেখেন মঞ্চে গভর্নরের পাশে অনেক বিশিষ্ট অতিথি রয়েছেন, বিশেষ করে পাশেই বসে আছেন সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ। হরকিষণ এই অতিথিদের বাঁচিয়ে গভর্নরকে গুলি করলেন। প্রথম গুলিটি গভর্নরের বুক ঘেঁষে বাঁ হাতে লাগে এবং দ্বিতীয় গুলিটিতে গভর্নর পিঠে সামান্য আঘাত পান। ইতিমধ্যে এক পুলিশ ইনস্পেক্টর হরকিষণকে গুলি করার চেষ্টা করলে হরকিষণের পালটা গুলিতে সে প্রাণ হারায়। আরও দুটি গুলিতে আরও দুজন আহত হন। গুলি ফুরিয়ে যাবার পর হরকিষণকে অনেকে মিলে গ্রেপ্তার করে। প্রায় আড়াই মাস ধরে বিচারের পর হরকিষণকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় এবং প্রিভি কাউন্সিলেও দণ্ড বজায় থাকে। মিয়ানওয়ালি জেলে হরকিষণের ফাঁসী হলে তাঁর অস্ত্রদীক্ষাদান সার্থক হল না দেখে মর্মাহত হয়েছিলেন পিতা গুরুদাস মল। পুত্র গ্রেপ্তারের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনিও গ্রেপ্তার হয়েছিলেন এবং তাঁর বিচার চলছিল লাহোর আদালতে। অসুস্থ দেহ, লক্ষ্যসিদ্ধির ব্যর্থতা এবং তেইশ বছর বয়স্ক ছেলের মৃত্যুতে অবসন্ন গুরুদাস মলের জেলেই মৃত্যু হয় হরকিষণের ফাঁসীর মাত্র পঁচিশ দিন পরে। উনিশ শো চৌত্রিশ সালের নয়ই জুন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে যুগান্তর দলের বিপ্লবী দীনেশচন্দ্র মজুমদারের ফাঁসী হয় মাত্র সাতাশ বছর বয়সে। চার বছর আগে পঁচিশে আগস্ট তারিখে ডালহৌসী স্কোয়ারের কাছে পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টের গাড়ি লক্ষ্য করে দীনেশ প্রথম বোমাটি ছোঁড়েন। তাঁর সঙ্গী ছিলেন অনুজাচরণ সেন, অতুল সেন ও শৈলেন নিয়োগী। উলটো দিক থেকে বোমা ছোঁড়েন অনুজাচরণ কিন্তু সেটি কাছে ফেটে যাওয়ায় ঘটনাস্থলেই নিহত হন অনুজাচরণ। দীনেশ কিছুটা পরে ধরা পড়েন এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে মেদিনীপুর

জেলে প্রেরিত হন। দু'বছর পরে তিনি আরও দু'জন বিপ্লবীর সঙ্গে মেদিনীপুর জেল থেকে পালিয়ে শেষ পর্যন্ত চন্দননগরে আত্মগোপন করেন। ওদিকে বিপ্লবী নলিনী দাসও তাঁর বন্ধু ফণী দাসকে নিয়ে হিজলি জেল থেকে পালিয়ে এসে পৌঁছন চন্দননগরে। চন্দননগরের আস্তানা পুলিশ ঘিরে ফেললে দীনেশ মজুমদার ও নলিনী গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে পুলিশ-ব্যূহ ভেদ করে পালিয়ে যান। দীনেশ মজুমদারের গুলিতে নিহত হন চন্দননগরের পুলিশ কমিশনার। দুই বিপ্লবী নলিনী দাস ও জগদানন্দ মুখার্জীর সঙ্গে দীনেশ মুজমদার শেষ পর্যায়ে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের যে বাড়িতে আত্মগোপন করে থাকেন, পুলিশ তেত্রিশ সালের বাইশে মে সেই বাড়িতে হানা দিলে উভয়পক্ষে গুলি বিনিময় হয়। দীনেশ, নলিনী ও জগদানন্দ শেষ বুলেট অবধি লড়াই কবে আহত অবস্থায় ধরা পড়লে বিচারে দীনেশের ফাঁসী হয়।

এঁরা ছাড়াও বন্দী অবস্থায় সরকারী নির্যাতনে আরও অনেকে শহীদ হয়েছিলেন। এঁদের সঠিক সংখ্যা বলা সম্ভব নয়। এঁদের মধ্যে কয়েকজন শহীদের কথা নিচে বলা হল ঃ

পঞ্চানন পালিত ঃ আইন অমান্য আন্দোলনে গ্রেপ্তার হয়ে ত্রিশ সালে তিনি মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দী ছিলেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কুখ্যাত পেডি তাঁর বুকে সজোরে লাথি মেবে পাঁজর ভেঙ্গে দেন। ফলে, মেদিনীপুর জেলে ওই বছরে তাঁর মৃত্যু হয়।

বাবা লাথু রাম ঃ পাঞ্জাবের ওই ব্যবসায়ী একুশ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন এবং পরে অনেক সমাজকল্যাণমূলক কাজ করেন। ন'বছর পরে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে ওই বছর আগস্ট মাসে মণ্টগোমারি জেলে প্রেরিত হন। সেখানে রাজনৈতিক বন্দীদের উপর যে জুলুম ও নৃশংস অত্যাচার চলছিল, তার প্রতিবাদে অনশন ধর্মঘট করেন এবং সেজন্য তাঁকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় একটি কক্ষে বন্দী করে রাখা হয়। এর প্রতিবাদে তিনি জল গ্রহণও বন্ধ করেন। এই ষাট বছর বয়স্ক বন্দী জবরদস্তি খাওয়ানোর চেষ্টা প্রাণপণে প্রতিরোধ করেন। অবশেষে তিনি মারা গেলেন ওই বছরের তেরোই ডিসেম্বরে।

ভাউগির গোস্বামী ঃ ইনি মহারাষ্ট্রের আইন অমান্য আন্দোলনের সত্যাগ্রহী। মদের দোকানে পিকেট করছিলেন। পুলিশ দেওয়ালে বারবার তাঁর মাথা ঠোকার পর গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে জেলে পাঠানো হয় এবং সেখানে তিনি ত্রিশে ডিসেম্বর মারা যান।

অনিলচন্দ্র দাস ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কৃতী ছাত্র ঢাকার বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে গ্রেপ্তার হন এবং পুলিশের অমানুষিক অত্যাচাবের ফলে তাঁর মৃত্যু হয়।

গুরুদাস রাম ঃ পাঞ্জাবের ফিরোজপুর জেলার এই তরুণ স্কুলে ছাত্রাবস্থা থেকেই কংগ্রেসী আন্দোলনে ও পরে বিপ্লবী দলে যোগ দেন। ষোলো বছর বয়সে ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনারেল অফ পুলিশেব উপরে বোমা ফেলার জন্য তাঁর তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। সেখানে কর্তৃপক্ষের নির্মম দৈহিক অত্যাচারের প্রতিবাদে তিনি অনশন ধর্মঘট করেন। ওই অবস্থাতেও তাঁর উপর এমন অত্যাচার চালানো হয় যে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তিনি মুক্তি পান। মুক্তির কিছুদিনের মধ্যেই তিনি লোকান্তরিত হন।

সান্ত্বনা গুহ ঃ শান্তিনিকেতনেব ছাত্রী এবং সুলেখিকা এই মহিলার 'অগ্নিমন্ত্রে নারী' প্রভৃতি একাধিক বই সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। এঁকে বিনা বিচারে আটক করে রাখা হয় এবং জেলে আইন অমান্য করার অপরাধে বারবার শাস্তি পান। হিজলি বন্দীশালায় কর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহারের জন্য একুশ দিন অনশন ধর্মঘট করেন। তারপর রাজশাহী জেলে তাঁর উপর নৃশংস অত্যাচারের ফলে তিনি মারা যান চৌত্রিশ সালের উনিশে ডিসেম্বর।

নবজীবন ঘোষ ঃ মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট বার্জকে হত্যা করার পর ওই জেলার বহু পবিবার সরকারী অত্যাচারে জর্জরিত হয়। নবজীবনের ভাই নির্মলজীবনের তো ফাঁসীই হয়। ঘোষ পরিবারের আরো অনেকের মতো নবজীবন প্রথমে জেলা থেকে বহিষ্কৃত হন এবং এক বছর পরে কলকাতায় গ্রেপ্তার

হন। আরো দু'বছর পরে ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ থানায় অন্তরীণ অবস্থায় পুলিশের নৃশংস অত্যাচারের ফলে তিনি নিহত হন।

আন্দামান সেলুলার জেলের বন্দীরা তাঁদের জীবনের নিরন্তর দুঃসহ যাতনা কিছুটা লাঘব করার জন্য তেত্রিশ সালে চিফ কমিশনারের কাছে ভালো খাদ্য, পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা এবং বই ও পত্রিকা পড়ার সুযোগের দাবিতে আমরণ অনশনের প্রতিজ্ঞা করেন। চিফ কমিশনার এঁদের দাবি প্রত্যাখ্যান করলে আমরণ অনশন শুরু হয়। বন্দীদের হাত-পা বেঁধে, নাকে নল ঢুকিয়ে জবরদস্তি খাওয়ানোর চেষ্টা হয় এবং অনশনের তেতাল্লিশ দিন পার হলে, কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ওঁদের জল পানও করতে দেওয়া হয় না। অবশেষে, নাকে নল ঢুকিয়ে জবরদস্তি করে দুধ খাওয়াতে গিয়ে ফুসফুসে দুধ ঢুকে গিয়ে শহীদ হলেন তিনজন বিপ্লবী—মহাবীর সিং রাঠোর (লাহোর-ষড়যন্ত্র মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত), মোহিত মৈত্র (অস্ত্র আইনে পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত) এবং মোহনকিশোর নমোদাস (যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত)।

ইতিমধ্যে আন্দামান বন্দীদের অনশনের খবর আর তিন বন্দীর আত্মদানের খবরে দেশে তুমুল আন্দোলন শুরু হয়। কংগ্রেস ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী সকলেই যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন অনশন থামাবার। ছাত্র, যুবক, সাধারণ নাগরিকেরা সকলেই রাস্তায় নামেন। শেষ পর্যন্ত, ছেচল্লিশ দিন অনশনের পর এক-একটি করে সুযোগ-সুবিধা পাওয়া গেল- খাদ্যের অবস্থা বেশ কিছুটা উন্নত হল, সেলে সেলে আলো এবং বহু বইপত্রও পাওয়া গেল তিনটি অমূল্য প্রাণ এবং সমস্ত বন্দীর স্বাস্থ্যের মূল্যে।

একত্রিশ সাল থেকে কারাগার থেকে পালানো রাজবন্দীদের তালিকা ঃ (পরবর্তী তিন বছর পর্যন্ত) ওই বছরে হিজলী বন্দীশিবির থেকে পালান ফণী দাশগুপ্ত ও নলিনী দাস।

তার পরের বছরে মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে পালান দীনেশ মজুমদার, শচীন করগুপ্ত ও সুশীল দাশগুপ্ত।

আর এক বছর পরে বক্সা বন্দীশিবির থেকে পালান জিতেন গুপ্ত ও কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী এবং বহরমপুর বন্দীশিবির থেকে পালান ধীরেন দাস ও নিরঞ্জন মুখার্জী।

তারপরের বছরে আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে পালান পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত, নিরঞ্জন ঘোষাল, সীতা নাথ দে ও হরিপদ দে এবং বিজাপুর দুর্গ থেকে পালান বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা ডঃ গঙ্গাধর অধিকারী।

একুশ সালের প্রথম লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার গোড়ায় মৃত্যুদণ্ডে ও পরে দণ্ড হ্রাস করে যাবজ্জীবন দণ্ডে দণ্ডিত পৃথ্বী সিং আজাদকে দেশে ফিরিয়ে এনে মাদ্রাজ জেল থেকে কলকাতার কোনো জেলে নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ে পালানোর চেষ্টা করেন কিন্তু পরদিনই ধরা পড়েন। পরের বছর রাজমহেন্দ্রী জেল থেকে নাগপুর জেলে যাওয়ার পথে আবার তিনি ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ে পালান—এবার কিন্তু তাঁকে আর ধরা যায় নি।

বিনয়-বাদল-দীনেশের রাইটার্স অভিযান

ত্রিশ সালের আটই ডিসেম্বর বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স বা বি. ভি. দলের তিন তরুণ সদস্য বিনয় বসু, বাদল ওরফে সুধীর গুপ্ত এবং দীনেশ গুপ্ত প্রকাশ্য দিবালোকে কলকাতায় রাইটার্স বিল্ডিংয়ে হানা দিয়ে ইনস্পেক্টর জেনারেল অফ প্রিজন সিম্পসনকে গুলি করে হত্যা করেন।

ঠিক হয়েছিল, বিনয় বসুর নেতৃত্বে দীনেশ ও বাদল রাইটার্স বিল্ডিংস-এ ঢুকে কারাধিপতি কর্ণেল সিম্পসন্ ও অন্যান্য রাজপুরুষদের আক্রমণ করবেন। লোম্যানকে হত্যা করে বিনয় বসু তখন আত্মগোপন করে ছিলেন দলের আশ্রয়ে। তিনি ছিলেন মেটিয়াবুরুজে রাজেন গুহের বাড়িতে। দীনেশ ও বাদলকে রাখা হয়েছে নিউ পার্ক স্ট্রীটের একটি বাড়ির দোতলায়। মেটিয়াবুরুজ থেকে বিনয়কে রসময়

শূর এবং নিউ পার্ক স্ট্রীট থেকে দীনেশ ও বাদলকে নিকুঞ্জ সেন ট্যাক্সি করে খিদিরপুরে পাইপ রোডের মোড়ে একই সময়ে নিয়ে আসবেন বলেও স্থির হয়ে রইল। সময়ের একটু এদিক-ওদিক হবার উপায় নেই। কারণ, বিনয় বসুকে ধরার জন্য দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে সরকার।

দীনেশ ও বাদলকে আনার জন্য যথাসময়ে নিকুঞ্জ সেন নিউ পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে উপস্থিত হলেন। তিনি দেখলেন যে, তরুণদ্বয় দুঃসহ কর্মযাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে কাব্যপাঠে মগ্ন। দীনেশ তাঁর আরাধ্য দেবতা রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থ থেকে পড়ে চলেছেন কবিতা আর বাদল একাগ্রচিত্তে তাই শুনছেন। নিকুঞ্জ সেনের উপস্থিতি টের পেতেই তাঁরা কাব্যগ্রন্থ গুটিয়ে রেখে অনায়াসে সৈনিকের ক্ষিপ্রতায় 'এ্যাটেনশন' হয়ে দাঁড়ালেন।

যাত্রা শুরু হল।

বিনয় বাদল দীনেশ

নির্ধারিত সময়ে দীনেশ ও বাদলকে খিদিরপুর পাইপ রোডের মোড়ে নামিয়ে দিয়ে নিকুঞ্জ সেন লে গেলেন। ঠিক পাঁচ মিনিট পর আর একটি ট্যাক্সিতে রসময় শূর বিনয় বসুকে সঙ্গে করে সেই ানে নিয়ে এলেন।

নির্দিষ্ট কার্যসূচী অনুযায়ী বিনয় বসু অপেক্ষমান দীনেশ ও বাদলের সঙ্গে মিলিত হলেন। রসময় ূর দূরে দাঁড়িয়ে দেখলেন। মিনিট খানেকের মধ্যেই একটি চলন্ত ট্যাক্সি থামিয়ে তাতে তাঁরা তিনজনে ঠে বসেছেন। উল্কার বেগে এই তিন জন বীরকে নিয়ে ট্যাক্সিটি উধাও হয়ে গেল।

বিনয় মেডিক্যালের ছাত্র। লোম্যান-হত্যার আসামী হিসেবে সরকার ইতিমধ্যেই এই ফেরারী বিপ্লবীর াথার দাম ধার্য হয়েছে দশ হাজার টাকা। দীনেশ গুপ্ত শুধুমাত্র মৃত্যুহীন শহীদ নন, তাঁর মতো সফল ংগঠক বিপ্লবীদের ইতিহাসেও খুব বেশি নেই। মেদিনীপুরে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স দলের শাখা তিনিই ত্তন করেন। তাঁর আদর্শে, প্রেরণায় ও শিক্ষায় শিক্ষিত বিপ্লবীরাই তিন তিনটি জেলা-শাসককে হত্যা রে মেদিনীপুরে ইংরেজ-শাসন সাময়িকভাবে বিকল করে দিয়েছিলেন। ফাঁসীর দড়ি গলায় পরে তাঁরই নুগামী প্রদ্যোৎ-রামকৃষ্ণ-ব্রজ-নির্মলজীবন আত্মাহুতি দিলেন, তাঁরই মন্ত্রে উদ্দীপ্ত অনাথ পাঁজা ও মৃগেন ুপ্ত লড়াই করতে করতে প্রাণ দিলেন। দীনেশ গুপ্তের 'বিপ্লবী-মেদিনীপুর' সে-যুগে শৌর্যের ইতিহাসে একটি অমূল্য অধ্যায় সংযুক্ত করে গেছে।

এ ছাড়া দীনেশ ছিলেন দক্ষ স্বেচ্ছাসৈনিক। সুভাষচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার বাহিনী'র তিনি ছিলেন ক্যাপ্টেন। মেজর সত্য গুপ্তের তিনি প্রিয় অফিসার। নিয়মানুবর্তিতা রক্ষায় অদ্বিতীয়।

দীনেশ গুপ্তের আরো দিক ছিল। তিনি শুধু জাত-সাহিত্যিক নন, ছিলেন ধ্যানস্থ এক সাহিত্য

জিজ্ঞাসুও। জেল থেকে লিখিত তাঁর পত্রাবলী রসোত্তীর্ণ তো বটেই, দার্শনিক তত্ত্বে ও গভীর উপলব্ধিতেও সমৃদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব দীনেশের কিশোর-মনে সহজভাবে নিরন্তর বহমান ছিল।

রাইটার্স বিল্ডিংস ছিল দ্বৈত-শাসনপুষ্ট ব্রিটিশ সরকারের প্রধানতম দপ্তর। সে শাসনব্যবস্থা দেশবন্ধু এককালে বিকল করে দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর অবশ্য পুনরুজ্জীবিত হয় সেই ব্যবস্থা। তখন কিন্তু ইংরেজের ওই দুর্গে কারো আক্রমণের আশঙ্কায় কোনো কোলাপ্‌সিবল্ গেটের প্রতিরোধ রচিত হয়নি।

বিনয়, বাদল ও দীনেশ সোজা তিন তলায় উঠে যান এবং ইনস্পেক্টর জেনারেল অফ প্রিজনস্ কর্নেল সিম্পসনের ঘরে ঢুকে তাঁকে গুলি করে হত্যা করলেন। তাঁরা সিম্পসন্‌কে কে হত্যা করেই থামলেন না, অলিন্দের পূর্ব দিক ধরে গুলি ছুঁড়তে-ছুঁড়তে এগোতে থাকলেন। এর উদ্দেশ্য হয়তো ছিল আর্দালিসহ অন্যান্য ইংরেজ অফিসারকে সন্ত্রস্ত করা। তখন ওঁদের কেউ প্রতিরোধ করার সাহস দেখায়নি। ওঁরা নিঃশঙ্ক চিত্তে সারা বারান্দা চষে বেড়াতে থাকলেন এবং ওঁদের কণ্ঠ থেকে সমানে উচ্চারিত হতে থাকল 'বন্দে-মাতরম্' ধ্বনি।

অনেক অফিসার নিজস্ব আর্দালির মুখে এই ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ শুনে এবং আসন্ন মৃত্যুর কথা ভেবে নিজস্ব কক্ষের মধ্যেই টেবিলের নিচে বা আলমারির আড়ালে লুকোলেন। কিন্তু কৌতূহলী হয়ে যাঁরা দরজার পর্দা সরিয়ে বারান্দার ওই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখতে চেয়েছিলেন তাঁদের অচিরেই এর জন্য মূল্য দিতে হল। আহত হলেন ফিনান্স সেক্রেটারি আলেক্সজাণ্ডার মার্ এবং জুডিশিয়ালসেক্রেটারি নেলসন্। আব্দেল করিম গজনভি কামরার অভ্যন্তরে অবস্থান করেই আত্মরক্ষার্থে ঘন ঘন বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিতে থাকলেন।

বন্দুকের গুলি ফুরিয়ে যাওয়াতে রিভলভারগুলো পুনরায় গুলিভর্তি করার জন্য বিপ্লবীরা ইতিমধ্যে পাশপোর্ট অফিসঘরে ঢুকেছিলেন। এই অফিস ঘরটি ছিল 'সেন্ট্রাল পোর্টিকোর' পূর্বপ্রান্তে, চিফ সেক্রেটারির কামরা পেরিয়ে। হয়তো চিফ সেক্রেটারিই ছিলেন তাঁদের পরবর্তী লক্ষ্য।

এদিকে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী ওঁদের চারদিকে ঘিরে ফেলেছে। পালাবার আর কোনো পথ নেই। তখন ওঁরা ঢুকে পড়লেন ডি. পি. আই. -এর কামরায়। মৃত্যুকে বরণ করার জন্য বীরেরা গ্রহণ করলেন বিষ। শুধু তাই নয়, মৃত্যুকে সুনিশ্চিত করার জন্য নিজেদের মাথা তাক্ করে নিজেরা গুলি ছুঁড়লেন। বাদল গুপ্ত নিজেকে অবশ্য গুলি করার সুযোগ পান নি। তার আগেই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। কিন্তু বিনয় বসু ও দীনেশ গুপ্ত মরেও মরলেন না। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। পাঁচ দিন পরে বিনয় লোকান্তরিত হলেন, বাঁচলেন শুধু দীনেশ।

একত্রিশ সালের সাতই জুলাই দীনেশ গুপ্তের ফাঁসী হয়ে গেল জেলের ভিতরে, একান্ত সংগোপনে। কিন্তু সে গোপনতা বজায় থাকেনি। ইতিপূর্বে কোনো ছিদ্রপথে সে খবর বেরিয়ে এসেছিল। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের 'অ্যাডভান্স' পত্রিকায় পরদিন সকালে বড় বড় অক্ষরে সংবাদ-শিরোনামে ছাপা হল, 'ডন্টলেস দীনেশ ডাইজ এ্যাট ডন'।

করাচী কংগ্রেস অধিবেশনের আগে পরে

একত্রিশ সালের শুরু থেকেই কংগ্রেস ও সরকারের মধ্যে যে আপোষ আলোচনা চলছিল তার ফলস্বরূপ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পাঁচই মার্চ তারিখে গান্ধীজী ও সরকারের পক্ষ থেকে বড়লাট লর্ড আরউইন এক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ফলে, আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহৃত হল ও বন্দী সত্যাগ্রহীরা ছাড়া পেলেন এবং কংগ্রেসের পথ খোলা রইল বিলেতে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিয়ে তাঁদের দাবি আদায়ের চেষ্টা করার।

কিন্তু জেলে রইলেন বাংলার রাজবন্দীরা, ঠাকুরচন্দ্র সিং ও তাঁর গাড়োয়ালি সহবন্দীরা এবং লাহোর, মীরাট ও বিভিন্ন ষড়যন্ত্র মামলার দণ্ডিতেরা। আর সেদিন সকলকে, বিশেষ করে তরুণ সমাজকে যেটা

বিশেষ করে ক্ষুব্ধ করেছিল সেটা হল কংগ্রেস অধিবেশন শুরু হওয়ার ঠিক আগেই ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেবের ফাঁসী। তাঁদের বিক্ষোভ সেদিন প্রকাশ পেয়েছিল গান্ধীজীর বিরুদ্ধে কালো পতাকা প্রদর্শনের মিছিলে।

কংগ্রেস অধিবেশন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল। চব্বিশে মার্চ থেকে কানপুরে যে সাম্প্রদায়িক-দাঙ্গা শুরু হয়েছিল তাতে কয়েকশো হিন্দু ও মুসলমান নিহত হয়। উত্তরপ্রদেশ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি, কানপুরের 'প্রতাপ' পত্রিকার সম্পাদক ও বিপ্লবীদের বন্ধু গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থীর নিহত দেহের সন্ধান পাওয়া যায় উনত্রিশে মার্চ। হিন্দু এলাকা থেকে মুসলমান এবং মুসলিম এলাকা থেকে বহু হিন্দু পরিবারকে উদ্ধার করতে গিয়ে তিনি শহীদ হয়েছিলেন।

সমস্ত বিক্ষোভ ও অসন্তোষ সত্ত্বেও করাচী কংগ্রেসে গান্ধী-আরউইন চুক্তি অনুমোদিত হল। পথ পরিষ্কার হল গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের। তবু কংগ্রেসের অনুমোদন পাবার পরমুহূর্ত থেকে স্পষ্ট টের পাওয়া গেল চুক্তির শর্ত সরকারের তরফ থেকে ভঙ্গের। সব বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও গান্ধীজী উনত্রিশে আগষ্ট বিলেতের উদ্দেশে যাত্রা করলেন কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে।

গোলটেবিল বৈঠকে কোনো দাবিই আদায় হল না। আর ওদিকে দেশে নিত্য নতুন অত্যাচার শুরু করল লর্ড উইলিংডনের সরকার। আটাশে ডিসেম্বরে গান্ধীজী খালি হাতে দেশে ফিরে এলেন। গত বছরের মতো সরকার এবার কিছুটা অপ্রস্তুত অবস্থায় আইন অমান্য আন্দোলনের মুখোমুখি। গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হবার পরের বছরে চৌঠা জানুয়ারী কংগ্রেস ও তার সমর্থক সমস্ত সংগঠন বে-আইনী ঘোষিত হল এবং ওইদিনই গ্রেপ্তার হলেন গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতা।

ভারতবর্ষের মানুষ কিন্তু এই অত্যাচার মেনে নিতে পারেন নি। তাই, ওই বছরের প্রথম চার মাসে গোটা দেশ জুড়ে গ্রেপ্তার করা হল আশি হাজার মানুষকে আর পরবর্তী বছরের মার্চ মাসে ওই সংখ্যা দাঁড়াল এক লক্ষ কুড়ি হাজারে। এর সঙ্গে ছিল ব্যাপক গুলি চালানো, মারপিট, পিটুনি কর আদায় ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার হিড়িক। জনসাধারণের এত আত্মদানও সেদিন অবশ্য কোনো সার্থকতা পায় নি।

আইন অমান্য আন্দোলনের অন্তিম পর্ব

নেতৃত্ববিহীন সৈন্যদের বেপরোয়া সংগ্রাম ওই দু'বছরে ক্রমে ক্রমে স্তিমিত হয়ে এল। গান্ধীজী তেত্রিশ সালের জুলাই মাসে আলাপ-আলোচনার জন্য বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা করলেন কিন্তু বড়লাট রাজি হলেন না যতক্ষণ না গণ-আন্দোলন প্রত্যাহৃত হচ্ছে। কংগ্রেসের কার্যকর সভাপতি কংগ্রেসের সমস্ত সংগঠন ভেঙে দিয়ে আলাপের পথ পরিষ্কার করলেন। পরের বছরের মে মাসে গান্ধীজী এক বিবৃতিতে জানান, গণ-আন্দোলনের বদলে তিনি একাই আইন অমান্য করবেন। এরপরেই আনুষ্ঠানিকভাবে বিনা শর্তে আইন অমান্য আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘোষণার জন্য পাটনায় এ. আই. সি. সি.-এর অধিবেশন আহ্বানের ব্যবস্থা হল আর ওই ঘোষণার পরের বছরে সরকার কংগ্রেসের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিল। তবে ওই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের চৌহদ্দি থেকে বাদ দেওয়া হল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের লালকোর্তা বাহিনী, উত্তরপ্রদেশে যে সব কৃষক সমিতি ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন চালাচ্ছিল তাদের এবং সঙ্গী যুব লীগগুলোকে।

অন্য দিকে মীরাটে ধরপাকড়ের ফলে শ্রমিক আন্দোলন রাজনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, এমন কি কমিউনিস্ট পার্টিও সাময়িকভাবে ভেঙে যায়। কিন্তু মীরাট মামলা ফেঁসে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিষ্ট নেতারা মুক্তি পেয়েই অতি দ্রুত পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়নের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ওঁরা বোম্বাই সূতাকল শ্রমিক ধর্মঘটে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। সরকার-বিরোধী তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য জুলাই মাসে কমিউনিস্ট পার্টিকে আনুষ্ঠানিক ভাবে বে-আইনী ঘোষণা করা হল।

আন্দোলন প্রত্যাহৃত হওয়ার ফলে কংগ্রেসের কিছু নেতা ও সাধারণ কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যে আশাভঙ্গ ও প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয়। অনেকে সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বে আগ্রহী হন। অক্টোবর মাসে তেরোটি প্রাদেশিক সভায় ওই ধরনের সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন হয় বোম্বাইয়ে। তার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে গঠিত হয় 'অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি', ওই পার্টি যে কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই কাজ করবে, তা পার্টির নামকরণ থেকেই বোঝা যায়। অশোক মেহতা, রামমনোহর লোহিয়া, জয়প্রকাশ নারায়ণ ও এস. এম. যোশী প্রমুখ বারোজন নেতাকে নিয়ে এই নতুন পার্টির হাই -কমাণ্ড গঠিত হয়।

সমসাময়িক রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে সুভাষের ভূমিকা

উনিশ শো তেত্রিশ সালের গোড়ার কথা। জব্বলপুর সেন্ট্রাল জেলে তখন শরৎ ও সুভাষ একই সঙ্গে বন্দী। সুভাষ গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী। চিকিৎসার জন্য সরকার তাঁকে ইউরোপে যাবার অনুমতি দিল। জেল থেকে কড়া পুলিশী পাহারায় তাঁকে এ্যাম্বুলেন্সে করে স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হল, সেখান থেকে স্ট্রেচারে করে তাঁকে তুলে দিল ট্রেনের কামরায়।

জেলের মধ্যে শরতের কাছে বিদায় নেবার সময় সুভাষ ভেঙে পড়লেন। শরতের কাঁধে মাথা রেখে কিছুক্ষণ কাঁদলেন। আগেই ঠিক হয়েছিল, বোম্বাই থেকে সুভাষকে জাহাজে তুলে দেওয়া হবে এবং জাহাজটি ভারতের কূল ছেড়ে যাবার পর তিনি মুক্ত হবেন।

মার্চ মাসে তিনি ভিয়েনাতে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

যদিও সুভাষের ইউরোপ ভ্রমণের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল দ্রুত আরোগ্যলাভ করা, তবু এটা বিস্ময়কর নয় যে, ইউরোপে গিয়ে তিনি সুযোগের সদ্ব্যবহার করবেন তাঁর মাতৃভূমির বিষয়গুলো তুলে ধরবার জন্য। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মহাদেশের সমস্ত স্বাধীনতাপ্রেমী জনগণের নৈতিক এবং কার্যকরী সমর্থন আদায় করা। ওঁর উপর কোনোও বিশ্বাস ছিল না ব্রিটিশ সরকারের। তাই এমব্যাসী ও কনস্যুলেটগুলোকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল তাঁর কার্যকলাপের উপর নজর রাখার জন্য।

তেত্রিশ সালের পঁচিশে মার্চ ভিয়েনায় ব্রিটিশ কনসাল সুভাষের পাশপোর্টে হাঙ্গেরি ও চেকোশ্লোভাকিয়া যাবার এবং চব্বিশে এপ্রিল যুগোশ্লোভিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, গ্রীস, তুরস্ক, স্পেন, পর্তুগাল, সুইডেন, ডেনমার্ক ও নরওয়ে ভ্রমণ করার অনুমতি দিলেন। তাঁর মূল পাশপোর্টটিতে লালকালিতে উল্লেখ করা ছিল—'জার্মানী অথবা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে প্রবেশের পক্ষে বৈধ নয়।' তাঁর একান্ত প্রচেষ্টা এবং কয়েকজন ব্রিটিশ এম. পি. র চাপ সৃষ্টির ফলে সরকার চিকিৎসা-সংক্রান্ত পরামর্শ গ্রহণের জন্য সুভাষকে জার্মানী যাবার অনুমতি দিতে রাজি হল। একজন ব্রিটিশ প্রজা হলেও ইংলণ্ডে যাবার অনুমতি ছিল না তার। কিন্তু সতর্কিতের তালিকায় তাঁর নাম না থাকায় ভিয়েনা কন্সাল তাঁকে বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড এবং পোল্যাণ্ড ভ্রমণের অনুমতি দিলেন। তিনি অবশ্য সুভাষের পাশপোর্টে মিশরের জন্য অনুমোদন দান করতে অস্বীকার করলেন।

সুভাষ ইউরোপে ছিলেন প্রায় তিন বছর—চৌত্রিশ থেকে ছত্রিশ সাল। চৌত্রিশ সালের ডিসেম্বর মাসে বাবার গুরুতর অসুস্থতার তারবার্তা পেয়ে তিনি ভারতে এসেছিলেন। বাবাকে অবশ্য জীবিত দেখতে পাননি তিনি। তাঁর পৌঁছনোর আগের দিনই জানকীনাথের জীবনাবসান হয়। অনুমতি না নিয়ে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করায় আঠারো শো আঠারো সালের রেগুলেশন থ্রি অনুসারে কলকাতায় তাঁর উপর এক নির্দেশ জারি করে সুভাষকে স্বগৃহে অন্তরীণ করে রাখা হল।

তিনি প্রায় মাসখানেক তাঁর পরিবারের সঙ্গে বাস করে পঁয়ত্রিশ সালের জানুয়ারী মাসে আবার ইউরোপের উদ্দেশে যাত্রা করেন। ইউরোপে স্বল্পস্থায়ী অবস্থানের মধ্যে সুভাষ নিম্নলিখিত কাজগুলো সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ঃ

এক ঃ ভারতের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারের কুৎসামূলক প্রচারের বিরোধিতায় ভারতের ভাবমূর্তি ঊর্ধ্বে তুলে ধরা।

দুই ঃ ভারতের স্বাধীনতার জন্য নৈতিক এবং বাস্তব সাহায্য সংগ্রহ করা।

তিন ঃ আন্তর্জাতিক রাজনীতির অভ্যন্তরীণ ধারাটিকে উপলব্ধি করা এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে ভারতের সাহায্যে কাজে লাগানো।

চার ঃ বিশেষ করে ইউরোপের সেই সব দেশের রাজনৈতিক পদ্ধতির শিক্ষাগ্রহণ করা যে সব দেশ ফ্রান্স এবং ইংল্যাণ্ডের মতো সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোকে ভয় দেখাচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বিতার। ভিয়েনায় অবস্থানকালে অস্ট্রিয়ার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন হল তাঁর, কমিউনিস্ট দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ভাব-বিনিময় করলেন তিনি। সমাজবাদীদের নিয়ন্ত্রণাধীন ভিয়েনার মেয়র সুভাষকে পুরসভা পরিদর্শনে আমন্ত্রণ জানালেন। চোকোশ্লোভাকিয়ার বিদেশমন্ত্রী ডাঃ বেন্‌সের সঙ্গে তাঁর আলোচনা হল। তিনি চেক যুব-আন্দোলনকে বুঝতে চাইলেন সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে। তা ছাড়া, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংলণ্ড এবং রাশিয়ার সাহায্যে গঠিত চেক-লিজিয়নের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হলেন। তিনি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন বিশিষ্ট চেক ভারত-তত্ত্ববিদ্ প্রফেসর লেস্‌নির সঙ্গেও।

প্রাগে পোল্যাণ্ডের কূটনীতিবিদের সাহায্যে তিনি পোল্যাণ্ড সফরের সুযোগ পান এবং প্রথম মহাযুদ্ধের সময় রাশিয়ার অধিকার থেকে স্বাধীনতা লাভের জন্য জাপানে পোল্যাণ্ড সেনাবাহিনীর শিক্ষাসম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি।

স্বাস্থ্য-পরীক্ষার অজুহাতে জার্মানীতে গেলেও সুভাষ বৈদেশিক দপ্তরের কিছু নাৎসী নেতা ও অফিসারের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ গ্রহণ করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ভারতের জন্য নৈতিক ও বাস্তব সাহায্যের সন্ধান করা। কারণ তিনি অনুভব করেছিলেন, আপন জাতীয় শক্তি এবং আত্মসম্মানের চেতনায় জেগে উঠেছে যে জার্মান জাতি, তারা সহজাত প্রেরণাতেই একই লক্ষ্যে সংগ্রামরত অন্যান্য জাতিদের সম্পর্কে গভীর সহানুভূতি পোষণ করবে। তাঁর জানার আগ্রহ ছিল যে কীভাবে জার্মানীতে হিটলার এবং ইটালিতে মুসোলিনী অতি অল্পসময়ের মধ্যে জাতীয় চেতনাকে এত ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে পেরেছিলেন যে এই দুটি দেশ ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের প্রাধান্যকে পর্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা জানাতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু ভারতে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে ছত্রিশ সালে তিনি যখন আবার জার্মানী ভ্রমণ করেন তখন তিনি স্টুটগার্টে জার্মান একাডেমী ফর ফরেন রিলেশন্‌স্ -এর প্রতিষ্ঠাতা এবং ডিরেক্টর ড. থিয়ের ফেলডারকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, 'আমি দুঃখিত যে আমাকে ভারতে ফিরে যেতে হচ্ছে এই বিশ্বাস নিয়ে যে জার্মানীর নবজাতীয়তাবাদ কেবল সংকীর্ণ আর স্বার্থপরই নয়, উদ্ধতও বটে।'

পঁয়ত্রিশ সালের তেসরা এপ্রিল জেনিভাতে সুভাষ সাক্ষাৎ করেন রম্যাঁ রল্যাঁর সঙ্গে। সাক্ষাৎকার চলাকালে তিনি অত্যন্ত খুশি হয়ে উঠেছিলেন যখন রম্যাঁ রল্যাঁ মন্তব্য করেন, সত্যাগ্রহ ব্যর্থ হলে তিনি কামনা করবেন আন্দোলন ভিন্ন পথ অনুসরণ করুক। কারণ সুভাষের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে মহাত্মা এতদিন তাঁর দেশকে আশ্চর্যজনকভাবে সেবা করেছেন এবং তিনি তেমনই করে চলবেন। তবু তাঁর নেতৃত্বে ভারতের মুক্তি অর্জন সম্ভব নয়। ইউরোপে অবস্থানকালে সুভাষ যুগোশ্লোভিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, ফ্রান্স, তুরস্ক এবং আয়ার্ল্যাণ্ডও ভ্রমণ করেন। তুরস্কের কামাল আতাতুর্ক এবং আয়ার্ল্যাণ্ডের ডি. ভ্যালেরার নেতৃত্বে সিন ফিন আন্দোলনের সাফল্যে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন তিনি। তাঁদের সাফল্য রবীন্দ্রনাথকেও অত্যন্ত প্রভাবিত করেছিল। আইরিশ বিপ্লবের রূপকথার চরিত্র মাদাম গোন্না ম্যাকব্রাইডের সঙ্গে সুভাষ সাক্ষাৎ করেছিলেন। ডি. ভ্যালেরার সঙ্গেও তিনি সাক্ষাৎ করেছিলেন। ভ্যালেরার সহানুভূতি ছিল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি। সুভাষ লীগ অব নেশন্‌স্-এর প্রধান দপ্তর পরিদর্শন করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ভারতের নায্য কারণের প্রতি সমর্থন আদায়ের জন্য এই আন্তর্জাতিক মঞ্চটিকে ব্যবহার করা। কিন্তু তিনি দেখে সম্পূর্ণ হতাশ হলেন যে লীগ বৃহৎ শক্তিগুলিরই নিয়ন্ত্রণাধীন।

আয়ার্ল্যাণ্ডের ডি. ভ্যালেরা আমেরিকা থেকে এবং সান ইয়াৎ সেন জাপান থেকে সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। জারকে উৎখাত করার জন্য লেনিন জার্মানীর প্রতিক্রিয়াশীল সম্রাটের সাহায্য প্রার্থনা করতে দ্বিধা করেন নি। জার্মানী কিংবা জাপান সম্পর্কে সুভাষের কোনো মোহ ছিল না। অস্বীকার করা যায় না, জার্মানদের জীবনের কিছু কিছু বিষয় তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল, কিন্তু তাঁদের কাজকর্ম তিনি কখনও অন্ধভাবে সমর্থন জানান নি।

সুভাষ মনে করতেন, স্বাধীনতালাভের পর ভারতীয় জনগণের সামনে কাজ হবে সমাজবাদের ভিত্তিতে জাতীয় জীবনকে পুনর্গঠিত করা। তিনি অনুভব করেছিলেন, 'আমরা এইসব জাতীয় সমস্যা. বিশেষত অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব ব্যক্তিগত উদ্যোগের হাতে ছেড়ে দিতে পারি না. অর্থনৈতিক প্রশ্নের সমাধানের দায়িত্ব নেবে রাষ্ট্র। দেশের শিল্পায়নের প্রশ্নেই হোক কিংবা হোক কৃষির আধুনিকীকরণের প্রশ্ন, আমরা চাই রাষ্ট্র এগিয়ে আসুক এবং দায়িত্ব গ্রহণ করে স্বল্প সময়ের মধ্যে সংস্কারের ব্যবস্থা করুক।'

যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে সে সম্পর্কে সুভাষ আরো বলেছিলেন, 'দেশের ঘটনা এবং অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করে সোভিয়েত রাশিয়ায় জাতীয় অর্থনীতির এক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। একই জিনিস ঘটবে ভারতে... স্বাভাবিকভাবেই অন্যান্য দেশের গবেষণাসমূহ বিচার করে দেখব আমরা — কিন্তু সর্বোপরি আমাদের সমস্যার সমাধান আমাদেরই করতে হবে এক ভারতীয় পথে এবং ভারতীয় পরিস্থিতির অধীনে। সুতরাং শেষ পর্যন্ত আমরা যে প্রণালী স্থাপন করব তা হবে ভারতীয় জনগণের উপযুক্ত এক ভারতীয় পদ্ধতি।'

ভারতের তিন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী

চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমণ ছাব্বিশ সালে এফ. আর. এস. নির্বাচিত হন এবং চার বছর পরে তাঁরই নামে পরিচিত নতুন এক রমণ এফেক্ট আবিষ্কার করে জগদ্বিখ্যাত হন। ত্রিশ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পান।

মেঘনাদ সাহা কুড়ি সালে তাপ আয়ন তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। সাত বছর পরে তিনি এফ.আর.এস.হন। তিনি বহু বিজ্ঞানী সংস্থা এবং জাতীয় পরিকল্পনার সূত্রপাত করেন। সত্যেন্দ্রনাথ বসু, বসু-আইনস্টাইন পরিসংখ্যানের অন্যতম উদ্ভাবক। কোয়ান্টাম পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য গবেষণার ফলে তাঁর ও বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ফার্মির নামে যথাক্রমে 'বোসন' ও 'ফার্মিয়ন' নামে মৌলপদার্থের শ্রেণীবিন্যাস সম্ভব হয়। আটান্ন সালে তিনি এফ. আর. এস. নির্বাচিত হন।

দেশীয় রাজ্যে প্রজা আন্দোলন

আইন অমান্য আন্দোলনের পাশাপাশি দেশীয় রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যেও ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি কিছুটা আলোড়ন লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে মণিপুরের রানী গুইদালো পরিচালিত আন্দোলন বেশ ব্যাপক গণ-আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে। মণিপুর, আসাম ও নাগাল্যাণ্ডের সীমান্ত এলাকায় একত্রিশ সাল নাগাদ তাঁর এক জ্ঞাতিভ্রাতা যাদোনাঙ্গ কিছুটা ধর্মীয় কিন্তু মূলত ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন। ওই বছরের উনত্রিশে আগস্ট তারিখে যাদোনাঙ্গকে ইম্ফলে ফাঁসী দেওয়া হলেও আন্দোলন থামেনি বরং কিশোরী গুইদালোর পরিচালনায় আরো ব্যাপক রূপ ধারণ করে, বিশেষ করে জেলিয়াঙ্গরং উপজাতির মধ্যে। কর বন্ধ ও বেগার খাটার বিরুদ্ধে ওই আন্দোলন দেখতে দেখতে মণিপুর নাগা পার্বত্য এলাকা ও উত্তর কাছাড় অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। জেলায় জেলায় সৈন্য পাঠিয়ে খানাতল্লাসী ও অত্যাচার চালিয়েও 'রানীকে' (এ নাম জনসাধারণই তাঁকে দিয়েছিলেন) বেশ কিছুদিন ধরা যায় নি।

ইংরেজরা রানী গুইদালোর নামে নানা কুৎসা রটনা করেও তাঁকে জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে নি। নাগা হিল্‌সের ডেপুটি কমিশনার জে.পি.মিলস্ হাফলং-এর এস. ডি. ও. মণিপুরের উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং আসাম রাইফেলসের তৃতীয় ও চতুর্থবাহিনী একযোগে তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই চালায় এবং তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করে। সরকার বহু গ্রাম জ্বালিয়ে, ব্যাপক ধরপাকড় করে, সন্ত্রাস চালিয়ে অবশেষে বত্রিশ সালের সতেরোই অক্টোবর সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে রাণীকে ধরে। হাতকড়া পরিয়ে, কোমরে দড়ি দিয়ে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় প্রথমে কোহিমায় ও পরে ইম্ফলে। দশ মাস ধরে বিচার চালিয়ে তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। দেশ স্বাধীন হলে সাতচল্লিশ সালে তুবা জেল থেকে তিনি মুক্তি পান—তবু তাঁকে তখনই ফিবে যেতে দেওয়া হয়নি মণিপুরে, তাঁর নিজের গ্রামে।

বত্রিশ সালের অক্টোবর মাসে কাশ্মীরে শেখ্ আবদুল্লা 'মুসলিম কনফারেন্স' প্রতিষ্ঠা করেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই জম্মুর স্বেচ্ছাচারী-শাসনবিরোধী হিন্দু নেতা পি.এন.বাজাজ প্রমুখের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। ছ'বছর পরে এই যোগাযোগের ফলে 'মুসলিম কনফারেন্স' রূপান্তরিত হয় 'ন্যাশনাল কনফারেন্সে'। একত্রিশ সালের তেরোই জুলাই তরুণ শেখ আবদুল্লা যখন শ্রীনগর জেলে বিরাট এক গণ-অভিযান চালান তখন পুলিশের গুলিতে একুশ জনের মৃত্যু হওয়া সত্ত্বেও শাসকেরা ব্যাপারটাকে কিছুটা সাম্প্রদায়িক রূপ দিতে পেরেছিল।

একত্রিশ সালে আলোয়ারে সেগু অধিবাসীরা যে ব্যাপক সংগ্রাম শুরু করেন তাতে পাঞ্জাবের মুসলিম নেতা মহম্মদ ইয়াফি খান সাম্প্রদায়িকতা আমদানি করার চেষ্টা করলেও সৈয়দ মুতানাবি ফরিদাবাদী ও পববর্তীকালে মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিক হিসেবে সুপরিচিত কে. এম. আসারফের শুভ প্রচেষ্টায় আন্দোলন সুস্থ ও ঐক্যবদ্ধ থাকে এবং অত্যাচারী মহারাজ শেষ পর্যন্ত গদীচ্যুত হয়।

একত্রিশ সালের জুলাই মাসে ত্রিচিনাপল্লীর কাছে পুডুকোটাহ্ নামে ক্ষুদ্র রাজ্যে কয়েকদিনের জন্য জনতা-শাসন চালু হয়েছিল। নতুন ট্যাক্সের বিরুদ্ধে প্রতিবাদরত জনতা পুলিশ ও মিলিটারিকে পর্যুদস্ত কবে। আদালতের নথিপত্র জ্বালিয়ে, জেল থেকে বন্দীদের মুক্ত করে রাজাকে বাধ্য কবেছিল তখনকার মতো বাড়তি কর আদায় বাতিল করতে।

কয়েকটি স্বতন্ত্র চরিত্রের আন্দোলন

বিহারে ঊনত্রিশ সালে স্বামী সহজানন্দ কিষাণ সভা শুরু কবেছিলেন। আইন অমান্য আন্দোলনের সময়ে তাঁরই অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহযোগী যদুনন্দন শর্মাব নেতৃত্বে গযা জেলায় একটি শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠে। অন্ধ্রে তাঁব জমিদারী এলাকায় এবং কিছুটা ওড়িশাতেও কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠে। একত্রিশ সালে অন্ধ্রেএন.বি রামা নাইডু ও অধ্যাপক এন.জি. রঙ্গের নেতৃত্বে কৃষকেরা পুরুষানুক্রমে গরু চরাবার ও জঙ্গল থেকে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহের যে অধিকার ভোগ করতেন জমিদারেরা তা খর্ব করার চেষ্টা করায় অরণ্য সত্যাগ্রহ শুরু হয়। মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে মনু গোণ্ড, চৈতু কইবু প্রমুখ আদিবাসী নেতার পবিচালনায় এই ধরনের সত্যাগ্রহ জোরদার হয়ে ওঠে। মধ্যপ্রদেশে কোনি ও গোজক্ষির অরণ্য সত্যাগ্রহ কিছুদিন পর বারবার পুলিশ ফাঁড়ির উপবে আক্রমণে পরিণত হয। উত্তরপ্রদেশে গান্ধীজীব সতর্কবাণী সত্ত্বেও বায় বেরিলিতে কালকাপ্রসাদ ও অঞ্জলিকুমাব জমিদারের সব বকম পাওনা বন্ধেব আন্দোলন করেন।

এদিকে বত্রিশ সাল থেকে গান্ধীজীর হরিজন আন্দোলনের পাশাপাশি অস্পৃশ্যতার জন্য বিধ্বস্ত তামিলনাড়ুতে ই.ভি.রামস্বামী নাইকার পরিচালিত (পেরিয়ার' নামে সর্বজন পরিচিত) ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য-বিরোধী আত্মমর্যাদা আন্দোলন ত্রিশের দশকের গোড়া থেকেই তীব্র হয়ে ওঠে। সরকার-ঘেঁষা, জাস্টিস পার্টি'র আন্দোলনের থেকে এটা ছিল অনেক বেশি চরমপন্থী, এমন কি দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে কিছুটা

সমাজবাদীও ছিল, বিশেষ করে বত্রিশ সালে পেরিয়ারের সোভিয়েত সফরের পরে। শেষ অবধি ওই আন্দোলন থেকে পি. জীবনন্দনের মতো কমিউনিস্ট নেতার আবির্ভাব হলেও মূল আন্দোলন কিছুটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

কেরলে কংগ্রেস নেতা কেলাপ্পানের নেতৃত্বে একত্রিশ সালের নভেম্বর মাসে গুরুভায়ুর মন্দিরে সর্বজনের প্রবেশাধিকারের দাবিতে যে আন্দোলন শুরু হয় তাতে বিপুল সাড়া পাওয়া যায়—শুধু মালাবার নয়, ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন রাজ্য থেকেও স্বেচ্ছাবাহিনী এতে যোগ দেয়। বত্রিশ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গান্ধীজীর নির্দেশে ওই আন্দোলন শেষ অবধি প্রত্যাহৃত হয়। ওই আন্দোলনে বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন উত্তরকালের কমিউনিস্ট নেতা এ. কে. গোপালন।

নয়া সংবিধান

এইসব আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে পঁয়ত্রিশ সালে ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষ শাসনের নতুন সংবিধান ঘোষণা করলেন। তখন সাধারণভাবে তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখা গেল, বিশেষ করে রাজা-মহারাজা ও পৃথক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত মুসলমান প্রতিনিধি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহৃত হওয়া সত্ত্বেও শ্রমিক, কৃষক, অনুন্নত সমাজের মধ্যে ওই সময়ে যে আলোড়নের লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল তারই প্রতিফলন পরিস্ফুট হল বে-আইনী কমিউনিস্ট পার্টি, কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি, সুভাষচন্দ্র ও বিঠলভাই প্যাটেলের অনুবর্তী ও মানবেন্দ্রনাথ রায়ের অনুগামীদের তৎপরতায়। এঁরা একবাক্যে নিন্দা করলেন এই নয়া সংবিধানকে এবং পঁয়ত্রিশ সালের পর থেকে 'বামপন্থী' নামে চিহ্নিত হলেন।

কংগ্রেসের মধ্যে সত্য মূর্তি, ভুলাভাই দেশাই, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ডাঃ আনসারি প্রমুখ নেতা নয়া সংবিধানে প্রাদেশিক সরকার মূলত নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে থাকবে (গভর্নরের বিশেষ ক্ষমতা ও অন্যান্য রক্ষাকবচের ব্যবস্থা সত্ত্বেও) এই বিধানে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হলেন। এঁদের সঙ্গে খোলাখুলিভাবে এবার যোগ দিলেন বিখ্যাত প্রাক্তন 'নো-চেঞ্জার' নেতা শ্রী চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারি এবং গোড়ায় গোড়ায় কিছুটা প্রচ্ছন্নভাবে এবং ক্রমেই প্রকাশ্যে এগিয়ে-আসা অন্যান্য গোঁড়া গান্ধীবাদী নেতাও। চৌত্রিশ সালের বোম্বাই অধিবেশনে কংগ্রেস সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের ভাষণেই এটা পরিস্ফুট। সাধারণের কাছে এঁরা ক্রমশ পরিচিত হলেন 'দক্ষিণপন্থী' অভিধায়।

নয়া সংবিধানের প্রতি মনোভাব নিশ্চয়ই 'বাম বা দক্ষিণ পন্থা নির্ধারণের একমাত্র মাপকাঠি নয়। ক্রমে আরও সব নির্দিষ্ট প্রশ্নকে ঘিরে বাম দক্ষিণ চিন্তার ব্যবধান পরিস্ফুট হয়েছে—আবার আবছাও রয়ে গেছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে।

লক্ষ্ণৌ ও ফৈজপুর অধিবেশনে কংগ্রেস সভাপতির জবাহরলাল নেহরুর ভাষণ

ছত্রিশ সালের এপ্রিল মাসে লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতি জবাহরলাল নেহরু বলেন, পৃথিবী আজ দুটি বিরাট শিবিরে বিভক্ত—একদিকে সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসিস্ট আর অন্যদিকে সমাজতন্ত্রী ও জাতীয়তাবাদী শিবির। ..... আমরা যারা স্বাধীন ভারতের জন্য লড়ছি এখানে আমাদের স্থান কোথায়? আমরা অবশ্যই একত্রে দাঁড়াব সেই প্রগতিশীল শক্তিদের সঙ্গে যাঁরা রয়েছেন ফ্যাসিজম ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। বিশেষ করে আমাদের মোকাবিলা করতে হবে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যেটি বর্তমান পৃথিবীতে পুরোনো ও সুদূরপ্রসারী।

'কংগ্রেসের বর্তমান মতাদর্শের সঙ্গে কি সমাজবাদ খাপ খায়? আমরা মনে করি না খাপ খায়। দেশের দ্রুত শিল্পায়নে আমি বিশ্বাসী, আমার মতে একমাত্র সেই পথেই জনসাধারণের জীবন-যাত্রার

মান ভালোভাবে উন্নত হতে পারে এবং দূর হতে পারে দারিদ্র্য। তবুও অতীতে আমি সর্বান্তঃকরণে

জহরলাল নেহেরু

খাদি কর্মনীতির সঙ্গে সহযোগিতা করেছি এবং আশা রাখি ভবিষ্যতেও করব কারণ আমি মনে করি

খাদি ও পল্লীশিল্পের একটা নির্দিষ্ট স্থান আছে আমাদের এখনকার অর্থনীতিতে। ....কিন্তু এইগুলোকে আমি দেখি আমাদের জীবন্ত সমস্যাবলীর সমাধান হিসেবে নয়, মধ্যবর্তী স্তরের সাময়িক পদ্ধতি হিসেবেই।

'আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে আমাদের রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক সমস্যাদির একমাত্র সমাধান হতে পারে সংবিধান পরিষদ মারফৎ যদি সে পরিষদ গঠিত হয় প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ও গণভিত্তিতে। ওই ধরনের পরিষদ উদ্ভব হবে না যতদিন না দেশে একটা আধা-বিপ্লবী ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং কাগুজে সংবিধানের বদলে অন্তত বাস্তব সম্পর্কাদি এমন হয়ে দাঁড়ায় যাতে ভারতবাসী তাঁদের ইচ্ছাকে সর্বত্রই অনুভব করাতে পারেন।'

'যুদ্ধের গুজবে ও আশঙ্কায় আজ পূর্ণ এই পৃথিবী। বেশ কয়েকমাস ধরে রক্তাক্ত নিষ্ঠুর এক যুদ্ধ চলেছে আবিসিনিয়ায়। আমরা আবার একবার দেখছি ঔপনিবেশিক আধিপত্যের সন্ধানে সাম্রাজ্যবাদ কি পরিমাণে ক্ষুধার্ত ও পররাজ্যগ্রাসী হতে পারে। .... দূর প্রাচ্য দিগন্তেও যুদ্ধ ঘনিয়ে এসেছে আর আমরা দেখছি এক প্রাচ্য দেশীয় সাম্রাজ্যবাদ প্রাচীন চীনের দিকে ক্রমাগত নির্মমভাবে এগোচ্ছে ও স্বপ্ন দেখেছে বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্যের।'

কংগ্রেসের ফৈজপুর অধিবেশনের সভাপতির ভাষণে জবাহরলাল বলেছিলেন, '.......কংগ্রেস নীতির একমাত্র যুক্তিগ্রাহ্য পরিণাম হতে পারে সরকারী কর্তৃত্ব বা মন্ত্রীত্বের ব্যাপারে মাথা না ঘামানো। এর থেকে বিচ্যুতির অর্থ ওই নীতির বর্জন। অনিবার্যভাবেই তার অর্থ ভারতবাসীকে শোষণের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অংশীদার করা।

'আমাদের সামনে আসল লক্ষ্য হল দেশের সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তির সমাবেশ ঘটিয়ে এক শক্তিশালী যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলা। ... ওই ধরনের ফ্রন্টে সংগঠিত শ্রমিক ও কৃষকের সক্রিয় যোগদান ফ্রন্টের শক্তিবৃদ্ধি ঘটাবে ও তাকে তাই স্বাগত জানাতে হবে...।'

জবাহরলালের ওই প্রগতিশীল কর্মকাণ্ডের পিছনে যে আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিত কার্যকর হয়েছিল, সেটি হল জার্মানীর ফ্যাসিজমের জয়লাভের পর সারা পৃথিবীতে ফ্যাসিজম ও যুদ্ধের বিপদ সম্পর্কে চেতনা বৃদ্ধি। পঁয়ত্রিশ সালে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক সপ্তম কংগ্রেসে তার প্রতিফলন দেখা যায় কমিন্টার্নের প্রস্তাবে ও সাধারণ সম্পাদক ডিমিট্রিভের ভাষণে। ভারতের ক্ষেত্রে সেই নীতিরই প্রয়োগের চেষ্টা হয় কমিউনিস্ট নেতা রজনীপাম দত্ত ও মীরাট মামলার প্রাক্তন আসামী বেঞ্জামিন ব্র্যাডলের যুক্ত নিবন্ধে।

ফৈজপুর কংগ্রেসের সভাপতি জবাহরলালের সংগঠিত শ্রমিক ও কৃষকদের সম্মিলিত শক্তিহিসেবে কংগ্রেসকে সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তির যুক্তফ্রন্টে পরিণত করার ওই 'কালেকটিভ এ্যাফিলিয়েশনে'র প্রস্তাব' ভোটে পরাস্ত হয়। এবং তাঁর মন্ত্রীত্ব গ্রহণ না করার প্রস্তাব নিয়ে ভোটাভুটি না হলেও নেতাদের কথাবার্তায় বোঝা যাচ্ছিল কংগ্রেস সে পথেই চলেছে। আর পরের বছর নির্বাচনের পর গভর্নরের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে কিছুটা প্রতিশ্রুতি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস সাতটি রাজ্যে মন্ত্রীত্ব গঠন করে সাঁইত্রিশ সালের জুলাই মাসে।

সাতাশ সালে বোম্বাইয়ে প্রতিষ্ঠিত হলেও 'নিখিল ভারত দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলনে'র কাজ এতাবৎ দরখাস্ত লেখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ছত্রিশ সালে জবাহরলালের সভাপতিত্বে যে অধিবেশন হয় তাতে জবাহরলালের ভাষণে ও কিছু কিছু সিদ্ধান্তে গণসংযোগ ও কৃষকের দাবি-দাওয়ার কথা কিছুটা স্পষ্ট করে ধ্বনিত হল।

সমসাময়িক শ্রমিক আন্দোলন

আটাশ থেকে একত্রিশ সাল পর্যন্ত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন পরপর দু'টি বিভেদের জন্য দুর্বল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু নতুন আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে চেষ্টা শুরু হয় ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে

ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার বন্দীরা তেত্রিশ সালের আগস্টে মুক্তি পাবার পর ওই প্রচেষ্টা আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং পঁয়ত্রিশ থেকে আটত্রিশ সালের মধ্যে ওই প্রয়াস পরিপূর্ণভাবে সার্থক হয় নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে পূর্ণ ঐক্য প্রতিষ্ঠায়।

কয়েকটি বিশিষ্ট সংস্থা ও গণ সংগঠনের উদ্ভব

নিখিল ভারত কিষাণ সভা ঃ কংগ্রেস ও গান্ধীজীর অসহযোগ, আইন অমান্য আন্দোলন এবং আরো পরবর্তীকালে ভারত-ছাড়ো আন্দোলনের ডাকে সারা দেশে লক্ষ কৃষক সাড়া দিয়ে অপরিসীম দুঃখ যন্ত্রণা-ভোগ করেছিলেন, অনেকে শহীদও হয়েছিলেন। তবে কৃষকের দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ-কষ্ট থেকে উদ্ভূত তাঁদের দাবি-দাওয়া নিয়ে সংগ্রামের জন্য কোনো স্থায়ী, সংগ্রামী সংগঠন গড়ে তোলা সম্ভব হয় নি।

পঁচিশ সালের পর, বিশেষত ত্রিশের দশকের দ্বিতীয়ার্ধ, থেকে 'শ্রমিক কৃষক পার্টি' মারফৎ বাংলা, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশে কমিউনিস্টরা কৃষকের দাবি নিয়ে স্থানীয়ভাবে কিছুটা সংগ্রাম শুরু করেন। ঊনত্রিশ সালের নভেম্বর মাসে স্বামী সহজানন্দ বিহারে একটি 'বিহার প্রাদেশিক কিষাণ সভা' প্রতিষ্ঠা করেন ছোটখাটো দাবির ভিত্তিতে। ছত্রিশ সালের জানুয়ারী মাসে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির মীরাট সম্মেলনের সময় ওই পার্টির কিছু নেতা এবং কয়েকজন বিশিষ্ট বামপন্থী ব্যক্তি সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নেন যে অন্ধ্রের কংগ্রেস নেতা অধ্যাপক এন.জি.রঙ্গ এবং জয়প্রকাশ নারায়ণকে যুগ্ম সম্পাদক করে একটি সর্বভারতীয় কৃষক সংগঠন গড়ে তোলা হবে।

এই উদ্দেশ্যে লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেস অধিবেশনের সময়েই এগারোই এপ্রিল বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধি দের যে সম্মেলন হয় তার থেকেই উদ্ভব হয় 'নিখিল ভারত কিষাণ সভার'। স্বামী সহজানন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওই সম্মেলনে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক এন জি রঙ্গ (অন্ধ্র), ইন্দুলাল যাজ্ঞিক (গুজরাট) মোহনলাল গৌতম ও কে.এম আশরফ (উত্তর প্রদেশ), সোহন সিং যোশ ও আহমদ দিন (পাঞ্জাব) কমল সরকার ও সুধীন প্রামাণিক (বাংলা) এবং কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির দুই নেতা—জয়প্রকাশ নারায়ণ ও রামমনোহর লোহিয়া।

নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন

ছত্রিশ সালের এপ্রিল মাসে লক্ষ্ণৌতে উত্তর প্রদেশ ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে সারা দেশের ন'শো ছিয়াশি জন প্রতিনিধির এক সম্মেলন থেকে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের উদ্ভব হয়। সম্মেলনটি উদ্বোধন করেছিলেন জবাহরলাল এবং সভাপতি ছিলেন মহম্মদ আলি জিন্না। সম্মেলনে গৃহীত বিবৃতি অনুযায়ী ছাত্র ফেডারেশনের লক্ষ্য ছিল, 'ছাত্রদের নাগরিকতা অর্জনের জন্য প্রস্তুত করা, যাতে তাঁরা তাঁদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক চেতনা জাগ্রত করে জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে যোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন।'

নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ ঃ

ছত্রিশ সালের এপ্রিল মাসে লক্ষ্ণৌতে হিন্দী লেখক মুন্সী প্রেমচন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত লেখকদের এক সম্মেলনে 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘে'র জন্ম হয়। সম্মেলনে ভাষণ দেন সরোজিনী নাইডু, উর্দু কবি ও রাজনীতিবিদ্ মওলানা হজরৎ মোহানি প্রমুখ এবং উপস্থিত ছিলেন ড. মুলকরাজ আনন্দ, হীরেন্দ্রনাথ মুখার্জী, ড. আলিম, রশিদা জেহান প্রমুখ। সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন উর্দু লেখক সাজ্জাদ জহীর।

নিখিল ভারত ব্যক্তি স্বাধীনতা সংঘ ঃ

ছত্রিশ সালের জুলাই মাসে জবাহরলালের উদ্যোগে 'নিখিল ভারত ব্যক্তি স্বাধীনতা সংঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর অনুরোধে ওই সংঘের সম্মানিত সভাপতি হতে সম্মত হন রবীন্দ্রনাথ এবং কার্যকরী সভানেত্রী হন সরোজিনী নাইডু। ত্রিশের দশকের শেষ দিকে ওই সংঘ এবং অনেক ক্ষেত্রে তার সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সরকারী অনাচার বন্ধ করার ব্যাপারে সার্থকভাবে উদ্যোগী হন।

ফ্যাসিজম ও যুদ্ধবিরোধী সংঘ ঃ

ছত্রিশ সালের জুলাই মাসে স্পেনের নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে ফ্যাসিস্ট জেনারেল ফ্রাঙ্কো বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং প্রথম থেকেই তাঁকে প্রকাশ্যে দরাজ হাতে অস্ত্রশস্ত্র ও সর্ববিধভাবে সাহায্য করতে থাকে হিটলার ও মুসোলিনী এবং ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদীরা। জাতীয় কংগ্রেসের বহু সভায় নিন্দা করা হয় শুধু ফ্রাঙ্কো, হিটলার বা মুসোলিনীর নয়, তারই সঙ্গে ফ্রাঙ্কোর প্রতি সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকারের ওই ধরনের পরোক্ষ সাহায্যদানের।

সেদিন স্পেনের গণতান্ত্রিক সরকারের সঙ্গে সংহতি জ্ঞাপনের জন্য বার্সেলোনায় গিয়েছিলেন জবাহরলাল ও কৃষ্ণ মেনন।

স্পেনের সরকারকে অকুণ্ঠ সাহায্যদানের জন্য মানবসমাজের বিবেকের প্রতি আবেদন জানান রবীন্দ্রনাথ আর ফ্রাঙ্কোবাহিনীর বিরুদ্ধে সেদিন স্পেনের রণক্ষেত্রে যে 'আন্তর্জাতিক সৈন্যবাহিনী' সংগ্রাম করেছিল তাতে যোগ দিয়েছিলেন মহারাষ্ট্রের এক কমিউনিস্ট তরুণ-গোপালমুকুন্দ হুদ্দার। রম্যাঁ রলাঁ ও আঁরি বারব্যুসের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ভারতবর্ষে যে 'ফ্যাসিজম ও যুদ্ধবিরোধী সংঘ' গড়ে ওঠে তার সভাপতি হন রবীন্দ্রনাথ। কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য সংখ্যা ছিল একুশ জন। সাধারণ সম্পাদক ছিলেন সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিশ্বশান্তি কংগ্রেসে ভারতীয় মনীষীদের বাণী

তেরশো তেতাল্লিশ বঙ্গাব্দের চোদ্দই ভাদ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, জবাহরলাল নেহরু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রমথ চোধুরী, নন্দলাল বসু প্রেমচন্দ প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি বিবৃতিতে বলা হয়, 'আমরা আমাদের এবং আমাদের দেশবাসীর পক্ষ হইতে অন্যান্য দেশের জনসাধারণের সহিত সমস্বরে বলিতেছি যে, আমরা যুদ্ধকে ঘৃণা করি এবং যুদ্ধ পরিহার করিতে চাই; যুদ্ধে আমাদের কোন স্বার্থ নাই। কোনো সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ভারতবর্ষের যোগদানের আমরা ঘোর বিরোধী; কারণ আমরা জানি যে, আগামী যুদ্ধে সভ্যতা ধ্বংস হইবে।'

নয়া সংবিধানে নির্বাচিত সরকারদের কাজকর্ম

নির্বাচনে জয়ী হবার পর গভর্নর যথেচ্ছভাবে তাঁর বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন না—এই প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর সাঁইত্রিশ সালের জুলাই মাসে কংগ্রেস উত্তর প্রদেশ, বিহার, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও স্বল্পকাল পরে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও আসামে মন্ত্রীত্ব গঠন করে। আটত্রিশ সালের মার্চ মাসে সিন্ধু প্রদেশেও আল্লা বক্স মন্ত্রিসভা গঠন করেন কংগ্রেসের সহায়তায়। বাংলা আর পাঞ্জাবে মন্ত্রিসভা গঠন করল যথাক্রমে ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক প্রজাপার্টি ও সিকন্দর হায়াৎ খানের নেতৃত্বে ইউনিয়নিস্ট পার্টি।

নির্বাচিত মন্ত্রিসভাগুলোর কাছে স্বভাবতই দেশবাসীর প্রথম প্রত্যাশা ছিল অবিলম্বে সমস্ত রাজনৈতিক

বন্দীর মুক্তিলাভ। এমন কি, এই প্রশ্নে আটত্রিশ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যখন উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা দুটি সাময়িকভাবে পদত্যাগ করে তখন তারা বিপুল সমর্থন পায়। ওদিকে আন্দামান সেলুলার জেলের বন্দীরা তিনটি দাবি নিয়ে সাঁইত্রিশ সালের পঁচিশে জুলাই থেকে আমরণ অনশন শুরু করলেন। দাবিগুলো হল—সব রাজবন্দী ও রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি, আন্দামান-বন্দীদের অবিলম্বে দেশে ফিরিয়ে আনা এবং মুক্তি না পাওয়া অবধি সব রাজনৈতিক বন্দীকে কমপক্ষে ডিভিশন 'টু'র বন্দীহিসেবে গণ্য করা। ওঁদের সমর্থনে ভারতবর্ষে সেদিন প্রায় তিন হাজার রাজবন্দী ও রাজনৈতিক বন্দী যোগ দিয়েছিলেন। তখন সারা দেশেও আন্দোলন দুর্বার হয়ে উঠল। কলকাতা টাউন হলে বিরাট জনসভা হল রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে।

আন্দোলনের চাপে সাঁইত্রিশ দিন অনশনের পর আন্দামানের বন্দীরা দেশে ফেরার নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর অনশন বন্ধ করলেন। আর এক মাসের মধ্যে তাঁদের দেশে ফিরিয়ে আনাও হল, তবে মুক্ত নয়, বন্দী হিসেবেই। গভর্নর রাজবন্দীদের মুক্তি যথাসাধ্য ত্বরান্বিত করবেন ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের ঘটনা যাচাই করে— এই প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর কংগ্রেসী মন্ত্রীরাও পদত্যাগ প্রত্যাহার করলেন। আর বাংলায় রাজবন্দীদের মুক্তি ত্বরান্বিত করতে সেদিন দেশব্যাপী জনগণ বিশেষ করে ছাত্রসমাজ এগিয়ে এসেছিলেন।

আটত্রিশ সালে সদ্য নির্বাচিত কংগ্রেস সভাপতি সুভাষের নেতৃত্বে রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে কলকাতার রাজপথে ছাত্র মিছিল হয়।

কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলো বত্রিশ সাল থেকে যে বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে রাজ্যশাসন ব্যবস্থা চালু রেখেছিল তা বাতিল করে এবং কয়েকজন বন্দীকে মুক্ত করে কাজ শুরু করলেন। প্রথম দিকে শ্রমিক আন্দোলন এবং কৃষকদের দাবির প্রতি কিছুটা সহানুভূতিশীল মনোভাবও দেখা গিয়েছিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই (সাঁইত্রিশ সালের অক্টোবর মাস থেকে মাদ্রাজ মন্ত্রিসভা) কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলোও রাজদ্রোহকর বক্তৃতা, ধর্মঘট প্রভৃতির বিরুদ্ধে উত্তরোত্তর দমন-নীতির আশ্রয় গ্রহণ করতে লাগল। এই সম্পর্কে দুটো দৃষ্টান্ত দেওয়া হল ঃ

বোম্বাই মন্ত্রিসভা আটত্রিশ সালের নভেম্বর মাসে বিধান সভায় যে ট্রেড ডিসপিউট এ্যাক্ট পাশ করাল তাতে সালিশী বিচার আবশ্যিক এবং বে-আইনী ধর্মঘটের জন্য ছ'মাস কারাদণ্ডের ব্যবস্থা এবং ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের যে নিয়ম ধার্য করল তাতে কোম্পানি কর্তৃক স্বীকৃত নয় এমন ইউনিয়নের পক্ষে রেজিস্ট্রেশন অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠল। এর বিরুদ্ধে সেদিন বোম্বাইয়ে অসংখ্য প্রতিবাদ মিছিল বেরোয় আর ছয়ই নভেম্বরের প্রতিবাদ সভায় সমবেত হয় আশি হাজার শ্রমিক।

কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গোড়ায় সুদের হার বেঁধে দিয়ে কৃষকদের ঋণের বোঝা কিছুটা কমাতে চেষ্টা করে। মাঠে গরু-মোষ চরাবার উপরে যা ধার্য ছিল বোম্বাইয়ে তা তুলে দেওয়া ও মাদ্রাজে কমানো হয়। ছত্রিশ ও সাঁইত্রিশ সালে উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি যে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের প্রস্তাব করেছিল তা কার্যকর করা হল না। বাংলার ফজলুল হক মন্ত্রীত্ব কিস্তিবন্দী ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে কিছুটা ঋণের বোঝা কমানোর চেষ্টা করে কিন্তু ফ্রাউড কমিশনের ক্ষতিপূরণ দিয়ে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের ব্যাপারে চুপচাপ থাকে। পাঞ্জাবে সিকন্দর হায়াৎ খানের মন্ত্রিসভা পুরোনো ক্যানাল কর চালু করার জন্য কড়াকড়ি করায় শুধু হিন্দু মহাসভা নয়, স্থানীয় কংগ্রেসও তার নিন্দা করে। পরে অবশ্য কংগ্রেসের উচ্চতম নেতৃত্ব হস্তক্ষেপ করে এই ব্যাপারে। বিহারে মুঙ্গের জেলার খাস জমি প্রত্যর্পণের দাবিতে স্বামী সহজানন্দ ও উত্তরকালে কমিউনিস্ট নেতা কার্যনন্দ শর্মার নেতৃত্বে ছত্রিশ সাল থেকে উনচল্লিশ সাল অবধি যে বিশাল কিষাণ আন্দোলন চলে তার উপর সরকার প্রচণ্ড দমননীতি চালায়।

দিকে দিকে শ্রমিক বিক্ষোভ

সাঁইত্রিশ সালের ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারী থেকে দশই মে পর্যন্ত বাংলার চটকল শ্রমিকেরা চুয়াত্তর দিন ধরে ধর্মঘট করলেন। মন্দা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছত্রিশ সাল থেকে চটকল শিল্পে আবার মালিকেরা বেশ মোটা মুনাফা করতে থাকেন। স্বভাবতই শ্রমিকেরা দাবি করেন মন্দার নামে যে মজুরী কাটা শুরু হয়েছিল তা বন্ধ করে পুরো মাইনে পাওয়ার, ছাঁটাই বন্ধ করার এবং যাঁরা ছাঁটাই হয়েছিলেন তাঁদের পুনর্নিয়োগ করার। এই ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিলেন দু'লক্ষ পঁচিশ হাজার চটকল শ্রমিক। এটি পরিচালনা

চার কমিউনিস্ট নেতা : বাঁদিক থেকে মুজফ্ফর আহ্মদ, বঙ্কিম মুখার্জি, পি. সি. যোশী, সোমনাথ লাহিড়ী।

করেন যে যুক্ত স্ট্রাইক কমিটি তাতে ছিলেন বঙ্কিম মুখার্জী, মুজফ্ফর আহ্মেদ, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, শিবনাথ ব্যানার্জী প্রমুখ নেতা। আর এর প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র, জবাহ্রলাল এবং রবীন্দ্রনাথ। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হকের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে দশই মে ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়। সাঁইত্রিশ সালে শ্রমিক ধর্মঘটের দিক থেকে বাংলার পরেই স্থানলাভ করে বোম্বাই ও তারপর মাদ্রাজ। উত্তরপ্রদেশ ও কানপুরে সাঁইত্রিশ সালে সুতাকল শ্রমিকরা মজুরী বৃদ্ধির ও ছাঁটাই বন্ধের দাবিতে যে ধর্মঘট শুরু করেন, কিছুদিনের মধ্যেই তা পরিণত হয় চল্লিশ হাজার সুতাকল শ্রমিকের সাধারণ ধর্মঘটে। এখানে গোবিন্দবল্লভ পন্থের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা বাংলার হক-মন্ত্রিসভার মতোই পুলিশী জুলুম চালিয়ে ধর্মঘট ভাঙার চেষ্টা করে কিন্তু শেষ অবধি আপোষ-আলোচনা করতে এবং শ্রমিকদের অবস্থা-সম্পর্কে তদন্ত কমিটি গড়তে বাধ্য হয়। বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও পাঞ্জাবেও ধর্মঘটের ঢেউ দেখা যায়।

সাঁইত্রিশ সালের ত্রিশে এপ্রিল তারিখে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয় চটকল শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে রবীন্দ্রনাথের বিবৃতি। তিনি বলেন, 'গত ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ধর্মঘটে জড়িত লক্ষ লক্ষ চটকল শ্রমিকের দুর্গতির কথা শুনে আমি গভীরভাবে মর্মাহত। এর ফলে পীড়িত হচ্ছেন শুধু শ্রমিকেরাই নন, তাঁদের স্ত্রী-পুত্র-পরিবারও । উচ্চতর বেতন ও কাজ করার উন্নততর মানবিক

অবস্থার দাবি-ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত। ...... লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারবর্গের জীবন যার ফলে এইভাবে বিপর্যস্ত তার ন্যায়সঙ্গত সমাধান আমরা কি অবিলম্বে নতুন সংবিধান অনুসারে গঠিত মন্ত্রীসভার কাছে প্রত্যাশা করব না? সমাজের ভার যাঁরা বহন করেন, সমাজই তাঁদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে— এই হল মানবতার দাবি।' আটত্রিশ সালে বাংলাদেশে হক মন্ত্রিসভা প্রতিশ্রুতি ভাঙায় নব্বই হাজার চটকল শ্রমিক আবার ধর্মঘট করতে বাধ্য হন। কুলটি ও হীরাপুরের চোদ্দ হাজার ইস্পাত শ্রমিকও ওই বছর ধর্মঘট করেন।

আটত্রিশ সালে কানপুরে সরকারী তদন্ত কমিটি সূতাকল শ্রমিকদের জন্য মালিক ন্যূনতম বেতন মাসিক পনেরো টাকা ও নিয়মিত প্রতি বছর ইনক্রিমেন্টের সুপারিশ করলে মালিকরা সেই সুপারিশ অগ্রাহ্য করে ও কানপুর মজদুর সভার স্বীকৃতি বাতিল করে। ফলে, ছেচল্লিশ হাজার সূতাকল শ্রমিক এক বছর পরেই আবার দ্বিতীয় সাধারণ ধর্মঘট করেন। বাহান্ন দিন ধর্মঘট চলার পর মালিকরা অবশেষে তদন্ত কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করতে বাধ্য হন। ৲

এই পর্বের ধর্মঘটগুলো চলে যৌথ নেতৃত্বে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রমিকেরা দাবি আদায় করতে সক্ষম হন। তবে সরকার ও মালিক, দু'দিক থেকেই প্রচণ্ড জুলুম চালানো হয় ধর্মঘট ভাঙার জন্য। আটত্রিশ সালের পনেরোই নভেম্বরে রানীগঞ্জের বল্লভপুর পেপার মিল্স শ্রমিকদের ধর্মঘট ভাঙার জন্য মালিকদের এক ইংরেজ কর্মচারী লরিতে কিছু দালাল নিয়ে কারখানায় ঢোকার চেষ্টা করে। কাগজ-কল ইউনিয়নের সহ-সম্পাদক সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাধা দেবার চেষ্টা করলে ওই ইংরেজ কর্মচাবী নিজে লরি চালিয়ে সুকুমারকে লরির চাকায় পিষ্ট করে দেয়।

একত্রিশ সালে অমৃতসরে বিপ্লবী কাজকর্মের জন্য গ্রেপ্তার হয়ে লাহোর জেলে আটক ছিলেন পাঞ্জাবের হোশিয়ারপুর জেলার হাজার সিং । সেখান থেকে পালিয়ে মাদ্রাজে উটকামণ্ড ব্যাঙ্ক লুটের মামলায় তিনি দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে রাজামুন্দ্রি জেলে প্রেরিত হন। সেখান থেকে পালাবার পর আবার গ্রেপ্তার হন। এবার তাঁকে পাঠানো হয় আন্দামানে। আটত্রিশ সালে মুক্তি পেয়ে তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন এবং টাটানগরে শ্রমিক সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সেখানেই ধর্মঘটকালে পিকেট করার সময় পুলিশের লরি তাঁকে চাপা দিয়ে হত্যা করে।

সুভাষের প্রতি ইংরেজদের বিরূপতা ও সহায়তা

ইউরোপে অবস্থানকালে ছত্রিশ সালের এপ্রিল মাসে জবাহরলাল কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হবার সংবাদ পেলেন সুভাষ। তিনি অনুভব করলেন যে ভারতবর্ষে তাঁর উপস্থিতি পরিবর্তনকামীদের হাত শক্তিশালী করবে। কিন্তু তিনি গৃহে ফেরার ইচ্ছা প্রকাশ করায় ভিয়েনার ব্রিটিশ কন্সালের কাছ থেকে সতর্কতামূলক বার্তা পেলেন— ভারতের মাটিতে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে। এই সতর্কতামূলক নির্দেশকে উপেক্ষা করেই সুভাষ ভারতের উদ্দেশে রওনা হলেন এবং আটই এপ্রিল তারিখে বোম্বাইতে এসে পৌঁছালেন। তৎক্ষণাৎ ওঁকে গ্রেপ্তার করে বোম্বাইয়ের আর্থাব রোড জেলে বন্দী করে রাখা হল।

পাঁচদিন পরে সুভাষকে স্থানান্তরিত করা হল পুণার সেন্ট্রাল জেলে। ইংরেজ সরকার সুভাষকে কখনও একটা জেলে দীর্ঘদিন বন্দী করে রাখতে ভয় পেত, কারণ রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রশ্নে তিনি ছিলেন চরমতম বিপজ্জনক ব্যক্তি। তাই তাঁকে সরিয়ে নিয়ে আসা হল আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। তাঁর প্রতি সরকারের এই নির্মম অবিচারে গোটা দেশ তোলপাড় হয়ে উঠল। অযৌক্তিকভাবে তাঁকে বন্দী করে রাখার প্রতিবাদে সারা দেশে হরতাল পালিত হল দশই মে তারিখে। জনমতের চাপে এবং দুর্বল স্বাস্থ্যের কারণে বিশে মে সুভাষকে জেলহাজত থেকে মুক্তি দিয়ে কার্শিয়াং এর কাছে গিড্ডা পাহাড়ে তাঁর ভাইয়ের

বাড়িতে নজরবন্দী করে রাখা হল। অবশ্য কার্শিয়াং অবস্থানকালে তাঁর উপর জারি করা নিয়ন্ত্রণবিধি মেনে চলার ব্যাপারে কোনো বাহ্যিক প্রতিশ্রুতিদানে প্রস্তুত ছিলেন না সুভাষ।

সুভাষের ব্যাপারে ন্যায়বিচার লাভের জন্য জন, থারটেল্, উইলিয়ামস্ ম্যাক্সটন, উইলকিনসন্, জাগেব, গ্রেনফেল্, সোরেন্‌সেন্ এবং আর্ল অফ কিনাউল প্রমুখ ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্যগণ যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন তার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। বত্রিশ সাল থেকে সাঁইত্রিশ সালের মধ্যে তাঁরা হাউস অব কমন্‌স্ এবং হাউস অব লর্ডস এ প্রতিধ্বনিত করেছিলেন ভারতীয় জনগণের মনোভাব। সুভাষের স্বাস্থ্য, বিনাবিচারে আটক, পাশপোর্টের সুযোগ এবং সুভাষকে ইংলণ্ড ভ্রমণ করতে দেওয়া এবং ভারতে প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে সরকারী অস্বীকৃতি সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিলেন তাঁরা।

সুভাষকে ইংলণ্ড-সফরের অনুমতিদানে অস্বীকৃত হওয়ার এবং তাঁর ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করার বিরুদ্ধে সেক্রেটারী অব স্টেট ফর ইণ্ডিয়াকে লেখা ছাব্বিশ সালের আঠাশে মার্চ তারিখের চিঠিতে ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট লেবর পার্টির সেক্রেটারী জি.উইলিযমস্ জোরালো প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন সরকারের কাছে।

সুভাষ ভারতে প্রত্যাবর্তন করলে তাঁকে স্বাধীনতা দেওযা হবে না বলে জারী করা একতরফা সরকারী সতর্কীকরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে আঠাশে মার্চ এসেক্স হলে আয়োজিত এক জনসভায় পার্লামেন্টের সদস্য উইলিয়ম টি. কেলীর সভাপতিত্বে এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সরকারের কাছে অনুরোধ জানানো হয় সুভাষকে ইংলণ্ড-ভ্রমণের পাশপোর্টের সুযোগ দেবার জন্য।

পুনরায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে সুভাষকে কার্শিয়াং থেকে কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এনে ভর্তি করা হল সাঁইত্রিশ সালের মার্চ মাসে। মাত্র আঠারো দিন পরে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হল।

সুভাষের পুনরায় বিদেশ যাত্রা

সাঁইত্রিশ সালের ডিসেম্বর মাসে সুভাষ পুনরায় অস্ট্রিয়া যান এবং তাঁর ইংলণ্ডে প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবার ফলে সেখান থেকে তিনি যান ইংলণ্ডে। আটত্রিশ সালের জানুয়ারী মাসে ইংলণ্ডে অবস্থানকালে তিনি জানতে পারেন যে তিনি সর্বসম্মতিক্রমে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। ইংলণ্ডে তাঁর কার্যকলাপের বিবরণ ব্যাপকভাবে প্রচার করে ব্রিটিশ সংবাদপত্র। ইংলণ্ড পরিভ্রমণের সময় তিনি লর্ড হ্যালিফ্যাক্স এবং লর্ড জেটল্যাণ্ডের মতো ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেই সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন লেবার এবং লিবারাল পার্টির বিশিষ্ট সদস্যদের সঙ্গে যাঁরা তখন স্পষ্টতই ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন, যেমন ক্লিমেন্ট এ্যাটলি, গ্রীণউড, বেভিন, হ্যারল্ড ল্যাস্কি, এ্যালেন এবং স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্।

লণ্ডনে অবস্থানকালে তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন রজনীপাম দত্ত এবং আটত্রিশ সালের চব্বিশে জানুয়ারী লণ্ডনে 'ডেলি ওয়ার্কার' পত্রিকায় এক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। সুভাষকে 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল'-এ প্রকাশিত ফ্যাসীবাদ ও কমিউনিজম্ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়ে মন্তব্য করতে বলা হলে সুভাষ বলেন, 'আমি সত্যিকার যা বোঝাতে চেয়েছিলাম তা হল ভারতে আমরা আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা চাই এবং তা জয় করে আমরা চাই সমাজবাদের পথে যাত্রা করতে। কমিউনিস্ট মতবাদ এবং ফ্যাসীবাদের মধ্যে সমন্বয়ের কথা উল্লেখ করার সময় আমি এটাই বোঝাতে চেয়েছিলাম। সম্ভবত আমার ব্যবহৃত অভিব্যক্তিটি সুখকর হয়নি। কিন্তু আমি এটা লক্ষ্য করতে বলি যে আমি যখন গ্রন্থটি রচনা করছিলাম, ফ্যাসীবাদ তখন তার সাম্রাজ্যবাদী অভিযান শুরু করেনি এবং এটিকে আমার এক চরম জাতীয়তাবাদ বলে মনে হয়েছিল মাত্র।'

'আমি এটাও লক্ষ্য করতে বলি যে ভারতে যাঁরা কমিউনিস্ট মতবাদের পক্ষে আছেন বলে ধারণা,

তাঁদের অনেকেরই প্রদর্শিত কমিউনিস্ট মতবাদ আমার কাছে জাতীয়তাবিরোধী বলে প্রতিভাত হয়েছে। এই ধারণা আরও শক্তিশালী হয়েছে তাঁদের অনেকেরই জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি প্রদর্শিত শত্রুতাপূর্ণ মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে। যাই হোক, এটা স্পষ্ট যে আজ পরিস্থিতির মূলগত পরিবর্তন ঘটেছে।

'আমি আরও বলতে চাই যে আমি এটা সর্বদাই বুঝতে পেরেছি এবং অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি যে কমিউনিস্ট মতবাদ, মার্কস ও লেনিনের রচনায় যেমন ভাবে তা প্রকাশিত হয়েছে এবং কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশন্যালের নীতি, সরকারী বিবৃতি যা প্রকাশ পেয়েছে সেটা জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে এবং এটিকে তার বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির অঙ্গীভূত বলে স্বীকার করে।

'আজ আমার ব্যক্তিগত ধারণা এই যে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে ব্যাপকতম জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট হিসেবে সংগঠিত করা উচিত এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন ও সমাজবাদী শাসন প্রতিষ্ঠার মিলিত লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা উচিত।'

আটত্রিশ সালের জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহ নাগাদ সুভাষ ভারতে ফিরে আসেন।

হরিপুরায় কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ

ফেব্রুয়ারী মাসে গুজরাটের হরিপুরায় একান্নতম কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে সুভাষ বলেন,'ব্রিটিশ অভিজাতবর্গ ও বুর্জোয়া শ্রেণী প্রধানত টিকে আছে মূলত শোষণ করার মতো উপনিবেশ ও সাগরপারের পরাধীন জাতিরা আছে বলেই। শেষোক্তদের মুক্তি সেই ব্রিটেনের ধনতন্ত্রী শাসকশ্রেণীর অস্তিত্বরই মূলে আঘাত হানবে এবং ত্বরান্বিত করবে গ্রেট ব্রিটেনে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা।...আমরা যেমন ভারতের এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দাসত্ব শৃঙ্খলে বাঁধা দেশগুলোর রাজনৈতিক মুক্তির জন্য লড়ছি, আমরা সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রাম করছি ব্রিটিশ জাতির অর্থনৈতিক মুক্তির জন্যও।

'মাঝে মাঝে যাকে ভারতীয় ভারত (অর্থাৎ দেশীয় রাজ্যগুলো) নামে পরিচয় দেওয়া হয়, তাতে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য ওই দেশীয় রাজ্যগুলোর প্রজারা যে আন্দোলন করে থাকেন তার প্রতি...কংগ্রেস সহানুভূতি ও নৈতিক সমর্থন জানিয়ে থাকে। এই মুহূর্তে আমাদের হাতে এত বেশি দায়িত্ব যে কংগ্রেসের পক্ষে এর চাইতে বেশি কিছু করা সম্ভব নয় আমাদের স্বজনদের জন্য।...কংগ্রেসের ভিতরে আমার মতো অনেকে আছেন যাঁরা চান দেশীয় রাজ্যের প্রজা-আন্দোলনে কংগ্রেসকে আরো সক্রিয়, আন্দোলনে যোগদানের ভূমিকায় দেখতে।...আমাদের জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে কংগ্রেসের ভূমিকা কী, এ-সম্বন্ধে বহু কংগ্রেসীর মনে ধারণা স্পষ্ট নয়। আমি জানি কোনো কোনো বন্ধু মনে করেন স্বাধীনতা লাভের পর সংগ্রাম লক্ষ্যসিদ্ধি হয়ে গেলে কংগ্রেসের উচিত লুপ্ত হয়ে যাওয়া। ওই রকম চিন্তা একবারেই ভ্রান্ত। যে পার্টি ভারতের জন্য স্বাধীনতা অর্জন করবে সেই পার্টিই পরবর্তী দিনে পুনর্গঠনের সমগ্র কর্মনীতিকে সার্থক করে তুলবে। ক্ষমতা যাঁরা দখল করবেন তাঁরাই পারবেন উপযুক্তভাবে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে।'

'শ্রমিক ও কৃষক সংস্থাগুলোর কংগ্রেসে অন্তর্ভুক্তির যৌথ অনুমোদনের বহু বিতর্কিত প্রশ্নে ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি যখন দিন আসবে, তখন এটা আমাদের গ্রহণ করতেই হবে যাতে সমগ্র প্রগতিশীল ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিগুলোকে কংগ্রেসের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়।

'...ভারতবর্ষের পররাষ্ট্র নীতি ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ গড়ে তোলার কাজের উপর আমি খুবই গুরুত্ব দিয়ে থাকি কারণ আমি বিশ্বাস করি আগামী দিনের আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহ ভারতে আমাদের সংগ্রামের সহায়ক হবে।'

'কংগ্রেসের মধ্যে দক্ষিণ ও বামের যে মতভেদ আছে সেটা উপেক্ষা করা অর্থহীন।....কংগ্রেস আজ গণসংগ্রামের সর্বোচ্চ সংগঠন।......আমি বিশেষ করে দেশের বামপন্থী গোষ্ঠীগুলোর কাছে আবেদন

জানাই তাঁরা তাঁদের সমস্ত শক্তি সামর্থ্য সমবেত করুন কংগ্রেসের গণতন্ত্রীকরণে এবং তাকে ব্যাপকতম সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করার কাজে।'

সুভাষের মনে কোনো সন্দেহ ছিল না দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা আর রোগ দূরীকরণ এবং বৈজ্ঞানিক উৎপাদন ও বন্টন-সম্পর্কিত আমাদের প্রধান সমস্যাগুলোর সার্থকভাবে মুখোমুখি হওয়া সম্ভব হবে কেমলমাত্র সমাজবাদের পথেই। এই উদ্দেশ্যে তিনি চেয়েছিলেন যে আমাদের জাতীয় সরকার একটি কমিশন গঠন করবেন যার কাজ হবে পুনর্গঠনের একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। বাস্তবে কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে তিনি জবাহরলালকে চেয়ারম্যান করে একটি জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করেন।

ভারতবর্ষের সংহতি সম্পর্কে বলতে গেলে, তাঁর কামনা ছিল একটি শক্তিশালী কেন্দ্র এবং সেই সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে যথেষ্ট স্ব-শাসনের অধিকারসহ বিভিন্ন প্রদেশে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা। আমাদের ভাষা সম্পর্কে তাঁর পরামর্শ ছিল রোমান হরফে লেখা হিন্দী ও উর্দুর সংমিশ্রণ।

দারিদ্র্য, বুভুক্ষা এবং রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রতিরোধ করতে চেয়েছিলেন সুভাষ।

কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে তাঁর আচরণ এবং কাজে সুভাষ ছিলেন সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক। তৎকালীন ওয়ার্কিং কমিটির একজন সদস্য এবং ঐতিহাসিক পট্টভি সিতারামাইয়া লেখেন, সুভাষ তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারা 'সাড়ম্বরে জাহির করতে চাইতেন না' এবং 'তাঁর মধ্যে এককভাবে পক্ষাবলম্বনের ইচ্ছা ছিল না বলে মনে হয়।'

আটত্রিশ সালের অক্টোবর মাসে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করা ছাড়াও ওই বছরের জুলাই মাসে চীনে একটি মেডিক্যাল মিশন পাঠানোর ব্যাপারে তিনি উদ্যোগ গ্রহণ করেন। জাপানী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত চীনা জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা জানাতে 'চায়না ডে' পালিত হয় তাঁর অনুরোধে। ওই বছরের অক্টোবর মাসে কংগ্রেস সোশ্যালিস্টে তাঁর রচনায় তিনি মিউনিখ চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য এবং ইউরোপীয় রাজনীতি থেকে সোভিয়েত রাশিয়াকে উৎখাত করার পরিকল্পনায় ফ্যাসিবাদী রাজনীতিবিদ্‌দের স্বেচ্ছায় সমর্থন দানেব জন্য ফ্রান্স ও ব্রিটেনের নিন্দা করেন।

ত্রিপুরী কংগ্রেস-অধিবেশন ও সুভাষের পুনর্নির্বাচন

জবাহরলাল নেহরু-সম্পাদিত 'এ বাঞ্চ অফ ওল্ড লেটার্স' প্রকাশিত হলে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষের পুনর্নির্বাচনের ব্যাপারে সুপারিশ করে গান্ধীজী ও জবাহরলালকে চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু এই পত্র লেখার ব্যাপারে ড. মেঘনাদ সাহা-ই যে কবিকে প্রভাবিত করেছিলেন, এ খবর অনেকেরই জানা নেই। তা ছাড়া, ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিশনের ব্যাপারেও তিনিই বুঝিয়ে-শুনিয়ে কবিকে এতে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণের আবেদন জানিয়েছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর যুগে আমাদের দেশে যুক্তিবাদী ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রবর্তনের জন্য যাঁরা দৃঢ় সংগ্রাম করেছিলেন ড. সাহা ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

জাতীয় উন্মাদনার যুগে হিন্দ স্বরাজ-এর আর্থনীতিক জীবনদর্শন দেশের অধিকাংশ মানুষকেই আচ্ছন্ন করেছিল। দেশের অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীই তখন গান্ধীজীর অনুকরণে চিন্তা করছেন ও কথা বলছেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মতো বৈজ্ঞানিকও চরকা-দর্শনের মহিমা প্রচার করছেন। স্মরণ রাখা দরকার, রবীন্দ্রনাথ-ই এই অসহযোগ তত্ত্ব ও হিন্দ স্বরাজের জীবনদর্শনের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। তার জন্য তিনি দেশবাশীর কাছ থেকে, এমন কি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের কাছ থেকেও তিরস্কৃত হয়েছিলেন। অবশ্য এর কয়েকবছর পরেই প্রফুল্লচন্দ্র আধুনিক যন্ত্রশিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে প্রবল

আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। উল্লেখযোগ্য, তরুণ বৈজ্ঞানিক মেঘনাদ সাহাও সেদিন চরকা-দর্শনের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেছিলেন।

বস্তুতপক্ষে সাতাশ-আটাশ সাল থেকেই সুভাষ ও জবাহরলালের নেতৃত্বে কংগ্রেসের মধ্যে প্রগতিশীল চিন্তাধারার প্রসার ঘটতে থাকে। এই সময় জবাহরলাল রাশিয়া পরিদর্শন করে আসার পর সোভিয়েতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ও তার গঠনমূলক কর্মকাণ্ডের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বই লিখেছিলেন। ত্রিশ সালের শেষভাগে 'প্রবাসী'তেও রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকলে সোভিয়েতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও গঠনমূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে এ-দেশের বুদ্ধিজীবীদের প্রবল ঔৎসুক্য ও আকর্ষণ জন্মাতে থাকে। কিন্তু এই সময় গান্ধীজীর নেতৃত্বে লবণ সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলন চলতে থাকায় পরিকল্পনা ও অর্থনীতিক পুনর্গঠন নিয়ে চিন্তা করবার অবকাশ কেউ পান নি। দীর্ঘ চার বছর ধরে দেশকে ইংরেজের বিরুদ্ধে অবিচ্ছিন্নভাবে লড়াই করতে হয়েছে।

চৌত্রিশ সালে গান্ধীজী আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়ে দেশকর্মীদের গ্রামে ফিরে গিয়ে খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানান। ওই বছরেই বোম্বাই কংগ্রেসে গান্ধীজী কংগ্রেস ত্যাগ করে কংগ্রেস কর্মীদের সামনে 'অখিল ভারত গ্রাম উদ্যোগ সংঘ' গঠনের প্রস্তাব রাখেন। তাঁর এই প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়। এর অল্পকাল পরে গান্ধীজীর অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এই সংঘের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য হতে রাজি হন। বলা বাহুল্য, গান্ধীজী ও কুমারাপ্পার এই গঠনমূলক কর্মসূচীতে গ্রামীণ শিল্প পুনর্গঠনের বিস্তারিত পরিকল্পনা থাকলেও বৃহদাকার যন্ত্রশিল্প ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার কোনো স্থান ছিল না।

মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর কংগ্রেসকে দেশের বেকার সমস্যা, দারিদ্র্য ও আর্থনীতিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। জবাহরলাল তখন কংগ্রেস সভাপতি। সাঁইত্রিশ সালের আগস্ট মাসে ওয়ার্কিং কমিটির এক বৈঠকে আর্থনীতিক পুনর্গঠনের প্রশ্নে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের একটি আন্তঃপ্রাদেশিক বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু তখন এটি কার্যকর হয় নি।

আটত্রিশ সালে হরিপুরা কংগ্রেসে সুভাষ সভাপতি নির্বাচিত হলে ওই বছরেরই মে মাসে তিনি কংগ্রেসের প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রীদের এক বৈঠকে ওয়ার্কিং কমিটির উপযুক্ত সিদ্ধান্তটি কার্যকর করার আবেদন জানান। আটত্রিশ সালের পঁচিশে জুলাই ওয়ার্কিং কমিটির এক বৈঠকে কংগ্রেসের শিল্পমন্ত্রীদের এক সম্মেলন আহ্বান করে দেশের পরিকল্পনা সম্পর্কে যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহ ও একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগের ব্যাপারে কংগ্রেস সভাপতির উপর দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়।

বলা বাহুল্য, কংগ্রেস নেতারা এ-বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করার আগেই এম. এস. বিশ্বেশ্বরায়া, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও ডঃ মেঘনাদ সাহা প্রমুখ বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞানীরা যন্ত্রশিল্প ও সুপরিকল্পিত আর্থনীতিক পুনর্গঠনের পক্ষে লিখতে থাকেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ও এর স্বপক্ষে প্রবল যুক্তি দিয়ে লিখতে থাকেন। তিনি 'মডার্ন রিভিউ'-এর বিশেষ পরিকল্পনা-সংখ্যা প্রকাশ করলেন। ওই সংখ্যায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, ডঃ মেঘনাদ সাহা, ডঃ এস. এস. ভাটনগর, জি. এল. মেটা, ভি. পি. খৈতান, এ. আর. দালাল, অধ্যাপক সুব্রহ্মনিয়ম প্রমুখ বিশেষজ্ঞরা তথ্যপূর্ণ ও মননশীল নিবন্ধ লিখলেন।

এই সংখ্যায় ডঃ মেঘনাদ সাহা 'দ্য ফিলজফি অফ ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন' শিরোনামায় যে-নিবন্ধটি লিখেছিলেন তাতে তিনি কংগ্রেস নেতাদের যে জাতীয় পরিকল্পনা সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই, এই রকম সংশয় প্রকাশ করেন এবং এ-সম্পর্কে তাঁদের ঔদাসীন্যের অভিযোগ করেছিলেন। এর অল্পকাল পরেই তিনি গান্ধীজীর 'ওয়ার্ধা পরিকল্পনার'ও বিরূপ সমালোচনা করেন। মেঘনাদের এইসব লেখায় বেশ উত্তাপ ছিল। সুতরাং তার সমালোচনা হতে থাকল।

ওই বছরের একুশে আগস্ট তারিখে ইণ্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ এ্যাসোসিয়েশন-এর পক্ষ থেকে মেঘনাদ সুভাষকে আমন্ত্রণ জানান। এই সভায় তিনি সুভাষকে প্ল্যানিং কমিশন সম্পর্কে কংগ্রেসের পরিকল্পনার

বিষযে কিছু প্রশ্ন ও আলোচনাদি কবে তাঁব অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি-সম্পর্কে খুব সন্তুষ্ট হন। এই আলোচনাব

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

কিছুকাল পবে, দোসবা অক্টোববে দিল্লীতে কংগ্রেসী শিল্পমন্ত্রীদেব সম্মেলনে সুভাষ প্ল্যানিং কমিশনেব একটি খসডা পেশ কবেন।

এদিকে সুভাষের সঙ্গে আলোচনার পর মেঘনাদ তাঁর সম্পর্কে অত্যন্ত আশান্বিত হন। তিনি মনে করেন, প্ল্যানিং কমিশনকে সার্থক করে তুলতে হলে কংগ্রেস সভাপতি পদে সুভাষের পুনর্নির্বাচিত হওয়া প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে তাঁর রবীন্দ্রনাথের কথা সর্বাগ্রে মনে আসে কারণ কবির প্রগতিশীল চিন্তাধারার সঙ্গে মেঘনাদ ইতিপূর্বেই পরিচিত ছিলেন। তাঁর ধারণা হয় যে, রবীন্দ্রনাথকে তিনি যদি তাঁর এই পরিকল্পনার কথাটা বোঝাতে পারেন এবং তিনি যদি প্ল্যানিং কমিশন ও সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্বাচনের পক্ষে গান্ধীজী ও জবাহরলালকে একটু চাপ দেন তাহলে তাতে আর কোনো বাধা থাকবে না।

তখন শান্তিনিকেতনে গিয়ে কবির সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করলেন মেঘনাদ এবং কবির আমন্ত্রণে তিনি তেরোই নভেম্বরে শান্তিনিকেতনে পৌঁছলে কবি তাঁকে সিংহ-সদনে সংবর্ধনা জানান।

মেঘনাদ প্রথমেই সরাসরি কবিকে তাঁর উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনার কথাটা বলতে সাহস পাননি। এই ব্যাপারে তিনি প্রথমে কবির সেক্রেটারী অনিল চন্দের সঙ্গে সব কথা খুলে আলোচনা করেন। এই আলোচনার পর স্থির হয়, অনিল সুভাষের পুনর্নির্বাচনের গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্যটি কবিকে বুঝিয়ে বলবেন এবং এই ব্যাপারে গান্ধীজী ও জবাহরলালকে চিঠি লেখাতে চেষ্টা করবেন। অনিল চন্দের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ জবাহরলালকে উনিশে নভেম্বরে একটি চিঠি লিখে তাঁকে শান্তিনিকেতন-ভ্রমণের আমন্ত্রণ জানান। শুধু তাই নয়, যাবতীয় দ্বিধা দ্বন্দ্ব কাটিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশেষ দূত হিসেবে সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর মারফৎ গান্ধীজীকে একটি চিঠি লেখেন। এই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত বিনীতভাবে বাংলার বিশেষ সংকটজনক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সুভাষের পুনর্নির্বাচনের কথাটা বিবেচনা করে দেখার জন্য গান্ধীজীকে অনুরোধ জানান।

চিঠিটি পেয়ে গান্ধীজী জবাহরলালকে একটি চিঠি লিখলেন চব্বিশ ডিসেম্বরে। তাতে তিনি লিখলেন, 'এই পত্রখানি দূত মারফৎ গুরুদেবের কাছ থেকে এসেছে। আমি ব্যক্তিগত অভিমত জানিয়ে উত্তর দিয়েছি যে, বাংলার দূষিত আবহাওয়া দূর করতে হলে সভাপতিত্বের কাজ থেকে তাঁকে মুক্ত রাখা প্রয়োজন। আমার সন্দেহ নেই যে, গুরুদেব তোমাকে সোজাসুজি চিঠি লিখবেন, নয়ত তোমার সঙ্গে আলাপ করবেন। তুমি তোমার নিজের মত জানাবে।'

ইতিমধ্যে আটাশে নভেম্বরে অনিল চন্দ জবাহরলালকে একটি চিঠি লেখেন। সেই চিঠির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল, 'সামনের বছরে তিনি (রবীন্দ্রনাথ)একজন 'আধুনিকবাদী' কংগ্রেসী রাষ্ট্রপতি চান, যাতে করে বিবরণী শেষ হলে অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি দ্বারা সেটি সাগ্রহে স্বীকৃত হবে, শুধুমাত্র শিকেয় তোলা থাকবে না। তাঁর এবং আমাদের সকলের মতে—আপনি এবং সুভাষ বাবু মাত্র দুটি খাঁটি আধুনিকবাদী উচ্চ অধিনায়ক রয়েছেন। আপনি পরিকল্পনা কমিটির সভাপতি হওয়ায় আপনার সক্রিয় সহযোগিতা এরই মধ্যে পাওয়া গেছে, তাই তিনি সুভাষবাবুকে আবার রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত দেখতে চান। আশা করি আমি আমার বিশ্বাসভঙ্গ করছিনে এবং আপনি হয়ত এরই মধ্যে জেনে গেছেন বা শীঘ্রই নিশ্চিত জানতে পারবেন যে, তিনি এই সেদিন এ-সম্পর্কে গান্ধীজীকে চিঠি লিখেছেন। এবং যদি আপনার দেখা পান, খুব সম্ভবত সুভাষবাবুকে পুনর্নির্বাচিত করায় সাহায্য চাইবেন।'

সুভাষ কবির সাক্ষাৎ প্রার্থনা এবং শান্তিনিকেতন পরিদর্শনের ইচ্ছা ব্যক্ত করে রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখলে বিশে নভেম্বর তিনি সুভাষকে কবে তাঁর ওখানে যাবার সুবিধে হবে তা জানাতে বলেছেন, কারণ তাহলে তিনি ওঁকে অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হতে পারেন।

কিন্তু সুভাষ তখন নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজে যুক্তপ্রদেশ পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরছিলেন। এই কারণেই সম্ভবত কবির চিঠিটি তাঁর হস্তগত হয়নি।

এগারোই ডিসেম্বরে ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের কথা। সুতরাং কলকাতায় দু'দিন থেকেই সুভাষ ওয়ার্ধায় গেলেন। ওয়ার্ধার বৈঠকে ত্রিপুরী কংগ্রেসের দিন ধার্য হয়। পরের বছরে দশ থেকে তেরোই মার্চে ত্রিপুরীতে কংগ্রেস অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। এই সময় রবীন্দ্রনাথের চিঠির জবাবে

সুভাষ তাঁকে ওয়ার্ধা থেকে চোদ্দই ডিসেম্বরে একটি চিঠি লিখে জানান, তিনি জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি নাগাদ শান্তিনিকেতনে যেতে চান। শান্তিনিকেতনে সুভাষের আসার সংবাদে সন্তোষ প্রকাশ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে চিঠি লিখলেন বিশে ডিসেম্বরে।

ইতিমধ্যে কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচন নিয়ে জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। বস্তুত এতদিন পর্যন্ত গান্ধীজীর মনোনীত ব্যক্তিই সর্বসম্মতিক্রমে কংগ্রেস সভাপতি মনোনীত হতেন। কিন্তু এবার বেশ কিছুদিন থেকেই সুভাষের পুনর্নির্বাচনের পক্ষে দেশের বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস কমিটি ও নেতাদের কাছ থেকে প্রস্তাব আসতে লাগল। সুভাষও নীতিগত প্রশ্নে সভাপতিপদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাইলেন। দেশের সমস্ত বামপন্থী ও প্রগতিশীল দলগুলো এজন্য সুভাষের উপর চাপ দিচ্ছিলেন। কিন্তু গান্ধীজী ও তাঁর অনুগামীরা সুভাষের পুনর্নির্বাচন চাইছিলেন না। তাঁরা এবার মওলানা আবুল কালাম আজাদকে সভাপতি করতে চাইলেন। ঊনচল্লিশ সালের পনেরোই জানুয়ারী কংগ্রেস সভাপতি মনোনয়নের দিন ধার্য ছিল।

ওইদিন আসামের গোপীনাথ বরদলৈ, ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ, বিষ্ণুরাম মেধী, সিদ্ধিনাথ শর্মা এবং জে. সি. গুপ্তের নেতৃত্বে বাংলার কংগ্রেস প্রতিনিধিদের দশ জন কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে সুভাষের নাম প্রস্তাব করলেন। অন্যদিকে গান্ধীজীর অনুগামীরা মওলানা আজাদ এবং পট্টভি সীতারামিয়ার নাম প্রস্তাব করেন। পরদিন ষোলোই জানুয়ারী কংগ্রেস সেক্রেটারী ঘোষণা করে দিলেন যে, 'আগামী পঁচিশে জানুয়ারীর মধ্যে এলাহাবাদে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অফিসে কারও কাছ থেকে যদি প্রার্থীপদ প্রত্যাহারপত্র না পাওয়া যায়, তাহলে ঊনত্রিশে জানুয়ারী সমস্ত প্রদেশের প্রতিনিধিদের ভোট গ্রহণ করা হবে।'

ঠিক এই রকম পরিস্থিতিতেই রবীন্দ্রনাথ সুভাষকে 'দেশনায়ক' রূপে বরণ করে নেবার সংকল্প জানিয়ে পত্র দেন। সুভাষের পুনর্নির্বাচনে যে গান্ধীজীর সম্মতি বা অনুমোদন নেই একথা তিনি পরিষ্কার কবিকে লিখে জানিয়েছিলেন এবং সে-কথা জেনেও কবি প্রকাশ্যেই সুভাষকে অভিনন্দন জানাতে চাইলেন। রবীন্দ্রনাথ যে সুভাষচন্দ্রের মধ্যে শুধু কংগ্রেস সভাপতি বা সারা দেশের ভাবী নায়ককে দেখতে চাইছিলেন তা নয়; সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আবার বাঙালিজাতি তার সমস্ত দুর্বলতা কাটিয়ে বলিষ্ঠভাবে আত্মপ্রকাশ করবে, এই বাসনাই তিনি এতদিন সংগোপনে অন্তরে লালন করে এসেছেন।

বিশে জানুয়ারী মওলানা আবুল কালাম আজাদ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে বিরত থাকবার জন্য তাঁর নাম প্রত্যাহার করে নেন। ফলে আরও জটিলতর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। পরদিন সকালে সুভাষ শান্তিনিকেতনে যাবার আগে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলেন, 'মওলানা আবুল কালাম আজাদ রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং এই সম্পর্কে তিনি যে বিবৃতি দিয়েছেন উক্ত বিবৃতি পাঠ করিয়া আসন্ন রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন সম্পর্কে আমারও কিছু বলিবার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। ব্যক্তিগত ব্যাপার নহে বলিয়া এই সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা কালে সৌজন্যের ভুয়া অভিমান ত্যাগ করিতে হইবে। ভারতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন তীব্র হইয়া উঠার ফলে নূতন ভাবধারা আদর্শবাদ এবং কর্মতালিকার সমস্যা দেখা দিয়াছে।

'অন্যান্য স্বাধীন দেশের মতো ভারতে রাষ্ট্রপতিদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইলে কোনো বিশেষ সমস্যা সম্পর্কে নির্দেশ পাওয়া যাইবে এবং জনগণ কি চাহে তাহার পরিষ্কার নির্দেশ পাওয়া যাইবে। এই সকল কারণে জনগণ ভারতের রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন ও নির্দিষ্ট সমস্যা এবং কর্মতালিকার ভিত্তিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়া সংগত বলিয়া বিবেচনা করেন। এই দিক হইতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবাঞ্ছনীয়ও নহে।'

সুভাষচন্দ্র শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে আসার পরদিনই সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ ওয়ার্কিং কমিটির কয়েকজন সদস্য এক বিবৃতিতে জানালেন যে, মওলানা আজাদ ও ওয়ার্কিং

কমিটির সদস্যদের মধ্যে আলোচনাক্রমেই পট্টভি সীতারামিয়াকেই এবার সভাপতি পদের মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।

চব্বিশে জানুয়ারী সুভাষ কলকাতা থেকে এর প্রতিবাদে একটি বিবৃতিতে বলেন, ওয়ার্কিং কমিটিতে এ রকম কোনো আলোচনার কথা তিনি বা আর কেউ জানেন না।

ওইদিন বরদৌলি থেকে সর্দার প্যাটেল, আচার্য জে. বি. কৃপালনি, ভুলাভাই দেশাই, জয় রামদাস দৌলতরাম, শঙ্কররাও দেও, রাজা গোপালাচারি এবং বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ যে বিবৃতি দেন তার এক জায়গায় বলা হয়, 'মওলানা সাহেব এই নির্বাচনের প্রতিযোগিতা হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হইয়াছেন দেখিয়া আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। কিন্তু তিনি যখন প্রতিযোগিতা না করিবার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ভাবেই গ্রহণ করিয়াছেন তখন তিনি আমাদের মধ্যে কয়েকজনের সহিত পরামর্শ করিয়াই ডঃ পট্টভির নির্বাচন সমর্থন করিয়াছেন। যথেষ্ট বিবেচনা করিয়াই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। আমরা মনে করি যে খুব গুরুতর কারণ না ঘটিলে বিদায়ী সভাপতিকে পুনরায় নির্বাচন না করার নীতিই অক্ষুণ্ণ রাখা উচিত।'

এরপর সুভাষ এবং সর্দার প্যাটেল, ডঃ পট্টভি ও রাজেন্দ্রপ্রসাদের মধ্যে বিবৃতি ও পালটা-বিবৃতি দেওয়া শুরু হয়। ছাব্বিশে জানুয়ারী কুমায়ুন পর্বত থেকে জবাহরলালও একটি বিবৃতি দিলেন। সুভাষের সমর্থনে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (ন্যাশন্যাল ফ্রন্ট-পন্থী), কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট, লেবার পার্টি ও মানবেন্দ্র নাথ রায়-পন্থীরা প্রচার শুরু করেছিলেন।

ঊনত্রিশে জানুয়ারী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের ফল সম্পর্কে কিছুটা বিস্ময়জনকভাবে কংগ্রেস কোনো প্রামাণিক বিবৃতি প্রকাশ করেনি। সুভাষের সংখ্যাধিক্যে জয়লাভের খবর বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিভিন্ন রকম খবর প্রকাশিত হয়—কখনো একশো নিরানব্বই, কখনও দু'শো তিন, আবার কখনো দু'শো সাত। সর্বমোট নির্বাচক সংখ্যা ছিলেন তেত্রিশ শো। অল্প কিছু অবৈধ ভোট বাদ দিলে ওই নির্বাচনে প্রায় নব্বই শতাংশ বৈধ ভোট পড়েছিল।

পট্টভি সীতারামিয়ার তুলনায় সুভাষ বেশি ভোট পেয়েছিলেন বর্মা, তামিলনাদ, পাঞ্জাব, বাংলা, কেরল, যুক্তপ্রদেশ, দিল্লী, বোম্বাই সিটি, অসম, আজমীর ও কর্ণাটকে। পক্ষান্তরে, সীতারামিয়া সুভাষকে হারিয়ে দিয়েছিলেন উৎকল, গুজরাট, বেরার, অন্ধ্র, বিহার, মহারাষ্ট্র, নাগপুর, সিন্ধ, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও মহাকোশলে। জয়লাভের পরই সুভাষ নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে এক বিবৃতিতে বলেন, 'ভারতের স্বাধীনতা লাভের শত্রুরা হয়ত এই ভাবিয়া উৎফুল্ল হইয়াছেন যে, এই নির্বাচন দ্বন্দ্বের ফলে কংগ্রেসের মধ্যে দলাদলি সূচিত হইতেছে। কিন্তু আমি সুস্পষ্টভাবে সকলকে জানাইয়া দিতেছি যে, কংগ্রেস পূর্বের ন্যায় ঐক্যবদ্ধ রহিয়াছে—কোনো দলাদলি ঘটিতে পারে নাই। কোনো কোনো বিষয়ে কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে মতভেদ থাকিতে পারে; কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাহারা সকলেই একমত। দেশের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিবর্গের ঐক্য ও সংহতি বর্তমানে পূর্বাপেক্ষা অধিক মাত্রায় প্রয়োজনীয়। যাহাতে এই ঐক্য ও সংহতি পরোক্ষভাবেও ক্ষুণ্ণ হইতে পারে, এমন কোনো কাজ করা বা কথা বলা আমাদের কোনো ক্রমেই উচিত নহে।'

বলা বাহুল্য, সুভাষচন্দ্রের এই আবেদন ব্যর্থ হয়। অচিরেই এই নির্বাচন উপলক্ষে কংগ্রেসের মধ্যে তীব্র অন্তর্বিরোধ ও দলাদলির সৃষ্টি হয়।

ত্রিপুরী অধিবেশনের পর কংগ্রেসে অনৈক্য

কংগ্রেসের ত্রিপুরী অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে সুভাষ বলেন, 'ফ্রান্স ও ব্রিটেনের মতো তথাকথিত গণতান্ত্রিক শক্তি, মনে হয় ইটালির ও জার্মানীর সঙ্গে যোগ দিয়ে চক্রান্ত করছে কিছু দিনের মতো সোভিয়েত রাশিয়াকে ইউরোপীয় রাজনীতি থেকে হটিয়ে দিতে।...আটটি প্রদেশে কংগ্রেসের হাতে

শাসনের ভার থাকায় আমাদের জাতীয় সংগঠনের শক্তি ও মর্যাদা আজ বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্রিটিশ ভারতের গণ-আন্দোলনও যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছে। আর একটা অভূতপূর্ব জাগরণ দেখা গিয়েছে ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলিতে। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যখন এত আমাদের অনুকূল তখন স্বরাজের দিকে শেষ ধাপ এগোবার এর চেয়ে উপযুক্ত মুহূর্ত আর কী হতে পারে আমাদের জাতীয় ইতিহাসে?

' .....হরিপুরা কংগ্রেস প্রস্তাবে আমরা যেভাবে স্থির করেছিলাম, আমার সুদৃঢ় মত এই যে, এখন আমাদের দেশীয় রাজ্যগুলোর সেই মনোভাব বদলাতে হবে।.....সেই প্রস্তাব অনুসারে দেশীয় রাজ্যগুলোতে বিধানসভা মূলক কাজ অথবা সংগ্রাম কোনোটাই করা চলত না কংগ্রেসের নামে। কিন্তু হরিপুরার পরে অনেক কিছু ঘটে গেছে। আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি সর্বোচ্চ শক্তি অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যগুলোর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। এ অবস্থায় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কী আমাদের উচিত হবে না দেশীয় রাজ্যের জনগণের আরও নিকটে পৌঁছবার?...... .পুরোনো প্রস্তাবে যে নিষেধাজ্ঞা ছিল সেটা তুলে নিয়ে ব্যাপক ও ধারাবাহিক ভিত্তিতে ওয়ার্কিং কমিটির দেশীয় রাজ্যে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও দায়িত্বশীল সরকার গঠনের দাবিতে গণ-আন্দোলনগুলোকে পরিচালনা করা উচিত।

'......আমাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কাজ করতে হবে সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগঠনের সঙ্গে, বিশেষ করে কৃষক ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে। দেশের সমস্ত চরমপন্থী শক্তিগুলোকে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ও সামঞ্জস্য রেখে কাজ করতে হবে আর সব সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তির প্রচেষ্টাই হবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাত হানবার দিকে এক হয়ে অগ্রসর হওয়া।'

কিন্তু কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানেই তখন সুভাষের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তুমুল অনৈক্য দেখা দেয়। উনচল্লিশ সালের একত্রিশে জানুয়ারী প্রভাতী সংবাদপত্রে সুভাষের জয়লাভের খবর প্রকাশিত হল। ওইদিন ইন্দিরা-সহ জবাহরলাল শান্তিনিকেতনে এলেন 'হিন্দী ভবন' উদ্বোধন করতে।

পরদিন সুভাষের জয়লাভ সম্পর্কে গান্ধীজীর ঐতিহাসিক বিবৃতিটি প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। ওই বিবৃতিতে গান্ধীজী বলেন, 'মিঃ সুভাষ বসু তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ডঃ পট্টভি সীতারামিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে সুস্পষ্টরূপেই জয়লাভ করিয়াছেন। আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, গোড়া হইতেই আমি তাঁহার পুনর্নির্বাচনের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলাম। ইহার কারণ এ স্থলে বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। নির্বাচনী প্রচারপত্রে তিনি যে সকল তথ্য ও যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আমি সমর্থন করি না। আমি মনে করি, সহকর্মীদের কথা তিনি যেভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার পক্ষে অযৌক্তিক ও অশোভন হইয়াছে। তথাপি তাঁহার জয়লাভে আমি আনন্দিত। মওলানা সাহেব তাঁহার নাম প্রত্যাহার করিবার পর আমার চেষ্টাতেই ডঃ পট্টভি নির্বাচন হইতে সরিয়া দাঁড়ান নাই। অতএব এই পরাজয় তাঁহার অপেক্ষা আমারই অধিক। আমি যদি সম্পূর্ণ নীতি ও কর্মপদ্ধতির প্রতিনিধিত্ব দাবি করিতে না পারি, তবে আমার কোনই মূল্য নাই। অতএব আমার নিকট ইহা সুস্পষ্ট যে, আমি যে নীতি ও কার্যপদ্ধতির পরিপোষক, ত্রিপুরী যে কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা তাহা সমর্থন করেন না। এই পরাজয়ে আমি আনন্দ প্রকাশ করিতেছি।' এই দীর্ঘ বিবৃতির উপসংহারে তিনি বলেন,

'হাজার হোক, সুভাষবাবু তো আর দেশের শত্রু নন। তিনি দেশের জন্য নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন। তাঁহার কার্যক্রম এবং নীতিকেই তিনি সর্বাপেক্ষা প্রগতিমূলক মনে করেন। যাঁহারা সংখ্যালঘিষ্ঠ তাঁহারা কেবলমাত্র উহার সাফল্য কামনা করিতে পারেন। তাঁহারা যদি উহার সহিত তাল রাখিয়া চলিতে না পারেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে অবশ্যই কংগ্রেসের বাহিরে চলিয়া আসিতে হইবে। তাঁহারা যদি তাল রাখিয়া চলিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহারা সংখ্যাগরিষ্ঠদের শক্তি বৃদ্ধি করিবেন। সংখ্যালঘিষ্ঠদের কোনক্রমেই বাধা সৃষ্টি করা উচিত হইবে না। যখন তাঁহারা সহযোগিতা করিতে অসমর্থ হইবেন, তখন তাঁহারা সহযোগিতা হইতে বিরত থাকিবেন। কংগ্রেসসেবীদিগকে আমি স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, যাঁহারা কংগ্রেসী হইয়াও স্বেচ্ছায় কংগ্রেসের বাহিরে থাকেন তাঁহারাই কংগ্রেসের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ

প্রতিনিধি। সুতরাং যাঁহারা কংগ্রেসে থাকা অস্বস্তিকর মনে করিবেন তাঁহারা বাহিরে চলিয়া আসিতে পারেন। তাঁহারা কোনপ্রকার বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিয়া বাহির হইবেন না; কার্যকরীভাবে দেশের অধিকতর সেবা করার উদ্দেশ্য লইয়াই তাঁহারা বাহিরে আসিবেন।'

এই বিবৃতি পাঠ করে সমগ্র দেশ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে পড়ল। এই নির্বাচন যুদ্ধে সীতারামিয়া ও সুভাষচন্দ্রের মাঝখানে গান্ধীজী কখন এবং কি করে এসে পড়লেন, একথা সাধাবণ লোকে কিছুতেই বুঝে উঠেতে পারল না।

জবাহরলাল তখন শান্তিনিকেতনে। পয়লা ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতনের ছাত্ররা এক ঘরোয়া বৈঠকে জবাহরলালকে গান্ধীজীর ওই বিবৃতির তাৎপর্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করার অনুরোধ জানালে তিনি যা বলেন তা খুবই অস্পষ্ট ও ভাসা-ভাসা ধরনের।

পরদিন সকালে সুভাষ শান্তিনিকেতনে এসে জবাহরলালের সঙ্গে একান্তে তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও কংগ্রেসের ভূমিকা নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন। মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও তাঁর কিছুক্ষণ কথা হয়েছিল। সুভাষ বিকেলে কলকাতায় ফিরে যান। রবীন্দ্রনাথ ও জবাহরলাল সুভাষকে অবিলম্বে গান্ধীজীব সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবিষয়ে তাঁর নির্দেশ গ্রহণের পরামর্শ দেন।

কলকাতায় পৌঁছে পরদিনই সুভাষ গান্ধীজীর বিবৃতির জবাবে এক প্রেস বিবৃতিতে বিষয়টি পরিষ্কার করবার উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেন, 'মহাত্মার সহিত কোন-কোন বিষয়ে ক্বচিৎ আমার মতভেদ ঘটিয়া থাকিলে মহাত্মার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কাহারো অপেক্ষা আমি কম শ্রদ্ধাবান নহি। আমার সম্বন্ধে মহাত্মাজী কী অভিমত পোষণ করেন তাহা আমি জানি না তবে তিনি আমার সম্বন্ধে যে অভিমতই পোষণ করুন না কেন তাঁহার বিশ্বাস ও আস্থাভাজন হইবার জন্য আমি সর্বদাই যত্নবান থাকিব কেননা সকলের বিশ্বাস ও আস্থাভাজন হইয়াও আমি যদি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের আস্থাভাজন না হইতে পারি তাহা হইলে তাহা অতিশয় মর্মন্তুদ হইবে।'

এই বিবৃতিদানের কয়েকদিন পরই সুভাষ এলাহাবাদে আবার জবাহরলালেব সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ওইদিনই তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য ওয়ার্ধার উদ্দেশে যাত্রা করেন এবং সেবাগ্রামে পৌঁছে গান্ধীজীব পবামর্শ ও নির্দেশ প্রার্থনা করেন। কিন্তু এই আলোচনা ফলপ্রসূ হয় নি। গান্ধীজী সুভাষকে বললেন, সর্দাব প্যাটেল এবং অন্যান্যরা একই কমিটিতে তাঁর সঙ্গে কাজ করবেন না। জবাবে সুভাষ তাঁকে বলেন যে, তাঁদেব সঙ্গে দেখা হলে তিনি এই বিষযে আলাপ করে ওঁদের সহযোগিতা লাভ করার চেষ্টা করবেন। ব্যর্থমনোরথ হয়ে সুভাষ জ্বব গাযেই সতেরোই ফেব্রুযাবী তাবিখে কলকাতায ফিরে আসেন।

এরপর সুভাষ খুবই অসুস্থ হযে পড়লেন। বাইশে ফেব্রুয়ারী ওয়ার্ধায় ওযার্কিং কমিটির বৈঠকেব কথা। ডাঃ নীলবতন সরকার প্রমুখ বিশেবজ্ঞরা তাঁকে কোনো মতেই ওযার্ধায় যাবার অনুমতি দিলেন না। সুভাষ সমস্ত অবস্থা জানিয়ে ওয়ার্কিং কমিটিব বৈঠক স্থগিত রাখবার আবেদন জানিয়ে সদস্যদেব তার করলেন। কিন্তু কোনো ফলই হল না। নির্ধারিত সময়ে সুভাষচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে সর্দার প্যাটেল সহ ওয়ার্কিং কমিটিব বাবো জন সদস্য একযোগে পদত্যাগ করে বিবৃতি দিলেন। জবাহরলাল স্বতন্ত্রভাবে পদত্যাগ করে বিবৃতি দেন। এর ফলে সুভাষচন্দ্রের মানসিক প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে তা অনুমান করা শক্ত নয়।

সাতই মার্চ ত্রিপুরী কংগ্রেস শুরু হবার কথা। সুভাষ তখনও অসুস্থ। ডাক্তারদের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে অসুস্থ শরীরেই তিনি ত্রিপুরী যাত্রা করেন। ছযই মার্চ একশো তিন ডিগ্রী জ্বর নিয়ে তিনি জব্বলপুরে পৌঁছন।

এদিকে রাজকোটে দেশীয় রাজ্যে প্রজা আন্দোলন শুরু হলে গুরুতর সঙ্কট সৃষ্টি হয় এবং চৌঠা মার্চ থেকে গান্ধীজী অনশন শুরু করেন। সাতই মার্চ বড়লাটের কাছ থেকে রাজকোট সমস্যার সন্তোষজনক মীমাংসার আশ্বাস পেযে গান্ধীজী অনশন ত্যাগ করেন।

ওইদিনই ত্রিপুরীতে এ. আই. সি. সি.-র বৈঠক শুরু হয়। জ্বর আরও বেড়ে যাওয়ার সুভাষ ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারেননি। পরদিন বিষয় নির্বাচনী বৈঠকে সুভাষকে অসুস্থ অবস্থায় স্ট্রেচারে করে আনা হয়। ওইদিনই গোবিন্দবল্লভ পন্থ গান্ধীজীর নেতৃত্ব ও তাঁর অনুসৃত নীতির প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করে তাঁর ঐতিহাসিক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সুভাষ আপোষ আলোচনার দ্বারা প্রস্তাবটিকে সর্বজনগ্রাহ্য করবার অনুরোধ জানান। কিন্তু সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। দু'দিন আলোচনার পর দশই মার্চ বিষয়-নির্বাচনী সমিতির সভায় পণ্ডিত পন্থের ওই প্রস্তাবটি ২১৮-১৩৫ ভোটে গৃহীত হয়। সুভাষ অবশ্য ওইদিন উপস্থিত হতে পারেননি। ওইদিনই ত্রিপুরী কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশন শুরু হয়। সুভাষের অনুপস্থিতিতে শরৎচন্দ্র বসু সভাপতির অভিভাষণটি পাঠ করেন।

পরদিন সমস্ত পত্র-পত্রিকায় এই খবর ফলাও করে ছাপা হয়। সমস্ত বাংলার মানুষ সেদিন পরাজয়ের অপমানে ক্ষোভে ও ক্রোধে ফেটে পড়বার উপক্রম হয়। ত্রিপুরী কংগ্রেসের এই হৃদয়বিদারক পরিস্থিতির মধ্যেও সুভাষ যে অসুস্থতাজনিত সমস্ত শারীরিক ক্লেশকে অগ্রাহ্য করে শেষ পর্যন্ত মাথা উঁচু করে লড়াই করেছিলেন এর জন্য সুভাষের প্রতি রবীন্দ্রনাথের হৃদয় অপরিসীম দরদ ও সহানুভূতিতে ভরে উঠল। এই নিরতিশয় অবমাননা ও দুঃখের মধ্যে সুভাষচন্দ্রকে বিশেষভাবে জানিয়ে দিলেন যে, বাংলাদেশের পক্ষ থেকে তিনি তাকে যে প্রকাশ্য অভিনন্দন জ্ঞাপনের সংকল্প করেছিলেন তা সফল হতে মোটেই বিলম্ব হবে না।

এগারোই মার্চে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিটি কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুভাষকে পাঠানো হয় নি রবীন্দ্রনাথেরই নির্দেশে। সুধাকান্ত রায়চৌধুরীকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'চিঠিটা দিস না। অত সংক্ষেপে চিঠিতে মনের কথা সব পরিষ্কার হয়নি। আরো কিছু আমার বক্তব্য আছে। সুভাষ ভালো করে সুস্থ হয়ে উঠুক, তারপর যা হয় করা যাবে। ও চিঠি এখন দিস না।'

এদিকে ইউরোপে তখন মহাযুদ্ধের করাল ছায়া ঘনিয়ে এল। হিটলারের হিংস্র থাবা তখন চেকোশ্লোভাকিয়ার বুকে। পনেরোই মার্চ নাৎসীবাহিনী প্রাগনগরী অধিকার করে। সেই দিনই সন্ধ্যায় হিটলার প্রাগনগরী অধিকার করে তার পুরোনো প্রাসাদশীর্ষে নাৎসী বিজয়-পতাকা উড়িয়ে দেন এবং পরদিন তার-বেতারে পত্র-পত্রিকায় সারা পৃথিবীতে এই খবর ফলাও করে ছাপা হল। রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে। এই সংবাদে তিনি যে কি পরিমাণে ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত হন তা অনুমান করা শক্ত নয়। কবির আরও দুঃখ ও ক্ষোভের কারণ এই যে, ত্রিপুরী কংগ্রেসে হিটলারের এই সাম্রাজ্যবাদী ক্ষুধা ও সর্বগ্রাসী নীতিকে তো নিন্দা করা হলই না, পরন্তু মহাত্মাজীর ভক্ত ও অনুগামীরা সগৌরবে ভারতবর্ষে তাঁর একচ্ছত্র নেতৃত্বের প্রশংসা করতে গিয়ে হিটলার-মুসোলিনীর সঙ্গে তাঁর তুলনা করেন। দশই মার্চ সন্ধ্যায় ত্রিপুরী কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনের সূচনাতেই কংগ্রেসের মধ্যে গান্ধীজীর স্থান নির্ণয় করতে গিয়ে বলেন, 'ফ্যাসিস্টদের মধ্যে মুসোলিনীর, নাৎসীদের মধ্যে হিটলারের এবং কমিউনিস্টদের মধ্যে স্ট্যালিনের যে স্থান, কংগ্রেসসেবীদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীজীরও সেই অবস্থান।' পাঞ্জাবের প্রতিনিধিরা তো 'মহাত্মাজী কী জয়! হিন্দুস্তান কী হিটলার কী জয়' বলে স্লোগানে মুখরিত করলেন অধিবেশন-স্থল।

এ-সবই সংবাদপত্র যোগে রবীন্দ্রনাথের নজরে আসে। তিনি তখন অমিয় চক্রবর্তীকে একটি চিঠিতে লিখলেন, 'অবশেষে, আজ, এমন কি, কংগ্রেসের মঞ্চ থেকেও হিটলারী নীতির নিঃসংকোচ জয়ঘোষণা শোনা গেল। ছোঁয়াচ লেগেছে। স্বাধীনতার মন্ত্র উচ্চারণ করবার জন্য যে বেদী উৎসৃষ্ট, সেই বেদীতেই আজ ফ্যাসিস্টের সাপ ফোঁস করে উঠেছে। মনে হচ্ছে আমি এক জায়গায় লিখেছিলুম—Proud power tries to keep safe in its own exclusive hand with a grip that kills it. ডান হাত দিয়ে নেশনের স্বাধীনতার টুঁটি চেপে ধরে বাঁ হাত দিয়ে তাকে স্বাধীনতার ঢোঁক গিলিয়ে দেবার আশ্বাস দেওয়া কেবল ব্যক্তি বিশেষেরই অধিকারায়ত্ত, এই সর্বনেশে মত দেশকে খোকা করে রাখবার উপায়।'

ত্রিপুরী কংগ্রেসে 'পন্থ-প্রস্তাব' গ্রহণ উপলক্ষে কলকাতা ও সারা বাংলায় তুমুল উত্তেজনা দেখা দেয়। রবীন্দ্রনাথ এ-সম্পর্কে গান্ধীজীর হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেন কিন্তু গান্ধীজী তার জবাবে কবিকে জানালেন যে তিনি সুভাষকে কিছু পরামর্শ দিয়েছেন, এছাড়া সংকট বা অচলাবস্থার সমাধানের আর কোনো উপায় তিনি দেখতে পাচ্ছেন না।

গান্ধীজীর সঙ্গে সুভাষের মৌল আদর্শ ও নীতিগত পার্থক্য এবং বিরোধ ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠছিল। তা ছাড়া, কিছুকাল থেকে , বিশেষ করে আটত্রিশ সালে ইউরোপে মিউনিক সংকটকাল থেকেই সুভাষ তাঁর বক্তৃতা ও বিবৃতিতে আভাসে-ইঙ্গিতে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে চরমপত্র বা আলটিমেটাম দেবার কথা বলে আসছিলেন। অথচ গান্ধীজী তা চাইছিলেন না। ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষ তাঁর সভাপতির অভিভাষণে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে চরমপত্র দেওযার কথাটা বিবেচনা করে দেখবার অনুরোধ জানালেন।

কিন্তু কিছু হল না। সবচেয়ে জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন নিয়ে। সুভাষ তখন জামাডোবায় অসুস্থ। তাঁর অসুস্থতার সম্পর্কে বিপক্ষ দল অত্যন্ত হীন কুৎসা ও অপপ্রচার চালাতে থাকেন, তাঁর অসুস্থতা নাকি তাঁর বুজরুকী মাত্র। সুভাষ যে তাতে কি মর্মান্তিক আঘাত পেয়েছিলেন তা তাঁর সেই সময়কার 'মডার্ন রিভিউ'তে লিখা 'মাই স্ট্রেঞ্জ ইলনেস' প্রবন্ধে ব্যক্ত হয়েছে।

যাই হোক, সুভাষ পঁচিশে মার্চ গান্ধীজীকে এক দীর্ঘ পত্রে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন সম্পর্কে তাঁর পরামর্শ ও উপদেশ ভিক্ষা করেন। তিনি জানতে চান 'পন্থ প্রস্তাব'-কে তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব বলে তিনি মনে করেন কিনা।

রবীন্দ্রনাথ তখন কলকাতায়। তিনি তো ভারতীয় রাজনীতির প্রতিটি পদক্ষেপের খবর রাখতেন। নিদারুণ অসুখে ও বিপক্ষদের হীন আক্রমণে সুভাষের হৃদয় যে জর্জরিত হয়ে উঠেছে একথা বুঝতে পেরে তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল ও অস্থির হয়ে উঠলেন। তাঁর আশঙ্কা হয়েছিল, সুভাষ হয়তো উত্তেজনা ও মানসিক প্রতিক্রিয়ায় পদত্যাগ করে বসতে পারেন। তাই শান্তিনিকেতনে যাবার আগে সুভাসকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করার জন্য কিছু পরামর্শ দিয়ে তিনি একটি চিঠি লিখেছিলেন।

সুভাষ পাঁচই এপ্রিল একটি বিবৃতি প্রকাশ করে বললেন। 'নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সভ্য বা কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের এরূপ আশঙ্কা করিবার কারণ নাই যে, আমি পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব মান্য করিব না।... আমার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর মতামতের উপর নির্ভর করিবে।'

কিন্তু সুভাষের এই বিবৃতির পরেও সংকট কাটল না। সুভাষ গান্ধীজীকে ধানবাদে আসার জন্য অনুরোধ জানালেন কিন্তু গান্ধীজী রাজকোটে চলে গেলেন। ওঁদের দুজনের মধ্যে সাক্ষাৎ আলোচনার অনুরোধ জানিয়ে তারবার্তা পাঠালেন রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় পৃথক-পৃথক ভাবে। কিন্তু তাও ব্যর্থ হল।

গান্ধীজী রাজকোট ছেড়ে সুভাষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতে পারেন নি। ওঁর কাছে রাজকোট সমস্যাটিই অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী বলে মনে হয়। গান্ধী-সুভাষ পত্রালাপও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। সুভাস আপোষের যতগুলো প্রস্তাব করেছিলেন গান্ধীজী তা গ্রহণ বা অনুমোদন করতে পারেন নি। তিনি আদর্শ ও নীতিগত পার্থক্যের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেবার পরামর্শ দিয়ে সুভাষকে পুরোনো সদস্যদের বাদ দিয়েই সম্পূর্ণভাবে তাঁর অনুগামীদের নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের পরামর্শ দেন। কিন্তু সুভাষ 'পন্থ-প্রস্তাব'-এর উল্লেখ করে সম্মিলিতভাবে কাজ করবার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। শেষে স্থির হয়, কলকাতায় আসন্ন এ.আই.সি.সি.-র বৈঠকের সময় গান্ধীজী কলকাতায় এসে সুভাষের সঙ্গে আরও আলাপ আলোচনা করবেন।

সুভাষ ও গান্ধীজী যথাক্রমে একুশে ও সাতাশে এপ্রিল কলকাতায় এলেন। গান্ধীজী উঠলেন সোদপুর আশ্রমে। সেদিনই ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের সমস্যা নিয়ে সুভাষের সঙ্গে নিভৃতে তাঁর প্রায় চার ঘন্টা আলোচনা হয়। কিন্তু আপোষ মীমাংসার কোনোই সম্ভাবনা দেখা গেল না।

পরদিন কলকাতায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির ঐতিহাসিক অধিবেশন শুরু হয়। সুভাষ আপোষ মীমাংসার শেষ চেষ্টা করে দক্ষিণপন্থী নেতাদের কাছে প্রস্তাব করেন যে, যদি কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দলের সভ্যদের নিয়ে নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গঠনে তাঁরা সম্মত না হন, তবে অন্তত চারজন নতুন বামপন্থী প্রতিনিধিকে ওয়ার্কিং কমিটিতে নেওয়া হোক। কিন্তু দক্ষিণপন্থী নেতারা তাতে রাজি হন না। তাঁরা পুরোনো সভ্যদের নিয়েই ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের জন্য জিদ ধরে রইলেন। ঊনত্রিশে এপ্রিল নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন শুরু হলে সুভাষ তাঁর পদত্যাগ পত্র দাখিল করেন এবং অত্যন্ত তাড়াহুড়োর মধ্যে তা গৃহীত হয়। ওঁর জায়গায় সভাপতি নির্বাচিত করা হল ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদকে।

কলকাতায় সেদিন কী ভয়ঙ্কর উত্তেজনা! বাইরে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের চারপাশে অপেক্ষমান বিপুল জনতা ক্রোধে ও উত্তেজনায় চিৎকার ও গর্জন করে বিক্ষোভ জানাতে থাকে। সুভাষ স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় নেতাদের একে-একে উত্তেজিত জনতার মধ্য দিয়ে পথ করে তাঁদের মোটরে উঠিয়ে দেন।

রবীন্দ্রনাথ তখন পুরীতে ছিলেন। সুভাষের পদত্যাগের বিবৃতি পাঠ করে তিনি খুবই বিচলিত হয়ে উঠলেন। কংগ্রেসের বিভেদপন্থীদের সমস্ত প্রচেষ্টাকে উপেক্ষা করে তিনি ঐক্যের জন্য যে কঠিন ধৈর্যসহকারে সংযত প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন তার জন্য সুভাষকে অভিনন্দন জানিয়ে পুরী থেকে এক তারবার্তা পাঠান রবীন্দ্রনাথ। ওই বার্তায় তিনি বলেছিলেন, 'অত্যন্ত বিরক্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়িয়াও তুমি যে ধৈর্য ও মর্যাদাবোধের পরিচয় দিয়াছ, তাহাতে তোমার নেতৃত্বের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের উদ্রেক হইয়াছে। আত্মসম্মান রক্ষার জন্য বাংলাকে এখনও সম্পূর্ণরূপে ধীরতা ও ভদ্রতাবোধ অব্যাহত রাখিতে হইবে; তাহা হইলেই আপাতদৃষ্টিতে যাহা তোমার পরাজয় বলিয়া মনে হইতেছে তাহাই চিরন্তন জয়ে পরিণত হইবে।'

উধম সিং-এর শহীদত্ব বরণ

ভারতের উধম সিং লণ্ডনে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র ছিলেন। চল্লিশ সালের তেরোই মার্চ লণ্ডনের ক্যাক্সটন হলে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের জন্য পাঞ্জাবের কুখ্যাত প্রাক্তন গভর্নর স্যার মাইকেল ওডায়ারকে গুলি করে হত্যা করেন। এর জন্য ওই বছরেই উধম সিংয়ের ফাঁসী হয়।

দেশীয় রাজ্যে প্রজা আন্দোলন

দেশীয় রাজ্যে প্রজা সম্মেলন এই পর্বে বেশ কিছুটা সক্রিয় হয়ে ওঠে। এ.আই.সি.সি. ও জবাহরলালের উদ্যোগে সাঁইত্রিশ সালের অক্টোবরে একটি প্রস্তাবে দেশীয় রাজ্য ও ব্রিটিশ ভারতের অধিবাসীদের কাছে মহীশূরের গণ-আন্দোলনকে সমর্থন করার জন্য আবেদন জানানো হয়। পরের বছরে ফেব্রুয়ারী মাসে সুভাষের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হরিপুরা অধিবেশনে সর্বপ্রথম ঘোষণা করা হয় পূর্ণ স্বরাজের আদর্শ শুধু ব্রিটিশ ভারতে নয়, দেশীয় রাজ্যের পক্ষেও প্রযোজ্য যদিও কংগ্রেস দেশীয় রাজ্য আন্দোলনে 'বর্তমানে শুধু নৈতিক সমর্থন ও সহানুভূতিই জানাতে পারে' এবং কংগ্রেসের নামে নয়, সেখানে আন্দোলন চালাবেন সেখানকার অধিবাসীরাও।

তবু মহীশূরের রাজ্য সংগঠনের গান্ধীবাদী নেতা কে.টি. ভাষ্যমের নেতৃত্বে যখন সাঁইত্রিশ সালের অক্টোবর মাসে ওই সংগঠনকে বৈধ করার ও কিছুটা দায়িত্বশীল জনপ্রিয় নির্বাচিত সরকারের দাবিতে আন্দোলন শুরু হয় তখন কয়েক মাসের মধ্যেই এমন বিশাল ও সংগ্রামী রূপ ধারণ করে যে কোলার জেলার একটি গ্রামে সমবেত দশ হাজার মানুষের উপর গুলি চালিয়ে সরকার ত্রিশ জনকে হত্যা করে। পরের মাসেই সর্দার প্যাটেল মহীশূরের দেওয়ান মীর্জা ইসমাইলের সঙ্গে স্থানীয় কংগ্রেসকে বৈধ করার

শর্তে একটি আপোষ করেন। কিন্তু শাসন সংস্কার সংক্রান্ত অন্য প্রতিশ্রুতিগুলো না মানার ফলে উনচল্লিশ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আবার তার এক দফা আন্দোলন শুরু হয়।

ওড়িশায় ঢেনকানল, তালচের, নীলগিরি, রণপুর প্রভৃতি রাজ্যের অবস্থা ছিল আরো অনগ্রসর। তাই শাসন সংস্কারের বদলে সেখানে মুখ্য দাবি ছিল বেগার খাটা, অরণ্য সম্পদের উপর কর-নির্ধারণ, রাজপরিবারে বিবাহাদি অনুষ্ঠানে জোর করে 'উপহার' আদায় প্রভৃতি বন্ধ করার ও প্রজাদের কিছুটা অধিকার স্বীকারের। এই প্রাথমিক দাবির জন্য তীর ধনুক নিয়ে সেখানকার আদিবাসীদের সংগ্রাম ইংরেজের সাহায্যে দেশীয় শাসকেরা নৃশংসভাবে দমন করে। তালচের থেকে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ বাঁচানোর জন্য ওড়িশার সংলগ্ন এলাকায় পালিয়ে যান।

ঢেনকানলে আন্দোলন দমনের জন্য বিদ্রোহীদের সন্ধানে পুলিশ ও মিলিটারী আটত্রিশ সালের দশই অক্টোবরে নীলকণ্ঠপুর ঘাটে তেরো বছরের খেয়া নৌকোর মাঝি বাজি রাউতকে নৌকোয় করে তাদের ব্রাহ্মণী নদী পার করে দিতে বলে। সে অস্বীকার করায় সৈনিকেরা বন্দুকের ঘায়ে তার হাড়গোড় চূর্ণ করে। ক্ষত-বিক্ষত দেহে মুমূর্ষু বাজি রাউত চিৎকার করে গ্রামবাসীদের সতর্ক করে দেয়। অতিরিক্ত রক্তপাতের ফলে সেই রাতেই সে মারা যায়। ওই বালক বীরের আত্মদানের কাহিনী লিখেছেন ওড়িশার বিখ্যাত কবি শচী রাউৎ রায় তাঁর কবিতায়।

বাজি রাউতের মৃত্যুর পর নীলকণ্ঠপুর ঘাটে যে বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশ হয়, তার উপর গুলি চালিয়ে পুলিশ ও মিলিটারি সেদিনই ফাগু সাহু, চানা সাহু, গোরী সাহু প্রমুখকে হত্যা করে। ঢেনকানল সংগ্রামে নেতৃত্বের মধ্যে ছিলেন কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট নবকৃষ্ণ চৌধুরী (পরে ওড়িশার কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী) ও তাঁর স্ত্রী মালতী দেবী, কমিউনিস্ট নেতা বৈষ্ণবচরণ পট্টনায়ক প্রমুখ। উনচল্লিশ সালের পাঁচই জানুয়ারী রণপুর রাজ্যে ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্ট, মেজর ব্যাজেলগেট রাজপ্রাসাদের সামনে জনতার উপরে গুলি চালানোয় ক্ষিপ্ত জনতা তাঁকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করে। ওই হত্যার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত রঘুনাথ মোহান্তি ও দিবাকর পারিধা চল্লিশ সালের চৌঠা এপ্রিল হাজারীবাগ জেলে ফাঁসীতে প্রাণ দেন।

ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন রাজ্যে সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ সালে দু'টি সংস্থা গঠিত হয়। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ওই দুই সংস্থার প্রাণশক্তি হয়ে ওঠেন কমিউনিস্ট ও সোশ্যালিস্ট সংগঠকরা। অন্য দিকে ত্রিবাঙ্কুরের স্বৈরতন্ত্রের প্রধান নেতা ছিলেন জবরদস্ত দেওয়ান, স্যার সি.পি. রামস্বামী আয়ার। কংগ্রেসী নেতৃত্ব সংগ্রামবিমুখ হওয়ায় বামপন্থী কর্মীরা গড়েন যুবলীগ।

ওই যুবলীগের নেতৃত্বে আটত্রিশ সালের ছয়ই সেপ্টেম্বরে শুরু হয় গণসত্যাগ্রহ। যুবলীগ বে - আইনী ঘোষিত এবং সভা সমাবেশ নিষিদ্ধ হলেও যুবলীগের ডাকে ত্রিবাঙ্কুরে শত শত সত্যাগ্রহী জাঠা আসতে থাকে। মালাবার থেকে জাঠা নিয়ে আসেন উত্তরকালের কমিউনিস্ট নেতা এ. কে. গোপালন আর সুদূর মাদুরাই থেকে কৃষক জাঠা আনলেন পাণ্ডিয়ান। দেওয়ান রামস্বামী আয়ারের পুলিশের লাঠির আঘাতে গুরুতর আহত হয়েছিলেন গোপালন এবং নিহত হলেন পাণ্ডিয়ান। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তিনিই প্রথম শহীদদের অন্যতম। অন্যান্য জাঠার নেতৃবৃন্দ কে. সি. জন, মহম্মদ ইউসুফ ও গণপতি কামাথ পরে যোগ দেন কমিউনিস্ট পার্টিতে। আটত্রিশ সালে ত্রিবাঙ্কুরে পুলিশ বারো বার সত্যাগ্রহীদের উপর গুলি চালিয়ে হত্যা করে পনেরো জন বামপন্থী তরুণ কর্মীকে।

চীনে ভারতীয় মেডিক্যাল মিশন

সাম্রাজ্যবাদী জাপান কর্তৃক আক্রান্ত চীনকে সাহায্যের জন্য কংগ্রেসের উদ্যোগে চীনে একটি মিশন পাঠানো হয় আটত্রিশ সালের আগস্ট মাসে। এই মেডিক্যাল মিশন পাঠানোর ব্যাপারে সেদিন বিশেষ উদ্যোগী হয়েছিলেন কংগ্রেস সভাপতি সুভাষ ও জবাহরলাল নেহরু। মিশন যখন চীনের দিকে রওনা হয়েছে তখন জাহাজে মিশন নেতা ডাঃ অটলের কাছে এক জরুরী বার্তা পৌঁছয় রবীন্দ্রনাথের কাছ

থেকে, 'আজকে চীনের এই প্রয়োজনের মুহূর্তে কংগ্রেসের সাহায্য যে এই মেডিক্যাল মিশনের রূপ গ্রহণ করেছে এতে আমি আনন্দিত। এই ধরনের সহায়তার সঙ্গে ভারতবর্ষ যথার্থভাবেই একাত্ম এবং আমাদের মন থেকে রক্তাক্ত মানবতার স্মৃতি দূর হয়ে যাবার অনেক পরেও সমস্ত প্রাচ্যদেশের জাতিদের ঐক্যবদ্ধ করার এই মৈত্রী বন্ধন চলতে থাকবে অবিরাম।'

চীনে এই যে ভারতীয় মেডিক্যাল মিশন পাঠানো হয়, এতে নেতৃত্ব দেন ডাঃ অটল। ইনি ছাড়াও এই দলে ছিলেন ডাঃ চোলকার, ডাঃ বিজয় বোস, ডাঃ দেবেশ মুখার্জী এবং ডাঃ কোটনিস। ডাঃ কোটনিস মেডিক্যাল মিশনের কাজ চালাতে চালাতে তেতাল্লিশ সালে মারা যান চীন দেশেই। ওদেশের মাটিতে পাশাপাশি স্থান পেয়েছে জগদ্বিখ্যাত কানডিয়ান অস্ত্র-চিকিৎসক ডাঃ নর্মান বেথুন এবং ডাঃ কোটনিসের সমাধি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘোষণা ও ভারতের জাতীয় সংকট

উনচল্লিশ সালের পয়লা সেপ্টেম্বরে জার্মানী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করার দু'দিন পরেই ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বড়লাট কোনো জনপ্রতিনিধির সঙ্গে পরামর্শ না করেই ভারবর্ষকেও যুদ্ধে ব্রিটেনের পক্ষে জড়িত বলে ঘোষণা করে দেন। তেসরা সেপ্টেম্বরেই এক অর্ডিন্যান্সে ঘোষণা করা হয় যে কেন্দ্রীয় সরকার অতঃপর ব্রিটিশ ভারতের শান্তিরক্ষা ও যুদ্ধ চালনার সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করবে। এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সভাসমিতি নিষিদ্ধ, সর্ববিধ প্রচার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত এবং বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা হল। এই স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে দোসরা অক্টোবরে বোম্বাইতে নব্বই হাজার শ্রমিক একদিনের রাজনৈতিক ধর্মঘট করলেন। এক সর্বসম্মত প্রস্তাবে সেখানে বলা হল, 'এই সভা মনে করে বর্তমান যুদ্ধ শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিক সংহতির পক্ষে একটি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ এবং ঘোষণা করে যে বিভিন্ন দেশে শ্রমিক ও জনসাধারণের কর্তব্য হবে মানবতাবিরোধী এই চক্রান্তকে পরাস্ত করা।'

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-বিরোধী পৃথিবীর প্রথম ধর্মঘট

উনচল্লিশ সালের অক্টোবর মাসে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বড়লাটের কাছে তাঁদের এই যুদ্ধে লক্ষ্য কী— এই প্রশ্নের যথোচিত জবাব না পেয়ে সমস্ত কংগ্রেস মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগের নির্দেশ দিলেন।

সংকট আরও ঘোরালো হল। তার কারণ, এর আগেই কংগ্রেসের মধ্যে দক্ষিণ ও বামের সংঘাতের ফলে ওই বছরেই এপ্রিল মাসে সুভাষ সভাপতির পদ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি কংগ্রেসের মধ্যেই 'ফরওয়ার্ড ব্লক' নামে একটি সংস্থা গড়ে তোলেন। তখন কমিউনিস্ট, কংগ্রেস, সোশ্যালিস্ট, মানবেন্দ্রনাথ রায়-পন্থী এবং সহজানন্দ প্রমুখ নেতা ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে একত্রে এক বাম-সমন্বয় কমিটি গড়ে তোলেন।

নয়ই জুলাই তারিখে এই বাম সমন্বয় কমিটি কংগ্রেস নেতৃত্বের উত্তরোত্তর অ-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাদির বিরুদ্ধে বিভিন্ন রাজ্যে সভা সমাবেশের ডাক দেয়। এর ফলে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব অনুসারে সুভাষকে সভাপতির পদ থেকে অপসারিত করা হয় এবং পরবর্তী ছয় বছরের জন্য তাঁর কংগ্রেসের কোনো পদাধিকারী হওয়া নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

ফরওয়ার্ড ব্লক ও মহানিষ্ক্রমণের আগে

তেসরা মে কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কের এক বিশাল জনসভায় সুভাষকে সংবর্ধনা জানানো হয়। ওই সভায় সুভাষ প্রকাশ্যে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' গঠনের কথা ঘোষণা করে বলেন যে, কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বামপন্থী ও প্রগতিশীলদের সংহত এবং সম্মিলিত করাই হবে এই ব্লকের প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি ঘোষণা

করেন, কংগ্রেসের বিরোধী হিসেবে নয়, পরন্তু কংগ্রেসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে এই ব্লক কাজ করবে এবং কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র, মূলনীতি ও কর্মপন্থা অনুসরণ করবে। তাছাড়া গান্ধীজীর প্রতি যতদূব সম্ভব শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করে তাঁর অহিংস অসহযোগ নীতিতে পূর্ণ আস্থা রাখবে। পরিশেষে, তিনি ওয়েলিংটন স্কোয়ারের অধিবেশনে বিক্ষোভ প্রকাশের নিন্দা করে বাংলাকে কঠিন সংযম ও শৃঙ্খলার সঙ্গে এগিয়ে যাবার আহ্বান জানান। সুভাষের এই রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের পাশাপাশি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে গান্ধীজীর নেতৃত্বের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা নিবেদন করেও রবীন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে একথা সুস্পষ্ট করে ঘোষণা করেন, গান্ধীজীর অনুসৃত পথ কিংবা তিনি ছাড়া আর কেউ-ই দেশকে নেতৃত্ব দিতে পারেন না— একথা তিনি মনে করেন না। অন্য কোনো শক্তিমান দেশনায়ক যদি দেশের ভাগ্যতরী পরিচালনার কৃতিত্ব ও যোগ্যতা দেখাতে পারেন তবে সমভাবেই তিনি তাঁব সিদ্ধি ও সাফল্য কামনা কববেন। অর্থাৎ, পন্থ-প্রস্তাব'-এর বিরুদ্ধেই রবীন্দ্রনাথ সরাসরি তাঁব মত ব্যক্ত করলেন। রবীন্দ্রনাথ জানিয়ে দিলেন, সর্বভারতীয় রাজনীতি ও তার নেতৃত্ব এবং নীতিগত তর্কাতর্কি থেকে দূরে থাকলেও তিনি বাংলাকে পুনর্গঠিত করার জন্য তার মধ্যে নতুন প্রাণ সঞ্চার করার কথাটাই বেশি করে ভাবছেন। আর এই কাজেই তিনি সুভাষকে দেশনায়করূপে বাংলার হাল ধরবার আহ্বান জানালেন।

উনিশে আগস্ট মহাসমারোহে রবীন্দ্রনাথ 'মহাজাতি সদন'-এর ভিত্তিপ্রস্তব স্থাপন করলেন। পরদিন জবাহরলাল কলকাতা হয়ে চীন যাত্রা করেন। যাত্রার প্রাক্কালে তিনি জোড়াসাঁকোয় গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন কিন্তু ওঁদের মধ্যে সুভাষকে নিয়ে কোনো আলোচনা হয়েছিল কিনা জানা যায় না।

পয়লা সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ভারতের স্বাধীনতা দেওয়া সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকার কোনো প্রতিশ্রুতি দেবে কিনা জানতে চাওয়া হলে সতেরোই অক্টোবরে বড়লাট তাব জবাবে এক বিবৃতিতে যা 'বলেন তা' অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক তো ছিলই, পরন্তু প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার অধিকাব সঙ্কুচিত এবং ব্যাপক গ্রেপ্তার ও অন্যান্য দমনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করায় ইংরেজ সরকারের মনোভাব সকলের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। বাইশে অক্টোবর ওয়ার্কিং কমিটিব বৈঠকে বড়লাটের এই বিবৃতিতে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে প্রতিবাদে কংগ্রেস মন্ত্রিদের পদত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়।

কিন্তু আইন অমান্য বা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করার ব্যাপারে তাঁরা কোনোরকম প্রস্তাব নিলেন না, সুভাষ ও বামপন্থীরা দীর্ঘকাল যেটা দাবি করে আসছিলেন কংগ্রেস নেতারা সংগ্রাম শুরু কবতে দ্বিধা ও দোমনা ভাব দেখাচ্ছেন এবং আপোষের জন্য ব্যগ্রতা দেখাচ্ছেন — সুভাসেব এই সন্দেহ ক্রমশ তীব্রতর হয়। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রশ্নে ইংরেজের সঙ্গে কোনো আপোষই চলতে পাবে না, এই কথাই দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে তিনি প্রত্যক্ষ গণ-সংগ্রামের জন্য কংগ্রেস নেতাদের কাছে বারবার আবেদন জানাচ্ছিলেন।

পনেরোই ডিসেম্বরে কলকাতা কর্পোরেশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'খাদ্য ও পুষ্টি' প্রদর্শনীব উদ্বোধন করতে এলে হাওড়া স্টেশনে রবীন্দ্রনাথেব সঙ্গে সুভাষের বিশ্ব-রাজনীতি ও দেশের বর্তমান অবস্থা নিয়ে প্রায় একঘন্টা ধরে একান্তে আলোচনা হয়। আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ স্থির নিশ্চয় হন, তৎকালীন সংকট মুহূর্তে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষার স্বার্থেই কংগ্রেসের অভ্যন্তবীন সংকট দূব করতে হবে এবং সুভাষের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে নিয়ে কংগ্রেসকে তাঁব সহযোগিতা গ্রহণ কবতে হবে।

মেদিনীপুর থেকে শান্তিনিকেতন ফিরেই সুভাষের প্রতি নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবার অনুরোধ জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীকে টেলিগ্রাম পাঠালেন বিশে ডিসেম্বরে এবং দু'দিন পরে গান্ধীজী এক টেলিগ্রাম পাঠিয়ে জানালেন, 'ওয়ার্কিং কমিটি আপনার তার বিবেচনা করে দেখেছে। পরিস্থিতি বিবেচনা করে তাঁরা নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে পারছেন না। আমার ব্যক্তিগত অভিমত হল, ওই নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে গেলে সুভাষবাবুকে শৃঙ্খলাপরায়ণ হতে হবে। আশা করি আপনি কুশলে আছেন।'

কিছুদিন পরে গান্ধীজী চার্লস ফ্রিয়ার এ্যান্ড্রুজকে একটি চিঠিতে লেখেন, 'সুভাষের ব্যবহার অনেকটা পরিবারের বখে যাওয়া ছেলের (স্পয়েল্ট চাইল্ড) মতো।' অবশ্য তিনি যে সুভাষকে নিজের ছেলের মতো মনে করেন, ওই চিঠিতে তারও উল্লেখ আছে।

রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজী ও ওয়ার্কিং কমিটির মনোভাব স্পষ্টই বুঝে অতঃপর চুপ করে যান। চল্লিশ সালের বিশে মার্চে রামগড়ে কংগ্রেস অধিবেশন বসে। সেখানে কি হতে চলেছে তা আগেই জানা গিয়েছিল পাটনায় ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত থেকে। গান্ধীজী ও কংগ্রেস নেতারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে চূড়ান্ত সংঘর্ষে নামতে দ্বিধা ও দোমনা ভাব দেখাচ্ছেন --- এই বিশ্বাস সুভাষের মনে দৃঢ়তর হয়েছিল। তাই রামগড়ে সুভাষ ও তাঁর অনুগামীরা উনিশে মার্চে একটি আপোষ বিরোধী সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন। এই সম্মেলনে সুভাষ তাঁর ভাষণে কংগ্রেস নেতাদের আপোষমূলক মনোভাবের সমালোচনা করে দেশবাসীকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে চূড়ান্ত বোঝাপড়ার সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি হবার আহ্বান জানালেন।

এই সময় থেকেই সুভাষের সঙ্গে ন্যাশন্যাল ফ্রন্ট বা কমিউনিস্ট পার্টির সম্পর্কচ্ছেদ ঘটে।

হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ

সুভাষ একটা জিনিস দৃঢ়ভাবে বুঝতে পেরেছিলেন, যেমন করেই হোক, ভারতের বিশাল মুসলিম সম্প্রদায়কে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে সামিল করতে হবে। এই কারণেই পঁচিশে মে তারিখে ঢাকার প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে তিনি হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনের পরিকল্পনা রাখেন। এরপর তিনি এই আন্দোলনকে সংগঠিত করার জন্য তাঁর সমস্ত শক্তি ও উদ্যম নিয়োজিত করেন। উনত্রিশে জুন বিকেলে কলকাতার এলবার্ট হলে এক বিরাট জনসভায় তিনি ঘোষণা করলেন,

'হলওয়েল মনুমেন্ট জাতীয় পরাধীনতার অন্যতম চিহ্নস্বরূপ। বহু বৎসর যাবৎ এই অলীক কলঙ্ক-চিহ্ন বাংলার বুকে দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু আজ আমরা প্রত্যেকেই অনুভব করিতেছি যে আমরা অদূর ভবিষ্যতে স্বাধীনতা পাইব এবং আমরা স্বাধীন জাতি হইব। তাই আজ আমরা আমাদিগকে পরাধীন হিসাবে ভাবিতে চাই না, আমরা স্বাধীনভাবে কাজ করিতে চাই। সেই জন্য আমাদের যাহা কিছু পরাধীনতার চিহ্ন তাহাই অপসারিত করিতে চাই। হলওয়েল মনুমেন্ট ওইগুলির অন্যতম। ইহাকে অপসারিত করিবার সময় আসিয়াছে। এই বিষয়ে বাংলার হিন্দু মুসলমান সকলেই একমত। তাই যখন এমন একটা বিষয় পাওয়া গিয়াছে যাহা লইয়া বাঙালী মাত্রই একমত, তখন তাহা লইয়া আমাদের কাজ করিতে হইবে। তেসরা জুলাই সিরাজদ্দৌলার স্মৃতি দিবসের মধ্যে হলওয়েল মনুমেন্টটি লোকচক্ষুর অন্তরালে সরাইয়া লইবার দাবি বাংলা সরকারের নিকট করা হইয়াছে। আমরা চাই জাতির মিথ্যা কলঙ্ক স্বরূপ এই মনুমেন্টটি লোকচক্ষুর অন্তরালে সরাইয়া লওয়া হইক।'

ওইদিনই 'ফরওয়ার্ড ব্লক পত্রিকায় তিনি ঘোষণা করলেন, 'আগামী তেসরা (জুলাই) থেকে আমাদের অভিযান শুরু হবে। আমি সিদ্ধান্ত করেছি যে, প্রথম দিনের বাহিনী পরিচালনা করব আমি নিজে।'

এই সময় উনত্রিশে জুন রবীন্দ্রনাথ কালিম্পং থেকে কলকাতায় ফিরলেন। অপরিসীম ব্যস্ততা সত্ত্বেও দোসরা জুলাই মঙ্গলবার সকাল এগারোটায় সুভাষ গিয়ে ওঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। সুভাষ ও রবীন্দ্রনাথের এটিই শেষ দেখা সাক্ষাৎ।

এই সাক্ষাতের মাত্র দু'তিন ঘন্টা পরে, বেলা আড়াইটের সময়, গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি কমিশনার এলগিন রোডের বাড়িতে গিয়ে সুভাষকে ভারতরক্ষা আইনের একশো উনত্রিশ ধারা মতে গ্রেপ্তার করেন। গ্রেপ্তারের পরেই তাঁকে প্রেসিডেন্সী জেলে পাঠানো হয়।

মহানিষ্ক্রমণ

আলিপুরে কারাজীবন শুরু হল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ততদিনে ক্রমশ বিস্তার লাভ করেছিল। বিশ্বরাজনীতি ও পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে তার রাজনৈতিক সুযোগ নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে উনি কারাগারে বসেই ঘোষণা করলেন, বেআইনীভাবে তাঁকে আটক করে রাখার নৈতিক অধিকার ব্রিটিশ সরকারের নেই। সরকারের এই অন্যায়ের প্রতিবাদে তিনি আমরণ অনশন শুরু করবেন।

উনত্রিশে নভেম্বর থেকে পাঁচই ডিসেম্বর পর্যন্ত সাত দিনের অনশনে সুভাষ কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ব্রিটিশ শাসকরা তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতিতে আতঙ্কিত হয়ে নানাভাবে তাঁকে খাদ্য গ্রহণের চেষ্টা করলেন। তারপর আলিপুরের প্রেসিডেন্সি জেল থেকে অসুস্থ সুভাষচন্দ্রকে শর্ত সাপেক্ষে এলগিন রোডের বাসভবনে স্থানান্তর এবং সেখানে গোয়েন্দা পুলিশের পাহারায় রাখার কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হল। সাদা পোষাকে মোট বাষট্টি জন গোয়েন্দা কর্মীকে নিযুক্ত রাখা হয়েছিল সুভাষের গতিবিধি লক্ষ্য কবার জন্য।

আত্মীয়-স্বজন, আগন্তুক, বাড়ির ভৃত্যরা, সাদা পোষাকের পুলিশ যারা বাড়ির চারদিকে পাহারায় নিযুক্ত ছিল, এমন কি সুভাষের ভাই ডাঃ সুনীল বসুর পোষা এ্যালসেশিয়ান কুকুরটিরও গতিবিধি, বিশেষত রাত্রিবেলায় চলাফেরার উপর বিশেষ ভাবে নজর রাখা হল। সুভাষের নির্দেশ অনুযায়ী ওঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ডাঃ শিশিব বসু নজর রাখতেন বাড়ির চারপাশে নিযুক্ত টিকটিকিদের উপর। চল্লিশ সালের বড়দিনে সুভাষ শিশিরকে গাড়ি চালিয়ে বর্ধমানে গিয়ে এবং সেখান থেকে ফিরে এসে ওঁকে রিপোর্ট করতে বললেন। । ঠিক হল সুভাষ ঘোষণা করবেন যে, উনি কিছুদিনের জন্য লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যাবেন। এই স্বেচ্ছাকৃত অবসর-ব্রত যাপনেব সময উনি কোনো ব্যক্তিব সঙ্গে দেখা করবেন না বা কথাও বলবেন না।

একচল্লিশ সালের সতেরোই জানুয়ারী পূর্বপরিকল্পনামতো মধ্যরাত্রেব কিছু পবে এলগিন রোডের বাসভবন থেকে অতিসন্তর্পণে রহস্যজনক ভাবে সুভাব তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শিশিরের সহাযতায় ধানবাদের উদ্দেশে রওনা হলেন। গোমো স্টেশনে পৌঁছে কুলির মাথায় মালপত্র তুলে দিয়ে উনি একা চলে গেলেন। পূর্ব পরিকল্পনামতো ছাব্বিশে জানুয়ারী রিষড়ার বাগানবাড়িতে শরৎ ও তাঁব পরিবারবর্গকে সুভাষের অন্তর্ধানের খবর দেওয়া হল।

সংবাদপত্রে কয়েকদিন ধরে এই খবর প্রকাশিত হলে গান্ধীজী শরৎকে টেলিগ্রাম কবলেন 'ওয়্যার ট্রুথ'। শরৎ জবাব দিলেন, 'সারকামস্ট্যান্সেস ইনডিকেট রিনানসিয়েশন'। রবীন্দ্রনাথকে লিখলেন, 'হোপ হি উইল হ্যাভ ইওর ব্লেসিংগ্স্ হোয়ারএভার হি মে বি' এবং রাজেন্দ্র প্রসাদকে জানালেন, 'নো নিউজ'।

মাস তিনেক পরে শরৎ ও বিভাবতী রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন। ততদিনে সুভাষের জার্মানীতে পৌঁছানোর খবর এসে গেছে। রবীন্দ্রনাথ শরৎকে বলেছিলেন, 'তুমি আমাকে বলতে পারো' এবং শরৎ তাঁকে সুভাষের আসল খবর দিয়েছিলেন। কলকাতায় ফিরে শরৎ শিশিরকে জানান, রবীন্দ্রনাথ সুভাষের জন্য এতই উদ্বিগ্ন ছিলেন যে, তিনি তাঁকে সত্যি কথা না বলে পারেন নি।

ভগৎ রামের সহায়তায় সুভাষ দুর্গম গিরিপথে পা বাড়ালেন স্বাধীনতা দিবসের পুণ্যলগ্নে, ছাব্বিশে জানুয়ারী ভোরে। একত্রিশে জানুয়ারী ভারতের সীমানা পেরিয়ে সুভাষ পৌঁছে গেলেন কাবুলে।

সুভাষ থেকে নেতাজী

ভগৎরামের অগ্রজ হরিকিষেণ ত্রিশ সালের তেইশে ডিসেম্বরে লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ দিতে আগত পাঞ্জাবের গভর্নর কুখ্যাত মোরেন্সি সাহেবকে গুলি করে হত্যা করেন। তাঁর অন্তিম প্রার্থনা অগ্রাহ্য করে তাঁর মরদেহ মিয়ানওয়ালী জেলের পাশে বেওয়ারিশ মুসলমান কয়েদীদের কবরস্থানে পুঁতে ফেলা হয়। ভগৎরাম সুভাষকে ওদের অর্থাৎ ইংরেজ সরকারের উদ্যত

থাবার নাগাল থেকে ছিনিয়ে এনে সেই ভ্রাতৃহত্যার উপযুক্ত বদলা নিলেন। গোমো থেকে কাবুল পর্যন্ত সুভাষের ছদ্মনাম ছিল মহম্মদ জিয়াউদ্দিন। কাবুলে পৌঁছানোর পরদিন ভগৎরামকে নিয়ে সুভাষ রুশ দূতাবাসের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লেন। তখন তাঁর নতুন ছদ্মনাম অরল্যাণ্ডো মাৎসোট্টা।

ওই দূতাবাসে গেলেও কোনো কিছুর সুরাহা হল না। ভগৎরাম পরপর তিনদিন এজেন্সি অফিস এমব্যাসী অফিস এবং বিভিন্ন রাশিয়ান অফিসারের কাছে গেলেন। এমন কি, সব শেষে স্বয়ং রাশিয়ান রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে আলাপ করলেন, তবু কোনোদিক থেকে আশার আলো দেখা গেল না।

মনে মনে বেশ একটু আহত হলেন সুভাষ। তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল, আর কেউ না হলেও অন্তত রুশ সরকারের কাছ থেকে সবরকম সহযোগিতা তিনি পাবেনই, কিন্তু কার্যত দেখা গেল ঠিক তার বিপরীত। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, এই ব্যাপারে তারা এতটুকু উৎসাহী নয়। বিভিন্ন রাষ্ট্রের গুপ্তচরদের কাছে খোলা শহর কাবুল তখন স্বর্গভূমি। চারিদিকে যুদ্ধ চলছে। আফগানিস্তান দুর্বল রাষ্ট্র। তেমন কিছু হলে চাপে পড়ে তারা যে তখন তাঁকে ইংরেজদের হাতে তুলে দেবে না, সুভাস সে-সম্পর্কে সুনিশ্চিত হতে পারছিলেন না। বিশেষ করে একজন আফগান গোয়েন্দা পুলিশ যখন সন্দেহবশত সুভাষের পিছনে লেগে ছিল।

শেষ পর্যন্ত সুভাষ দেখা করলেন খোদ জার্মান রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে। কথাবার্তা হল, প্রয়োজনীয় প্রতিশ্রুতিও পাওয়া গেল। তবে সেই মুহূর্তে তাঁদের পক্ষে কোনো কিছু করা সম্ভব ছিল না। সর্বাগ্রে বার্লিন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে সিমেন্স কোম্পানীর কাবুলের প্রতিনিধি হের টমাসের কাছে গিয়ে মাঝে মাঝে খোঁজ করলেই সব কিছু জানা যাবে। সুভাষের নিরাপত্তার কথা ভেবে ভগৎরাম উত্তমচাঁদের সহযোগিতা চান যিনি এককালে ছিলেন নওজোয়ান সভাব একজন বিশিষ্ট কর্মী এবং কিছুদিন কারাবাসও করেছিলেন। উত্তমচাঁদ তাঁব দারিদ্র্য-জীর্ণ পর্ণকুটিরে সুভাষেব মতো ভারত-বিখ্যাত ব্যক্তিকে আশ্রয় দিতে প্রাথমিক ভাবে রাজি হননি কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুভাষ সংকটাপন্ন অবস্থায় পড়লে উনি সুভাষকে তাঁর বাড়িতে আশ্রয় দেন।

শারীরিক দিক থেকে সুভাষ দীর্ঘদিন অসুস্থ। বারংবার কারাবাস তাঁর শরীরকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। তার উপর নতুন উপদ্রব দেখা দিল জ্বর ও আমাশয়।

একদিন উত্তমচাঁদেব গৃহিনীর কেমন যেন সন্দেহ হল। রাতদিন ফিস ফিস, গুজ গুজ। সব সময়ে ঘরের দরজার বাইবে থেকে শিকল টানা। এ কি ফেবারী আসামী নাকি?

তখন উত্তমচাঁদ বাধ্য হয়েই গৃহিনীর কাছে সুভাষের নাম বললেন। গৃহিনী বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। রাষ্ট্রপতি সুভাষ বসু, আজন্ম বিপ্লবী সুভাষ বসু, ভারতের লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর আশা ও আকাঙ্ক্ষাব প্রতীক পুরুষসিংহ সুভাষ বসু, কল্পনার রাজপুত্র সুভাষ বসু কিনা আশ্রয় নিয়েছেন তাঁদের এই সামান্য পর্ণকুটিরে। এ আনন্দ। এ গৌরব তিনি রাখবেন কোথায়? না। আর কোথাও তিনি যেতে দেবেন না সুভাষকে। যতদিন কাবুলে থাকবেন, ততদিন কষ্ট হলেও এখানেই তাঁকে থাকতে হবে। কিছুতেই তাঁর অন্যত্র যাওয়া চলবে না। উত্তমচাঁদের গৃহিনী ও কন্যার সেবা যত্ন স্নেহ ও ভালোবাসায় সুভাষ আবার সুস্থ হয়ে উঠলেন। হের টমাসের কাছে হাঁটাহাঁটি করেও বার্লিন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো সুনির্দ্দিষ্ট খবর পাওয়া যাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, সীমান্ত অতিক্রম করে সুভাষ রুশ দেশে ঢুকে পড়বেন। উত্তমচাঁদের ব্যবস্থাপনায় সুভাষকে সহায়তা করতে এল দুই ব্যক্তি। ইয়াকুব খাঁ ও তার শ্যালক। ইয়াকুব একজন ফেরারী খুনী আসামী, অনেক দিন ধরেই সে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে কাবুলে। আর শ্যালকটি শুধু খুনী নয়, ডাকাতও। ওদের পারিশ্রমিক দিতে হবে মোট সাতশো আফগান মুদ্রা। চার শো আগাম দিতে হবে। এ ছাড়া ওই শ্যালকের জন্য দিতে হবে লুঙ্গি, গেঞ্জি, ইত্যাদি সামান্য দু'একটা উপহার সামগ্রী। চব্বিশে ফেব্রুয়ারী দিন ধার্য হল।

এর মধ্যেই, ভগৎরাম খবর পেলেন, বার্লিন থেকে সংবাদ এসেছে, সুভাষকে ইটালিয়ান এমব্যাসীতে গিয়ে ওদের রাষ্ট্রদূত অ্যালবার্ট কোরানীর সঙ্গে তখনই দেখা করা দরকার। ওখানে গিয়ে জানা গেল, বার্লিন থেকে খবর এসেছে। সিনর বোসের ব্যাপারে তারা সবরকমের সাহায্য করতে প্রস্তুত। কিন্তু রুশ সরকার সুভাষকে কোনোরকমে ভিসা দিতে রাজি নন। কারণ, এ-নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কোনরকম ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হোক, তা তাঁরা চান না। অবশ্য, এই ব্যাপারে রুশ সরকারের উপর ক্রমাগত চাপ দেওয়া হচ্ছে। সুভাষকে কষ্ট করে আরও কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে হবে। এ-ব্যাপারে সমস্ত দায়িত্ব এখন থেকে ইটালিয়ান এমব্যাসীর। জার্মান দূতাবাসের নয়।

বারোই মার্চ দুপুরবেলায় ইটালিয়ান রাষ্ট্রদূতের স্ত্রী মিসেস কোরানী উত্তমচাঁদের দোকানে এসে হাজির হলেন। রুশ সরকারের অনুমতি মিলেছে, সুভাষকে দু'চারদিনের মধ্যেই পাশপোর্ট, ছবি ও পোষাক পরিচ্ছদ তৈরি করে নিতে হবে। পনেরোই মার্চ হাজিসাহেবের বাড়িতে সুভাষ ও ভগৎরামের নেমন্তন্ন ছিল। সেখানে উত্তমচাঁদ এসে জানালেন চূড়ান্ত খবর এসে গেছে। পরের দিন সুভাষের স্যুটকেসটা দোকানে নিয়ে রেখে দিতে হবে। বেলা দুটোর সময় এমব্যাসী থেকে লোক এসে ওটা তুলে নিয়ে যাবে তাদের জিম্মায়। পরদিন বিকেলে সুভাষকে যেতে হবে ইটালিয়ান বন্ধু ক্রেশিনির বাড়িতে। ওখান থেকে তাঁকে পাড়ি দিতে হবে ইউরোপের উদ্দেশে।

ষোলোই মার্চে ইটালিয়ান এমব্যাসি থেকে পাঠানো গাড়িতে উঠলেন ডাঃ ওয়েলগার, একজন জার্মান, একজন ইটালিয়ান ডাক হরকরা ও ইউরোপীয়ান ড্রাইভারসহ সুভাষ ওরফে অরল্যাণ্ডো মাৎসোট্টা। সুভাষের নতুন ইটালিয়ান নাম।

খবর এল, আটাশে মার্চ তারিখে সুভাষ নির্বিঘ্নে বার্লিনে পৌঁছে গেছেন। ওখান থেকে প্রকাশিত সব পত্র-পত্রিকায় এই খবর ছেপেছে, ছবিও বেরিয়েছে। ইটালি থেকে সুভাষ টেলিফোনে জানালেন, 'অক্ষশক্তির সঙ্গে আমার এখনও কোনো রাজনৈতিক বোঝাপড়া হয়নি। অবশ্য কোনোরকম বোঝাপড়া না করেই তারা আমাকে সব রকম সাহায্য দিতে প্রস্তুত। কিন্তু আমি তা মেনে নিতে রাজি নই। স্বাধীন ভারতের প্রতিনিধিরূপে আমাকে স্বীকৃতি না দেওয়া পর্যন্ত তাদের কাছ থেকে কোনোরকম সাহায্য নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই একটু অপেক্ষা করতে হবে। তবে বার্লিন রেডিও থেকে শীগ্‌গিরই হয়তো আমি দেশবাসীকে আমার বক্তব্য শোনাতে পারি।'

তারপর দীর্ঘদিন একটা রহস্যময়তার আবরণে ঢাকা পড়ে রইল সুভাষের সব পরিকল্পনা। ভগৎরাম নীরব। পাঞ্জাবের কীর্তি কিষাণ পার্টি নিঃশব্দ। অবশেষে গভীর উৎকণ্ঠার পর জানা গেল, জার্মানী রাশিয়া আক্রমণ করেছে, সুতরাং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মতে এ যুদ্ধ জনযুদ্ধ। কীর্তি কিষাণ পার্টিও সেই নীতিতে বিশ্বাসী। এই অবস্থায় ইংরেজের সঙ্গে আর বিরোধ নয়। বরং তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কি করে সেই ফ্যাসীবাদকে উৎখাত করা যায়, এখন থেকে তা-ই হবে তাদের প্রধান কাজ। কাজেই, সুভাষ ও তাঁর কার্যাবলীর সঙ্গে এখন থেকে কোনোরকম সম্পর্ক রাখা কমিউনিস্টদের পক্ষে সম্ভব নয়। প্রচ্ছন্ন মর্মবেদনা কণ্ঠে ফুটিয়ে ভগৎরাম বললেন, 'পার্টির নির্দেশ আমাকে মানতেই হবে।'

এবার আরম্ভ হল ব্রিটিশ সরকারের নির্যাতন। গ্রেপ্তার, অত্যাচার। বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের দায়িত্বশীল নেতা সত্য বক্সী ও যতীন গুহ গ্রেপ্তার হলেন। দুজনকে দিল্লীর লালকেল্লায় এনে অকথ্য নারকীয় নির্যাতন চালানো হল। কাবুলে উত্তমচাঁদ গ্রেপ্তার হলেন। তাঁর রেডিওর দোকানের প্রায় লক্ষাধিক টাকার জিনিসপত্র জলের দামে বিক্রী করে দেওয়া হল নীলাম ডেকে। কিন্তু ভগৎরাম যে কোথায় ডুব দিলেন, হাজার চেষ্টা করেও কেউ তার কোনো হদিশ পেল না।

আফ্রিকার উত্তর উপকূলে ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে জার্মান ইটালির সেনাদের যুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনী চূড়ান্তভাবে বিধ্বস্ত হয়। বিজয়ীদের হাতে যে ব্রিটিশ বাহিনী গ্রেপ্তার হয়, তার অধিকাংশই ভারতীয়

জওয়ান। তাদের ইটালিতে নিয়ে গেলে এক প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী বাবা অজিত সিং তাদের নিয়ে একটি দল গঠনের চেষ্টা করেছিলেন কারণ ওদের ব্রিটিশ বিরোধী মানসিকতা ব্যাপকতর করার দরকার ছিল।

সুভাষ ভাবলেন রাশিয়া যদি তার স্বার্থে ব্রিটিশ শক্তির সাহায্যপ্রার্থী হতে পারে, তবে তিনি কেন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাহায্যের জন্য জার্মান-ইটালির ব্যাপক প্রভাব এবং শক্তিকে সুকৌশলে কাজে লাগাবেন না।

অতএব সুভাষ বিনা দ্বিধায় মস্কো ছেড়ে চলে গেলেন জার্মানীর রাজধানী বার্লিন শহরে। ভারত থেকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হয়ে কাবুল, কাবুল থেকে মস্কো, মস্কো থেকে বার্লিন। মাত্র তিন মাসের মধ্যে ছদ্মবেশধারী ছদ্মনামে নেতাজী কখনও রেলপথে, মোটরযানে, কখনও টাঙ্গায় অথবা পায়ে হেঁটে প্রথম পর্যায়ের অভিযান শেষ করলেন। বার্লিন শহরে তিনি নতুন নন। পঁয়ত্রিশ সালে তিনি আর একবার জার্মানীতে গিয়েছিলেন। তখন ব্যক্তিগতভাবে বিশিষ্ট কিছু জার্মান শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিবিদের সঙ্গে তাঁর সখ্যতা হয়। তাই, এই রাজনৈতিক সফরের সময় পুরোনো সখ্যতায় তিনি বেশ উপকৃত হন।

ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী-সম্পর্কে হিটলারের ধারণা ছিল ইংরেজের লেখা ইতিহাস বই পড়ে। তা ছাড়া, তিনি যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইথিওপিয়াসহ বিভিন্ন রণাঙ্গনে সাধারণ সেনারূপে লড়াই করেছেন, তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের জন্য অগণিত ভারতীয় সৈন্যকে প্রাণ দিতে দেখেছেন। তখন তাঁর মনে হয়েছিল ভারতীয়রা তার দেশের শোষক-শাসকের হয়ে তাদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখতে যতখানি উৎসাহী. স্বদেশের মুক্তির জন্য ততখানি নয়।

এই একপেশে সংবাদ ও অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে হিটলারের মানসিকতা গড়ে ওঠার ফলে সুভাষের বার্লিনে উপস্থিতির খবরে প্রথমে তাঁকে সমর্থন জানাতে কুণ্ঠাবোধ করেন। মুসোলিনী সুভাষকে রোমে আমন্ত্রণ জানান, ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতায় তাঁর দেশের সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দেন কিন্তু সুভাষ তা গ্রহণ করলেন না। তাঁর মনে হল, মুসোলিনীর আমন্ত্রণ এবং তাঁর ইটালি বাস তাঁর মূল উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক হবে না। তার চেয়ে হিটলারের সহায়তা অনেক বেশি লাভজনক। কিন্তু হিটলারের পরামর্শ সমিতি নাজি সদস্যদের সঙ্গে তিনি কথাবার্তা বলে হতাশ হলেন। কারণ সুভাষ দেশ ও জাতির স্বার্থের পরিপন্থী কোনো শর্তে বা চুক্তিতে সম্মত হতে রাজি হলেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওদের কাছ থেকে সুভাষের শৌর্য বীর্য ব্যক্তিত্ব জনপ্রিয়তা সাহস ও অনমনীয় মানসিকতার রিপোর্ট পেয়ে হিটলার অবশেষে সুভাষের সঙ্গে সাক্ষাতে সম্মত হলেন।

ওঁর সঙ্গে সাক্ষাতে মুগ্ধ হিটলার অতঃপর ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়ে সুভাষের দেওয়া সমস্ত দাবি নিঃশর্তে মেনে নিয়ে সরকারকে অবিলম্বে তা কার্যকর করার নির্দেশ দিলেন এবং সুভাষকে একজন স্বাধীন দেশের মুখ্য নেতারূপে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিলেন। তারপর থেকে জার্মানীতে সুভাষ যে স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার সুযোগ-সুবিধা পান, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন অবস্থায় তা বহু বিদেশী কূটনীতিকেরই ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

জার্মানীর হাঙ্গারীয়ান প্রতিনিধি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'আমরা জার্মান সরকারের মিত্রপক্ষ। অথচ সুভাষচন্দ্র একজন ভারতীয় হয়ে জার্মানীতে যে রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছেন, তা যে কোনো পূর্ব ইউরোপের কূটনীতিকের পক্ষে কল্পনাতীত।'

বার্লিনে অবস্থানকারী তৎকালীন জাপানী রাষ্ট্রদূত এবং বিশ্বখ্যাত কূটনীতিক মোরেল ওসীমা সুভাষ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'এশিয়া ইউরোপ ও আমেরিকার যে ক'জন বিশিষ্ট কূটনীতিকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ঘনিষ্ঠ সুযোগ-সুবিধা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে নেতাজী সুভাষ অনন্য এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্ব।'

হিটলার তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'মেইন কামপক'-এ ভারতীয়দের সম্পর্কে যে বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন, সুভাষের সংস্পর্শে আসবার পর তিনি পরবর্তীকালে তাঁর আত্মজীবনী থেকে তা বাদ দেন এবং স্বীকার করেন, ভারতবর্ষ ও ভারতীয়দের সম্পর্কে অজ্ঞানতা, সঠিক সংবাদসূত্রের অভাবেই আত্মজীবনীতে তিনি প্রথম ভুল তথ্য ও মন্তব্য প্রকাশ কবেছিলেন।

সুভাষ যখন হিটলারের সঙ্গে দেখা করেন তাব মাত্র মাস দুয়েক আগে জার্মান, ইটালি ও জাপান এক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। ইটালি আব জার্মান সবকারেব বন্দী শিবিবে শিক্ষাপ্রাপ্ত যে সব ভাবতীয় জওয়ান ছিলেন তাঁদের নিয়ে সুভাষ আজাদী বাহিনী গড়ার প্রথম স্বপ্ন দেখলেন। তিনি মধ্য ইউরোপেব যেসব অঞ্চলে বিভিন্ন ভারতীয় বসবাস করেন তাঁদের নিয়ে 'মুক্ত ভারত কেন্দ্র' বা 'ফ্রি ইণ্ডিয়া সেন্টাব' গড়ে তুলবেন। পরাধীন ভারতবর্ষেব স্বাধীনতা আন্দোলনের সপক্ষে জনমত জাগ্রত করাব জন্য এই সেন্টার বেতার কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা কববে এবং ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর মধ্যে যেসব ভাবতীয় যোদ্ধা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন অথবা ব্রিটিশ-বিবোধী দেশের হাতে যুদ্ধবন্দী, তাঁদের মুক্ত করে প্রবাসী ভারতীয় তরুণদেব নিয়ে এক সেনাবাহিনী গড়ে তুলবে। কিছুটা টালবাহানাব পব জার্মানি কর্তৃপক্ষে দুটো প্রস্তাবেই সম্মত হলেন। এজন্য জার্মান সরকার প্রয়োজনীয় অর্থ ঋণ দিতেও রাজি হলেন।

হিটলাব সুভাষের সঙ্গে আলোচনা কবে তাঁর দূবদৃষ্টি ও রণকৌশলের ধারায় বিস্মিত ও মুগ্ধ হলেন। জার্মান সবকাবের কাছে সুভাষের মর্যাদা আরও বেড়ে গিয়েছিল। জার্মান সরকারের বিদেশ দপ্তর সুভাষকে তাঁর পরিকল্পনামতো স্বাধীনভাবে কাজ করাব অধিকাব দিলেন। ওই দপ্তবেব মাধ্যমে একটি শাখা কেন্দ্র খুলে সুভাষেব প্রস্তাবিত ফ্রি ইণ্ডিয়া সেন্টাবকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিপ্লব প্রচারণেব কাজ করার সুযোগও দেওয়া হল। বার্লিন শহরে প্রাণকেন্দ্র টাইগার্টেন অঞ্চল বিদেশি দূতাবাসগুলোব জন্য নির্দিষ্ট হলেও সেখানে সুভাষেব কাজেব জন্য বিরাট এক সুদৃশ্যভবন তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হল। একচল্লিশ সালের অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে অনাড়ম্বব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ওই ভবনে ফ্রি ইণ্ডিয়া সেন্টাবেব প্রতিষ্ঠা হল। সঙ্গে-সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানটি শুধু কূটনৈতিক মর্যাদাই পেল না, জার্মান সরকাবেব কাছ থেকে অনেক বেশি সুযোগ-সুবিধাও পেল। দোসবা নভেম্বরে সংঘেব প্রথম সভা বসেছিল। উদ্দেশ্য ছিল, সংঘের পববর্তী কার্যক্রম ও নীতি-নির্ধাবণ কবা। নভেম্বব মাসেব মধ্যে সুভাষ বেতারকেন্দ্র পরিচালনা কববার জন্য এমন ত্রিশ জন যুবককে নিয়োগ করলেন যাঁরা হিন্দী, উর্দু, তেলুগু, তামিলসহ বিভিন্ন ভাষা শিখে স্বদেশবাসীর উদ্দেশে স্বাধীনতা সংঘের আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রচাব কবে বিদেশে ব্যাপক প্রস্তুতির দায়িত্ব নিতে পাবেন।

ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘেব প্রথম সভায় চাবটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ প্রস্তাবিত স্বাধীনতা-অভিযানেব যুদ্ধধ্বনি হবে 'জয়হিন্দ'। জাতীয় নেতা সুভাষচন্দ্র অতঃপব 'নেতাজী' রূপে অভিহিত হবেন। ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত হবে রবীন্দ্রনাথেব 'জনগণমন অধিনায়ক' গানটি। হিন্দী হবে স্বাধীন ভারতবর্ষের জাতীয় ভাষা। নেতাজী আবেগমথিত কণ্ঠে বললেন, "'জয়হিন্দ' ধ্বনি শুধুমাত্র আমাদের সমরধ্বনি নয়, সামাজিক অনুষ্ঠানে, প্রাত্যহিক জীবনেব প্রতিটি কাজে এই ধ্বনি হবে প্রতিটি ভারতবাসীর প্রেরণার উৎস।"

বিয়াল্লিশ সালের উনত্রিশে মে তারিখে ভারত-জার্মান সাংস্কৃতিক সমিতির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে হামবুর্গে অনুষ্ঠিত এক সভায় ভারতের জাতীয় সংগীত হিসেবে 'জনগণমন অধিনায়ক' গানটি গাওয়া হল এবং ভারতের জাতীয় পতাকা হিসেবে তেরঙ্গা পতাকা উড়তে লাগল জার্মানি পতাকাব পাশাপাশি। ভারতেব জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় সংগীত এই সর্বপ্রথম বিদেশের মাটিতে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করল। অন্যান্য দেশের কূটনীতিবিদ সরকারী প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে জার্মান সরকার নেতাজীকে রাষ্ট্রীয় সম্মানে অভিষিক্ত করলেন।

নেতাজীব সঙ্গে জার্মান সবকাবেব যে চুক্তি হয তাব অন্যতম শর্ত হল ঃ

(ক) ভাবতীয জওযানদেব স্বদেশভূমি ভাবতবর্ষেব মুক্তিযুদ্ধ ছাড়া তাদেব অন্য কোনো বণাঙ্গনে পাঠানো অথবা জার্মান বাহিনীব অন্তর্ভুক্ত কবা চলবে না।

(খ) জার্মান সেনাদেব মতো তাদেব আধুনিক অস্ত্র পবিচালনা ও ব্যবহাবেব সুযোগ দিতে হবে। জাতীয চেতনা, শৃঙ্খলাবোধ, সহযোদ্ধাদেব সঙ্গে সখ্যতা বজায বাখতে এবং উচ্চপর্যাযেব সামবিক শিক্ষা প্রদানে জার্মান সামবিক বাহিনী বাধ্য থাকবেন।

(গ) প্রতিটি ভাবতীয জওযান জার্মান সেনাদেব সমমর্যাদা পাবে। খাদ্য, পোষাক, বেতন, ভাতা ও ছুটি সহ কোনো ব্যাপাবেই তাব হেবফেব কবা চলবে না। এবং ভাবতীয জওযানবা কেবলমাত্র ভাবতীয নেতাব নেতৃত্বাধীন পবিচালিত হবে।

'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন

বিযাল্লিশ সালেব নযই আগস্ট অল ইণ্ডিযা কংগ্রেস কমিটি বিপুল ভোটাধিক্যে 'ভাবত ছাড়ো' প্রস্তাব পাশ কবে। সেই বাত্রেই কংগ্রেস ওযার্কিং কমিটিব সদস্যবা গ্রেপ্তাব হয়ে আগা খাঁ প্রাসাদ ও আহম্মদ নগব দুর্গে প্রেবিত হন। পবদিন থেকেই শুরু হয ভাবতব্যাপী গান্ধীজী-নির্দেশিত 'কবেঙ্গে ইযে মবেঙ্গে' আন্দোলন।

জয প্রকাশ নাবাযণ

ওই আন্দোলন দমন কবতে সবকাব যাবতীয নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন কবে। গ্রেপ্তাব লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস, গুলি—কোনো কিছুই বাদ যাযনি। যাবা পুলিশ বা মিলিটাবীব গুলিতে মাবা যান তাঁদেব মধ্যে ছিলেন মেদিনীপুবেব বিখ্যাত গান্ধীবাদী নেত্রী, বাহাত্তব বছব বযস্কা মাতঙ্গিনী হাজবা, আসামেব স্কুল ছাত্রী কনকলতা বড়ুযা ও গৃহবধূ ভোগেশ্ববী ফুকননি, গুজবাটেব ষোলো বছব বযস্ক ছাত্রনেতা শ্রীশকুমাব এবং অন্যান্য বাজ্যেব বহু মানুষ।

ভাবত ছাড়ো আন্দোলনে নাশকতামূলক কাজেব জন্য যাদেব ফাঁসী হযেছিল, তাঁদেব মধ্যে ছিলেন আসামেব কুশল কোঁযাব, ওড়িশাব আদিবাসী নেতা লক্ষ্মণ নাযেক, উত্তবপ্রদেশেব আব এস পি নেতা বাজনাবাযণ মিশ্র ও সিন্ধু প্রদেশেব তরুণ যুবনেতা হেমু কালানী প্রমুখ।

বিযাল্লিশেব ভাবত ছাড়ো আন্দোলনে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট ও বেশ কিছু বিপ্লবী দলেব সদস্যও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ কবেন। বিযাল্লিশ সালেব নভেম্ববে হাজাবিবাগ সেন্ট্রাল জেল থেকে পালিযে যান জযপ্রকাশ নাবাযণ, বামনন্দন মিশ্র ও আবও তিন জন কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট নেতা এবং অনতিবিলম্বে বামমনোহব লোহিযা, অরুণা আসফ আলি, অচ্যুত পটবর্ধন প্রমুখ সোশ্যালিস্টদেব সঙ্গে যোগ দিযে সংগ্রাম চালিযে যান। বেঙ্গল ভলান্টিযার্স, অনুশীলন, যুগান্তব, বিভোলিউশনাবি কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইণ্ডিযা, আব এস পি প্রভৃতি দলও এই আন্দোলনে যোগ দেয। আত্মগোপন কবে নানাবিধ আন্দোলন চালান অরুণা আসফ আলি, সুচেতা কৃপালনী, ঊষা মেটা প্রমুখ। এঁদেব মধ্যে ঊষা মেটা বোম্বাইতে গোপন বেডিও থেকে সংবাদ দেবাব ব্যবস্থা কবতে গিযে ধবা পড়েন।

তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার

বিয়াল্লিশ সালের সতেরোই ডিসেম্বরে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তেতাল্লিশ সালের ছাব্বিশে জানুয়ারী ওই সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে সুতাহাটা, নন্দীগ্রাম, মহিষাদল ও তমলুকের প্রতিটি জায়গায় একটি করে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ওই সরকারের পরিচালনায় একটি বিদ্যুৎবাহিনী গঠিত হয়েছিল।

তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকাবের সর্বাধিনায়ক ছিলেন সতীশচন্দ্র সামন্ত এবং বিশিষ্ট নেতাদের মধ্যে ছিলেন অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, সুশীলচন্দ্র ধাড়া প্রমুখ।

কাঁথি মহকুমাতেও পটাশপুর ও খেজুরী থানায় প্রায় একমাস জাতীয় সরকার কার্যকর ছিল। দিনাজপুরের বালুরঘাটেও এক দিনের জন্য ব্রিটিশ শাসন অচল হয়ে যায়। চোদ্দই সেপ্টেম্বরে বালুরঘাটের প্রথম সত্যাগ্রহী সরোজরঞ্জন চ্যাটার্জীর নেতৃত্বে জনতা শহরে প্রবেশ করে আদালত, ডাকঘর প্রভৃতিতে হানা দিয়ে রেজিস্ট্রি অফিস প্রভৃতি পুড়িয়ে দেয়। টেলিগ্রাফের তার কাটে এবং সরকারী গুদামের ধান দরিদ্রদের মধ্যে বিলি করে। বালুরঘাটের ওই সংগ্রামে এক প্রধান ভূমিকা ছিল সাঁওতালদের। তাঁরা তীরধনুক নিয়ে পুলিশদলকে আক্রমণ করেন।

মহারাষ্ট্রে স্বাধীন সরকার

মহারাষ্ট্রে সাতারা জেলায় গ্রামে গ্রামে ব্রিটিশ রাজের প্রতিদ্বন্দ্বী এক 'প্রতি সরকার' বা 'পর্তিসরকার' গড়ে ওঠে। প্রায় চারশো গ্রামে ওই ধরনের গণ-পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠিত হয়। কর্মীরা ট্রেন ধ্বংস করে। লাইন উপড়িয়ে, তার কেটে সাতারা জেলায় ব্রিটিশ রাজকে বহু দিনের জন্য সম্পূর্ণ অচল করে স্বাধীন পঞ্চায়েত রাজ স্থাপন করে। এঁদের নেতা ছিলেন নানা পাটিল (পরে লোকসভার সদস্য), পাণ্ডু মাস্টার, আম্মা মাস্টার, শ্রীনাথ লাল এবং ডাঃ উত্তম রাও।

উত্তরপ্রদেশের বালিয়া জেলার আজমগড়ে সাময়িকভাবে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে। সেখানে সংশ্লিষ্ট আন্দোলনের নেতা ছিলেন চৈতু পাণ্ডে, ঝাড়খণ্ডে রায়, সরযূ পাণ্ডে প্রমুখ।

ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের শহীদ

বিয়াল্লিশ সালের তেরোই মার্চ প্রথমে ব্যাঙ্ককে ও পরে সিঙ্গাপুরে অবস্থিত 'ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের পক্ষ থেকে কয়েক দফায় জাপানী সাবমেরিনে বেশ কয়েকজন ভারতীয় বিপ্লবীকে নেতাজী দেশে পাঠান বিদ্রোহ সংঘটনের জন্য। এঁরা প্রায় প্রত্যেকেই ধরা পড়েন ও তাঁদের মধ্যে অনেকেই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। এঁরা হলেন মহিন্দর সিং, ত্রিবাঙ্কুরের আবদুল মহম্মদ কাদির, সত্যেন্দ্র চন্দ্র বর্ধন, এস. এ. আনন্দ এবং ফৌজা সিং। ফৌজা সিং সম্ভবত হাঁটা পথে অসমের ভিতর দিয়ে এসেছিলেন। তেতাল্লিশ সালের দশই সেপ্টেম্বর এঁদের মাদ্রাজ পেনিটেনশিয়াবীতে ফাঁসী দেওয়া হয়। ডাঃ পবিত্র সরকার, অমৃত সিং এবং এদেশে তাঁদের দুই সহযোগী হরিদাস মিত্র ও জ্যোতিষচন্দ্র বসুরও মৃত্যুদণ্ড হয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীর হস্তক্ষেপে অন্তর্বর্তী সরকারের নির্দেশে তাঁরা মুক্তি পান।

সৈনিকের বিদ্রোহ

তেতাল্লিশ সালের আঠারোই এপ্রিল 'চতুর্থ মাদ্রাজ কোস্টাল ডিফেন্স ব্যাটারি'র বারো জন সৈনিককে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ষড়যন্ত্রের জন্য গ্রেপ্তার করা হয়। ওই বছরের ছয়ই জুলাই ও পাঁচই আগস্টে সামরিক আদালতে মনকুমার বসু ঠাকুর, নন্দকুমার দে, দুর্গাদাস রায়চৌধুরী, নিরঞ্জন বড়ুয়া, চিত্তরঞ্জন মুখার্জী, ফণিভূষণ চক্রবর্তী, সুনীলকুমার মুখার্জী, কালিপদ আইচ এবং নীরেন্দ্র মোহন মুখার্জীর মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় এবং সাতাশে সেপ্টেম্বরে ওঁরা ফাঁসীকাঠে মৃত্যুবরণ করেন।

নাৎসীবাদ বিরোধিতায় ভারতীয় নারী

নূর ইনায়েৎ খাঁ বা নুরুন্নিসা বেগমের জন্ম টিপু সুলতানের বংশে। দ্বিতীয় যুদ্ধকালে ফ্রান্স নাৎসী বাহিনীর পদানত হলে প্যারিস-নিবাসী এঁদের পরিবার ইংলণ্ডে পালিয়ে যায়। সেখানে নুর বিমান বাহিনীতে যোগ দেন। তাঁর অনুরোধে তাঁকে প্যারাসুটে নামিয়ে দেওয়া হয় ফ্রান্সে—যাতে সেখান থেকে গোপন রেডিও মারফৎ নাৎসী বাহিনীর অবস্থান বিষয়ে তিনি খবরাখবর পাঠাতে পারেন। দেড় বছর ধরে ওই বিপজ্জনক কাজ চালানোর পর তিনি 'গেস্তাপো'র হাতে ধরা পড়েন। নৃশংস অত্যাচার চালিয়েও তাঁর সঙ্গীদের কোনো খবর তাঁর মুখ থেকে বার করা যায়নি। শেষ পর্যন্ত নাৎসীরা তাঁকে কুখ্যাত 'ডাচাও' বন্দীশিবিরে পাঠিয়ে দিয়ে গুলি করে মারে।

কমিউনিস্টদের তৎপরতা

একচল্লিশ সালের বাইশে জুন জার্মানী সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করায় বে-আইনী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের মধ্যে কর্মপন্থার বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়। জেলে কারারুদ্ধ নেতারাও এই আলোচনায় যোগ দেন। আলোচনার পর একচল্লিশ সালের শেষ দিকে তাঁরা স্থির করেন যে, জার্মানী কর্তৃক সোভিয়েত ভূমি আক্রমণের পর যুদ্ধের চরিত্রের আমূল রূপান্তর ঘটেছে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ রূপান্তরিত হয়েছে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী জনযুদ্ধে। সুতরাং এ যুদ্ধের বিরোধিতা নয়, কমিউনিস্ট পার্টির নিজস্ব ভূমিকা অক্ষুণ্ণ রেখে এ যুদ্ধে যোগদানই কর্তব্য।

কমিউনিস্ট পার্টি এই নতুন ভূমিকা গ্রহণের পর দেশের ভিতরে ও বাইরে পার্টিকে বৈধ ঘোষণা করার দাবি ওঠে ও তার ফলে বিয়াল্লিশ সালের জুলাই মাসে পার্টি বৈধ ঘোষিত হয়।

যুদ্ধের চরিত্রের পরিবর্তন, জার্মানী ইটালি ও জাপানের বিরোধী শক্তির সমাবেশে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা এবং জয়লাভের একান্ত প্রয়োজনীয়তা ও তাৎপর্য বিষয়ে প্রচার ও ভারতবর্ষে জাতীয় সংকট দূর করার জন্য জাতীয় নেতাদের অবিলম্বে মুক্তিদানের দাবিতে দেশবাসীকে সমবেত করা— এই হল তখনকার দিনের কমিউনিস্টদের কাজ।।

তা সত্ত্বেও, সাম্রাজ্যবাদী সরকার পার্টিকে বৈধ ঘোষণা করলেও, তার উপরেও যে সতর্ক নজর রাখে তার প্রমাণ ওই সময়েই ক্যানানুর জেলে ফাঁসী হল চারজন কমিউনিস্ট কৃষক তরুণের। এঁরা হলেন মাদাথিল আপ্পুর, কুনহাম্বু নায়ার, চিরুকানন্দন এবং আবু বাকর।

একচল্লিশ সালের মে মাসে কমিউনিস্ট নেতা কে. পি. আর গোপালনের নেতৃত্বে মালাবারে কৃষকদের সঙ্গে পুলিশের এক রক্তাক্ত সংঘর্ষে মারা যান বহু কৃষক। সংশ্লিষ্ট মামলায় কে. পি. আর. গোপালনের ফাঁসীর হুকুম হয়। কিন্তু গান্ধীজী, জবাহরলাল ও সারা ভারতব্যাপী আন্দোলনের ফলে মৃত্যুদণ্ড মকুব হয়ে তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। অথচ পূর্বোক্ত চারজন কৃষক তরুণের অপরাধ ছিল, মালাবারের কুখ্যাত স্পেশাল পুলিশ ও জমিদারের পোষা গুণ্ডাবাহিনী একটি কৃষক-কন্যাকে লাঞ্ছিত করলে তারা আরও অনেক বিক্ষুব্ধ কৃষককে সংগঠিত করে পাল্টা আক্রমণ করেছিল পুলিশ বাহিনী ও ওই গুণ্ডাদের। ওই সংঘর্ষে মারা গিয়েছিল একজন পুলিশ কনস্টেবল। এঁদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলে তার বিরুদ্ধে আপিল নাকচ করে দেয় মাদ্রাজ হাইকোর্ট।

কমিউনিস্ট পার্টির তরফে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা হয় প্রিভি কাউন্সিলে। সেখানের ওই কৃষক বিদ্রোহীদের পক্ষে মামলা লড়েন বামপন্থী ব্যারিস্টার ডি. এম. প্রিট। সে আপিলও নাকচ হল ওই চারজন তরুণের ফাঁসী হয়।

একদিকে যেমন ইংরেজ সরকার স্বভাবতই কমিউনিস্টদের আদৌ বিশ্বাস করেনি, নানা ভাবে তার বিরোধিতাই করেছে, অন্যদিকে তেমনি কমিউনিস্ট বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীলপন্থীরা ওই সময়ে তাঁদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়েছিল। যেমন, ঢাকায় তরুণ কমিউনিস্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ও সুলেখক সোমেন চন্দকে বিয়াল্লিশ সালের আটই মার্চ তারা নৃশংসভাবে হত্যা করে। এর প্রতিবাদে কলকাতায়

আটাশে মার্চ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে লেখকদের যে সম্মেলন হয় তার থেকে উদ্ভূত হয় 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সমিতি।'

কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলে ওঁরা প্রথমেই উদ্যোগী হন সব মত ও পথের মানুষকে নিয়ে একটি সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি (ফ্রেণ্ডস অফ সোভিয়েত ইউনিয়ন) গঠনে। এর সভাপতি নির্বাচিত হন বিপ্লবী ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।

নেতাজী ও আজাদ হিন্দ্ ফৌজ

তেতাল্লিশ সালের গোড়ায় নেতাজীর গোপন নির্দেশ পেয়ে তাঁর স্ত্রী এমিলি শেঙ্কল বার্লিনে এলেন। তখন তাঁর কোলে ছিল মাত্র ছ'মাসের শিশুকন্যা অনিতা। সপ্তাহ তিন-চার আগে নেতাজী যখন ভিয়েনায় যান তখন তিনি তাঁর সদ্যোজাত শিশুকন্যাকে প্রথম দেখেন।

কয়েক মাস আগে অর্থাৎ বিয়াল্লিশ সালের অক্টোবর মাসে নেতাজী একবার জার্মান ত্যাগের পরিকল্পনা করেছিলেন। তখন তাঁকে বিদায় দেবার আনুষ্ঠানিক পর্বও শেষ হয়েছিল। কিন্তু জরুরী কারণে তিনি সেই যাত্রা বাতিল করেন। অতএব মাত্র তিন মাসের ব্যবধানে নেতাজীর জরুরী তলব পেয়ে তিনি তার নিগূঢ় অর্থ বেশ বুঝতে পারলেন এবং বার্লিনে এসে এমিলি উঠলেন সোদিয়েন স্ট্রাসের বাসভবনে যেখানে নেতাজী তখন বসবাস করছিলেন।

নেতাজীর জার্মান ত্যাগের প্রস্তুতিপর্ব শেষ হল। সহধর্মিনী-সচিব এমিলির উপর নির্দেশ হল, নেতাজীর বার্লিন-ত্যাগের পরও তিনি যেন সোদিয়েন স্ট্রাসের বার্লিনস্থ্ বাসভবনে নির্দিষ্টকাল বসবাস করেন। তাঁর আচার-আচরণ ও চলায়-বলায় যেন এমন একটা ভাব ফুটে ওঠে যে নেতাজী এখানেই আছেন এবং থাকবেন। এ ছাড়াও নেতাজী বেশ কিছু নির্দেশবার্তা এমিলির কাছে রাখলেন যা তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁকে করতে হবে। অবশেষে যাত্রাকাল নির্দিষ্ট হল আটই ফেব্রুয়ারী।

খুব ভোরে তিনি শয্যাত্যাগ করলেন। একটু বাদেই তিনি বার্লিন শহর ছেড়ে কীল্-এর পথে যাত্রা করবেন। তিনি মেজদাদা শরতের উদ্দেশে এই চিঠিটি লিখলেন,

'পরম পূজনীয় মেজদাদা, আজ পুনরায় আমি বিপদের পথে রওনা হইতেছি। এবার কিন্তু ঘরের দিকে। হয়তো পথের শেষ আর দেখিব না। যদি তেমন বিপদ পথের মাঝে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ইহজীবনে আর কোন সংবাদ দিতে পারিব না। ...আমার অবর্তমানে আমার সহধর্মিনী ও কন্যার প্রতি একটু স্নেহ দেখাইবে—যেমন সারাজীবন আমার প্রতি করিয়াছ।'

নেতাজী বার্লিনের শহরতলীর রেল স্টেশন লেহর্টার বানহোফ থেকে একটি লোকাল ট্রেনে উঠলেন। সঙ্গী হলেন নাম্বিয়ার, স্টেট সেক্রেটারী উইল হেল্ম্ কেপলার, আলেকজাণ্ডার ওয়ার্থ এবং আবিদ হাসান।

কীল শহরের একটি হোটেলে মাত্র একটি রাত্রি অতিবাহিত করলেন ওঁরা। পরদিন সকালে জার্মান সাবমেরিনের ক্যাপ্টেন নির্দিষ্ট সময়ে গাড়ি নিয়ে হোটেলের সামনে হাজির হলেন। সংক্ষিপ্ত লাগেজসহ গাড়ি সকলকে নিয়ে সমুদ্র-সৈকতে গিয়ে দাঁড়াল। নেতাজী সাবমেরিনে উঠলেন, অনুসরণ করলেন আবিদ হাসান। জঙ্গী সাবমেরিণ আচমকা সমুদ্রের অতল জলে ডুব দিল। মে মাসে ওই অভিযান শেষ হয় সুদীর্ঘ সাড়ে তিন মাস পরে।

জার্মান সাবমেরিন আটলান্টিক মহাসাগরের অতলপথে ম্যাডাগাসকার উপকূল পর্যন্ত যায়। পূর্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী অন্য একটি জাপানী সাবমেরিন নির্দিষ্ট সময়ে মালয়ের পেনাঙ উপকূল থেকে ম্যাডাগাসকার উপকূলে গিয়ে হাজির হয়। ওই সাবমেরিন ভারত মহাসাগরের তলদেশ দিয়ে পৌঁছে পেনাঙ উপকূলে। পেনাঙ তখন জাপানীদের দখলে। পেনাঙ থেকে নেতাজী বিমানে টোকিওতে পৌঁছন ওই মাসেই।

নেতাজীর টোকিও তথা জাপান উপস্থিতির খবর প্রথম দিকে কৌশলগত কারণে গোপন রাখা হয়। বিশে জুন তারিখে টোকিও রেডিও সর্বপ্রথম এই খবর প্রচার করে। পরদিন নেতাজী টোকিও থেকে বেতার ভাষণ দেন। তাতে উনি বলেছিলেন, 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিত হল ভারতবর্ষে। তাই

ইংরেজ আমাদের কোনোদিনই নিজে থেকে স্বাধীনতা দিয়ে দেবে না। হ্যাঁ, আপোষ করার চেষ্টা মাঝে মাঝে করবে কিন্তু আমরা যেন সেই ফাঁদে পা না দিই। ভারতবর্ষের ভিতরে এবং বাইরে আমাদেব সর্বশক্তি দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।'

নেতাজী আবার চল্লিশ জুন বেতার বক্তৃতা দিতে এলেন। জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো ভারতবর্ষেব স্বাধীনতা সংগ্রামে সবরকমের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি দেশবাসীকে সে কথা জানালেন। সেবার টোকিও ছেড়ে যাবার আগে জাপানকে ধন্যবাদ জানিয়ে এক বাণী রেকর্ড কবে যান। তাতে নেতাজী বলেছিলেন, 'আমি যখন প্রাইমারী স্কুলের ছাত্র, তখন এশিয়ার ছোট্ট দেশ জাপান ইউরোপেব মস্ত বড় দেশ রাশিয়াকে হারিয়ে দিয়েছে শুনেছিলাম। এখবর তখন ভারতবর্ষের মানুষকে প্রেরণা দিয়েছিল। তখন থেকে আমরা এ্যাডমিরাল টোগো বা জেনাবেল নোগির নাম শুনে আসছি। আজ আপনারা আমার দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে আগ্রহ দেখিয়েছেন, তার জন্য আমার আন্তবিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।'

দোসরা নভেম্বর জাপানে জার্মান রাষ্ট্রদূত স্টাহ্মার নেতাজীর হাতে একটি টেলিগ্রাম দেন। তাতে ছিল আজাদ হিন্দ্ সরকারকে জার্মান গভর্নমেন্টের স্বীকৃতি দেওয়ার খবর। নেতাজী খুশি হলেন এবং পরের দিন সন্ধ্যা থেকে তিনি খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

অবশ্য জার্মান সরকারের স্বীকৃতি পাবার আগেই নেতাজী বিশ্বের এক স্বাধীন দেশেব বাষ্ট্রপ্রধানেব কাছ থেকে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। তিনি বার্লিন থেকে সিঙ্গাপুবে পৌঁছেছিলেন দোসরা জুলাই। দু'দিন পরে সিঙ্গাপুবের ক্যাথয় ভবনে আজাদ হিন্দ ফৌজের মূল নেতা রাসবিহারী বসু নেতাজীর ত্যাগ, নিষ্ঠা, দূরদর্শিতা আর দুঃসাহী অভিযানের কাহিনী বর্ণনা কবে আজাদ হিন্দ্ ফৌজেব নেতৃত্বভার তাঁব উপব অর্পণ করার প্রস্তাব করেছিলেন। তারও দু'দিন পরে সিঙ্গাপুরেব মিউনিসিপ্যাল ভবনের সামনেব প্রাঙ্গণে জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো এবং আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর সর্বাধিনাযক নেতাজী সামরিক অভিবাদন গ্রহণ করলেন। তোজো নেতাজীকে স্বীকৃতি দিলেন, স্বাধীনতা-যুদ্ধে সব রকমের সহায়তার আশ্বাস দিলেন এবং তোজোর স্বীকৃতির অনতিকালের মধ্যে জার্মানীর স্বীকৃতি পেয়ে নেতাজী স্বভাবতই উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন।

ষোলোই জুন জাপানের পার্লামেন্টে নেতাজীর প্রথম পদার্পণ ঘটে। ভিতরে বিশিষ্ট অতিথিদের গ্যালারিতে বসেছিলেন। দ্বিতীয়বার তিনি আসেন নভেম্বর মাসে। এই বাড়ির অপব এক প্রশস্ত হলে বসেছিল বৃহত্তর পূর্ব এশিয়ার সম্মেলন। পাঁচ ও ছয়ই নভেম্বরের এই সম্মেলনে জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো ছাড়া উপস্থিত ছিলেন ফিলিপিনের প্রেসিডেন্ট জোসে লরেল, বার্মাব প্রধানমন্ত্রী বা ম, থাইল্যাণ্ডের প্রিন্স ওয়ান ওয়াইথায়াকন, চীনের নানকিং সরকারের প্রেসিডেন্ট ওয়াং চি-ওয়াই, মাঞ্চুরিয়ার প্রধানমন্ত্রী চ্যাং কেই কেই। নেতাজী উপস্থিত ছিলেন অবজার্ভার হয়ে, কারণ ভারতবর্ষ এই বৃহত্তর পূর্ব এশিয়া কো-প্রসপারিটি পরিধির বাইরে পড়ে। কিন্তু ব্যক্তিত্বেব জোবে নেতাজীই কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়লেন এই সম্মেলনের।

অপর সব দেশের নেতারা ভারতবর্ষের সমর্থনে বক্তৃতা করলেন। বা ম বললেন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা না এলে এশিয়ার অন্যান্য দেশের পরাধীনতা ঘোচার কোনো আশা নেই। ধন্যবাদ দিতে উঠে নেতাজী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ দৃপ্ত ভঙ্গিতে আবেগদীপ্ত ভাষায় যে ভাষণ দিলেন তার বর্ণনা দিতে গিয়ে দোভাষী কাকুৎসুবো বলেছেন, 'ভালো করে দোভাষীর কাজ করতে পারছিলাম না। এত অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম, আমার চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। উনি বললেন, যে যুক্ত ইস্তাহার আজ এই সম্মেলন থেকে প্রচারিত হল তা একদিন এশিয়ার পরাধীন দেশগুলির চার্টার অফ ফ্রিডম বলে গণ্য হবে। এক নতুন এশিয়ার স্রষ্টা বলে জাপানের নাম ইতিহাসে লেখা থাকবে।'

সম্মেলনের শেষে তোজো ঘোষণা করলেন, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে আজাদ হিন্দ্ সরকারকে হস্তান্তর করে দিচ্ছেন জাপান গভর্নমেন্ট। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ভারতের প্রথম স্বাধীন ভূখণ্ডে পরিণত হল।

এশিয়া সম্মেলনের সময় হিবিয়া পার্কে এক বিরাট জনসমাবেশ হয়েছিল। বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে নেতাজীও মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন এবং ওই সমাবেশে বক্তৃতা করেছিলেন।

পঞ্চাশের মন্বন্তর

নেতাজী যখন পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গনে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ উৎখাত করার জন্য চূড়ান্ত আঘাত হানতে প্রস্তুত হচ্ছেন, গান্ধীজীর ডাকে ভারত-ছাড়ো আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গোটা দেশের টালমাটাল অবস্থা, তখন প্রশাসনিক ষড়যন্ত্রে তেরো শো পঞ্চাশ বঙ্গাব্দে এই বাংলায় যে মন্বন্তর ঘটেছিল তাতে বাংলার পঁয়ত্রিশ লক্ষ মানুষ মারা যান। সেদিন প্রচুর স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান তাদের সীমিত শক্তি নিয়ে এই মন্বন্তর ও মহামারীক্লিষ্ট দুর্গতদের পাশে দাঁড়াবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল। আর্তত্রাণের জন্য লঙ্গরখানা খোলা বা টাকা তোলা প্রভৃতি কাজে এই সব প্রতিষ্ঠানগুলো আর্ত ও বিপন্ন মানুষগুলোর পাশে সেদিন দাঁড়িয়েছিল। পঞ্চাশের মন্বন্তর সম্পর্কে সেদিন উপন্যাস, কবিতা, গল্প লিখেছিলেন ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক সংঘের সদস্য তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল হালদার প্রমুখ সাহিত্যিকেরা এবং গান বেঁধেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিনয় রায়, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, হরিপদ কুশারী, ছবি এঁকেছিলেন জয়নুল আবেদিন, চিত্তপ্রসাদ, গোপাল ঘোষ, সোমনাথ হোড় এবং ফটো তুলেছিলেন সুনীল জানার মতো শিল্পী।

এঁরা সকলেই যুক্ত ছিলেন ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক সংঘের সঙ্গে।

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের 'দিল্লী চলো' অভিযান

নেতাজী রাসবিহারী বসুকে দেখতে এসেছিলেন ওঁদের বাড়িতে। রাসবিহারী তখন খুব অসুস্থ। শত রকম ব্যস্ততার মধ্যেও নেতাজী ওঁকে দেখতে এলেন। স্বাস্থ্যের সঙ্গে রাসবিহারীর মন তখন খুব ভেঙে পড়েছিল। হতাশার ভাব এসে গিয়েছিল। তেতাল্লিশ সালে নেতাজী যখন এশিয়া সম্মেলনের জন্য টোকিওতে গিয়েছিলেন তখন উনি রাসবিহারীকে অনেক আশা দিয়েছিলেন। যুদ্ধে জয় হবে, ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে।

এক বছর পরে আবার গেলেন নেতাজী। যুদ্ধের অবস্থা তখন অন্যবকম। রাসবিহারী বসুও প্রকৃতপক্ষে শেষ শয্যায়। ওই সাক্ষতে দু'জনেই খুব আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন। তবে নেতাজী ওঁব হাত ধরে তখনও আশ্বস্ত করেছিলেন, স্বাধীন ভারতবর্ষের মাটিতে আবার দেখা হবে। চুয়াল্লিশ সালের নভেম্বরে এই সাক্ষাৎকারের পরে পঁয়তাল্লিশ সালেব জানুয়ারী মাসে রাসবিহারী লোকান্তরিত হন। মৃত্যুসংবাদ পেয়ে নেতাজী টেলিগ্রাম পাঠালেন শোকবার্তা জানিয়ে এবং তিনি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সব খরচ বহন করতে চেয়েছিলেন আজাদ হিন্দ্ সরকারের পক্ষ থেকে। প্রয়াণের কয়েকদিন আগে জাপান সম্রাটের পক্ষ থেকে রাসবিহারীকে 'অর্ডার অব দ্য রাইজিং সান' উপাধি দেওয়া হয়। সম্রাট হিরোহিতো 'অর্ডার অব দ্য রাইজিং সান' সম্মান নেতাজীকেও দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু 'আগে আমার দেশ স্বাধীন হোক' বলে নেতাজী সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

চুয়াল্লিশ সালের নভেম্বর মাসে নেতাজী জাপানের একটি স্মরণীয় সমাবেশে বক্তৃতা করেছিলেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় আশা ও উৎসাহের বানী শোনালেন। বোমায় বিধ্বস্ত টোকিও শহর দেখে তিনি বলেছিলেন, শত্রুপক্ষ চাইছে তাড়াতাড়ি যুদ্ধ শেষ করতে, মনোবল ভেঙে দিতে। কিছুতেই তা হতে দেওয়া হবে না। তিনি আরও বললেন, ভারতীয় স্বাধীনতা-যোদ্ধারা ও জাপানী সেনাদল তাঁদের ভাগ্য একসূত্রে গেঁথেছেন। এখন জীবন ও মৃত্যু একই সুতোয় বাঁধা হয়ে গেছে। তবে উনি দৃঢ় আশা ব্যক্ত করেছিলেন, পরাজয়ের কোনো প্রশ্নই ওঠে না কারণ ন্যায় ও সত্যের জয় অবশ্যই হবে।

নেতাজী সে-সময় ওঁর জাপানী দোভাষী কাকিৎসুবোকে বলেছিলেন, সমাবেশ যতই বড় হয় ততই তিনি বলতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়-আয়োজিত ছোট একটি বিদগ্ধ সমাবেশেও

সেবার তিনি বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতার অনুবাদ করতে গিয়ে নেতাজীর বাগ্মিতায় মুগ্ধ হয়ে যেতেন কাকিৎসুবো। জাপানে প্রবেশের সময় নিরাপত্তার কারণে নেতাজীর একটা ছদ্মনাম ছিল মাৎসুদা। সেবার ইম্পিরিয়াল হোটেলের সেই বিরাট সাংবাদিক সম্মেলনেই তিনি বিশ্বের সাংবাদিক জগতে আবার আত্মপ্রকাশ করলেন।

তৃতীয়বার টোকিও সফরের সময় নেতাজী বিমান বন্দরে এসে পৌঁছেছিলেন পয়লা নভেম্বর। হানেডা বিমানবন্দরে ওঁকে অভ্যর্থনা জানাতে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী শিগেমিৎসু। ভারতীয়দের মধ্যে চুয়াল্লিশজন টোকিও ক্যাডেট ছিল, হাতে তাদের তেরঙা পতাকা। সেবার অর্থাৎ চুয়াল্লিশ সালের ছয়ই নভেম্বরে গ্রেটার ইস্ট এশিয়া কনফারেন্সের প্রথম বার্ষিকীর দিনে নেতাজীর সঙ্গে জাপানের সম্রাটের দেখা হয় তাঁর রাজপ্রাসাদে।

টেরুও হাচিয়া নেতাজীর সঙ্গে সাক্ষাতে ব্যর্থ হন পঁয়তাল্লিশ সালের গোড়ায়। আজাদ হিন্দ্ সরকারে জাপানের রাষ্ট্রদূত হয়ে এলেও রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে পরিচয়পত্র পেশ করতে ব্যর্থ হওয়ায় এই ব্যবস্থা।

পঁয়তাল্লিশ সালের প্রথম থেকেই যুদ্ধের অবস্থা আজাদ হিন্দ ফৌজের পক্ষে ভালো ছিল না। নেতাজীকে হাচিয়া পশ্চাদপসরণের পরামর্শ দিতেই, উনি বললেন, 'তোমরা আমাকে ভেবেছ কি? সব সৈনিকের নিরাপদে রিট্রিটের ব্যবস্থা আগে চাই। তা ছাড়া, রানী ঝাঁসী বাহিনীর একটি মেয়েও যতক্ষণ এখানে থাকবে, ততক্ষণ আমি রেঙ্গুন ছেড়ে এক পা-ও নড়ব না।'

হাচিয়া তাঁর এক সহকর্মীর সহায়তায় সেই বিপর্যয়ের মধ্যে নেতাজীর জন্য গাড়ি ও অন্যান্যদের জন্য ট্রাক ও লরির ব্যবস্থা করলেন। নেতাজীর অন্য চেহারা দেখা গেল তখন। তিনি সকলের তদারক করছেন, সকলের সঙ্গে দুঃখকষ্ট ভাগ করে নিচ্ছেন। পথে ইসোডা, হাচিয়া আর কাকিৎসুবোর গাড়ি অচল হয়ে পড়লে এই তিন জাপানী কর্মকর্তাকে নেতাজী নিজের লিঙ্কন গাড়িতে তুলে নিলেন।

পথে সিটাং-এ আজাদ হিন্দ্ ফৌজের এক সৈনিক সুরুতা বলে এক জাপানী অফিসারকে শত্রু-পক্ষের চর বলে ভুল করে হত্যা করে। এজন্য ওঁর পরিবারবর্গের কাছে যতটাকা ক্ষতিপূরণ দেবার পরামর্শ দিয়েছিলেন কাকিৎসুবো, নেতাজী তার দ্বিগুণ দিয়েছিলেন।

যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত হাচিয়া ছিলেন জাপানের রাষ্ট্রদূত। জাপানের পরাজয় যখন অনিবার্য হয়ে পড়ল, হাচিয়া ব্যাঙ্ককে আত্মসমর্পণ নিয়ে নেতাজীর সঙ্গে আলোচনা করলেন। জাপানের আত্মসমর্পণের পর হাচিয়া ও ইসোডা সায়গন পর্যন্ত এলেন নেতাজীর সঙ্গে। সেখানে পৌঁছে নেতাজীর যাবার ব্যবস্থা করতে ফিল্ড মার্শাল তেরৌচির সদর দপ্তরে অনেক ছুটোছুটি করতে হল। সায়গন এয়ারপোর্টে পঁয়তাল্লিশ সালের আগস্টে হাচিয়া অন্যান্যদের সঙ্গে নেতাজী ও হবিবুর রহমানকে বিদায় জানান। পরে এই হাচিয়া লালকেল্লায় বিচারাধীন আই.এন.এ. অফিসারদের সঙ্গে ছিলেন।

পঁয়তাল্লিশ সালের বাইশে আগস্ট সায়গন থেকে টোকিওতে যাবার সময় সায়গন বিমান বন্দরে আই. এন. এ. পদস্থ অফিসার আয়ার যখন বিমানে উঠতে যাচ্ছন তখন প্রপেলারের গর্জনের মধ্যেই আচমকা তাঁকে বিমান দুর্ঘটনার খবর দেওয়া হয়। উনি তখন নেতাজীর বিমান-দুর্ঘটনাস্থল তাইহোকুতে যাবার জন্য অস্থির হয়ে পড়লেও জাপানীরা ওঁকে তাইচু বলে এক জায়গায় নিয়ে যায়। ক্ষিপ্ত আয়ার সঙ্গী জাপানী অফিসারদের বারবার বলতে থাকেন,'আমাকে দেখতে দাও নেতাজীকে, আমাকে হবিবুরের সঙ্গে কথা বলতে দাও। নয়তো তোমাদের এই দুর্ঘটনার কথা কে বিশ্বাস করবে?'

বাইশ তারিখে টোকিওতে গিয়ে বিমান-বন্দর থেকে সোজা চলে গেলেন ইম্পিরিয়াল হেড-কোয়ার্টার্সে। কিন্তু সেখানে গিয়েও অফিসারদের মুখে শুনলেন, তাইহোকুর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। মরীয়া হয়ে আয়ার বললেন, 'তোমরা আমাকে তাইহোকু নিয়ে গেলে না, তোমরা এখন বলছ কোনো খবর নেই, তোমাদের আমি ওয়ার্নিং দিচ্ছি, সারা পূর্ব এশিয়াতে বা ইণ্ডিয়াতে কেউ তোমাদের কথা বিশ্বাস করবে না।'

ওঁদের পাওয়া খবর অনুসারে আঠারোই আগস্টে বিমান দুর্ঘটনা হয়েছে। আয়ার ওঁদের বললেন,

'তোমরা এখনও সেই খবর প্রকাশ করোনি কেন?' তখন ওঁরা আয়ারকে বললেন, 'আপনি ড্রাফট করে দিন কীভাবে নিউজ দেওয়া হবে।' সেখানে বসে সংবাদের খসড়া তৈরি করে দিলেন আয়ার এবং পরদিন অর্থাৎ তেইশে আগস্ট জাপানের কাগজে শিরোনাম হল সেই দুঃসংবাদ।

ব্রিটিশ ইনটেলিজেন্সের এক বড় কর্তা কর্নেল ফিগেসকে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের হেড কোয়ার্টারস্ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়, তাইহোকুতে নেতাজীর বিমান-দুর্ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত করে একটা পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট দিতে। ফিগেস ম্যাকআর্থারের একশো লোকের একটি দলকে এই কাজ করে দিতে অনুরোধ করলে ওরা অনেককে জিজ্ঞাসাবাদ করে, বিশেষ করে হবিবুর রহমানকে। তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, নেতাজী ওই বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। তাইহোকু হাসপাতালে যে দু'জন ডাক্তার নেতাজীর চিকিৎসা করেছিলেন, তাঁদের অন্যতম ডাঃ ইয়োশিমির বিবৃতিতেও এই সংবাদ সমর্থিত হয়।

যুদ্ধ তখন শেষ হয়েছে। জাপান, বিশেষ করে টোকিও শহর বোমায় বিধ্বস্ত। পঁয়তাল্লিশ সালের সেপ্টেম্বর মাস। একদিন মাইহোজি মন্দিরের পূজারী এলেন মোচিজুকির সঙ্গে দেখা করতে। মোচিজুকি তখন ছিলেন রেনকোজি মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক। পূজারী এসে মোচিজুকিকে বললেন, আজাদ হিন্দ্ সরকারের সর্বাধিনায়ক, ভারতীয় নেতা সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্য তিনি একটি পারলৌকিক অনুষ্ঠান করতে রাজি হবেন কিনা? তখন আমেরিকান অকুপেশন ফোর্স জাপানে নেমে পড়েছে। বড় কোনো মন্দিরে অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয়। কেউ রাজিও হবে না। খুব বেশি আড়ম্বর না করে, একটু গোপনে এই অনুষ্ঠান করা প্রয়োজন।

মোচিজুকি নিজে লিখেছেন, 'আমি ভাবলাম, প্রয়াত মানুষের জন্য কোনো সীমারেখা নেই আর তা ছাড়া এই ধরনের কাজ করা একজন বৌদ্ধ পুরোহিতের অবশ্য কর্তব্য। মোচিজুকির কথা মতো দিনটি ধার্য হল আঠারোই সেপ্টেম্বর। প্রায় একশোজন মানুষ উপস্থিত হল রেনকোজির মন্দিরে। সেপ্টেম্বর মাসের আট তারিখ থেকে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের সভাপতি রামমূর্তির বাড়িতে ছিল নেতাজীর ভস্মাধার। ওই বাড়িতেই সে-সময় লীগের অফিসের কাজও চলত। আনন্দমোহন সহায়ের স্ত্রীর অনুরোধে একদিনের জন্য ওঁদের বাড়িতেও নিয়ে রাখা হয় এই ভস্মাধারটি। আজাদ হিন্দ্ সরকারের প্রচার সচিব আয়ার তখন রয়েছেন সেই বাড়িতে। সেপ্টেম্বরের আট তারিখ থেকে আঠারোই পর্যন্ত দশ দিন টোকিও ক্যাডেটের দল এই আধারের অতন্দ্র প্রহরায় থেকেছে। টোকিও মিলিটারী একাডেমীর ছাত্র এইসব কিশোর ছিল নেতাজীর একান্ত স্নেহভাজন। সিঙ্গাপুর, কুয়ালালামপুর ও রেঙ্গুনে এরা যখন স্কুলের শেষ ধাপে, কেউ কেউ সবে স্কুলের চৌকাঠ ডিঙিয়েছে, তখন নেতাজী নিজে এদের বাছাই করে মিলিটারী একাডেমীতে ট্রেনিংয়ের জন্য পাঠান। দশজন যায় এয়ারফোর্স ট্রেনিংয়ে আর চৌত্রিশজন আর্মি ট্রেনিংয়ে। এরা 'টোকিও বয়েজ' নামে পরিচিত ছিল। নেতাজী ওদের একবার চিঠি লিখেছিলেন, 'আমার নিজের কোনো ছেলে নেই, তোমরা আমাব ছেলের মতো।' এইসব ছেলেরা পালা করে বাত্রিদিন নেতাজীব ভস্মাধারটি পাহারা দিয়েছে।

তারপর আঠারোই সেপ্টেম্বর সকালে শ্রীমতী সহায়ের বাড়ি থেকে শোভাযাত্রা রওনা হল রেনকোজি মন্দিরের দিকে। বয়সে সব থেকে ছোট ক্যাডেট ভিরিককে বেছে নেওয়া হয়। তার গলা থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় কাঠের আধারটি। সঙ্গে হেঁটে চলে বাকিসব টোকিও ক্যাডেট, শ্রীমতী সহায়, রামমূর্তি, আয়ার ও অন্যান্যরা। হবিবুর রহমানের সেইদিনই ডাক পড়ে আমেরিকান হেডকোয়ার্টার্সে। তাই উনি থাকতে পারেননি। দশ পনেরো জন জাপানী পদস্থ অফিসার ছিলেন। জাপান সরকারের পক্ষে ছিলেন লেঃ জেনারেল টাকাকুরা। প্রায় দু'মাইল হেঁটে মিছিল এসে পৌঁছয় রেনকোজিতে।

আরো পাঁচজন পুরোহিতকে সঙ্গে নিয়ে মোচিজুকি অনুষ্ঠান পরিচালন করলেন। ঘন্টাখানেক ধরে পুজো-পাঠ চলে। রামমূর্তি পুজোর শেষে পুরোহিতদের দক্ষিণা দেন। কাগজে মোড়া ছিল সেই ইয়েন বা জাপানী মুদ্রা। শ্রীমতী সহায়, রামমূর্তি ও একজন জাপানী অফিসার মোচিজুকিকে অনুরোধ করলেন, যতদিন অন্য ব্যবস্থা করা না যাচ্ছে, ততদিন উনি যদি এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নেন তাহলে বড় ভাল হয়। মোচিজুকি সম্মত হলেন।

ভস্মাধার ছাড়াও আরও একটি মূল্যবান আধার নেতাজীর স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এই সম্পর্কে জাপানী অফিসার হায়াশিদার বিবৃতি উদ্ধৃতি করা যেতে পারে, 'তাইপে— তখন বলা হত তাইহোকু। ... তারিখটি ছিল ৫ সেপ্টেম্বর। হবিবুর ও সাকাই দু'জনেই বিমান দুর্ঘটনায় আহত। সম্পূর্ণ সুস্থ নন, হাতে ও মুখে ব্যাণ্ডেজ। গলা থেকে উত্তরীয় ঝুলিয়ে তাতে আমি বহন করলাম পবিত্র আধার। আমাদের সঙ্গে দু'টি কাঠের বাক্স ছিল। আমাকে বলা হয় ছোট বাক্সতে আছে ভস্মাধার। আর বড় বাক্সতে আছে নেতাজীর "ট্রেজার"। বিমান দুর্ঘটনার পর বিমান বন্দরে কুড়িয়ে পাওয়া গেল আধপোড়া স্বর্ণ-অলঙ্কার, হীরে-জহরৎ। পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় মেয়েরা একদা এসব দান করেছিলেন নেতাজীর যুদ্ধভাণ্ডারে।' হায়াশিদা ওই বাক্স দু'টি নিয়ে ট্রেনে চড়ে টোকিওর ইম্পিরিয়াল জেনারেল হেডকোয়ার্টার্সে পৌঁছে ডিউটি অফিসার মেজর কিনোশিটাকে বাক্স দু'টি বুঝিয়ে দেন এবং পরদিন সকালে কিনোশিটা লেঃ জেনারেল টাকাকুরার হাতে বাক্স দু'টি জমা দেন। টাকাকুরা অন্য অফিসারদের ডেকে পাঠালে তাঁরা সকলে নীরবে নতমস্তকে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন নেতাজীর স্মৃতির উদ্দেশে।

সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর হাতে জাপানের সব থেকে শক্তিশালী কোয়াংটুং বাহিনী সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হওয়ার পরেও, জাপান যখন সম্পূর্ণ পরাজয়ের মুখে তখন হঠাৎ মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানের নির্দেশে হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে বীভৎস হত্যাকাণ্ড ঘটে, যুদ্ধ জয়ের পক্ষে যে কাজ ছিল সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। এর সঙ্গে সঙ্গেই সূচনা হয় পারমাণবিক যুগের। ওই আনবিক বোমা পতনের পরেই স্থিরীকৃত হয়ে যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিণতি। একদিকে জাপানের আত্মসমর্পণ, অন্যদিকে রণাঙ্গনে নেতাজীর অনুপস্থিতি আজাদ হিন্দ ফৌজের সামনে সংকটজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে।

তবু আজাদ হিন্দ্ ফৌজ তাদের 'দিল্লী চলো' অভিযান অব্যাহত রাখে। ইম্ফলের মধ্য দিয়ে তারা পশ্চিম দিকে এগোতে থাকে। ঈম্ফল উপত্যকায় এক ধরনের ভয়াবহ সৌন্দর্য আছে। এখানকার চারপাশের পাহাড় গভীর অরণ্যে ঘেরা। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের দখলে তখন একটিও বিমান নেই। বিপর্যস্ত সাপ্লাই লাইনের ফলে দিনের পর দিন সৈন্যরা এক ধরনের ঘাস সিদ্ধ খেয়ে-খেয়ে পুষ্টির অভাবে ভুগছিলেন। এর সঙ্গে ছিল ঘন বর্ষার দাপট। ম্যালেরিয়া ও জোঁকের উপদ্রব। জোঁকের কামড় থেকে 'নাগা সোর' বা 'নাগা ক্ষত' বলে এক ধরনের অসুখ দেখা দিল। এই অসুখে শরীরে ফোস্কা পড়ে যেত।

আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত দুর্ধর্ষ ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজের মোকাবিলা করা তখন আর কিছুতেই সম্ভব নয়। এমন কি পশ্চাদপসরণ করতে করতে ক্ষুধা তৃষ্ণা ও ব্যাধিতে সৈন্যরা ঢলে পড়তে লাগলেন। অবশ্য, এত দুঃখ কষ্ট সত্ত্বেও পশ্চাদপসরণের আদেশ যখন এসেছিল তখন আজাদ হিন্দ্ ফৌজ এবং জাপানী সেনাবাহিনী ওই আদেশ মানতে চাননি। ফিফটিনথ্ আর্মির ভারপ্রাপ্ত মুতাগুচি তাঁর অফিসারদের ডেকে বললেন, 'গোলাবারুদ নেই তো হয়েছে কি? গোলাবারুদ ফুরিয়ে গেলে শুধু বেয়নেট ব্যবহার করতে হবে। বেয়নেট না থাকলে খালি হাতে লড়তে হবে, হাত যদি না থাকে পা চালাতে হবে, লাথি তো মারতে পারবে— ঈশ্বর জাপানকে রক্ষা করবেন, জাপানের পরাজয় হতেই পারে না।' জাপানের সেনাধ্যক্ষ ফুজিয়ারার মনে হয়েছিল, বেপরোয়া মুতাগুচি এক সময় আত্মহননের কথাও চিন্তা করেছিলেন।

সামরিক আদালতে আই. এন. এ. অফিসারদের বিচার

জাপানের পরাজয়ের পর ভারতের মাটিতে আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর 'দিল্লী চলো' অভিযান পরাস্ত হল এবং ওই ফৌজের অফিসার ও সৈন্যরা ব্রিটিশ-বাহিনীর হাতে বন্দী হন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের এমনই ঔদ্ধত্য যে তারা সামরিক আদালতে ধীলন, শাহনওয়াজ এবং সায়গল এই তিন আই.এন. এ. অফিসারের বিচারের ব্যবস্থা করে। এর প্রতিবাদে সেদিন গর্জে উঠেছিল গোটা ভারতবর্ষ। এই তিনি অফিসারের পক্ষে আদালতে সওয়াল করতে আসেন কৈলাসনাথ কাটজু, তেজবাহাদুর সপ্রু ও জবাহরলাল

নেহরু। একুশে নভেম্বর অবিলম্বে আই. এন. এ. বন্দীদের মুক্তির দাবিতে কলকাতার ধর্মতলা স্ট্রীটে ডালহৌসী স্কোয়ারে যাবার পথে ছাত্র মিছিলের উপর গুলি চলে। গুলিতে নিহত হন রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। মিছিল তবু ছত্রভঙ্গ হয়নি। পরদিন সর্বাত্মক সাধারণ ধর্মঘট ও হরতালে কলকাতার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অচল হয়ে পড়ে। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের পতাকার সঙ্গে লাল ঝাণ্ডা একত্রে ওড়ে মানুষের হাতে। পঁয়তাল্লিশ সালের ওই দিন ধর্মতলা স্ট্রীটে সারারাত ছাত্রদের সঙ্গে ছিলেন প্রবীন কংগ্রেস নেত্রী জোতির্ময়ী গাঙ্গুলী। পরদিন ভোরে এক দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়।

রশিদ আলি দিবস

পঁয়তাল্লিশ সালের পয়লা ডিসেম্বর ভারতের প্রধান সেনাপতি স্যার ক্লড অকিনলেক লেখেন, 'সামনের বসন্তকালে ভারতে সংগঠিত বিপ্লবের সম্মুখীন হওয়ার জন্য আমাদের তৈরি থাকতে হবে। যে গণ-বিদ্রোহ হতে পারে তা ১৯৪২ সালের আগস্টের চেয়ে ব্যাপকতর হবে উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও বাংলাদেশে।'

ছেচল্লিশ সালের দশই ফেব্রুয়ারী লালকেল্লাতে শুরু হল আই. এন. এ.-র ক্যাপ্টেন রশিদ আলির বিচার। খবর ছড়িয়ে পড়ামাত্র ছাত্ররা ধর্মঘট ডাকলেন কলকাতায় এবং হাজারে হাজারে লোক এগিয়ে এল ডালহৌসী এলাকার নিষিদ্ধ অঞ্চলে। পুলিশ বাহিনী শুরু করল নৃশংস লাঠি-চালনা।

এগারোই ও বারোই ফেব্রুয়ারীতে চলে কলকাতার শহরতলীতে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত অভিযান ও আন্দোলন। ট্রাম বাস থেকে শুরু করে সবরকম পরিবহনের চলাচল বন্ধ, বিক্ষুব্ধ জনতা জ্বালিয়ে দিল সামরিক বাহিনীর গাড়ি। পুলিশ ও মিলিটারীর সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান ছাত্র ও বস্তীর নওজোয়ানদেব সংঘর্ষে শহীদ হলেন বারোজন সংগ্রামী তরুণ। সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিল কমিউনিস্ট পার্টি ও শ্রমিক ইউনিয়নগুলো সম্মিলিতভাবে।

বারোই ফেব্রুয়ারী ওয়েলিংটন স্কোয়াবের বিপুল সমাবেশ থেকে মিছিল সোবাবর্দী ও গান্ধীবাদী নেতা সতীশ দাশগুপ্তের নেতৃত্বে ডালহৌসী স্কোয়ারের নিষিদ্ধ অঞ্চল পেরিয়ে এগিয়ে গেল। পুলিশ কমিশনার তাঁর গোপন রিপোর্টে লিখলেন, 'এ বিক্ষোভে সবচেয়ে বিপজ্জনক সংগঠনেব ভূমিকা নিয়েছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি।.... এদেব লক্ষ্য সশস্ত্র বিপ্লব।'

আই. এন. এ. বন্দী মুক্তির দাবিতে দেশের মানুষ, বিশেষ কবে কলকাতার ছাত্র সমাজ যে প্রচণ্ড হৃদয়াবেগে জ্বলে উঠেছিলেন সেদিন তা প্রকাশ পেয়েছিল সুকান্তের কবিতায়, 'বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে/আমি যাই তারই দিন-পঞ্জিকা লিখে।'

নৌ-বিদ্রোহ

বোম্বাই ও করাচীর ভারতীয় নৌ-সেনাবা আঠাবোই ফেব্রুয়ারী বিদ্রোহ শুরু করেন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। 'হিন্দুস্তান', 'তলোয়ার' ও 'চমক' যুদ্ধ জাহাজে, ক্যাসেল ব্যারাকে সর্বত্রই তাঁরা ইউনিয়ন জ্যাক ছিঁড়ে ফেলে মাস্তুলে ওড়ালেন স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐক্যের তিন রঙা পতাকা। বিদ্রোহের সমর্থনে সারা দেশের মানুষ এগিয়ে আসেন। একে পরিপূর্ণ সমর্থন জানায় কমিউনিস্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক, আর. এস. পি. ও আর. সি. পি. আই.-এর মতো বামপন্থী দলগুলো আর আগস্ট বিপ্লবের অন্যতম নেত্রী অরুণা আসফ আলি। ভারতের শ্রমিক, মেহনতী মানুষ ও ছাত্রসমাজও বিপুলভাবে এই আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানান। বোম্বাই-এ নৌ-বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি ও অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয়। বোম্বাইয়ের পঁয়ত্রিশ লক্ষ শ্রমিক তাতে সাড়া দিয়ে সাধারণ ধর্মঘট করেন।

অন্যদিকে সরকার কোর্ট মার্শাল জারী করে শহরকে তুলে দেয় ব্রিটিশ সৈন্যদের হাতে। সাধারণ ধর্মঘট ভাঙার জন্য ব্রিটিশ সৈন্য বোম্বাইয়ে ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ি থেকে মেশিনগান চালায়। দু'দিনে

মিলিটারির গুলিতে নিহত হন পাঁচশো'র বেশী মানুষ। শহীদদের মধ্যে ছিলেন কমিউনিস্ট নেত্রী কমল দোন্দে। অসম সাহসিক যুদ্ধ চালিয়ে তেইশে এপ্রিল কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে তাঁরা আত্মসমর্পণ করেন কর্তৃপক্ষের কাছে নয়, ভারতবর্ষের জনসাধারণের কাছে।

ত্রিবাঙ্কুরে পুন্নাপ্রা-ভায়লারের গণ-অভ্যুত্থান

ছেচল্লিশ সালের মাঝামাঝি ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে দুর্ভিক্ষের সংকট ঘনিয়ে এলে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে ভাইকমে একটি ভুখা মিছিল সংঘটিত হয়। এই সময়ে তারই কাছাকাছি আলেপ্পি শহরে ট্রেড ইউনিয়ন নেতা টি.ভি. টমাস শ্রমিক বিক্ষোভ পরিচালনা করছিলেন। তাঁদের উপর প্রচণ্ড দমননীতি চালাচ্ছিলেন স্বৈরাচারী দেওয়ান, সি. পি. রামস্বামী আইয়ার। সমগ্র কেরালায় কমিউনিস্ট পার্টি স্থির করল যে আলেপ্পির শ্রমিক এবং দুর্ভিক্ষ-পীড়িত এলাকার কৃষক গোটা রাজ্যে স্বৈরাচার শাসনের বিরুদ্ধে সাধারণ ধর্মঘট করবে। কাছেই সমুদ্র তীরে ছিল পুন্নাপ্রা ও ভায়লার গ্রামে কমিউনিস্টদের শক্ত ঘাঁটি। সেখানে সংগ্রামী শ্রমিক কৃষক তরুণদের দুটি শিবির স্থাপিত হয়েছিল। ছেচল্লিশ সালের অক্টোবরে সেখানে সংগ্রামে নেতৃত্ব দানের জন্য উপস্থিত হলেন কে. সি. জর্জ ও টি.ভি. টমাস। বাইশে অক্টোবর ডাক দেওয়া হয় সাধারণ ধর্মঘট। সঙ্গে সঙ্গে সি.পি. রামস্বামী আইয়ার বেআইনী ঘোষণা করলেন কমিউনিস্ট পার্টি, নারকেল ছোবড়া শ্রমিক ইউনিয়ন ও জেলেদের সংগঠনকে, আর শুরু হল গ্রেপ্তার ও পুলিশী তাণ্ডব।

চব্বিশে অক্টোবর সাধারণ ধর্মঘটের পাশাপাশি আরম্ভ হল পুন্নাপ্রার পুলিশ শিবির ও অত্যাচারী এক জমিদারের বাড়ির উপর গণ-অভিযান। পুলিশের গুলি বর্ষণে প্রাণ হারালেন দশজন শ্রমিক কিন্তু অন্য পক্ষে পুলিশ দারোগাও। শেষ পর্যন্ত দখল হল জমিদারের বাড়ি আর বন্দী হল পুলিশ ঘাঁটি থেকে যে পুলিশেরা সেখানে আশ্রয় নিয়েছিল, তারা।

ছাব্বিশে অক্টোবরে রামস্বামী আইয়ারের সেনাবাহিনী ভায়লারে ঢোকার চেষ্টা করল কিন্তু তাদের প্রতিহত করল গণ সংগ্রামীরা। অবশেষে সাতাশে অক্টোবর ভোর রাত্রে অন্ধকার ও কুয়াশার সুযোগ নিয়ে মোটর লঞ্চে পাঁচশো পদাতিক সৈন্য ভায়লারে ঢুকে হানা দিল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর ঘাঁটিতে। তারপরে সেখানে অনুষ্ঠিত হল ত্রিবাঙ্কুরের জালিয়ানওয়ালাবাগ। পাঁচশো সুশিক্ষিত সৈনিকের রাইফেল ও মেশিনগানের গুলিতে নিহত হলেন পাঁচশোর বেশি কৃষক ও শ্রমিক। রক্তবন্যার মধ্যে রামস্বামী আইয়ার সামায়িকভাবে দমন করলেন পুন্নাপ্রা ও ভায়লারের গণ-অভ্যুত্থান। তবু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হল ত্রিবাঙ্কুরকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার চক্রান্ত। ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন ও মালাবারকে একত্র করে গঠিত হল কেরল রাজ্য।

মহারাষ্ট্রের ওরলি আদিবাসী অভ্যুত্থান

বোম্বাই শহর থেকে মাত্র পঞ্চাশ মাইল দূরে মহারাষ্ট্রের থানে জেলায় বসবাস করতেন জমিদারের শোষণে ভূমিহীন আড়াই লক্ষ দিনমজুর। তাঁদের অবস্থা ছিল ক্রীতদাসের মতো। এঁদের মধ্যে সমাজ সেবার কাজ করতে যান একদা 'সারভেন্টস্ অফ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র কর্মী-দম্পতি, শ্যামরাও ও গোদাবরী পারুলেকর। সেখানে তাঁদের অভিজ্ঞতা চল্লিশের দশকের সূচনা থেকেই। দেখতে দেখতে তাঁরা হয়ে উঠেন লক্ষ লক্ষ ওরলিদের জীবনের একমাত্র আশ্রয়স্থল। গোদাবরী হয়ে ওঠেন তাঁদের সকলেরই প্রিয় 'তাই' অর্থাৎ দিদি।

পারুলেকররা প্রথম যখন সেখানে যান তখন সেখানে চালু ছিল মধ্যযুগীয় প্রথা। বেগার শ্রম, কথায় কথায় দৈহিক পীড়ন, নারী ধর্ষণ, ও নরহত্যা। এঁরা দু'তিন বছর কাজ করার ফলে পঁয়তাল্লিশ সালের জানুয়ারী মাসে প্রাদেশিক কিষাণ সম্মেলনে সাহস করে যোগ দিলেন আড়াইশো জন ওরলি। ওই বছরই তেইশে মে শপথ নিলেন পাঁচ হাজার আদিবাসী এই মর্মে যে তাঁরা বিনা মজুরিতে জমিদার বা ঠিকাদারের

কাজ করবেন না। তাঁরা দলে দলে সভা, সম্মেলন, মিছিল করে শেষ পর্যন্ত অবসান ঘটালেন বেগারি প্রথা ও অর্ধ দাসত্বের। ভালওয়াবা গ্রামে বিরাট পুলিশ বাহিনী পঁয়তাল্লিশ সালের দশই অক্টোবর বিনা প্ররোচনায় বেপরোয়া গুলি চালায় এক ওরলি সমাবেশের উপর। তাতে শহীদ হলেন পাঁচ জন আদিবাসী। সরকারী নির্দেশে থানে জেলা থেকে বহিষ্কৃত হলেন পারুলেকররা। তবু শেষ অবধি জমিদার ঠিকাদার ও ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটকে মানতে হল কিষাণ সভার দাবি।

ধর্মঘট ও হরতালের খতিয়ান

ছেচল্লিশ সালের ঊনত্রিশে জুলাই ডাক ও তার বিভাগের কর্মচারীদের ভারতব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে কলকাতায় যে অভূতপূর্ব সর্বাত্মক ধর্মঘট ও হরতাল হয় তাতে যোগ দেন যোলো লক্ষ ছোট বড় কারখানা শ্রমিক, অফিস কর্মচারী, স্কুল কলেজের ছাত্র ও সাধারণ নাগরিক। এমন কি, কলকাতার বেতার কেন্দ্রটিকেও সম্পূর্ণ অবরোধ করে রাখেন ছাত্রী ও মহিলারা। প্রথম-প্রথম কিছু পুলিশ দেখা গেলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে লক্ষ লক্ষ মানুষ রাস্তায় বেরিয়ে আসার ফলে রাজপথ থেকে পুলিশ ও মিলিটারি সরিয়ে নেওয়া হয়। ছেচল্লিশ সালে ডাক, তার, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কসহ ধর্মঘটের সংখ্যা পূর্বের সমস্ত মাত্রা ছাপিয়ে যায়। ওই বছরের সংঘটিত এক হাজার ছ'শো ঊনত্রিশটি ধর্মঘটে ধর্মঘটীর সংখ্যা দাঁড়ায় ঊনিশ লক্ষ একচল্লিশ হাজার সাতশো আটচল্লিশ জন।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

ঊনত্রিশে জুলাইয়ের অভূতপূর্ব সর্বাত্মক ধর্মঘট ও হরতালের মাত্র আঠারো দিন পরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আঘাত হানল প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সাহায্যে। ষোলোই আগস্ট মুসলীম লীগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' পালনের দিনে কলকাতায় শুরু হল যে মারাত্মক হত্যাকাণ্ড তাতে প্রাণ হারালেন প্রায় পাঁচ হাজার হিন্দু-মুসলমান নাগরিক ও আহত হলেন প্রায় পনেরো হাজার মানুষ। পঁয়তাল্লিশ সালের নভেম্বর অথবা ছেচল্লিশ সালের ফেব্রুয়ারীতে একেবারে গোড়া থেকেই যেমন সৈন্যবাহিনী নামানো হয়েছিল এবারে তা করা হল না—সৈন্যবাহিনী রাজপথে নামল চব্বিশ ঘন্টা পরে যখন হত্যাকাণ্ড ছড়িয়ে পড়েছে সারা শহর ও শহরতলীতে।' 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকা দুটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে এব নাম দিয়েছিল 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং'।

আর তারপর প্রতিহিংসার নামে একের পর এক অনুষ্ঠিত হল নোয়াখালি, বিহার, গড়মুক্তেশ্বর (উত্তরপ্রদেশ) ও পাঞ্জাবের ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড।

সেই দুর্যোগের দিনে, উক্ত সাম্প্রদায়িক হানাহানির বিষাক্ত আবহাওয়ায় যখন সারাদেশ আচ্ছন্ন তখন সেই দাঙ্গা প্রশমন ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য যাঁরা প্রাণপাত চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে গান্ধীজীর নাম নিশ্চয়ই সর্বাগ্রগণ্য। কলকাতা, নোয়াখালি, বিহার, পাঞ্জাব—দেশেব এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে তিনি অক্লান্তভাবে ছুটে গেছেন তারই জন্য আর ওই অবস্থায় একটি মানুষের পক্ষে যা করা সম্ভব তা' করেছেন প্রাণপণে।

নোয়াখালিতে বাঁশের সেতুর উপর তাঁর একক যাত্রার ছবিটি দেশব্যাপী সেই উন্মত্ততার মুহূর্তে তাঁর নিঃসঙ্গতারই যেন প্রতীক। আর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধ করতে গিয়ে যাঁরা সেদিন মৃত্যুবরণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল ও জালালাবাদ সংগ্রামের বীর বিপ্লবী লালমোহন সেন, স্মৃতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীল দাশগুপ্ত, শচীন মিত্র, ননী সেন। কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ছেচল্লিশ সালের শেষ দিকে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রেরা সম্মিলিতভাবে মিছিল বার করার চেষ্টা করেন। অনেক সময় তার উপরে সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা আক্রমণ করে। তা সত্ত্বেও জীবনপণ করে সেদিন তাঁরা কিছু মিছিল সংগঠিত করেন।

ছেচল্লিশ সালে ঠিক পুজোর আগে দাঙ্গার বিরুদ্ধে প্রগতি লেখক সংঘ, কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ, গণনাট্য সংঘ এবং আর্টিস্ট এ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে কলকাতার রাজপথে লেখক ও শিল্পীদের এক যৌথ মিছিল বের হয়। ওই মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সবিতাব্রত দত্ত, সুধী প্রধান, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, সুচিত্রা মিত্র, দেবব্রত বিশ্বাস, জ্যোতির্ময় রায়, দ্বিজেন চৌধুরী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রেক্ষাপট

সাঁইত্রিশ সালে ব্রিটিশ সরকারের প্রস্তাবিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ফলে যেটুকু অধিকার পাওয়া যাবে, মুসলীম লীগ তাতে প্রলুব্ধ হল এবং কংগ্রেস প্রাথমিক দ্বিধা কাটিয়ে লর্ড লিনলিথগোর আশ্বাসের উপর ভরসা করে প্রাদেশিক মন্ত্রীসভায় প্রবেশে রাজি হল। কিন্তু পরের বছরে উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদানের টালবাহানায় অবস্থা জটিলতর হলেও ওই পরিস্থিতি সাময়িকভাবে সামলে নেওয়া গেল।

বিয়াল্লিশ সালের 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সমস্ত প্রদেশ থেকে কংগ্রেসী মন্ত্রীরা পদত্যাগ করলে ব্রিটিশ সরকার প্রত্যেকটি প্রদেশে রাজ্যপালের শাসন চালু করল। মহম্মদ আলি জিন্না বরাবরই বলে আসছিলেন, কংগ্রেসী মন্ত্রীদের মনোভাব সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুষ্ট। ওঁদের সঙ্গে মন্ত্রীসভায় একসঙ্গে কাজ করা যায় না। যদিও তাঁর এই মনোভাবের স্বপক্ষে তিনি কোনো তথ্য দিতে পারেন নি, কিন্তু কংগ্রেসী মন্ত্রীরা পদত্যাগ করলে তিনি লীগ-মন্ত্রীদের ওই দিনটি 'মুক্তি দিবস' হিসেবে পালনের নির্দেশ দেন।

যাই হোক, যখন এই রকম একটা জটিলতা চলতে থাকল তখন লর্ড লিনলিথগো পুনরায় প্রস্তাব দিলেন, ব্যবস্থা-পরিষদকে সম্প্রসারিত করা হবে এবং যুদ্ধ বিষয়ক পরামর্শদাতা পর্ষৎ গঠন করা হবে কিন্তু কংগ্রেস এই প্রস্তাবে কানই দিল না।

কংগ্রেস পদত্যাগ করলে অনেক প্রাদেশিক মন্ত্রীসভায় মুসলীম লীগের সদস্য ঢুকে পড়লেন। চল্লিশ সালের লাহোর অধিবেশনে মুসলীম লীগ মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থে ভারত-বিভাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এই ব্যাপারে লর্ড লিনলিথগো জিন্নাকে ব্রিটিশ সরকারের বিভেদ-নীতি অনুসারে প্রশ্রয় দিতে থাকলেন।

বিয়াল্লিশ সালের প্রথম দিকে বিশ্বযুদ্ধে জাপানের বিস্ময়কর অগ্রগতিতে বিমূঢ় হয়ে সরকার কংগ্রেসের সঙ্গে একটা গুরুত্বপূর্ণ বোঝাপড়া চাইছিলেন। এই আশায় বিলেত থেকে এল স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স্ মিশন কিন্তু সেই মিশন মূলত বার্থ হল লর্ড লিনলিথগো ও কয়েকজন উচ্চপদস্থ আমলার সড়যন্ত্রে। সরকার বুঝতে পারছিল তারা জাপানের হাত থেকে বার্মাকে রক্ষা করতে পারেনি, তারা তেতাল্লিশের মন্বন্তরকে ঠেকাতে পারেনি এবং স্বাধীনতাকামী চল্লিশ কোটি মানুষের আকাঙক্ষাকে আর দাবিয়ে রাখা সম্ভব নয়। সম্ভবত এই কারণে, শ্রমিকদলের সরকারের প্রধান হিসেবে এ্যাটলি তখন ভারতীয় জনগণের স্বার্থবিরোধী কোনো কাজ করা উচিত নয়—এই মন্তব্য করলেন এবং তাঁর বক্তব্যে মুসলীম লীগের প্রতি পৃষ্ঠপোষণার বিন্দুমাত্র ইঙ্গিত ছিল না।

ছেচল্লিশ সালের তেইশে মার্চ লর্ড পেথিক লরেন্স, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস এবং এ. ভি. আলেকজাণ্ডার করাচী বিমানবন্দরে এসে পৌঁছলেন। বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের কাছে ওঁরা বললেন, ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে লর্ড ওয়াভেলের সঙ্গে সহমত হয়ে ওঁরা ভারতীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলতে এসেছেন। দু'দিন পরে দিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে লর্ড পেথিক-লরেন্স পুনরায় এই একই কথা বললেন এবং পয়লা এপ্রিল থেকে সতেরোই এপ্রিলের মধ্যে ওঁরা বড়লাট, প্রাদেশিক গভর্নর এবং সকল রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীর সঙ্গে কথা বললেন। মে মাসের দুই থেকে পাঁচ তারিখে সিমলায় কংগ্রেস ও মুসলীম লীগকে নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক বসলেও তা ব্যর্থ হল।

হিন্দু মহাসভার স্মারকলিপিতে দেশ বিভাগের বিরোধিতা করা হয়েছিল। শিখ সম্প্রদায়ের মানুষেরাও দেশ বিভাগ চাইলেন না কিন্তু তাঁরা বললেন, পাঞ্জাব বিধান সভায় তাঁদের আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে দিতে হবে অথবা বর্তমান পাঞ্জাব থেকে এমন একটি অংশকে ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে ভারত সরকারের অধীনে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশের মর্যাদা দিতে হবে যেখানে সকল প্রধান গুরুদ্বারগুলো অবস্থিত আছে এবং যেখানে পাঞ্জাবীরাই সংখ্যাগুরু। কমিউনিস্ট পার্টির স্মারকলিপিতে দাবি করা হল ভাষাভিত্তিক এবং সাংস্কৃতিক পুনর্গঠন করে প্রত্যেকটি প্রদেশকে স্বাধীনতা দিতে হবে যাতে তারা নিজেরা সিদ্ধান্ত নেবে ভারতীয় ইউনিয়নে থাকবে, না, পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্র অথবা একটি স্বতন্ত্র ভারতীয় ইউনিয়ন গড়ে তুলবে। অবশ্য কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকে এই ধরনের প্রস্তাব দিলেও তাঁরা চেয়েছিলেন, সকলের সহযোগিতায় দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য এবং স্বাধীনতা ও সার্বিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার স্বার্থে সকলকে ঐক্যবদ্ধ ভারতীয় রাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত। ক্যাবিনেট মিশনের ধারণা হল, একমাত্র মুসলীম লীগ ছাড়া, সব রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠী স্বাধীন ভারতকে ঐক্যবদ্ধ দেখতে চায়। সতেরোই মে তারিখে লর্ড ওয়াভেলের বেতার ভাষণেও এই অভিমত প্রতিফলিত হল। কিন্তু বাইশে মে তারিখে জিন্না যে বিবৃতি দিলেন তাতে পাকিস্তান প্রাপ্তির কোনো সঙ্গত দাবি তিনি উত্থাপন করতে পারলেন না।

এদিকে নতুন উপদ্রব দেখা দিল শিখদের নিয়ে। লর্ড পেথিক-লরেন্সকে পঁচিশে মে তারিখে একটি চিঠি লিখে মাস্টার তারা সিং জানতে চাইলেন, ওঁরা হিন্দু ও মুসলমানদের মতো ন্যায্য বিচার পাবেন কিনা। যদি ওঁদের দাবি অনুযায়ী ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মিশন কাজ না করে, তা হলে ওঁরা 'কঠোর সংগ্রামে' প্রবৃত্ত হবেন। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের স্বার্থ উপেক্ষা করা হচ্ছে বলে ওই সম্প্রদায়ের মানুষেরাও বিক্ষোভ দেখাতে থাকলেন।

শেষ পর্যন্ত এই বিবদমান দল ও গোষ্ঠী তাদের নিজস্ব পরিস্থিতির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী অন্তর্বর্তী সরকার গঠনে প্রস্তুত হলেন। ছ'টি প্রদেশে মুসলীম লীগ মন্ত্রীসভায় আসতে পারবে—এই বিবেচনায় জিন্না আপাতত মিশনের প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিলেন। ছাব্বিশে জুন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সিদ্ধান্ত নিল মুক্ত, ঐক্যবদ্ধ ও গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্র রচনা করার স্বার্থে। এই ব্যাপারে তখন মওলানা আজাদ ও জবাহরলাল কংগ্রেসের তরফে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। শিখ সম্প্রদায়ের মানুষেরা শেষ পর্যন্ত ভারত সচিব এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অনুরোধে কংগ্রেস এবং মুসলীম লীগের সঙ্গে এক যোগে কাজ করতে রাজি হলেন।

জুলাই মাসে 'কনষ্টিট্যুয়েন্ট এ্যাসেম্ব্লি'র সংবিধান পরিষদের নির্বাচন হল। এগারোটি গভর্নর শাসিত প্রদেশের দু'শো দশটি 'সাধারণ' আসনের মধ্যে একশো নিরানব্বইটি আসন দখল করল কংগ্রেস, কংগ্রেসের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে পাঞ্জাবের ইউনিয়নিস্ট পার্টি পেল দু'টি আসন, কমিউনিস্ট পার্টি একটি, কংগ্রেস বিরোধী তপশীলী জাতি ফেডারেশন দু'টি এবং বাকি ছটি আসন পেলেন নির্দল সদস্যেরা। মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট আটাত্তরটি আসনের মধ্যে মুসলীম লীগ তিয়াত্তরটি, কংগ্রেস তিনটি, কংগ্রেসের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে পাঞ্জাবের ইউনিয়নিস্ট পার্টি একটি এবং বাংলার কৃষক প্রজা পার্টি পেল একটি। শিখদের জন্য সংরক্ষিত চারটি আসনের মধ্যে কংগ্রেসের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে অকালি পার্টি পেল তিনটি এবং একটি পেলেন একজন কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী। অতএব সভায় মোট দু'শো ছিয়ানব্বই জন সদস্যের মধ্যে কংগ্রেস একাই দু'শো বারো জন সদস্যের আনুগত্য দাবি করতে পারত, লীগের প্রতি সমর্থন ছিল তিয়াত্তর জনের এবং বাকি এগারো জনের মধ্যেও ছ'জনের সুস্পষ্ট সমর্থন ছিল কংগ্রেসের প্রতি।

হাউস অব লর্ডসে লর্ড পেথিক-লরেন্স আঠারোই জুলাই যে বিবৃতি দেন, তাতে তিনি স্পষ্টতই কংগ্রেস দলের 'জাতীয় চরিত্র' সম্পর্কে তথ্যনিষ্ঠ বক্তব্য রেখেছিলেন। কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকায় সমাজের সর্বস্তরের মানুষ ছিলেন। বর্ণহিন্দু, তপশীলী জাতি (একত্রিশ জনের মধ্যে ঊনত্রিশ জন ছিলেন

কংগ্রেসপ্রার্থী), আদিবাসী (যেমন, বিহারের দেবেন্দ্রনাথ সামন্ত,) ভারতীয় খ্রীস্টান (যেমন বাংলার ড. হরেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায়), এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান (যেমন, বাংলার ফ্র্যাঙ্ক এ্যান্টনি ও সেন্ট্রাল প্রভিন্সের সি. ই. গিবন), পার্শী (যেমন, বোম্বাইয়ের মিনু মাসানী ও সেন্ট্রাল প্রভিন্সের আর. কে সিদ্ধা — অর্থাৎ সমাজের সর্বস্তরের মানুষ কংগ্রেসে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। এমন মানুষকেও কংগ্রেস মনোনীত করেছিল যাঁরা কখনও কংগ্রেসকে সেবা করেন নি (যেমন উত্তর প্রদেশের ড. এস. রাধাকৃষ্ণণ এবং মাদ্রাজের স্যার এন. গোপালস্বামী আয়েঙ্গার), এমন কি কংগ্রেসের মনোনীত তালিকায় ছিলেন ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতো কংগ্রেস বিরোধী নেতা যিনি হিন্দু মহাসভার প্রার্থী হয়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু মুসলীম লীগের চরিত্র ছিল কংগ্রেসের সম্পূর্ণ বিপরীত। লীগের গোঁড়া সমর্থক ছাড়া কেউ জিন্নার মনোনীত হন নি। একমাত্র পাকিস্তান-পন্থী মুসলমান ছাড়া আর কোনো দল, গোষ্ঠী বা ব্যক্তি জিন্নাকে সমর্থন না করায় মুসলীম লীগ বস্তুতপক্ষে একটি সাম্প্রদায়িক দল হয়ে দাঁড়াল।

এইরকম একটা কোণঠাসা অবস্থায় পড়ে উনত্রিশে জুলাই মুসলীম লীগ সিদ্ধান্ত নিল ওরা ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা থেকে বেরিয়ে আসবে এবং 'পাকিস্তান অর্জনের লক্ষ্যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে' নামবে। এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে সর্দার প্যাটেল ও জবাহরলাল বিবৃতি দিলে জিন্না বললেন, 'মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের জন্য পাকিস্তান দাবি করা ওঁদের জন্মগত অধিকার'।

পয়লা আগস্টে সর্দার প্যাটেল ঘোষণা করলেন, প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্য মুসলীম লীগ যে হুমকি দিয়েছে, সেটা সরকার বিরোধী আন্দোলনে পরিণত না হয়ে হিন্দু বিরোধী হাঙ্গামায় পর্যবসিত হবে। মাত্র ছ'সপ্তাহ পরে কলকাতায় ইতিহাসের জঘন্যতম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতায় দাঙ্গ া তদন্ত কমিশন এই নারকীয় ঘটনার কারণ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে কিছু না বললেও জিন্না বলেন, এই দাঙ্গা হিন্দুরাই ঘটিয়েছিল। একুশে আগস্ট কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক পি. সি. যোশী বলেছিলেন, মুসলীম লীগ কর্তৃক অনুষ্ঠিত এই দাঙ্গা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের স্পর্শ করেনি, এটা বরং প্রত্যক্ষভাবে হিন্দু বিরোধী সংঘর্ষে রূপান্তরিত হয়েছিল।

অন্তর্বর্তী সরকার

কলকাতায় যখন এইরকম ভয়াবহ পরিস্থিতি, দিল্লীতে তখন লর্ড ওয়াভেল ও জবাহরলাল অন্তর্বর্তী সরকার গঠনে উদ্যোগী হলেন। মুসলীম লীগ তো ইতিমধ্যেই সরকার গঠন থেকে সরে দাঁড়িয়েছিল, তবু জবাহরলাল বোম্বাইতে অবস্থিত জিন্নাকে সহযোগিতার জন্য আবেদন জানালে জিন্না সেই অনুরোধে কর্ণপাত করলেন না। চব্বিশে আগস্ট জাতির উদ্দেশে বেতার ভাষণে লর্ড ওয়াভেল মুসলীম লীগকে বললেন, ওই দল অন্তর্বর্তী সরকারের চোদ্দ জন সদস্যের মধ্যে পাঁচ জনকে পাঠাতে পারেন এবং আশ্বস্ত করলেন, কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ওই দলের অভিমত খারিজ করে দেওয়া হবে না। কিন্তু এবারও জিন্না বেঁকে বসলেন। তিনি তেসরা সেপ্টেম্বর বোম্বাইতে ইউনাইটেড প্রেস অফ আমেরিকার প্রতিনিধির কাছে এক সাক্ষাৎকারে বললেন, বড়লাটের বক্তব্য 'সবচেয়ে অবিজ্ঞজনোচিত ও অরাজনৈতিক সুলভ যা সাংঘাতিক এক গুরুত্বপূর্ণ পরিণতি'র সৃষ্টি করবে এবং 'সরাসরি' পাকিস্তান সৃষ্টি করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই।' শুধু তাই নয়, জিন্না আরও বললেন, পাকিস্তান সৃষ্টি হলে ওঁরা ওখানকার আড়াই কোটি সংখ্যালঘুর স্বার্থ ও নিরাপত্তার ব্যাপারে লক্ষ্য রাখবেন।

যাই হোক, দোসরা সেপ্টেম্বরে জবাহরলালের সহ-সভাপতিত্বে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্বভার গ্রহণ করল। এতে পাঁচজন বর্ণহিন্দু, তিন জন মুসলমান (একজন কংগ্রেস এবং বাকি দু'জন কংগ্রেস বিরোধী ও লীগ বিরোধী), একজন তপশীলী উপজাতিভুক্ত হিন্দু (কংগ্রেস), একজন শিখ (অকালি দল), একজন ভারতীয় ক্রীশ্চান (কংগ্রেস দলভুক্ত নন) এবং একজন পার্শী (কংগ্রেস দলভুক্ত নন) যোগ দিলেন।

জবাহরলাল তাঁর প্রথম সরকারী বেতার ভাষণে সব বিতর্কমূলক বিষয় সমাধানে ঐক্যমতে পৌঁছনোর ব্যাপারে তাঁর আগ্রহের কথা জানান। ওঁর এই ভাষণের উত্তরে জিন্না বললেন, 'আমাকে পিছন থেকে ছুরি মারা হয়েছে, এখন মিষ্টি কথা বলে আঘাতে প্রলেপ দেওয়ার দরকার নেই।'

জিন্না আরও হুমকি দিলেন, দরকার বুঝলে তাঁরা রাশিয়ার সাহায্য নেবেন। সিন্ধু প্রদেশের মুসলীম লীগ সদস্যেরা আটই সেপ্টেম্বরে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে সিদ্ধান্ত নিলেন, তাঁরা রাষ্ট্রসংঘে প্রতিনিধি পাঠিয়ে পাকিস্তানের দাবি তুলবেন। ওঁদের সভাপতি ইউসুফ আবদুল্লা হারুণ তেইশে সেপ্টেম্বরে লণ্ডনে বললেন, তিনি এই দাবিতে প্যারিসে গিয়ে মলোটভের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত বড়লাটের পীড়াপীড়িতে জিন্না তাঁর দলের পাঁচজন প্রতিনিধিকে অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদানের অনুমতি দিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, এই পাঁচজনের মধ্যে একজন হলেন যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। তিনি ছিলেন বাংলার তপশীলী জাতিভুক্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে একজন মন্ত্রী। কিন্তু জিন্না ওঁর নাম নিজের দলভুক্ত প্রতিনিধিদের তালিকায় রেখে মুসলীম লীগকে একটি অসাম্প্রদায়িক দলের চেহারা দিতে চাইলেন। জিন্না যখন বলেছেন, হিন্দু ও মুসলমান দু'টো পৃথক জাতি এখন একজন হরিজনকে মনোনীত করায় গান্ধীজী খুবই বিস্মিত হলেন এবং তাঁর মনে হল হাজার হাজার তপশীলী জাতিভুক্ত মানুষ যখন ঢাকা, নোয়াখালি এবং ত্রিপুরায় মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষেব হাতে তখন লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হচ্ছিলেন, তখন জিন্নার এই সন্দেহজনক কাজটির মুখ্য উদ্দেশ্য হল মন্ত্রীসভায় গিয়ে নতুন কোনো ঝঞ্ঝাট বাধানো।

কংগ্রেস ইতিপূর্বে মুসলীম লীগকে সমগ্র ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে মেনে নেয়নি কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকারে ওই দলের প্রতিনিধিমূলক সদস্যদের অন্তর্ভুক্তির পিছনে হয়তো কোনো একটা গোপন বোঝাপড়া ওয়াভেল ও জবাহরলালের মধ্যে হয়েছিল যেটি অনুমানসাপেক্ষ। এই পবিস্থিতিতে গান্ধীজী শুধু বললেন, 'একটা বোঝাপড়া হয়েছে যে অন্তর্বর্তী সবকাবের সব সদস্যবা যুক্তভাবে ভারতের কল্যাণের জন্য কাজ করবেন এবং কোনো ব্যাপারেই তাঁরা বড়লাটের হস্তক্ষেপ চাইবেন না।' জবাহরলাল গান্ধীজীব এই অভিমত মেনে নিলেন কিন্তু জিন্না এই ফর্মূলা মেনে নিতে রাজি হলেন না।

দিল্লীতে যখন নেতৃবৃন্দের মধ্যে এইসব আলাপ আলোচনা ও মন কষাকষি চলছে তখন কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন ছড়িযে পড়ল পূর্ব বাংলাব ঢাকা, নোয়াখালি ও ত্রিপুরাতে। ঢাকাব মুসলীম লীগ নেতা নিজামুদ্দিন প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন, মুসলীম লীগ অহিংস নীতিতে বিশ্বাস কবে না। নোয়াখালি এবং ত্রিপুরাতে তখন জনসংখ্যার ভিত্তিতে মুসলমান সম্প্রদায়েব মানুষ ছিলেন শতকবা যথাক্রমে ৮১.২ ও ৭৭.১ শতাংশ আর হিন্দু ছিলেন ১৮.৮ ও ২২.৯ শতাংশ। তদানীন্তন কংগ্রেস সভাপতি আচার্য জে. বি. কৃপালনী দাঙ্গাবিধ্বস্ত নোয়াখালি ও ত্রিপুরাতে ব্যাপকভাবে ঘুরে এসে ছাব্বিশে অক্টোবরে কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে ওই দুই জায়গার দাঙ্গাকবলিত চেহারার বিশদ বর্ণনা দিয়ে জানালেন কিভাবে মুসলীম লীগ সরকারের প্রকাশ্য মদতে সংখ্যালঘু হিন্দুরা আক্রান্ত হয়েছে। শুধু হত্যা কবেই সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মানুষেরা ক্ষান্ত হয়নি তারা জোর করে অসংখ্য হিন্দু মহিলাকে বিবাহ করেছে এবং প্রচুর মানুষকে ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য করেছে।

এরপরেই শুরু হল বিহারে হিন্দুদের পালটা আঘাত দেবার পালা। তারা বিহারে কয়েক হাজার মুসলমান নরনারীকে হত্যা করল। এই মর্মান্তিক ঘটনা সম্পর্কে চোদ্দই নভেম্বরে জবাহরলাল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে এক বিবৃতি দিলেন। তিনি বললেন, কলকাতায় নারকীয় দাঙ্গার সময় বিহারের অনেক অধিবাসীকে প্রাণ দিতে হয়েছে, অনেকে রুজি রোজগার ও ভিটেমাটি ছেড়ে বিহারে ফিরে এসেছে। তাদের মুখে দাঙ্গাবিধ্বস্ত কলকাতার লোমহর্ষক কাহিনী শুনে এবং নিজেদের আত্মীয়-স্বজন হারিয়ে অনেকেই বিক্ষুদ্ধ হয় ওঠে। এই সময়ে এল নোয়াখালির পাশবিক অত্যাচারের সংবাদ। বিশেষত, মেয়েদের ধর্ষণ ও গণ-ধর্মান্তরিতকরণের কাহিনীতে মানুষ আর ধৈর্য ধরতে পারেনি।

বিহারের এই দাঙ্গায় সরকার কড়া হাতে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন এবং মাত্র সাতদিনের মধ্যে আগুন নিভে গেল। যেসব গ্রামে দাঙ্গা গুরুতর আকার ধারণ করেছিল, সরকার সেইসব গ্রামের মানুষদের উপর পিটুনি কর আদায় করল। গান্ধিজী হুমকি দিলেন, অবিলম্বে বিহারে দাঙ্গা না থামলে তিনি অনশন শুরু করবেন। জবাহরলালের কড়া নির্দেশে বিহারের কংগ্রেস সরকার খুব দ্রুত দাঙ্গা থামিয়ে দিল এবং জবাহরলালের এই মনোভাবকে প্রশংসা করেছিলেন ব্রিটিশ সংসদে তৎকালীন বিরোধী দলের নেতা স্যার উইনস্টন চার্চিল।

দাঙ্গা পরবর্তী প্রশাসনিক চাপান-উতোর

বিহারের দাঙ্গাকে মুসলীম লীগ নতুনভাবে কাজে লাগাতে চাইল। কলকাতা এবং বিহারের দাঙ্গা নিয়ে জিন্না অনেক কিছু অতিশয়োক্তি করলেন কিন্তু তাঁর বক্তব্যে ঘুণাক্ষরেও পূর্ব বাংলার কথা তুললেন না। অন্তর্বর্তী সরকারের মুসলীম লীগ প্রতিনিধি আবদুর রব নিস্তার তাঁর বক্তব্যে পূর্ব বাংলার দাঙ্গার শোচনীয় পরিস্থিতিকে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব না দিয়ে কেবলমাত্র বিহারের হিন্দুদের বর্বরতা নিয়ে অনেক কিছু বললেন। তাঁর বক্তব্যের প্রতিবাদ করলেন ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ।

অবশেষে বাংলার লীগ মন্ত্রীসভার সুবুদ্ধির উদয় হল। তাঁরা বিহারে একজন আই. সি. এস. অফিসারকে পাঠিয়ে যাঁরা দাঙ্গায় সর্বস্বান্ত হয়ে বাংলা ছেড়ে বিহারে চলে গিয়েছিলেন তাঁদের ফিরিয়ে এনে বাংলার হিন্দু প্রধান জেলাগুলিতে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করলেন। সাতচল্লিশ সালের একত্রিশে জানুয়ারী বাংলার লীগ-মন্ত্রী সভার প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দী করাচীতে বললেন, বিহার থেকে দেড়লক্ষ নর-নারীকে এনে বাংলায় সব রকমের সুযোগ সুবিধাসহ বসবাসের বন্দোবস্ত করে দেওয়া হয়েছে। জিন্না বললেন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থামানোর একমাত্র বিকল্প সমাধান হল লোক-বিনিময় করা এবংএই যুক্তিকে শিরোধার্য করে সিন্ধু প্রদেশের ব্যবস্থা-পরিষদের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সৈয়দ মহম্মদ মীরন শাহ্ যুক্তপ্রদেশের মুসলমানদের তাঁর নিজের রাজ্যে যাবার অনুরোধ নিয়ে এলেন কিন্তু যুক্তপ্রদেশের মুসলীম লীগ সদস্যরা তাতে রাজি হলেন না।

গান্ধীজী আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, অন্তর্বর্তী সরকারে মুসলীম লীগের যোগদান একটা নয়া কৌশল হতে পারে। তাঁর এই আশঙ্কা সত্যে প্রমাণিত হল যখন আমেরিকায় জিন্নার ব্যক্তিগত প্রতিনিধি আটাশে অক্টোবর নিউ ইয়র্কে ঘোষণা করলেন, 'সরকারের ভিতরে ও বাইরে থেকে পাকিস্তান আদায়ের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।' চোদ্দই নভেম্বরে বিদেশী সংবাদদাতাদের কাছে দিল্লীতে জিন্না বললেন, পাকিস্তানের দাবি থেকে তিনি এক চুলও নড়বেন না।

অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে মুসলীম লীগ যুক্ত হওয়ার মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যে ওঁদের অসহযোগিতায় বীতশ্রদ্ধ হলেন জবাহরলাল। সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারে মুসলীম লীগের নেতা লিয়াকৎ আলি খান এক কড়া বিবৃতি দিয়ে জবাহরলালকে সমালোচনা করে বললেন, জবাহরলালের নেতৃত্ব তাঁরা মানেন না। তিনি যদি নিজেকে প্রধানমন্ত্রী পদের সমকক্ষ বলে ভেবে থাকেন, তাহলে তিনি ভুল করেছেন।

জবাহরলাল বাইশে নভেম্বরে একটি বিবৃতিতে বললেন, লিয়াকৎ আলি খানের জানা উচিত, বর্তমান সরকার একটি মন্ত্রীসভার দ্বারা পরিচালিত। তিনি নিজে যার শরিক। অথচ তাঁর মনোভাব যেন ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধির মতো। শিয়া নেতা সৈয়দ আলি জহীরও লিয়াকতের বিরুদ্ধে একই বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করলেন।

জিন্নার আবদার ও ব্রিটিশ সরকার

ছেচল্লিশ সালের নয়ই ডিসেম্বরে আহুত কনস্টিটুয়েন্ট এ্যাসেম্বলিতে জিন্না যোগদান করতে আপত্তি জানালে ব্রিটিশ সরকার লর্ড ওয়াভেল, দু'জন কংগ্রেস প্রতিনিধি, দু'জন লীগ প্রতিনিধি এবং একজন

শিখ প্রতিনিধিকে লণ্ডনে ডেকে পাঠালেন যাতে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে একটি ঐক্যমতের ভিত্তি তৈরি হয়। খান আবদুল গফুর খান বললেন, ব্রিটিশ সরকারের মতলব হল অনির্দিষ্টকালের জন্য কনস্টিট্যুয়েন্ট এ্যাসেম্বলির বৈঠক পিছিয়ে দেওয়া।

— জিন্না

কংগ্রেস এবং শিখ প্রতিনিধিরা প্রথমে লণ্ডনে না যাবার সিদ্ধান্ত করেছিলেন কিন্তু পরে এ্যাটলির ব্যক্তিগত অনুরোধে তাঁরা যেতে সম্মত হন। কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে ওই বৈঠকে যোগদান করেন জবাহরলাল, শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ছিলেন সর্দাব বলদেব সিং। মুসলীম লীগের প্রতিনিধি হিসেবে গেলেন জিন্না ও লিয়াকৎ আলি খান।

সেখানে বিভিন্ন সভায় ও সাংবাদিক সম্মেলনে জবাহরলাল ভারতের অহিংস ও ধর্মনিরপেক্ষ ভাবমূর্তি তুলে ধরে বললেন, ভারতের সমস্যা ভারতকেই সমাধান করতে হবে। যদি কোনো অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বা অন্য কোনো সমস্যা দেখা দেয়, সেগুলো সমাধানের ব্যাপারে ভারতের চল্লিশ কোটি লোককে একযোগে দায়িত্ব নিতে হবে। কিন্তু জিন্না তাঁর পুরোনো গোঁ ধরেই থাকলেন। পাঁচই ডিসেম্বরে হাউস অব কমন্সের দেওয়া নৈশভোজসভায় তিনি বলেই বসলেন, ব্রিটিশ সরকার যদি কংগ্রেসকে কোনো প্রকার বিশেষ অনুগ্রহ দেখায়, তাহলে তাব বিষময় প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে বাধ্য।

জিন্নাব হুমকিতে বড়লাট বিব্রত হয়ে ব্যক্তিগতভাবে চার্চিল এবং আমেরিকার সঙ্গে কথা বললেন এবং ওঁদেব মধ্যে কী কথা হল তা জিন্না ওঁদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ কবে জেনে গেলেন। এরপর হাউস অব কমন্সে চার্চিল ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বিরোধী নেতা হিসেবে দিলেন তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ।

তাঁর আবেগদীপ্ত দীর্ঘ ভাষণে তিনি বললেন, ক্ষমতা হস্তান্তব এখন খুবই জরুরী। কিন্তু ব্রিটিশ সরকাব এই হস্তান্তব কাকে করবে? ভারতেব দু'টি প্রধান সম্প্রদাযের প্রতিনিধিত্বমূলক দু'টি বৃহৎ রাজনৈতিক দলের কাছে শান্তিপূর্ণভাবে এই হস্তান্তর করলে খুব ভালো হয়। ভারতে বিগত নব্বই বছরের রক্তাক্ত সংঘর্ষে যত লোক প্রাণ দিযেছেন তাব চেয়ে অনেক বেশি মানুষ মারা গিয়েছেন জবাহবলালের নেতৃত্বে গঠিত অন্তর্বর্তী সরকাবের বিগত মাত্র চাব মাসেব জমানায়। সরকারী হিসেবে এই সময়ে দশ হাজার লোক নিহত হযেছেন বললেও চার্চিলের ধারণা এর দ্বিগুনেরও বেশি লোক মারা গিয়েছেন। এই অবস্থা আগামী দিনে ভয়াবহ আকার ধারণ করবে। বিহারের পুলিশ যখন উন্মত্ত হিন্দু দাঙ্গাকারীদের নিরস্ত করতে গুলি চালাতে দ্বিধা করেছিল তখন জবাহরলাল স্বয়ং ওদের উপর গুলি চালাতে আদেশ দেন এবং এজন্য চার্চিল সন্তোষ প্রকাশ করেন।

কিন্তু চার্চিলের সন্দেহ আগামী দিনে ভারতবর্ষে বৃহত্তর হিন্দু সম্প্রদায়কে রক্তাক্ত হানাহানি থেকে বিরত করা যাবে না। তিনি আরও বলেন, হিন্দু ও মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক তিক্ততা অনেক শতাব্দী ধরে চলে আসছে। ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কখনও-কখনও ঐক্য দেখা দিলেও আজ যদি ওদের স্বাধীনতা দেওয়া যায় তাহলে ওরা আবার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়বে। মনে রাখতে হবে, ভারতে মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা নয় কোটি এবং বর্ণহিন্দুদের কাছে অস্পৃশ্য মানুষ আছেন প্রায় চাব থেকে ছ'কোটি। এটাও মনে রাখতে হবে, ভারতে এই রকম একটা বৃহৎ জনগোষ্ঠী

প্রতিনিধিত্ব পাচ্ছে না। তিনি চান না, ক্ষমতা হস্তান্তরের পরে এই বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে আর একটি বৃহত্তম গোষ্ঠী সামরিক কায়দায় দাবিয়ে রাখুক এবং এজন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীকে ব্রিটিশ সামরিকবাহিনী সহায়তা করুক।

চার্চিলের ভাষণে জিন্নার দাবির যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া গেল। পাকিস্তান সৃষ্টির যুক্তি গান্ধীজীও ইতিপূর্বে মেনে নিয়েছিলেন। মুসলমান সম্প্রদায় কর্তৃক বিধ্বস্ত নোয়াখালি জেলার একটি হিন্দুপ্রধান গ্রাম-পরিদর্শনে গেলে একদল মুসলমান তরুণ গান্ধীজীকে সরাসরি প্রশ্ন করেন, বিহারে ওই ভয়ঙ্কর দাঙ্গার পরে তিনি পাকিস্তান সৃষ্টির দাবির যৌক্তিকতা মেনে নেবেন কিনা।

এই প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন, 'হ্যাঁ, একটি স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আমার কোনো আপত্তি নেই। বস্তুতপক্ষে বাংলার অবস্থা সেই রকমই। তবে এজন্য আমি বাংলার গভর্নরের কাছে যাবো না। আমি বরং সুরাবর্দীর কাছে যাবো এবং দরকার হলে সুরাবর্দী সরাসরি আমার কাছে আসবেন। কিন্তু কথা হল, এরকম একটি স্বতন্ত্র মুসলিমরাষ্ট্র গড়ে কি হবে? সেটি এখনও পরিষ্কার করা হয়নি। যদি একটি মুসলিম রাষ্ট্র বলতে বোঝায় স্বাধীনভাবে বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দেশের স্বার্থ বিঘ্নিত করার ক্ষমতা, তাহলে তাতে আমার কোনো সম্মতি নেই।'

আর একটি প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন, 'আগে দেশ স্বাধীন হোক, তারপরে পাকিস্তানের প্রসঙ্গ ভাবা যাবে। উল্টো পথে হাঁটলে বিদেশী সাহায্য চাইতেই হবে। স্বাধীনতা এবং পাকিস্তান—এই দু'টো বস্তুই বিদেশী শক্তির কাছে চেয়ে পাওয়া যাবে না। ভারত স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোনো চিন্তা মনে আশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়। স্বাধীনতা বলতে আমি শুধু ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তি বুঝি না, সব বিদেশী শক্তির হস্তক্ষেপ থেকে অব্যাহতি।'

এইভাবেই গান্ধীজী তথা কংগ্রেসের ধারণা এবং মুসলীম লীগের উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদ অবশেষে পাকিস্তানের জন্ম দিল এবং সাতচল্লিশ সালের পনেরাই আগস্টে স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পুণ্যলগ্নে ভারতের মানচিত্র পরিবর্তিত হয়ে গেল। সাতচল্লিশ সালের বিশে ফেব্রুয়ারী হাউস অব কমন্সে এ্যাটলি যে বিবৃতি দিয়েছিলেন, তাতে তিনি আশা প্রকাশ করেছিলেন, দু'টো বৃহৎ রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে আলোচনা সমাপ্ত হলেও তাঁর সরকার দেশীয় রাজ্যগুলোর সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ওই রাজ্যগুলোর উপরেই ছেড়ে দিচ্ছেন। এ-সম্পর্কে ওঁরা কোনো সুপারিশ করবেন না।

তেভাগা কৃষক সংগ্রাম

দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে, প্রায় এক বছর ধরে, কংগ্রেস মুসলীম লীগ এবং ব্রিটিশ সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ক আলাপ-আলোচনার মাঝখানে আরও কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল। ছেচল্লিশ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িকতার আবহাওয়ার মধ্যেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা তেভাগা সংগ্রামের ডাক দেয়। এটা ছিল বর্গাদারদের উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক নয়, দুই-তৃতীয়াংশ দাবির সংগ্রাম, যে দাবির ন্যায্যতা চল্লিশ সালে ভূমি রাজস্ব কমিশনও স্বীকার করেছিলেন। এই দাবির ভিত্তিতে অবিভক্ত বাংলার ষাট লক্ষ কৃষক তখন তিনটি শ্লোগান তোলেন—'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', 'নিজ গোলায় ধান তোলো' এবং 'তেভাগা চাই'।

ছেচল্লিশ সালে ফসল কাটার মরশুমে এই আন্দোলন প্রথম শুরু হল দিনাজপুর জেলার আটোয়ারি থানার রামপুর গ্রামে। আরও সাতবছর আগে এখানেই আধিয়ারদের সংগ্রাম পরাস্ত হয়েছিল। তখন থেকেই বর্গাদারেরা নিজেদের হালবলদে, নিজেদের পরিশ্রমে ফসল উৎপন্ন করে তার অর্ধেকই তুলে দিতে বাধ্য হতেন জোতদারদের হাতে। কিন্তু চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ সালের মধ্যে অবস্থা যে বদলাচ্ছে তা টের পাওয়া গিয়েছিল ছেচল্লিশ সালে দিনাজপুরে দরিদ্র রাজবংশী কৃষকসন্তান রূপনারায়ণের

বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভের পর। উনি ছাড়া ওই নির্বাচনে মাত্র দু'জন কমিউনিস্ট নেতা, জ্যোতি বসু ও রতনলাল ব্রাহ্মণ নির্বাচিত হন।

এবার দিনাজপুরে সেই রামপুর গ্রামে কৃষকেরা ধান কেটে নিজ গোলায় তোলার চেষ্টা করতেই পুলিশ মারধর শুরু করে। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকেরা রুখে দাঁড়াতেই পিছু হটতে হল পুলিশকে। এরপর গুরুদাস তালুকদার, সুশীল সেন, হাজি দানেশ, বিভূতি গুহ, সুনীল সেন, কালী সরকার, বসন্ত চট্টোপাধ্যায়, অজিত রায়, জনার্দন ভট্টাচার্য, সুধীর সমাজপতি, হৃষীকেশ ভট্টাচার্য, সত্য চক্রবর্তী, শচীন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখ নেতাদের মধ্যে কেউ কেউ আত্মগোপন করে আবার কেউ কেউ প্রকাশ্যে আন্দোলন পরিচালনা করতে থাকেন।

দেখতে দেখতে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে জেলার ত্রিশটি থানার মধ্যে বাইশটিতেই। হাজার হাজার কৃষক নাম লেখান স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে। আন্দোলনের শক্ত ঘাঁটি গড়ে ওঠে ঠাকুর গাঁওয়ে। কৃষকদের মধ্যে থেকে দুর্ধর্ষ সব নেতা বেরিয়ে আসেন কল্পরাম সিং, অভরণ সিং, ভবন সিং, পস্টরাম সিং ও তাঁর স্ত্রী জয়মণি। এঁদের মধ্যে কল্পরাম দেশভাগের পর পঞ্চাশ সালের তেইশে এপ্রিলে পূর্ব পাকিস্তানের রাজশাহী জেলে পুলিশের গুলিতে শহীদ হন। জয়মণি রাজবংশী মেয়েদের নেত্রী হিসেবেই অনেকবার পুলিশী হানা প্রতিরোধের সময় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন পুরুষদেরও। কৃষক সভার নতুন ঘাঁটি রাণী-সাঙ্গাইলে দোসরা ফেব্রুয়ারী পুলিশ কৃষকদের গ্রেপ্তার করতে এলে ভাগুনি নামে এক রাজবংশী তরুণীর নেতৃত্বে কৃষকেরা তাদের ঘিরে ফেলেন। ভাগুনি দারোগার হাত থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নেন ও তাকে একটি ঘরে আটকে রাখেন।

সাতচল্লিশ সালের চৌঠা জানুয়ারী দিনাজপুরের চিরির বন্দরে কৃষক মিছিলের উপর গুলি চালনায় শিবরাম নামে এক সাঁওতাল ও সমিরুদ্দীন নামে এক মুলসমান ভূমিহীন কৃষক নিহত হন এবং একজন পুলিশও ওই সংঘাতে মারা যান। তারপর চলে কৃষকদের উপরে পুলিশ ও জোতদারদের প্রচণ্ড মিলিত আক্রমণ যা তুঙ্গে ওঠে বালুরঘাট মহকুমার খাঁপুর গ্রামে। সেখানে বিশে ফেব্রুয়ারী পুলিশ যায় স্থানীয় নেতাদের গ্রেপ্তার করতে। কৃষকদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন সাঁওতাল। তাঁরা তীর, ধনুক, দা, টাঙ্গি নিয়ে প্রতিরোধ করেন। তারপর অবিশ্রাম গুলিবর্ষণে মারা যান স্থানীয় নেতা চিয়ার শাই, রাজবংশী মহিলা যশোদা ও আরো কুড়িজন কৃষক। ইমানিয়া গ্রামেও কৃষক নেতা ডোমা সিং-এর গ্রেপ্তার ঠেকাতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে শহীদ হন মুকুর কাঁদ ও তাঁর স্ত্রী এবং মকটু সিং ও নেনগেলি সিং। পঁচিশে ফেব্রুয়ারী কয়েকহাজার কৃষক মিছিল করে ঠাকুরগাঁওতে আসেন। এখানে বক্তৃতা দিতে এসেছিলেন রাণী মিত্র ও বীণা গুহ। মিছিলটিকে বে-আইনী ঘোষণা করে নেত্রী দু'জনকে বহিষ্কৃত করা হয়। আর কৃষকরা যখন শান্তিপূর্ণ ভাবে চলে যেতে আরম্ভ করেছিলেন তখন হঠাৎ তাঁদের উপর পুলিশ গুলি চালিয়ে দু'জন রাজবংশী কৃষক ও হীরামন মহম্মদ নামে একজন মুসলমান কৃষককে হত্যা করে। দু'জন সাঁওতাল কৃষকও আহত হয়ে হাসপাতালে মারা যান আর স্থানীয় নেতা নিয়ামত আহত হন, তাঁর পা কেটে বাদ দিতে হয়।

তেভাগা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে প্রথমে রংপুর ও জলপাইগুড়িতে, তারপর ময়মনসিংহ ও কিছুটা মেদিনীপুর জেলাতেও। রংপুরে বর্গাদারেরা ছিলেন সংখ্যায় প্রচুর। এঁদের অধিকাংশই ছিলেন রাজবংশী ও মুসলমান। আন্দোলনের আত্মগোপনকারী নেতাদের মধ্যে ছিলেন মহী বাগচী, অবনী বাগচী, মণিকৃষ্ণ সেন প্রমুখ। এখানে সাতচল্লিশ সালের জানুয়ারী মাসে জনৈক জোতদার গুলি চালালে বর্গাদারদের সংগ্রামী নেতা বাচ্চা মহম্মদ গুরুতর আহত ও ততনারায়ণ নিহত হন। দেবীগঞ্জেও নেতৃত্ব করতেন এক বৃদ্ধা রাজবংশী মহিলা। পরে কৃষকেরা ভালোবেসে তাঁকে ডাকতেন 'বুড়ি মা' নামে। পুরুষেরা ইতস্তত করায় তিনি মেয়েদের একটা শোভাযাত্রা করে ধানকাটা শুরু করেন। বোদায় নেতা ছিলেন মাধব দত্ত আর তিন কৃষক সন্তান, বাচ্চা মুনশী, ইন্দ্রমোহন ও রাধামোহন বর্মন ছিলেন নেতৃস্থানীয় কর্মী। পচাগড়ে নেতা ছিলেন উত্তরকালের নকশাল আন্দোলনের নেতা হিসাবে পরিচিত চারু মজুমদার।

দেবীগঞ্জে আন্দোলনের অন্যতম নেতা, সমর গাঙ্গুলী পরে ডুয়ার্স অঞ্চলে নেতা হিসেবে পরিচিত হন। উপজাতীয়দের মধ্যে ওঁর প্রভাব ছিল যথেষ্ট।

পয়লা মার্চ কৃষকরা জলপাইগুড়ির এক ধনী জোতদারের গোলা থেকে তাঁদের প্রাপ্য ধান তুলে আনতে যান। পুলিশের গুলিতে সেখানে লোঠরা বুড়া ও পাঁচজন কৃষক নিহত হন। চৌঠা এপ্রিলে মেটেলির আর এক জোতদারের গোলা থেকে ধান আনতে গিয়ে নিহত হন ন'জন কৃষক। দু'ক্ষেত্রেই কৃষকরা তীর ধনুক নিয়ে যথাসাধ্য লড়াই করেছিলেন পুলিশের রাইফেলের বিরুদ্ধে।

মেদিনীপুরে মহিষাদল, সুতাহাটা, নন্দীগ্রামে তেভাগা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ভূপাল পাণ্ডা, অনন্ত মাজীর পাশাপাশি বিমলা মণ্ডলও আত্মপ্রকাশ করেন আন্দোলনের পরিচালক হিসেবে।

ময়মনসিংহে হাজং বিদ্রোহ

ময়মনসিংহ জেলায় ত্রিশ সালে কৃষক-আন্দোলনের ঐতিহ্যমণ্ডিত কিশোরগঞ্জে মুলসমান ও উপজাতীয় কৃষকরা মিলিত ভাবে সংগ্রাম করে হিন্দু ও মুসলমান জোতদারদের বিরুদ্ধে । বহু কর্মী গ্রেপ্তার হন এবং জমিদারদের লাঠিয়ালদের হাতে সাতচল্লিশ সালের জানুয়ারীতে নিহত হন আদিবাসী কৃষক সর্বেশ্বর।

ময়মনসিংহ জেলায় ওই সময়েই সুসং পরগণার হাজং উপজাতিরা শুরু করেন টঙ্ক আন্দোলন। পাঁচই ডিসেম্বরে পাঁচ হাজার হাজং টঙ্ক খাজনা হ্রাস ও ওই খাজনা ফসলের বদলে অর্থে প্রদেয় খাজনায় রূপান্তরিত করার দাবিতে মিছিল করেন। হাজং ছাড়া মুসলমানরাও ছিলেন টঙ্ক প্রজাদের একটা বড় অংশ। প্রথম থেকেই ওই সংগ্রামের অদ্বিতীয় নেতা ছিলেন বর্তমানে বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি মণি সিং। আর তার সঙ্গে ছিলেন ললিত সরকার। হাজং আন্দোলন বিস্তৃত হয়েছিল গারো পাহাড়ের দক্ষিণে পঞ্চাশ মাইল লম্বা ও দশ মাইল চওড়া একটা অঞ্চল জুড়ে। এই আন্দোলন জোতদারদের বিরুদ্ধে নয়, মুখ্যত এটা ছিল সুসংয়ের জমিদার ও অন্য ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে।

একুশে জানুয়ারী গারোদের কাছ থেকে আদায় করা ধান-বোঝাই গাড়ি ইচ্ছে করে ফসল-ভর্তি মাঠের উপর দিয়ে চালাবার সময় হাজংরা এক জমিদারের মুহুরিকে আক্রমণ করেন। কোনোমতে সে প্রাণ নিয়ে পালায়। এর দশদিন পবে সোমেশ্বরী নদীতীরের বাহেরতসি গ্রামের হাজং কৃষকেরা দল বেঁধে অন্য গ্রামে গিয়েছিলেন সভা করতে। সেই সুযোগে পুলিশ বাহের তলির দু'টি মেয়ের উপর অত্যাচার করে ও কুমুদিনী নামে একটি মেয়েকে টানতে টানতে নিয়ে যায়। ইতিমধ্যে বাহেরতলির হাজং কৃষকেরা ফিরছিলেন গ্রামে। কুমুদিনীর আর্ত চিৎকার শুনে তাঁদের নেত্রী রাসমণি বাঘিনীর মতো পুলিশের উপর লাফিয়ে পড়েন টাঙ্গি হাতে। ওই সংঘাতে সেদিন পুলিশের গুলিতে নিহত হন বীরাঙ্গ না রাসমণি ও সুরেন্দ্র নামে আর এক হাজং কৃষক। তবে কুমুদিনীকে তারা নিয়ে যেতে পারে নি, বরং তাদের পালাতে হয়েছিল দু'জন পুলিশের লাশ ফেলে। হাজংরা পুলিশের রাইফেলও নিয়ে নেয়।

এর পর ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস বাহিনী হাজং-গ্রামগুলোতে নির্মম অত্যাচার চালায়। তাদের যথাসর্বস্ব লুট করে ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। কিন্তু নেতা বা কর্মীদের পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারেনি, ধানও কেড়ে নিতে পারেনি।

দেশবিভাগের পরেও হাজংদের উপর প্রচণ্ড অত্যাচার চলে। ষাটজন কৃষক নিহত হন এবং পাহাড়ে পালিয়ে আসা অনেক হাজং পরিবার ললিত সরকারের নেতৃত্বে সদ্যগঠিত মেঘালয় রাজ্যে চলে যান।

বাংলা কৃষক অভ্যুত্থানের ফলাফল

তেভাগা বর্গাদারদের দাবি ছিল বলে তাঁরাই ছিলেন সংগ্রামের পুরোভাগে এবং যোগদানকারীদের মধ্যেও সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু ওই আন্দোলন থেকে খেতমজুরদের পাওয়ার কিছু না থাকলেও তাঁরা বিপুল

সংখ্যায় যোগ দিয়েছিলেন আন্দোলনে এবং সংগ্রামী স্বেচ্ছাসেবকেরা অধিকাংশ এসেছিলেন ওই বর্গ থেকেই।

নির্মম অত্যাচারে সাময়িকভাবে আন্দোলন তখনকার মতো দমন করা গেলেও কিছুই আর আগের মতো রইল না। অনেক জায়গাতেই তেভাগা কার্যত প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। এইজন্য স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে পাশ করতে হয়েছিল 'পশ্চিমবঙ্গ বর্গাদার আইন ১৯৫০'। পূর্ব পাকিস্তান সরকারকেও পঞ্চাশ সালে ফসলে প্রদেয় অর্থ খাজনায় রূপান্তরিত করে হাজং কৃষকদের একটি মূল দাবি মেনে নিতে হল।

কৃষক-আন্দোলনের ওই প্রত্যক্ষ ফলাফল ছাড়াও আরো একটি পরোক্ষ লাভের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' ও তারপর নোয়াখালির সাম্প্রদায়িকতার তাণ্ডব যে সেদিন সমগ্র গ্রাম বাংলাকে গ্রাস করতে পারেনি তার অন্যতম প্রধান কারণ সেদিনকার হিন্দু-মুসলমান কৃষকের গৌরবমণ্ডিত যৌথ সংগ্রাম।

এর প্রকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত হাসনাবাদের সংগ্রাম। নোয়াখালিকে সাম্প্রদায়িক আগুনে জ্বালিয়ে গুণ্ডাবাহিনী সেদিন ছুটেছিল পাশেই ত্রিপুরার দিকে। সেখানে দাঙ্গার বিষ ছড়াতে তারা যে পথে ছুটেছিল তার মধ্যে ছিল হাসনাবাদ ও তারই সংলগ্ন আরো কয়েকটি গ্রাম। এগুলো বহুদিন থেকেই প্রথমে কংগ্রেসী ও পরে কিষাণ সংগ্রামে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের দুর্গ। তখনকার দুই শ্রেষ্ঠ নেতা ছিলেন কৃষ্ণসুন্দর ভৌমিক ও মোখলেশ্বর রহমান। নোয়াখালির দাঙ্গাবাজরা ত্রিপুরায় ঢোকার চেষ্টা করলে হাসনাবাদের পথে এই দুই নেতার নেতৃত্বে এবং কৃষক সভার ডাকে দশ হাজার লাঠিধারী কৃষক স্বেচ্ছাসেবক সেদিন রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। সেই অসম-সাহসিক প্রতিরোধ সংগ্রামে তাঁরা হাজার হাজার দাঙ্গাবাজকে পরাস্ত ও ছত্রভঙ্গ না করলে সাম্প্রদায়িক দাবানলে জ্বলে পুড়ে যেত ত্রিপুরা।

দাঙ্গার বিরুদ্ধে ট্রাম ও শিল্পশ্রমিক

কলকাতার সাম্প্রদায়িক হানাহানির রক্তসমুদ্রের মধ্যে যে কয়েকটি সাম্প্রদায়িক ঐক্যের ছোট ঘাঁটি দ্বীপের মতো জেগেছিল, তার মধ্যে ছিল বেলগাছিয়া, রাজাবাজার, পার্কসার্কাস ও বালিগঞ্জের ট্রাম-শ্রমিকদের মেসগুলো। ছেচল্লিশ সালের আগস্ট মাসে রাজাবাজারের ট্রাম-শ্রমিক ও কমিউনিস্ট নেতা রেজ্জাক ও চতুর আলি রক্ষা করেছিলেন শুধু ট্রাম-শ্রমিক ভাইদের প্রাণই নয়, ওই অঞ্চলের বহু হিন্দু পরিবারকেও। তেমনি ডোভার লেনের ট্রাম-মেসে বিজয় চক্রবর্তী ও রাজেন পাহাড়ীর নেতৃত্বে হিন্দু গুণ্ডাদের রুখলেন ট্রাম শ্রমিকেরা আর বেলগাছিয়া ও শ্যামবাজারে ট্রাম-শ্রমিকরা ওই ধরনের গৌরবমণ্ডিত ভূমিকা পালন করলেন কেতননারায়ণ মিশির, জহিরুল হক ও কালি ব্যানার্জীর নেতৃত্বে।

সাম্প্রদায়িকতার ওই বিষাক্ত আবহাওয়ার মধ্যেই একুশে জানুয়ারী থেকে আট হাজার ট্রাম শ্রমিক ট্রামওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নেতৃত্বে মূল মজুরী কুড়ি থেকে চল্লিশ টাকা বাড়ানোর দাবিতে শুরু করেছিলেন এক ঐতিহাসিক ধর্মঘট। পঁচাশি দিন ধরে ওই ধর্মঘট চলেছিল এবং তার ফলে যে সালিসী কমিটি গড়া হয়েছিল তার সিদ্ধান্ত অনুসারে ট্রাম শ্রমিকেরা আদায় করেছিলেন তাঁদের দাবি।

বাংলার ছাত্রসমাজের ভিয়েৎনাম দিবস পালন

জাতীয় সংকট মুহূর্তেও ছাত্র সমাজ তাদের আন্তর্জাতিক দায়িত্বের কথা ভোলেনি। সাতচল্লিশ সালের একুশে জানুয়ারী বঙ্গীয় ছাত্র ফেডারেশন ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের কবল থেকে ভিয়েৎনামের মুক্তির সংগ্রামের সমর্থনে 'ভিয়েৎনাম দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত করে। ওই সংগ্রামের সঙ্গে সংহতি জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে ছাত্ররা সেদিন কলকাতায় যে মিছিল বার করে তার উপরে পুলিশ পাঁচবার গুলি চালায়। এতে একজন ছাত্র গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়, উনিশজন গুলিবিদ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে নীত হয়। পঞ্চাশ

জন লাঠির আঘাতে আহত হয় এবং দু'শো জন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস পরদিন ধর্মঘট ডাকে। বাইশে ফেব্রুয়ারী কলকাতার রাজপথে আবার ব্যারিকেড গড়ে ওঠে এবং রাস্তায় রাস্তায় পুলিশের সঙ্গে সংগ্রামে ছাত্রদের সঙ্গে সামিল হন শ্রমিক ও জনসাধারণ।

ভিয়েৎনামের সমর্থনে ছাত্রদের সেই লড়াই ছড়িয়ে পড়ে ময়মনসিংহেও। সেখানেও ছাত্র মিছিলের উপর পুলিশের গুলি চলে তিনবার। শহীদ হয় অমলেন্দু ঘোষ নামে স্কুলের এক ছাত্র এবং গুলিবিদ্ধ হয় অনীতা বসু নামে ডিগ্রি ক্লাসের এক ছাত্রী। এরপর শুরু হয় প্রচণ্ড সংগ্রাম। সরকারী দপ্তরে অগ্নিসংযোগ করা হয় এবং ময়মনসিংহ থেকে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পূর্ণ হরতাল পালিত হয় সারা শহরে। ময়মনসিংহের ওই সংগ্রামে সেদিন বাঙ্গালী যুবকেরা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল।

দেশীয় রাজ্যে প্রজা আন্দোলন

ক্ষমতা হস্তান্তর আসন্ন বুঝে দেশীয় রাজ্যের রাজা-মহারাজারা ব্রিটিশের প্ররোচনায় প্রজা আন্দোলন দমনের জন্য নির্মম অত্যাচার চালায়। জয়শল্মীরে ছেচল্লিশ সালের তেসরা এপ্রিল প্রজা আন্দোলনের কর্মী সাগরমল গোপকে জেলখানায় পুড়িয়ে মারা হয়। ছেচল্লিশ সালে কাশ্মীরে জননেতা শেখ আবদুল্লা-পরিচালিত ন্যাশন্যাল কনফারেন্স 'নয়া কাশ্মীর' গঠনের জন্য যখন মহারাজের বিরুদ্ধে 'কাশ্মীর ছাড়ো' আন্দোলন শুরু করে, তখন আবদুল্লাকে গ্রেপ্তার করা হয়। আদালতে আবদুল্লার পক্ষ সমর্থনের বন্দোবস্ত করতে নিষেধাজ্ঞা ভেঙ্গে জবাহরলাল কাশ্মীরে প্রবেশ করেন। তাঁকে গ্রেপ্তার করার সময় তিনি রক্ষীদের বেয়নেটে আহত হন এবং তাঁকে আটক রাখা হয়। ক্ষমতা হস্তান্তরের দিন যতই এগিয়ে আসতে লাগল, বড় বড় রাজা-মহারাজা ও নবাবরা ততই রব তুললেন ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়ে দেশীয় রাজ্যগুলোকেও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে স্বীকার করতে হবে, অর্থাৎ ভারতকে শুধু দ্বিখণ্ডিত নয়, ছিন্নবিচ্ছিন্ন করতে হবে। বলা বাহুল্য এ-সবের পিছনে ছিল ইংরেজদের প্ররোচনা।

তেলেঙ্গানায় গণ-অভ্যুত্থান

দেশীয় রাজ্যে শাসকদের অত্যাচার চরমে উঠল হায়দ্রাবাদে। সেখানে তেলেঙ্গানা এলাকায় নালগোণ্ডা জেলার জলগাঁও তালুকের অত্যাচারী জমিদার ভিন্নুর রামচন্দ্র রেড্ডি চেষ্টা করছিল তার জমিদারীর অন্তর্গত পানাকুর্তি গ্রামের এক গরীব ধোপানী, আইলাম্মার সামান্য জমি গ্রাস করার। আইলাম্মা ছিলেন কমিউনিস্ট নেতৃত্বে পরিচালিত 'অন্ধ্র মহাসভা'র এক সক্রিয় কর্মী। তাঁর জমি থেকে জবরদস্তি ফসল কেটে নেবার আগে রামচন্দ্র রেড্ডি যথারীতি স্থানীয় 'সংঘম'-এর ('অন্ধ্র মহাসভা'র প্রচলিত নাম) নেতাদের এক মামলায় ফাঁসায় আর তারপর তার সাঙ্গোপাঙ্গো ও ভাড়াটে গুণ্ডাদের পাঠায় ফসল কাটতে। 'সংঘম'-এর অন্যান্য নেতা ও কর্মীরা কিন্তু তাদের হানা রুখে দেন এবং ফসল কেটে পাঠিয়ে দেন আইলাম্মার বাড়িতে।

কিন্তু দেশমুখের প্ররোচনায় পরদিন থেকেই শুরু হয় ধরপাকড। ছ'জন নেতাকে গ্রেপ্তার করে তাঁদের উপর চালানো হয় অকথ্য অত্যাচার। তবু রামচন্দ্রের আসল মতলব আইলাম্মার জমি বা ফসল দখল—সে হাসিল করতে পারে নি। তখন সে মতলব আঁটল 'সংঘম' নেতাদের বেমালুম খতম করার। তার পরামর্শে ছেচল্লিশ সালের চৌঠা জুলাই থানার পুলিশ অফিসারেরা গ্রাম ছেড়ে চলে গেল আর তারপরেই রামচন্দ্রের গুণ্ডাবাহিনী আক্রমণ শুরু করল কোডাভেণ্ডি গ্রামের 'সংঘম' নেতাদের উপরে। তার জবাবে 'সংঘম'-এর কর্মীরা সঙ্গে সঙ্গে লাঠি হাতে মিছিল করে বেরোলেন রাস্তায়। জমিদার বাড়ির কাছে এলে মিছিলের উপর গুণ্ডারা গুলি চালাতে শুরু করল। ডোড্ডি কোমারাইয়া ছিল স্থানীয় 'সংঘম'—এর নেতা। রামচন্দ্রের ভাড়াটে গুণ্ডার এক ঝাঁক গুলি ঝাঁঝরা করে দিল তাঁর দেহ। তিনিই

তেলেঙ্গানা গণ-অভ্যুত্থানের প্রথম শহীদ।

তবু ছত্রভঙ্গ হল না সেই মিছিল—বরং নিমেষের মধ্যে ঘেরাও হয়ে গেল জমিদার বাড়ি। আশপাশের গ্রাম থেকেও ছুটে এলেন অসংখ্য মানুষ। বৃথাই রামচন্দ্র ঘেরাও ভাঙার জন্য তার ছেলের সঙ্গে পাঠাল আরো দু'শো গুণ্ডার সশস্ত্র বাহিনী। বিক্ষুব্ধ জনতার প্রচণ্ড প্রহারে জর্জরিত হয়ে তারা পালাল সেখান থেকে। শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র পুলিশ এল কিন্তু ওই সঙ্গীন অবস্থায় ধরপাকড় করতে ভরসা পেল না, বরঞ্চ আশ্বাস দিল হত্যাকারী গুণ্ডাদের গ্রেপ্তার করার।

পুলিশ কর্তারা অবশ্য কথা রাখেনি যথারীতি। গ্রেপ্তার হয়েছিলেন 'সংঘম'-এর নেতারা, গুণ্ডারা নয়। কিন্তু ডোড্ডি কোমারাইয়ার শহীদত্ববরণের শিখায় সারা নালাগোণ্ডা জেলায় ও পরে সারা তেলেঙ্গানা জুড়ে প্রজ্বলিত হল সশস্ত্র সংগ্রামের শিখা। কালের দিক থেকে সেই সংগ্রামের ব্যাপ্তি ছেচল্লিশ সালের মাঝামাঝি থেকে একান্ন সালের অক্টোবর পর্যন্ত এবং তা পরিচালিত হয়েছিল স্বৈরতন্ত্রী নিজামশাহী, ধর্মান্ধ রাজাকার বাহিনী আব একেবারে শেষ পর্যায়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে।

কমিউনিস্ট-পরিচালিত তেলেঙ্গানা গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ হয়েছিলেন ছ'হাজার আন্দোলনকারী এবং গ্রেপ্তার হয়েছিলেন দশ হাজার মানুষ। পুলিশ ও মিলিটারী শিবিরে সপ্তাহের পর সপ্তাহ নিগৃহীত হয়েছিলেন অন্তত পঞ্চাশ হাজার মানুষ। হাজার হাজার গ্রামের লক্ষ লক্ষ মানুষ শিকার হয়েছিলেন মিলিটারী ও পুলিশের হামলা ও লাঠিচালনায়, ধর্ষিতা হয়েছিলেন কয়েক হাজার নারী আর সাধারণ মানুষের সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়েছিল কোটি কোটি টাকার।

তেলেঙ্গানা সংগ্রামে মোট নিহতের সংখ্যা-বিচারে শুধু গোটা ব্রিটিশ রাজত্বকালে সিপাহী বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ এবং মোপলা বিদ্রোহের পাশাপাশি এর স্থান।

স্বাধীনতার পরেও সংগ্রাম

সুদীর্ঘ সংগ্রামের পরে অবশেষে দেশ স্বাধীন হল। সাতচল্লিশ সালেব পনেরোই আগস্টে সংবিধান পরিষদে জবাহরলাল ঘোষণা করলেন, 'অনেক বছর আগে একদিন আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলাম আমাদের নিয়তির সঙ্গে। এখন সময় এসেছে সেই প্রতিশ্রুতি পালনে। সারা পৃথিবী যখন নিদ্রামগ্ন ভারত তখন আজ চোখ মেলেছে স্বাধীনতাব আলোয়।'

ওইদিন মধ্যরাত্রে ক্ষমতা হস্তান্তরেব সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করে 'ভারত' ও 'পাকিস্তান' (বাংলা ও পাঞ্জাবকে ভাগ করে এবং সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বালুচিস্তান নিয়ে) দুটি 'ডোমিনিয়ন' গড়া হল আর দুটি ডোমিনিয়নই হল রাজনৈতিক স্বাধীনতার অধিকারী।

তবু ওই তারিখটির পরেও ভরতীয় ভূ-খণ্ডে অসম্পূর্ণতা রয়ে গেল। সাতচল্লিশ সালের পনেরোই আগস্টেব মধ্যে অধিকাংশ দেশীয় রাজ্য ভারতের অন্তর্ভুক্ত হলেও তিনটি রাজ্যের ক্ষেত্রে কিছুটা গোলমাল দেখা দিল ঃ জুনাগড়, জম্মু কাশ্মীর ও হায়দ্রাবাদ।

এগুলোর মধ্যে সব থেকে ছোট রাজ্য জুনাগড়ের নবাব তাঁর প্রজাদের প্রবল বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও শেষ অবধি চেষ্টা চালান তাঁর রাজ্যকে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করার। তাঁর প্রজারা ছাড়াও আশে পাশে সৌরাষ্ট্রের অন্য সব রাজ্যগুলোও ছিল নবাবের এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে। তাঁর রাজ্যের প্রজা আন্দোলনের নেতারা নবাবের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য রাজ্যের বাইরে গিয়ে এক অস্থায়ী সরকার গড়ে প্রবল আন্দোলন চালাতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত অক্টোবর মাসে নবাব সপরিবারে রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যান এবং বিনা রক্তপাতে জুনাগড় ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়।

কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিং কাশ্মীর ভারত না পাকিস্তান কোন ডোমিনিয়নে যাবে—এ সম্পর্কে পরিষ্কার কোন সিদ্ধান্ত নিতে স্বাধীনতার পরেও বিলম্ব করছিলেন। ইতিমধ্যে সাতচল্লিশ সালের অক্টোবর মাসে পাকিস্তান সশস্ত্র পাঠানদের ট্রেনিং দিয়ে ব্রিটিশ অফিসারদের পরিচালনায় কাশ্মীরে প্রবেশ করাতে

থাকে। ওই বাহিনী কাশ্মীরে হত্যাকাণ্ড ও লুঠতরাজ চালাতে থাকে। বারমুলায় ন্যাশন্যাল কনফারেন্সের বীর নেতা, মহম্মদ শেরওয়ানিকে তারা নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে এবং ছাব্বিশে অক্টোবরে শ্রীনগর দখলের জন্য ঝিলম নদীর অপর পারে পৌঁছয়। ওই অবস্থায় মহারাজা ন্যাশন্যাল কনফারেন্সের অদ্বিতীয় নেতা শেখ আবদুল্লাকে জেলখানা থেকে মুক্ত করতে ও ভারতীয় ডোমিনিয়নে যোগ দিতে বাধ্য হন।

সাতাশে অক্টোবর থেকেই শত্রুর অভিযান রুখতে এবং কাশ্মীরকে রক্ষা করতে ভারতীয় বাহিনীকে বিমানে পাঠানো হতে থাকে। শেখ আবদুল্লার আশ্বাসে হিন্দু, মুসলমান ও শিখ ভারতীয় বাহিনীর পাশাপাশি অভিযানকারীদের কাশ্মীরের মাটি থেকে হটাতে শুরু করে। শেষ পর্যন্ত সামান্য একাংশ (সেই তথাকথিত 'আজাদ কাশ্মীর' অনতিবিলম্বে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়) বাদে প্রায় সমগ্র জম্মু ও কাশ্মীর মুক্ত হয় এবং আটচল্লিশ সালের মার্চ মাসে সেখানে এক জনপ্রিয় মন্ত্রীসভা গঠিত হয় শেখ আবদুল্লার নেতৃত্বে। অবশ্য পাকিস্তান এবং তার সাম্রাজ্যবাদী পরামর্শদাতাদের প্ররোচনা ও পরামর্শে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান আজও হয় নি।

বিদেশী চক্রান্ত হায়দ্রাবাদের ক্ষেত্রেও চলেছিল। সাতচল্লিশ সালের অক্টোবরে হায়দ্রাবাদের নিজাম ভারত সরকারের সঙ্গে এক বছরের চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ওই চুক্তি অনুযায়ী শর্ত ছিল, সেখানে এক জনপ্রিয় সরকার গড়ে তুলে সমাধান করতে হবে ডোমিনিয়নে যোগদানের প্রশ্ন। কিন্তু জনপ্রিয় সরকার গঠনের আদৌ কোন চেষ্টা না করে নিজাম ওই সময়ে ক্রমাগত চেষ্টা করতে থাকেন হায়দ্রাবাদের স্বাধীনতা ও পাকিস্তানে যোগদানের ঘোষণা করার। তারই জন্য পাকিস্তান ও তার বন্ধু দেশগুলোর কাছ থেকে গোপনে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র আসতে লাগল আর নিজামের পৃষ্ঠপোষকতায় গজিয়ে উঠল ধর্মান্ধ, সশস্ত্র রাজাকার বাহিনী। এদের নৃশংসতা যখন হায়দ্রাবাদের সীমানা ছাপিয়ে ভারতের সীমান্ত রাজ্যেও প্রবেশ শুরু করল তখন ভারতীয় বাহিনী বাধ্য হয়ে হায়দ্রাবাদে ঢোকে আটচল্লিশ সালের তেরোই সেপ্টেম্বরে। সেই ভারতীয় অভিযান যে চারদিনেই শেষ হয়ে যায় তার থেকে বোঝা যায়, নিজামের স্বৈরতন্ত্রের ভিত ছিল কত দুর্বল।

দেশীয় রাজ্য ছাড়াও ভারত ভূখণ্ডে ছিল ফরাসী ও পর্তুগীজ শাসিত এলাকা। ফরাসীদের অধীনে ছিল পাঁচটি ছোট উপনিবেশ—চন্দননগর, পণ্ডিচেরি, কারাইকল, ইয়ানাম ও মাহে। এগুলোর মধ্যে চন্দননগর ও পণ্ডিচেরি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনেও বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছে। চন্দননগরের চারুচন্দ্র রায়, মতিলাল রায়, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কানাইলাল দত্ত, শ্রীশ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বসন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের বিশিষ্ট পুরুষ। আবার অরবিন্দ ঘোষ, রাসবিহারী বসু, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, অতুল্য ঘোষ, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল, আনন্দ গুপ্ত, জীবন ঘোষাল, সুহাসিনী গাঙ্গুলী, শশধর আচার্য, দীনেশ মজুমদার, নলিনী দাস প্রমুখ বিখ্যাত ভারতীয় বিপ্লবী বিভিন্ন সময়ে আশ্রয় পেয়েছেন চন্দননগরে। পণ্ডিচেরিতে তেমনি আশ্রয় পেয়েছিলেন অরবিন্দ, সুব্রহ্মণ্য ভারতী, ডি. ভি. এম. আয়ারের মতো ভারতীয় বিপ্লবী। ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের পাশাপাশি ফ্রান্সের উপনিবেশগুলোতেও স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে, বিশেষ করে ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তর আসন্ন হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নামে সংগঠন গড়ে ওঠে, যেমন 'ফরাসী ভারত জাতীয় কংগ্রেস' 'মহাবল সভা,' 'ন্যাশন্যাল ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট' ইত্যাদি। ফরাসীরা অবশ্য শেষপর্যন্ত তাদের আধিপত্য আঁকড়ে থাকার চেষ্টা করে। তারা একদিকে নির্মম দমননীতি চালায় এবং ক্ষমতা হস্তান্তর ও ভারত-ভুক্তি যতদিন সম্ভব ঠেকিয়ে রাখার জন্য প্রত্যেকটি উপনিবেশে ওই প্রশ্নে গণভোট বা রেফারেণ্ডামের প্রস্তাব তোলে। যাঁরা আসলে ভারতীয় তাঁদের কাছ থেকেই ভারত-ভুক্তি চান কিনা জানতে চাওয়ার ওই প্রস্তাব সত্যিই অপমানজনক। ওই অবস্থায় মাহে উপনিবেশটির জনসাধারণ আটচল্লিশ সালের অক্টোবর মাসে বিদ্রোহ করে এবং অল্পদিনের মধ্যেই সেখানকার সশস্ত্র বাহিনী আত্মসমর্পণ করে তাঁদের কাছে। উনপঞ্চাশ সালে চন্দননগরে সদ্য নির্বাচিত

পৌরসভা রেফারেণ্ডাম বা গণভোট ছাড়াই প্রস্তাব গ্রহণ করে ভারতভুক্তির এবং ভারত সরকারও সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার শাসনভার গ্রহণ করে।

পণ্ডিচেরিতে ফরাসীরা প্রচণ্ড অত্যাচার চালায়। সেখানে কমিউনিস্ট নেতা ভি. সুব্বাইয়া ফ্রান্সের 'চেম্বার অফ ডেপুটিজ'-এর সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি তাই একদিকে পণ্ডিচেরির যথাশীঘ্র সম্ভব ভারত ভুক্তির এবং অন্যদিকে অবিলম্বে মৌলিক ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের আন্দোলন পরিচালনা করছিলেন দেশের মধ্যে এবং প্যারিসে 'চেম্বার অফ ডেপুটিজ' এর কক্ষেও।

এই সব আন্দোলনের ফলে শেষ পর্যন্ত চুয়ান্ন সালের আঠারোই অক্টোবর বাকি ফরাসী উপনিবেশ গুলোর পৌরসভা ও প্রতিনিধি সভাগুলোর একশো আটাত্তর জন নির্বাচিত সদস্যের মধ্যে একশো সত্তর জনই ভোট দেন অবিলম্বে ভারত ভুক্তির পক্ষে। এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে ভারত ও ফরাসী সবকার। তার ফলে চুয়ান্ন সালের পয়লা নভেম্বর অবশেষে ভারতে ফরাসী সরকারের অবসান ঘটে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমিটি গঠিত হওয়ার আগেই পনেরো শো দশ সালে পর্তুগীজেবা গোয়ায় তাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত করে ও ক্রমশ তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারে সচেষ্ট হয়। কিন্তু শেষ অবধি ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর গোয়া, দমন, দিউ, দাদরা ও নগর হাভেলি, এই পাঁচটি জায়গায় পর্তুগীজ উপনিবেশ চালু থাকে।

ইউরোপের খুব পশ্চাৎপদ দেশ হিসেবে গণ্য হলেও ভারত-ব্যতীত পর্তুগালের বিশাল সাম্রাজ্য ছিল আফ্রিকায়। এমন কি, আঠাবো শো পঁচানব্বই থেকে নিরানব্বই সালে পর্তুগীজ বাহিনীব বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সুদূর মোজাম্বিকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড ভোগ করতে করতে মারা যান বিদ্রোহী দাদা রাণে। উনিশ শো আটাশ সাল থেকে চুয়াত্তর সাল পর্যন্ত সেখানে প্রতিষ্ঠিত ছিল সালাজারের এক ফ্যাসিস্ট একনায়কত্ব। তাঁর বিরুদ্ধে এ দেশে বহুবাব বিদ্রোহেব চেষ্টা হয়েছে কিন্তু তা প্রতিবারেই দমন করা হয়েছে নৃশংসভাবে।

আটাশ সালে গোয়া জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের জনক নামে পরিচিত ট্রিস্টাও ব্রাগাঞ্জা কুনহা গোয়া কংগ্রেস কমিটি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল, গোয়াকে মুক্ত করে ভারতের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করা। গোয়ায় তখন সমস্ত সভা ও মিছিল নিষিদ্ধ ছিল এবং পুলিশের অনুমতি ছাড়া কোনো কিছু প্রকাশ করা যেত না। তেতাল্লিশ সালে ব্রাগাঞ্জা কুনহা সমেত বহু নেতাকে গ্রেপ্তার করে পর্তুগালে অথবা পর্তুগালের আফ্রিকান উপনিবেশে চালান দেওয়া হয় বহু বছরের জন্য। দত্তাত্রেয় দেশপাণ্ডে তো মুক্তি পান দেশ স্বাধীন হওয়ার পর। আর ব্রাগাঞ্জা কুনহা সাড়ে চাব বছর পেনিচে দুর্গে কাটানোর পর লিসবনে স্থানান্তরিত হন। সেখানে তাঁকে জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় কিন্তু দেশে ফেরবাব হুকুম দেওয়া হয় না। তিপ্পান্ন সালে তিনি পর্তুগাল থেকে পালিয়ে দেশে ফেরেন এবং 'গোযা এ্যাকশন কমিটি' গড়ে তোলেন। আর, গোয়া কংগ্রেসের এক অংশ সশস্ত্র সংগ্রামে গোয়াকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করেন 'আজাদ গোমন্তক দল'। চুযান্ন সালে দাদরা ও নগর হাভেলি মুক্ত হয় কিন্তু পর্তুগীজবা গোয়ায় প্রচণ্ড অত্যাচার চালায়, অনেকের প্রাণদণ্ড হয়। বালা রায়া মাপারির মতো অনেককে জেলে নির্মম অত্যাচার করে হত্যা করা হয়। সশস্ত্র যুদ্ধে নিহত হন ক্যামিলা পেরেরা, মনোহর পেদনেকাব, যশোবন্ত আদগর ওয়াডেকর, ফিদার আনভেকার, বালকৃষ্ণ ভোঁসলে, অশ্রুৎ চোভাঙ্কর, বালা দেশাই, পাণ্ডুরঙ্গ কেংক্রে, পুরুষোত্তম কার্কার, সুরেশ কার্কার, ফাতাবা নায়েক, রঘুনাথ শিরোদকর প্রমুখ।

পঞ্চান্ন সালের পনেরোই আগস্ট গোয়াকে মুক্ত করতে ভারতবর্ষ থেকে গোয়া সীমান্ত পেরিয়ে ভিতরে প্রবেশের জন্য এক অহিংস সত্যাগ্রহ শুরু হয়। তাতে যোগ দেন ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশের সত্যাগ্রহী। এঁদের উপরে পর্তুগীজরা নির্বিচারে গুলি চালালে হতাহত হন বহু সত্যাগ্রহী। নিহতদের মধ্যে ছিলেন অন্ধ্রপ্রদেশের সীতারামাস সুরি, মহারাষ্ট্রের বাবু রাও থোরাট, এম. এন ওয়াডেকার ও তুলসীরাম হির্ভে, মধ্যপ্রদেশের কল্যাণ শর্মা ও জগনমোহন চাপারালা ও পশ্চিমবঙ্গের হুগলির নিত্যানন্দ

সাহা। ভারতীয় সাংসদ এবং বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দলের নেতা ত্রাদব চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করে পাঠানো হয় লিসবনে সালাজারের জেলে। ব্রাগাঞ্জা কুনহা দোসরা সেপ্টেম্বরে বোম্বাইয়ে এক জনসভায় বলেন, 'ভারতবর্ষ বুঝতে পেরেছে যে ফ্যাসিজম কি পদার্থ...। সে বুঝেছে যে অতীতে রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে যে ধরনের লড়াই লড়েছে ফ্যাসিজমের সঙ্গে তা চলে না। .. নির্বিচারে সত্যাগ্রহী হত্যাকাণ্ড ভারতে পর্তুগীজ শাসনকে এক নিমেষে দেখিয়ে দিয়েছে সঠিক পরিপ্রেক্ষিত। এ শুধু এখন আর গোয়াবাসীর সমস্যা নয়— সমস্ত ভারতীয়ের এক বৃহৎ জাতীয় প্রশ্ন, সমগ্র দেশের স্বার্থেই যার নিষ্পত্তি অত্যাবশ্যক।'

সুতরাং লেফটেনান্ট জেনারেল জে. এন. চোধুরীর পরিচালনায় একষট্টি সালের আঠারোই ডিসেম্বরে গোয়া অভিমুখে শুরু হয় সশস্ত্র অভিযান যার নাম 'অপারেশন বিজয়'। মাত্র ছাব্বিশ ঘন্টার পর পর্তুগীজ সেনাপতি আত্মসমর্পণ করেন। ভারতের জাতীয় পতাকা ওড়ে গোয়া, দমন, দিউ-এর সর্বত্র এবং সেখানকার শাসনভার ন্যস্ত হয় ভারত সরকারের উপর।

পরিশিষ্ট : নেতাজীর প্রয়াণ বিষয়ক বিতর্ক

ঐতিহাসিকের কাজ হল তথ্যনিষ্ঠ ও বাস্তবসম্মত সংবাদ পরিবেশন করা। কিন্তু কোনো একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে যখন ঐতিহাসিকেরা কোনো নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন না, তখন পরবর্তীকালের গবেষকদের কাছে এই বিষয়টি একটি সমস্যার সৃষ্টি করে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনা করতে বসে আমরা ইতিহাসের পথ ধরেই বহু শতাব্দী পেরিয়ে এসেছি। কিন্তু পঁয়তাল্লিশ সালের আঠারোই আগস্ট অর্থাৎ স্বাধীনতা প্রাপ্তির মাত্র দু'বছর আগে এসে ভারত-ইতিহাসের একটি প্রচণ্ড বিতর্কমূলক ঘটনার মুখোমুখি হলাম আমরা। প্রশ্নটি হল, ওই তারিখে তাইহোকুতে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর জীবনাবসান হয়েছে কিনা?

যাঁরা বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর ওই দিন মৃত্যু হয়েছে বলে বিশ্বাস করেন, তাঁদের দেওয়া নেতাজীর প্রয়াণ সম্পর্কিত বিবরণী আমরা ইতিপূর্বেই লক্ষ্য করেছি। কিন্তু পরিশিষ্টে ভিন্ন মতাবলম্বীদের অভিমত পরিবেশন না করলে ইতিহাসের বিচারে নিরপেক্ষতা বজায় থাকবে না। তাই, এই প্রতিবেদন।

মাইকেল এডওয়ার্ডস, হিউ টয় এবং তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এ্যাটলী স্বীকার করেছেন, আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সংগ্রাম এবং দিল্লীতে এই ফৌজের তিনজন সেনাপতির বিচার ব্রিটিশ ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে বিদ্রোহ সৃষ্টি করেছিল। এই সৈন্যদের আনুগত্য আর ব্রিটিশ শাসকদের প্রতি অটুট থাকল না। এই কারণে ব্রিটিশ সবকার ভারতীয়দের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত নেন।

এই একই অভিমত পোষণ করতেন অনেক প্রখ্যাত ভারতীয় রাজনীতিবিদ। ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন আচার্য জে.বি. কৃপালনি। তিনি ওই সময়ে বলেছিলেন, নেতাজীর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ আড়াই বছরে যা করেছে, কংগ্রেস ষাট বছরেও তা করতে পারে নি। অথচ ভারতবর্ষের প্রতিটি সচেতন নাগরিক জানেন, ভারত সরকার পেনশনেব প্রশ্নে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের এই লড়াকু সৈনিকদের প্রতি আজও বৈষম্যমূলক আচরণ করে চলেছেন। ব্রিটিশ আমলে কমপক্ষে যাঁরা আঠারো মাস জেল খেটেছেন তাঁরাই স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন ও পেনশন পাচ্ছেন। কিন্তু আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অধিকাংশ স্বাধীনতা সংগ্রামীকে পেনশন দেওয়া হয়নি। বি.সি. দত্ত ছাড়া নৌবিদ্রোহের সৈনিকরা পেনশন পাননি।

এ তো গেল আজাদ হিন্দ্ ফৌজের প্রতি ভারত সরকারের তাচ্ছিল্য ও উদাসীনতার কথা। কিন্তু এই উদাসীনতা চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছে যায় ওই ফৌজের সর্বাধিনায়ক নেতাজীর প্রতি। নেতাজীর মৃত্যু হয়েছে কিনা তার চূড়ান্ত প্রমাণ নেই। এখন পর্যন্ত যা কিছু হয়েছে, সমগ্র তদন্তটাই অনুমান নির্ভর। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জবাহরলাল নেতাজীর মৃত্যুর উপর সঠিক আলোকপাত করতে যে তদন্ত কমিশন গঠন করেন, তার দু'জন সদস্য, শাহনওয়াজ খাঁ ও এস. মৈত্র তাঁদের প্রতিবেদনে জানান, পঁয়তাল্লিশ সালের আঠারোই আগষ্ট ফরমোজার (তাইওয়ান) তাইহোকু বিমানবন্দরে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হয়েছে এবং তাঁর চিতভস্ম টোকিওর রেনকোজি মন্দিরে রক্ষিত আছে। কিন্তু ওই তদন্ত কমিশনের তৃতীয় সদস্য, নেতাজীর ভাই সুরেশচন্দ্র বসু এই ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি তথ্য বিশ্লেষণ

করে দৃঢ়তার সঙ্গে লেখেন , 'I am firmly of opinion that the aircraft accident did not take place and that Netaji Subhas Chandra Bose did not die, as alleged ' আরও দু'টি সন্দেহজনক ঘটনা জিজ্ঞাসু মনকে নাড়া দেয়। প্রথমত, বিতর্কিত বিমান দুর্ঘটনার প্রতিবেদনে নেতাজীর বাঁধানো দাঁতটির কোনো উল্লেখ নেই। দ্বিতীয়ত, ছাপ্পান্ন সালে যে জাপানী প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, রেনকোজি মন্দিরে নেতাজীর চিতাভস্ম রক্ষিত আছে সেই প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত শাহনওয়াজ এবং খোসলা কমিশনে পেশ করা হয় নি।

শুধু তাই নয়, আটাত্তর সালের তেসরা সেপ্টেম্বর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে শাহনওয়াজ কমিটি ও খোসলা কমিশনের রায় পুরোপুরি বাতিল করে বলেছিলেন, ' reasonable doubts have been cast on the correctness of the conclusions reached in the two reports and various important contradictions in the testimony of witness have been noticed Some further contemporary official documentary records have also been available In the light of those doubts and contradictions and those records, Government find it difficult to accept that earlier conclusions are dicisive '

বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু-সম্পর্কে স্বয়ং গান্ধীজী এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলে সংশয় ছিল। তাই পঁয়তাল্লিশ সালের আগস্ট মাসে বিমান দুর্ঘটনা ঘটার এক বছর পরে গান্ধীজীর সহযোগী, গান্ধী আশ্রমের আবাসিক ও দাদাভাই নওরোজির নাতনি খুরশিদ নওরোজি মার্কিন লেখক লুই ফিশারকে লিখেছিলেন— 'ভারতের সেনাবাহিনী আন্তরিকভাবে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। সুভাষচন্দ্র বসু যদি এখন রাশিয়ার সাহায্য নিয়ে ভারতে আসেন তা হলে গান্ধীজী বা কংগ্রেস কেউ দেশকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে না।'

খুরশিদ নওরোজি যখন জানতেন, তখন গান্ধীজীও নিশ্চয়ই জানতেন, তাইহোকুর বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু সংবাদ মিথ্যা। নিউজ এজেন্সি মারফত নেতাজীব মৃত্যু সংবাদ ও তাঁর দেহ দাহ করার কথা শুনে গান্ধীজী বলেছিলেন, 'ইয়ে সব ঝুট হ্যায়, সুভাষ মরনা নেহি সকতা, দুসরা কিসিকা লাশ জ্বলা দিয়া হোগা।'

ব্রিটিশ সরকারও নেতাজীর মৃত্যু সংবাদ বিশ্বাস করেনি। তাই, তারা নেচার-কিওর হোমে গান্ধীজীর ঘরে তল্লাশি চালায়। তাদের হাতে ছিল সায়গন থেকে পলাতক সুভাষচন্দ্র বসুকে গ্রেপ্তারের ওয়ারেন্ট।

নেতাজীর প্রয়াণ সম্পর্কে জবাহরলাল নেহরুর প্রতিক্রিয়া অদ্ভুত, বিচিত্র ও বিস্ময়কর। তিনি বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু-সংবাদ বিশ্বাসই করেন নি। জাপান থেকে বেতারে নেতাজীর মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হলে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি শোনালেন, 'I disbelieve the authenticity of the news ' জবাহরলালের মতো একই অভিমত পোষণ করতেন ইঙ্গ-মার্কিন কর্তৃপক্ষও। জেনারেল ম্যাক আর্থার সোজাসুজি জানালেন, 'Bose has again escaped' লর্ড ওয়াভেল লিখলেন, 'It is just what would be given out and if he (Netaji) meant to go underground' কিন্তু তাই বলে ইঙ্গ মার্কিন কর্তৃপক্ষ তো নেতাজীর মতো চরমতম শত্রুর মৃত্যু সম্পর্কে সুনিশ্চিত না হয়ে স্বস্তিতে থাকতে পারেন না। তাই, ওঁরা ওঁদের সুদক্ষ গোয়েন্দা বাহিনীকে এ সম্পর্কে সঠিক তথ্য অনুসন্ধান করতে নির্দেশ দিলেন এবং গোয়েন্দারা নেতাজীর মতো ভারত-বিখ্যাত নেতার সঠিক সন্ধান পাবার জন্য ওঁদের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য বন্ধু, আর এক ভারত বিখ্যাত নেতা, জবাহরলালের দ্বারস্থ হয়ে সবকিছু জেনে- শুনে কর্তৃপক্ষের কাছে গোপন রিপোর্টে লিখলেন, 'There is, however, a secret report which says Nehru received a letter from Bose saying he was in Russia and wanted to escape in India '

জবাহরলাল দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, বিমান-দুর্ঘটনার গল্পটি নিছক বানানো। নেতাজী রাশিয়াতেই আছেন। ওঁর মনে প্রশ্ন জেগেছিল, মিত্রপক্ষের দেশ হয়ে ব্রিটিশের পয়লা নম্বর শত্রু সুভাষকে রাশিয়া কেন আশ্রয় দিল ? এই প্রশ্ন জবাহরলাল তুললেন তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এ্যাটলীর কাছে। খোসলা কমিশনের সামনে শ্যামল জৈন তাঁর সাক্ষ্যে বলেছেন, জবাহরলাল এ্যাটলীকে পাঠানোর জন্য শ্যামলকে

যে চিঠিটি টাইপ করতে দেন, সেই চিঠিতে জবাহরলাল লিখেছিলেন, 'I understand from a reliable source that Subhas Chandra Bose, your war criminal, has been allowed to enter Russian Teritory by Stalin . please take note of it and do what you consider proper and fit' অর্থাৎ ইংরেজদের যুদ্ধাপরাধী সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জবাহরলাল ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করছেন।

জবাহরলাল শুধু এ্যাটলীকে অনুরোধ করেই ক্ষান্ত হন নি, বাহান্ন সালে প্রকাশিত জন গান্থারের 'Inside Asia' বই পড়লে জানা যায়। জবাহরলাল আমেরিকার রাষ্ট্রপতিকেও জানিয়েছিলেন, সুভাষ বোস জীবিত আছেন। ওঁর দৃঢ় ধারণা ছিল, জাপানীরাই পরিকল্পনামতো নেতাজীকে আত্মগোপন করতে সহায়তা করেছে। কারণ ইংরেজ ও আমেরিকানদের হাতে নেতাজী ধরা পড়ুন এটা ওঁরা চায় নি।

নেতাজী যে রাশিয়ায় ছিলেন, সেকথা ড. সত্যনারায়ণ তাঁর 'Netaji Mystery' গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন। ওঁর গবেষণা অনুযায়ী নেতাজীর নির্দেশেই সিঙ্গাপুর, ব্যাঙ্কক, সায়গণ, তুরিণ হয়ে ফরমোজার তাইহোকুর বিমানবন্দর ছুঁয়ে তাঁর বিমান উড়ে যায় মাঞ্চুরিয়ার দাইরেনে। এখানে কনফুসীয় সাধুর ছদ্মবেশে নেতাজী আটচল্লিশ সাল পর্যন্ত ছিলেন। এখানে রাশিয়ান মিলিটারি পুলিশ তাঁকে বন্দী করে। তাঁকে ইয়াকুটস্পের বন্দী শিবিরে পাঠানো হয়। তাঁর সেল নম্বর ছিল পঁয়তাল্লিশ। পঞ্চান্ন সাল পর্যন্ত নেতাজী ওই সেলে ছিলেন। পরবর্তী ঘটনা ড. সত্যনারায়ণ জানাতে পারেন নি। বাংলার তৎকালীন ছোটলাট স্যার আর. জি. কেসির রেডিও মনিটর মিঃ কর পঁয়তাল্লিশ সালের ঊনিশে ডিসেম্বর হেডফোনে শুনতে পান, 'This is Radio Manchuria, Subhas Bose speaking' আমেরিকার গোয়েন্দা অফিসার হ্যারল্ড রবিনসন নাকি ফরমোজায় বন্দী শিবিরে নেতাজীকে দেখতে পেয়েছিলেন।

আটচল্লিশ সালের শেষের দিকে রাশিয়ায় নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত রাশিয়া থেকে ফিরে পালাম বিমানবন্দরে পৌঁছে সাংবাদিকদের বলেন, 'আমার কাছে এক উত্তেজনাকর খবর আছে।' খবরটি হল যে নেতাজীর রাশিয়ায় বন্দী হওয়ার খবর, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, তবে বিজয়লক্ষ্মী জবাহরলালের চাপে অতঃপর আর কখনও মুখ খোলেন নি।

তবে জনমতের চাপে পড়ে জবাহরলাল তিন সদস্যবিশিষ্ট শাহনওয়াজ কমিটি গঠন করে ওঁদের উপর নেতাজীর তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনা ও তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের দায়িত্ব দেন। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, এই সদস্যরা কেউ বিমান দুর্ঘটনার ক্ষেত্র তাইহোকুতে যান নি। এবং এঁদের মতো পরবর্তীকালে গঠিত খোসলা কমিশনও যায়নি। তবু এঁরা বললেন, নেতাজী ওই বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেছেন এবং তাঁর চিতাভস্ম জাপানের রেনকোজি মন্দিরেই রক্ষিত আছে। এই প্রতিবেদনের জন্য সম্ভবত জবাহরলাল শাহনওয়াজকে রেলমন্ত্রী হিসেবে তাঁর মন্ত্রী সভায় নিয়োগ করেন আর মিঃ মৈত্র হয়ে যান ব্রিটেনে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত।

আসলে, নেতাজীর মৃত্যু হয় নি এবং স্ট্যালিনের জমানায়, তিনি রাশিয়ায় আছেন— এটা ছিল জবাহরলালের দৃঢ় ধারণা। অথচ নেতাজীর মৃত্যুর একটা আপাত বিশ্বাসযোগ্য যুক্তি খাড়া করতে তাঁর ছিল অন্তহীন আগ্রহ। এই ধরণের দোদুল্যমানতার নজির ওঁর জীবনে অনেকবার লক্ষ্য করা যায়।

এইবার দেখা যাক রেনকোজি মন্দিরে উপস্থিত হয়ে জবাহরলাল কী করেছিলেন। জবাহরলাল ওই মন্দিরে যান সাতান্ন সালের তেরোই অক্টোবর। দর্শনার্থীর জন্য রক্ষিত খাতায় তিনি কিছু না লিখে তাঁর নিজের একটি ফটোর নিচে লিখলেন, 'বুদ্ধের বাণী মনুষ্য সমাজে শান্তির বারি সিঞ্চন করুক।' মন্দিরটি ভগবান বুদ্ধের স্মরণে, সুতরাং তিনি বেঠিক কিছুই লেখেন নি।'

কিন্তু নারায়ণ সান্যালের 'নেতাজি রহস্য সন্ধানে' পড়লে জানা যায়, নেতাজীর ভস্মাধারটি খুলে তাঁকে দেখানো হয়। জবাহরলাল দেখতে পান, তার মধ্যে কোনো মানুষের মাথার করোটির কিছু অংশ এবং বাকিটা শুধু ভস্ম। ভস্মাধারের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি মস্তক অবনত করেন নি। তিনি যখন সেই ঘর ছেড়ে যাচ্ছিলেন তখন ওই মন্দিরের প্রধান পুরোহিত মোচিজুকি তাঁকে অনুরোধ করেন একটি ধূপকাঠি জ্বেলে দিতে। উনি যেন বিরক্ত হলেন। ওখানে তখন সমবেত অন্যরা কাঠিটা জ্বেলে দিলে জবাহরলাল ধূপদানিতে সেই কাঠিটা গুঁজে না দিয়ে সেটা টেবিলের এক পাশে রেখে হন হন করে বেরিয়ে গেলেন।

রেনকোজি মন্দিরে ইন্দিরা গান্ধী যান উনসত্তর সালের ছাব্বিশে জুন। মন্দিরে রক্ষিত নেতাজীর সুপরিচিত ফটো ও তার পাশে রক্ষিত তথাকথিত ভস্মাধার ইন্দিরার চোখে পড়লেও তাঁর মানসিক প্রতিক্রিয়া জানা যায় নি। তিনিও তাঁর বাবাকে অনুসরণ করে বুদ্ধ-বন্দনা করে খাতায় লিখেছেন, 'বুদ্ধের আলোক বর্তিকা যেন আমাদের পথ দেখায়; সত্যের পথে, শান্তির পথে, সেবার পথে পরিচালিত করে।'

আসলে, ভারত সরকারের যদি সদিচ্ছা থাকত, তাহলে সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির সূত্র ধরে নেতাজীর অন্তর্ধান বা প্রয়াণ রহস্যের সূত্র উন্মোচন করতে সচেষ্ট হতেন। পেরেস্ত্রৈকা ও গ্লাসনস্তের সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও ভারত সরকার শুধু মৌনই থাকেন নি, তাঁরা পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নকে অনুরোধ করেছিলেন, নেতাজীর উপর কে. জি. বি. ফাইল যেন জনসমক্ষে প্রকাশ করা না হয়। এখন অবশ্য এশিয়াটিক সোসাইটির গবেষকদের উদ্যম ও সনিষ্ঠ প্রয়াসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে নেতাজীর সশরীরে রাশিয়ায় উপস্থিতির সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দল কংগ্রেসের এ. আই. সি. সি'র. মুখপাত্র ভি. এন. গ্যাডগিল পঁচানব্বই সালের পনেরোই সেপ্টেম্বর তারিখে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানালেন, 'নেতাজীর মৃত্যুর ব্যাপারে মস্কো থেকে এশিয়াটিক সোসাইটির গবেষকরা যে তথ্যাবলী সংগ্রহ করেছেন, সেগুলি চাওয়া উচিত কেন্দ্রীয় সরকারের এবং প্রয়োজনে ওই তথ্যগুলি খতিয়ে দেখে তদন্ত করা দরকার।'

এই সম্পর্কে আরও কয়েকজনের প্রাপ্ত অভিমত খতিয়ে দেখা যাক। সম্প্রতি আই. এন. এ. মামলার বিখ্যাত ত্রিমূর্তির অন্যতম কর্নেল ধীলন নাকি ভারত সরকারের বর্তমান বিদেশমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়কে ভারতে নেতাজীর চিতাভস্ম আনতে অনুরোধ করেছেন এবং শোনা যাচ্ছে আই. এন. এ.-র ঝাঁসীর রানী বিগ্রেড কর্নেল লক্ষ্মী সায়গলের সঙ্গেও প্রণ-··পর কথা হবে। কিন্তু এ সম্পর্কে লক্ষ্মী সায়গলের স্বামী পি. কে. সায়গল কী বলেন তা এস. এ. আয়ারের জবানিতে শোনা যাক, 'He (P K Saigal) was not convinced by the burns on Habib's (Col Habib-Ur-Kahaman) hand's and Habib's only woollen khaki uniform which he was supposed to have been wearing in the Red Fort, looked too undamaged to have been through a fire'

যিনি সুদূর জার্মানী থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত সাবমেরিনের মধ্যে প্রায় সাড়ে তিন মাস ধরে নেতাজীর ঘনিষ্ঠতম সান্নিধ্যে ছিলেন সেই আবিদ হাসানের অভিমত হল, হবিবুর রহমান অসত্য বলেছেন। 'He was sure that Netaji must have safely crossed over to the Russin occupied Zone in Manchuria in August 1945 ।' এই রকম একটি ইঙ্গিতও সম্প্রতি এশিয়াটিক সোসাইটির ভারতীয় গবেষকদল রাশিয়া থেকে পেয়েছেন।

এমন কি, বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর জীবনান্তের তথ্যে বিশ্বাসী এস.এ.আয়ার সদুত্তর দিতে পারেন নি, যখন তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'What happened to Netaji's favourite silver cigarette case which could not be reduced to ashes and what happened to his reading glasses which he always carried in his bushpocket?'

এইসব মন্তব্য ও অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি, পঁচানব্বই সালের উনত্রিশে মে তারিখে পররাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী আর. এল. ভাটিয়া সংসদে ঘোষণা করেছিলেন, 'নেতাজীর চিতাভস্ম দেশে আনার চেষ্টা করলে প্রচণ্ড বিতর্ক ও উত্তেজনার সৃষ্টি হবে।' তার কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন, 'নেতাজীর নিশ্চিত মৃত্যুর কোনো সংশয়বিহীন তথ্য সরকারের হাতে নেই।'

শাহনওয়াজ কমিটি ও খোসলা কমিশন নেতাজীর মৃত্যু সম্পর্কে কোনো আলোকপাত করতে পারেনি, মোরারজি দেশাই এই সম্পর্কে ভারত সরকারের অক্ষমতার কথা সংসদে সুস্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করেছেন। এমন কি, ইন্দিরা গান্ধীর সময়ে নেতাজীর ভ্রাতুষ্পুত্রকে নিয়ে যে কমিটি তৈরি হয়েছিল সেটা মাঝপথে ধামা চাপা পড়ে। কোনো কমিটিই নেতাজীর মৃত্যুর প্রশ্নে পরিচ্ছন্ন কিনারা করে তার প্রতিবেদন জনসমক্ষে প্রকাশ করতে পারেনি। তা ছাড়া, সুপ্রিম কোর্টে নেতাজীকে মরণোত্তর 'ভারতরত্ন' দেবার উদ্যোগের সময় যে মামলা রুজু হয়েছে এখনও তার কিনারা হয়নি। এইরকম একটা সামগ্রিক রহস্যময়তার অন্তরালে দশকের পর দশক ধরে সরকারে উপর যখন একটা অস্বস্তির কাঁটা ঝুলছে, তখন প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সরকারীভাবে জাপান সফরের সময় জাপান সরকার নেতাজীর চিতাভস্ম ভারতে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রণববাবুর কাছে আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রস্তাব দেন। এই ধরনের প্রস্তাব

রেনকোজি মন্দিরের তরফ থেকে অনেকবারই দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এইবারের প্রস্তাবটির গুরুত্ব অনেক বেশি। প্রথমত, এই প্রস্তাবটি প্রদান ও গ্রহণ করা হয়েছে উচ্চতম সরকারী পর্যায়ে। দ্বিতীয়ত, আসন্ন নেতাজী জন্মশতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে ওঁর চিতাভস্ম ফিরিয়ে আনার গুরুত্ব অসীম এবং তৃতীয়ত, এই চিতাভস্মকে কেন্দ্র করে আসন্ন নির্বাচনের কথা মনে রেখে রাজনৈতিক দলগুলো ফায়দা লুটতে উঠে পড়ে লাগবেন যদিও নেতাজীর রাজনৈতিক জীবনদর্শন থেকে এঁরা সহস্র যোজন দূরে অবস্থিত।

তবু ওই চিতাভস্মের কলসটি এদেশে এখন আনা অনেক জরুরী। নেতাজীর ধর্মনিরপেক্ষতা, অসাম্প্রদায়িকতা, গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা, প্রগতিশীলতা ও একনিষ্ঠ দেশপ্রেমের পথ অনুসরণ করার যতটা প্রয়োজনীয়তা আছে, তার চেয়ে এদেশে অনেক বেশি দরকার ওঁর ভস্মাধার-রক্ষিত কলসটির। যদিও পুলিশ-সূত্রে উননব্বই সালের চৌঠা সেপ্টেম্বরে টোকিও থেকে প্রচারিত হয় যে, এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে জাপানের তিনশো পঁয়তাল্লিশ বছরের পুরোনো ঐতিহাসিক রেনকোজি বৌদ্ধ মন্দিরটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়েছে, তাতে কি? যাঁরা মনে করেন, মন্দিরটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হলেও কোনো এক অলৌকিক প্রভাবে কলসটি তো সুরক্ষিত থাকতেও পারে, তাঁদের নিরস্ত করবে কে?

এই গ্রন্থটি রচনায় আলোচিত আকর গ্রন্থসমূহের তালিকা

History of Freedom Movement in India (3 Vols.) — R C Majumder.
Indian struggle for freedom. Hirendranath Mukherjee
ভারতের জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ। নেপাল মজুমদার
ইতিহাসের সন্ধানে। কৃষ্ণা বসু
আনন্দমঠ ও ভারতের জাতীয়তাবাদ। জীবন মুখোপাধ্যায়
নেতাজীর সহধর্মিনী। শেখর বসু
ভারতের জাতীয় আন্দোলন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
বাংলাদেশের ইতিহাস (৪ খণ্ড)। রমেশচন্দ্র মজুমদার
স্বাধীনতার পূর্বাভাস। অন্নদাশঙ্কর রায়
অনির্বাণ জ্যোতি। শিশিরকুমার বসু
ভারতীয় সন্ত্রাসবাদ। চার্লস টেগার্ট
আজাদ হিন্দের শেষ লড়াই। রমেন দাস
আমার বন্ধু সুভাষ। দিলীপ কুমার রায়
India from Curzon to Nehru and after—Durga Das
মহানিষ্ক্রমণ। শিশির কুমার বসু
সুভাষ চন্দ্র (৩খণ্ড)। পবিত্র কুমার ঘোষ
নেতাজী রহস্য সন্ধানে। নারায়ণ সান্যাল
আমি সুভাষ বলছি (৩খণ্ড)। শৈলেশ দে
পনেরোই আগষ্ট। প্রমথনাথ বিশী
আত্মকথা ও দুষ্প্রাপ্য রচনা। রাসবিহারী বসু
Netaji Through German Lens—Nanda Mukherjee
সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং। শঙ্করীপ্রসাদ বসু
রচনাবলী (৬খণ্ড)। সুভাষ চন্দ্র বসু।
সুভাষচন্দ্র : হরিপুরা থেকে রামগড়। নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত
চরণরেখা তব। কৃষ্ণা বসু
A History of India (2 Vols)—Percival Spear
A History of India — Ramila Thapar
Vivekananda's Influence on Subhas—Nanda Mukhejee
বঙ্গভঙ্গ। প্রমথনাথ বিশী
তরুণের স্বপ্ন। সুভাষচন্দ্র বসু
পত্রাবলী। সুভাষচন্দ্র বসু

The Constituent Assembly of India—Ed. A.C Banerjee
কারাকাহিনী। অরবিন্দ ঘোষ
আত্মকথা। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ
বাঙলায় বিপ্লবপ্রচেষ্টা। হেমচন্দ্র কানুনগো
শ্রী অরবিন্দ ও বাংলার স্বদেশীযুগ। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী
নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনা। সমর গুহ
বাঙলায় বিপ্লববাদ। নলিনীকিশোর গুহ
বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি। যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়
রবীন্দ্র রচনাবলী। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত
তাইহোকু থেকে ভারতে। শ্রী অভিজিৎ
স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা। উদ্বোধন কার্যালয়
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বা অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত
বিপ্লবতীর্থে। ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়
চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন। চারুবিকাশ দত্ত
আমি নেতাজীকে দেখেছি। নারায়ণ সান্যাল
সবার অলক্ষ্যে (১ম ও ২য় পর্ব) । ভূপেন্দ্র কিশোর বক্ষিত রায়
নিবেদিতা লোকমাতা। শঙ্করীপ্রসাদ বসু
আন্দামানে ত্রিশ বৎসর। ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী
বিপ্লবের পদচিহ্ন। ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত
কাকোরী ষড়যন্ত্র। মনীন্দ্র নারায়ণ রায
India Wins Freedom—Moulana Abul Kalam Azad
Sedition Committee's Report (1918)—President of the Commitee, justice Rawlatt
The Last Days of British—Raj Leonard Mosley
আমি নেতাজীর অন্তর্ধানে সঙ্গী ছিলাম। ভগৎরাম তলোয়ার
The Last Years Of British India—Michael Edwardes
সুভাষ ঘরে ফেরে নাই (৩খণ্ড)। শ্যামল বসু
নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্য। বরুণ সেনগুপ্ত
Indian Polities—coupland
My Autobiography—Jawaharlal Nehru
Springing Tiger—Hugh Toy
Pilgrimage to Freedom—K M Munshi
Swami Vivekananda, Patriot parophet—Bhupendra Nath Datta
Subhas Chandra Bose—The British Press, Intelligence & Parliament—Nanda Mukherjee
ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব। ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়।
The History of Indian National Congress—Pattavi Sitaramyya
Role of Honour—Kalicharan Ghosh
Indian Freedom Movement Revolutionaries in America —Kalyan Kumar Banerjee
Memoirs—M N Roy
The Sepoy Mutiny, 1857—Haraprasad Chatterjee
Two great Indian Revolutionaries—Uma Mukherjee
Bhagat Singh and his Comrades—Ajoy Ghosh
Police & Government Reports—Central & Provincial
The Statesman, Amrita Bazar Patrika আনন্দবাজার পত্রিকা।